মার্কসীয়-লেনিনীয় তত্ত্ব

প্রগতি

সমাজবিদ্যা

সমাজবিদ্যা

সমাজবিদ্যা

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

মূল রুশ থেকে অনুবাদ: অরুণ সোম

НАУКА ОБ ОБЩЕСТВЕ

На языке бенгали

Книга подготовлена авторским коллективом
Шахназаров Г. Х., Боборыкин А. Д.,
Красин Ю. А., Суходеев В. В.,
Писаржевский О. Н.

© বাংলা অনুবাদ · প্রগতি প্রকাশন · ১৯৭৭

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

О $\frac{60601-188}{014(01)-77}$ 602—77

সূচি

মুখবন্ধ 7

১

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বনিয়াদ

১ ॥ কমিউনিজমের তত্ত্বগত ভিত্তি . . ১৩

প্রথম অধ্যায়। জগৎ ও তার জ্ঞানসংক্রান্ত দার্শনিক ধারণা . ২২

২ ॥ বস্তু ও গতি ২৩

৩ ॥ জাগতিক ঘটনাপুঞ্জের সার্বিক সম্পর্ক ও বিকাশ ৩০

৪ ॥ চৈতন্য: অত্যুন্নত বস্তুর ধর্ম . . . ৪৭

৫ ॥ বস্তুবাদ ও ভাববাদ ৬০

দ্বিতীয় অধ্যায়। সমাজবিকাশের মতবাদ ৭১

৬ ॥ ইতিহাসের বস্তুবাদী উপলব্ধি . . ৭২

৭ ॥ সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা . . ৮৪
৮ ॥ শ্রেণী ও শ্রেণী-সংগ্রাম ৯১
৯ ॥ জাতি ও জাতিসম্পর্ক ১০১
১০ ॥ ঐতিহাসিক অপরিহার্যতা ও মানুষের ক্রিয়াকলাপ ১০৮

তৃতীয় অধ্যায়। **পুঁজিবাদ ও তার পতন** ১২০

১১ ॥ পুঁজিবাদী উৎপাদন ১২০
১২ ॥ পুঁজির দ্বারা শ্রমশোষণ ১৪০
১৩ ॥ সাম্রাজ্যবাদ ১৫৩
১৪ ॥ পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট . . . ১৬৬

চতুর্থ অধ্যায়। **পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগ** . ১৭৭

১৫ ॥ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র গঠন ১৭৭
১৬ ॥ বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ১৯১
১৭ ॥ শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলন . . ২১৩
১৮ ॥ জাতিসমূহের মুক্তি আন্দোলন . . ২২৪
১৯ ॥ শান্তি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান . . . ২৩১

২

সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম

পঞ্চম অধ্যায়। **সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা** ২৪৩

২০ ॥ মালিকানা ২৪৬
২১ ॥ পরিকল্পনাগঠন ২৫৮
২২ ॥ সমাজতন্ত্রে পণ্য-অর্থ সম্পর্ক . . . ২৬৫
২৩ ॥ ব্যবস্থাপনা ও অর্থনীতির পরিচালনা ২৭১
২৪ ॥ শ্রম ও বণ্টনব্যবস্থা ২৮২
২৫ ॥ পুনরুৎপাদন ৩০০

২৬ ॥ বর্তমান পর্যায়ে পার্টি ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্মপন্থা . . . ৩০৭
ষষ্ঠ অধ্যায়। **সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা** ৩২৬
২৭ ॥ শ্রমজীবীদের সমাজ ৩২৫
২৮ ॥ স্বাধীন জাতিগুলির সঙ্ঘ ৩৩৪
২৯ ॥ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র . . ৩৪৪
৩০ ॥ সোভিয়েত অধিকারবিধি ৩৫৮
৩১ ॥ শ্রমজীবীদের সামাজিক সংগঠনসমূহ ৩৬৭
৩২ ॥ সমাজতন্ত্র বিকাশের পথনির্দেশ . . ৩৮২
সপ্তম অধ্যায়। **কমিউনিজমের পথ** ৩৯৩
৩৩ ॥ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও বৈজ্ঞানিক-টেকনিক্যাল বিপ্লব ৩৯৩
৩৪ ॥ কমিউনিজমের দিকে গমনের দ্বন্দ্বতত্ত্ব ৪০১
৩৫ ॥ কমিউনিজমের বনিয়াদ ৪০৭
৩৬ ॥ শ্রেণীহীন সমাজের দিকে ৪৩০
৩৭ ॥ শহর ও গ্রাম ৪৩৫
৩৮ ॥ বুদ্ধিমার্গীয় ও শারীরিক শ্রম . . ৪৪০
৩৯ ॥ কমিউনিস্ট শ্রম ও বণ্টনের দিকে . ৪৪৬
৪০ ॥ কমিউনিস্ট সামাজিক আত্মনিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রব্যবস্থার পুনর্গঠন ৪৫৬
অষ্টম অধ্যায়। **নূতন মানুষের শিক্ষা** ৪৬০
৪১ ॥ ব্যক্তিমানুষ ও সমাজ ৪৬০
৪২ ॥ মেহনতে ধাতস্থ নূতন মানুষ . . ৪৭০
৪৩ ॥ সমাজতান্ত্রিক চেতনার বিশেষত্ব . . ৪৭৮
৪৪ ॥ বৈজ্ঞানিক বিশ্ববীক্ষা ৪৮৮
৪৫ ॥ নৈতিক দিগ্‌দর্শন ৪৯৬
৪৬ ॥ কমিউনিস্ট নীতিবোধ ও দৈনন্দিন জীবনচর্যা ৪৯৯
৪৭ ॥ মানুষের সব কিছু সুন্দর হওয়া চাই ৫০৭

নবম অধ্যায়। **পার্টি: কমিউনিজমের কর্ণধার** ৫১৩

৪৮ ॥ সোভিয়েত **সমাজে** পার্টির ভূমিকা . ৫১৪

৪৯ ॥ কমিউনিস্ট পার্টি জীবনের মূল নিয়ম ৫২৭

৫০ ॥ সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি ও বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন ৫৩৮

উপসংহার ৫৪২

মুখবন্ধ

বিংশ শতাব্দী মানবজাতির জীবনের দ্রুত ও গভীর পরিবর্তনের যুগ, আর সেই কারণেই এ যুগ নানা বিচিত্র নামে আখ্যাত। এই শতকের গোড়ায় যখন যন্ত্রবিজ্ঞান ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে বিদ্যুৎশক্তির প্রসার ঘটল তখন তার নাম হল বিদ্যুতের যুগ। পরবর্তীকালে পদার্থবিদেরা তার নাম দিলেন পারমাণবিক শক্তির যুগ, গণিতজ্ঞেরা দিলেন ইলেক্‌ট্রনিক কম্পিউটারের যুগ, রসায়নবিদেরা — কৃত্রিম উপাদানের যুগ আর জ্যোতির্বিদেরা — মহাকাশযাত্রার যুগ। প্রতিটি নামই কোন না কোন দিক থেকে সঙ্গত।

কিন্তু মহৎ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সমস্ত তাৎপর্য স্বীকার করে নিয়েও একথা বলতে হয় যে সমাজবিকাশের মূল গতি তাতে নির্ধারিত হয় না। বিজ্ঞান নিজে এবং তার কার্যত প্রয়োগ মূলত নির্ভর করে সমাজব্যবস্থার ওপর, — নির্দিষ্ট

সমাজে কারা শাসন করছে এবং সামাজিক বিকাশ কার স্বার্থের অধীন — সমাজতান্ত্রিক সমাজের মতো সমগ্র জনগণের স্বার্থের, না পুঁজিবাদী সমাজের মতো মুষ্টিমেয় বড় বড় মালিকের স্বার্থের, — তার ওপর।

বিংশ শতাব্দীর মূল বৈশিষ্ট্য হল কমিউনিজমের পথ উন্মুক্তকারী গভীরতম সামাজিক রূপান্তর।

আমাদের এই কালেই মানবজাতি সমস্ত রকম শ্রেণীগত ও জাতিগত উৎপীড়নের চূড়ান্ত অবসান ঘটাতে চলেছে, ন্যায়পরতার ভিত্তিতে সামাজিক সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস সাধন করছে; প্রতিক্রিয়া, কুসংস্কার ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানবজাতি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করছে সকল জাতির জন্য **শান্তি, শ্রম, মুক্তি, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব** ও **সুখ**। পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমে উত্তরণ — আমাদের কালের মর্মকথা।

সমাজ পুনর্বিন্যাসের বিশাল ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে: সোভিয়েত ইউনিয়নই প্রথম মানবজাতির সামনে কমিউনিজমের পথ উন্মুক্ত করেছে। এ শুধু কমিউনিজমের ওপর তার ঈর্ষণীয় অধিকার নয়, — এর ফলে বর্তেছে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তার দায়িত্ব, ইতিহাস ও উত্তরপুরুষের সামনে তার গুরুদায়িত্বভার।

'গঠনকর্ম' কথাটি বিশেষভাবে সেই সামাজিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রযোজ্য, যা সংঘটিত হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নে। কমিউনিজম গঠন — এর অর্থ হল জীবনযাত্রার পক্ষে অপরিহার্য শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে নূতন নূতন কলকারখানা, বিদ্যুৎকেন্দ্র ও রেলপথ নির্মাণ, ফসল ফলানো; কাজের সময় হ্রাসকরণ এবং শ্রমকে সৃজনশীল

ও আনন্দদায়ক করার উদ্দেশ্যে উৎপাদনের ক্ষেত্রে কলকব্জা ও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন ও প্রবর্তন; জনসাধারণের পরমায়ুবৃদ্ধি, স্বাস্থ্যসংরক্ষণ ও জীবনযাত্রাকে সুন্দর করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে আধুনিক বাসগৃহ, স্বাস্থ্যনিবাস, সংস্কৃতিভবন ও স্টেডিয়াম নির্মাণ; জনসাধারণের মধ্যে নূতন ধরনের সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন এবং এমন কমিউনিস্ট মানুষ গড়ে তোলা যে মানুষ অক্লান্ত স্রষ্টা, আত্মিক ঐশ্বর্য, নৈতিক পরিচ্ছন্নতা ও দৈহিক বিকাশে সমৃদ্ধ এক সুসমঞ্জস সর্বাঙ্গীণ মানুষ।

এইভাবে, কোটি কোটি মানুষের উদ্দেশ্যনিষ্ঠ শ্রমের পরিণতিরূপে কমিউনিস্ট সমাজের আবির্ভাব। কমিউনিজম গঠন তাই সমগ্র জাতির কাজ। জাতির চেতনা, উদ্যোগ, সংস্কৃতি ও পেশাগত দক্ষতার ওপর নির্ভর করে কমিউনিজমের অর্থনৈতিক কর্মসূচির সাফল্য।

সমাজজীবন অত্যন্ত জটিল। সমাজজীবনের নানা দিকের চর্চা নিয়ে ইতিহাস, দর্শনশাস্ত্র, রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র, নির্দিষ্ট অর্থবিদ্যা ও আইনবিদ্যা ধরনের বহু সমাজবিজ্ঞান প্রচলিত আছে। বর্তমান গ্রন্থে সমাজ ও তার বিকাশধারার সামান্য পরিচয় দেওয়া হয়েছে এবং সমাজ সম্পর্কে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তার মূল সূত্রগুলিমাত্র তুলে ধরা হয়েছে।

১

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বনিয়াদ

১ ॥ কমিউনিজমের তত্ত্বগত ভিত্তি

'ইউরোপ ভূত দেখছে, — কমিউনিজমের ভূত', — এই কথাগুলি দিয়ে শুরু হয়েছে বিখ্যাত 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার', যেখানে কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস তুলে ধরেছেন কমিউনিস্ট বিশ্ববীক্ষার মূল সূত্র। তারপর থেকে ১২৫ বছরেরও বেশি কেটে গেছে। কমিউনিজম এখন আর ভূত নয়, — এক প্রচণ্ড শক্তি, — যে শক্তি দুনিয়ার রূপান্তর ঘটাচ্ছে, বদলে দিচ্ছে এই গ্রহের রূপ। প্রতিবছরই বেড়ে চলেছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সমর্থকসংখ্যা, তার সংগ্রামী পতাকাতলে সমবেত হতে চলেছে সমগ্র শ্রমজীবী মানবসম্প্রদায়।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শক্তির উৎসটা কোথায়? শক্তি এখানেই যে এই মতবাদ সম্পূর্ণ বাস্তবসম্মত, তা বিশ্ববিকাশের নিয়মের সঙ্গে পরিচয় ঘটায়, মানবজাতির

সামনে জীবন, শ্রম ও সংগ্রামের তাৎপর্য খুলে ধরে। সুখ ও প্রগতির পথনির্দেশের দ্বারাই মার্কসীয়-লেনিনীয় মতবাদ **কমিউনিজমের তত্ত্বগত ভিত্তি** রচনা করেছে।

ব্যাপক অনুসন্ধানের ফল

মার্কসবাদের প্রস্তুতি — সমগ্র মানবেতিহাসের বহুবর্ষব্যাপী সুকঠিন বিকাশধারার মধ্য দিয়ে।

নির্মম শোষণের অত্যাচারে জর্জরিত ব্যাপক জনগণ চিরকাল স্বপ্ন দেখেছে উজ্জ্বল এক ভবিষ্যতের। এই স্বপ্নের রূপায়ণ ঘটেছে গানে আর কাহিনীতে, তার প্রকাশ্য অভিব্যক্তি ঘটেছে, কখনও বা তা ক্রোধের আকার নিয়ে ফেটে পড়েছে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের রূপে।

মানবজাতি তার শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়ে সমাজের ইতিহাসকে বোঝার চেষ্টা করেছে। আর তা থেকেই সৃষ্ট হয়েছে নানা দার্শনিক মতবাদ, অর্থনৈতিক তত্ত্বসমূহ, আঁকা হয়েছে আদর্শ সমাজব্যবস্থার চিত্র, যেখানে ন্যায়বিচারের প্রতি জনসাধারণের অটুট আস্থার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু অপরিণত সমাজ-সম্পর্ক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের স্বল্পতার দরুন এই সব মতবাদ কল্পস্বর্গবাদী চরিত্র লাভ করেছে মাত্র।

বিজ্ঞানভিত্তিক কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠার পূর্বশর্ত পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় মাত্র উনিশ শতকের মধ্যভাগ নাগাদ। পুঁজিবাদের বিকাশ সমাজজীবনে অর্থনীতির মুখ্য ভূমিকার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে। পুঁজিবাদের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীরও আবির্ভাব ঘটল। শ্রমিক শ্রেণী তার বার্তা ঘোষণা করল বৈপ্লবিক কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে (ফ্রান্সের লিয়োঁ ও জার্মানির সাইলেসিয়া তন্তুবায়দের বিক্ষোভ,

ইংলণ্ডের চার্টিস্ট আন্দোলন)। এরই পাশাপাশি প‌ুঁজিবাদী উৎপাদনের বিকাশ প্রকৃতিবিদ্যার অগ্রগতিতে প্রেরণা সঞ্চার করল; প্রকৃতিবিদ্যার ব্যাপক চর্চার ফলে প‌ৃথিবীর বিজ্ঞানসম্মত চিত্র গড়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য সঞ্চিত হল।

ন‌ূতন কমিউনিস্ট দ‌ৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্র রচিত হল। এর পরিপ‌ূর্ণতা যে আসন্ন হয়ে উঠেছিল দার্শনিক এবং রাজনৈতিক তত্ত্বসম‌ূহের বিকাশও তার সাক্ষ্য দেয়। ইতিমধ্যে বাস্তব অভিজ্ঞতার দাবিতে অগ্রণী সমাজচিন্তা এমন কতকগ‌ুলি প্রশ্ন তুলে ধরেছে যার জবাব ছিল মার্কসীয় মতবাদের কাছে। চিরায়ত জার্মান দর্শন, ব্রিটিশ রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র ও ফরাসী কল্পস্বর্গ সমাজতন্ত্র হয়ে দাঁড়াল মার্কসবাদের তত্ত্বগত উৎস।

চিরায়ত জার্মান দর্শনের বিশিষ্ট প্রবক্তা হলেন গেওর্গ হেগেল ও ল‌ুডভিগ ফয়েরবাখ। হেগেলের কৃতিত্ব এই যে তিনিই প্রথম বিকাশের তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন। তবে এই তত্ত্ব ছিল নেহাৎই সীমাবদ্ধ, কেননা হেগেলের মতে বিকাশ লাভ করে প্রকৃতি নয়, — এক পরম ভাব, যা নিজেই বিশ্বের ভিত্তি ও চরম কারণ। ফয়েরবাখ তার বিপরীতে বলেন যে পরম ভাব সম্পর্কিত কোন রকম আধ্যাত্মিক ও বিজ্ঞানবিরোধী ধারণার আশ্রয় না নিয়ে প্রকৃতিকে তার অভ্যন্তরস্থল থেকেই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। তিনি ধর্মীয় মতবাদের তীব্র সমালোচনা করেন। কিন্তু ফয়েরবাখের দ‌ৃষ্টিভঙ্গিও সংকীর্ণতা দোষে দ‌ুষ্ট। তিনি হেগেলীয় বিকাশতত্ত্বের বিরাট তাৎপর্য অন‌ুধাবন করতে পারেন নি এবং প্রকৃতি ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছেন। হেগেল ও ফয়েরবাখের মতবাদের মধ্যে এমন কতকগ‌ুলি বিশেষ চিন্তা ছিল যা মার্কসীয় দর্শন গড়ে তোলার প্রাথমিক পর্যায় হিশেবে কাজ করেছে।

রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের ক্ষেত্রে মার্কসবাদের প‌ূর্বস‌ূরী ইংরেজ অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডো। সামাজিক সম্পদের

উৎস যে শ্রম তা নির্দেশ করে দিয়ে তাঁরা বিজ্ঞানভিত্তিক রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের সূচনা করেছেন।

উনিশ শতকের মহান কল্পস্বর্গ-সমাজবাদী — আঁরি সাঁ-সিমোঁ, শার্ল ফুরিয়ে ও রবার্ট ওয়েন পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার উপর কঠোর সমালোচনার আঘাত হানেন ও শোষণমুক্ত এক আদর্শ সমাজের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু উক্ত উদ্দেশ্যে তাঁদের অবলম্বিত পন্থা মোটেই বাস্তবসম্মত ছিল না। কল্পস্বর্গ-সমাজবাদীদের অকপট বিশ্বাস ছিল যে আদর্শ সমাজব্যবস্থার উপায় হল সমাজকে সুশিক্ষিত করে তোলা এবং শোষক শ্রেণীর নীতিগত পরিবর্তনসাধন। তৎসত্ত্বেও তাঁদের মতবাদ বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ব রচনার পথ সুগম করেছে।

কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস তাঁদের পূর্বসূরী তাত্ত্বিকদের অনুসরণকারীমাত্র নন। তাঁরা উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ ভাবনাকে সমালোচকের দৃষ্টিতে বিচার করে পুনর্বিন্যাসের দ্বারা গড়ে তুললেন এমন এক অভিনব মতবাদ যা সবচেয়ে অগ্রণী ও বিপ্লবী শ্রেণীর — প্রলেতারিয়েতের — মূল স্বার্থসমূহের অভিব্যক্তি।

মার্কসবাদের প্রবর্তকরা সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করলেন:

সমাজতত্ত্বকে তাঁরা প্রতিষ্ঠা করলেন দৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিভূমির উপর, তাকে মুক্ত করলেন নানা রকম কপট ভাবনা, খামখেয়ালি কল্পনা ও কল্পস্বর্গবাদী পরিকল্পনা থেকে; এই সর্বপ্রথম, ভাবাদর্শ বলতে সচরাচর যে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রণালী বোঝায়, তা এক বিজ্ঞানের রূপ নিয়ে ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের বিষয়গত নিয়ম অনুসন্ধানে মনোনিবেশ করল।

তাঁরা সমাজতত্ত্বকে পরিণত করলেন প্রলেতারীয় গণ আন্দোলনের মতাদর্শে, এককালে যা ছিল ‘মানসিক

অভিজাত্যের' নাগালের মধ্যে তাকে তাঁরা বৈঠকখানার নিভৃত কক্ষ থেকে টেনে আনলেন **শ্রমজীবীদের স্বার্থে শ্রেণী-সংগ্রামের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে।**

তাঁরা **সমাজচিন্তার অনুধ্যান অতিক্রম** করলেন, তত্ত্ব ও প্রয়োগের বিচ্ছেদ ঘুচিয়ে দিলেন, শ্রমজীবীদের সজ্জিত করলেন বিশ্বরূপান্তর সংগঠনের প্রবল ভাবাদর্শগত অস্ত্রের সাহায্যে।

'মার্কসের মতবাদ সর্বশক্তিমান, কেননা তা বিশ্বাসযোগ্য,' — লেনিন এইভাবেই মার্কসবাদের অসাধারণ শক্তি ও প্রচণ্ড প্রভাবের সূত্র নির্দেশ করেছেন।

কমিউনিজমের মূল নীতির ভিত্তিতে সমাজের পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজন বিশ্বসম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধারণা। এই কারণেই মার্কসবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল **দর্শন — প্রকৃতি, সমাজ ও জ্ঞান বিকাশের মোটামুটি সাধারণ নিয়মসম্পর্কিত শাস্ত্র।**

তবে এক **সমাজব্যবস্থা** থেকে আরেক সমাজব্যবস্থায় **রূপান্তরের কারণ বুঝতে** গেলে কেবল সাধারণ নিয়মগুলির **জ্ঞানই যথেষ্ট হবে** না। **সকল** সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে **প্রধানতম স্থান** অধিকার করে থাকে অর্থনৈতিক সম্পর্ক, অথবা উৎপাদন-সম্পর্ক। এগুলির অধ্যয়ন না করে সমাজতন্ত্র এবং কমিউনিজমে কীভাবে আসা যেতে পারে — সে-প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়।

আর এই কারণেই মার্কসবাদের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছে **রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র — উৎপাদন-সম্পর্ক বিকাশের বিজ্ঞান।**

মার্কসবাদের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান — **বিজ্ঞানভিত্তিক কমিউনিজমের তত্ত্ব।** মার্কসবাদী দর্শন ও

মার্কসবাদী রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রনির্ভর এই তত্ত্ব **কমিউনিস্ট সমাজের আবির্ভাব ও বিকাশের নিয়ম** উদ্‌ঘাটন করে।

মার্কসবাদী চিন্তাধারা দর্শন, রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের মতবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, — তা সমাজবিদ্যার সকল ক্ষেত্রে, — ইতিহাস ও নীতিবিদ্যা, নন্দনতত্ত্ব, আইনশাস্ত্র ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিপ্লব এনে দিয়েছে। ঠিক কথায় বলতে গেলে জ্ঞানের এই সব এবং অন্যান্য শাখা একমাত্র তখনই বৈজ্ঞানিক চরিত্র লাভ করল যখন তা মার্কসীয় পদ্ধতিবিদ্যায় সজ্জিত হল, অর্থাৎ সামাজিক ঘটনার অধ্যয়নে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পেল।

এইভাবে, **মার্কসবাদ হয়ে দাঁড়াল প্রকৃতি ও সমাজবিকাশের সাধারণ নিয়মাবলী, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় এবং সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম গঠনের পথনির্দেশক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির এক সুসম্বদ্ধ পদ্ধতি।**

মার্কসবাদী দর্শন অথবা রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র অধ্যয়নকালে, বিজ্ঞানভিত্তিক কমিউনিজমের তত্ত্ব আয়ত্তে আনতে গেলে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে মার্কসবাদ হল এক অখণ্ড প্রণালী: তার সমস্ত উপাদানগুলি পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতিষ্ঠাতাদের অসংখ্য রচনার মধ্যে 'বিশুদ্ধ' অর্থনৈতিক বা দার্শনিক বলতে কোন রচনা নেই। দর্শন তাঁদের যুগিয়েছে সামাজিক সম্পর্কের সর্বাঙ্গীণ বিশ্লেষণের পদ্ধতি, আর তার ভিত্তিতে অতঃপর রচিত হয়েছে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। অন্য দিকে অর্থনীতি ও রাজনীতির গভীর অধ্যয়ন দার্শনিক সাধারণীকরণে নূতন মূল্যবান তথ্যের সংযোগ ঘটাল।

বিগতকালের চিন্তাবিদদের প্রয়াস ছিল এমন চূড়ান্ত তত্ত্ব খাড়া করা, যা রচয়িতাদের পরিকল্পনায়, সব রকম প্রশ্নের

চরম উত্তর দিতে সক্ষম। কিন্তু এমন কোন তত্ত্ব হতে পারে কি যা জীবনের সকল ঘটনা আগে থেকেই অনুমান করে ফেলে? আমাদের চারদিকের বাস্তবতা ত নিরন্তর বিকশিত হয়ে চলেছে, মানুষের জ্ঞানও ক্রমাগত চলেছে বৃদ্ধি পেয়ে। তত্ত্ব যখন নূতন তথ্যসমূহকে আমল না দিয়ে গোঁড়ামিতে পর্যবসিত হয় তখন তা জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, নিষ্ফল, — এমন কি ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়ায়, কেননা সে আর বাস্তবতার বিশ্বাসযোগ্য চিত্র দিতে পারে না। আর এই কারণেই তত্ত্বকে সর্বদা হতে হয় প্রয়োগনির্ভর। গ্যেটে ঠিকই বলেছেন:

তত্ত্ব নীরস জেন বন্ধু,
প্রাণতরু শ্যামলে শ্যামল।

সর্বায়িত চূড়ান্ত তত্ত্ব রচনার সকল প্রয়াস তাই সূচনাতেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। কিছুকাল যেতে না যেতে তাদের উদ্ভবকালের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত তত্ত্ব যে শ্রেণী স্বার্থের প্রকাশ ঘটিয়েছিল তার সঙ্গে একত্রে অতীতের গর্ভে মিলিয়ে গেল। শুধু সমাজচিন্তার ভাণ্ডারে রয়ে গেল সেই সব ধারণা যাতে বাস্তবতার অপেক্ষাকৃত গভীর প্রতিফলন ঘটেছে; সেগুলিকে গ্রহণ করল প্রয়োগের উপযোগী নূতন তত্ত্বসমূহ।

মার্কসীয় মতবাদ চরিত্রগতভাবে তার পূর্বগামী তত্ত্বসমূহ থেকে পৃথক। 'মার্কসবাদ কোন গোঁড়ামি নয়, — কার্যকলাপের পথনির্দেশক', — ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন এ কথাটা বারবার বলতে ভালবাসতেন। মার্কসবাদী তত্ত্বের সূত্রাবলী ক্রমাগত সমৃদ্ধ হয়ে চলেছে সমাজবিকাশের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও বিজ্ঞানের নব নব সাফল্যসাধনের মধ্য দিয়ে। মার্কসবাদ হল সৃজনশীল, উন্নয়নশীল মতবাদ।

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে ইতিহাস এক নূতন যুগে প্রবেশ করল। আসন্ন হয়ে উঠল সেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, যার অনিবার্যতা প্রতিপাদন করেছিলেন মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতারা। প্রলেতারিয়েতের সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল পুঁজিবাদের বৈপ্লবিক উচ্ছেদে তাদের কর্তব্য। আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক আন্দোলন সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করল, অন্য দিকে প্রকৃতিবিদ্যার অতি দ্রুত বিকাশের ফলে নূতন তথ্য ও আবিষ্কারসমূহের দার্শনিক সাধারণীকরণ হয়ে উঠল অবশ্যম্ভাবী: মার্কসবাদের সৃজনশীল বিকাশের দাবি তখন আসন্ন। এই মহান ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করলেন ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন।

গোঁড়া ব্যক্তিরা যে মার্কসবাদকে অনড় তন্ত্র হিশেবে বিবেচনা করে থাকে, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন নূতন ঐতিহাসিক যুগের কর্মপন্থা ও প্রকৃতিবিদ্যার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারসমূহের দার্শনিক তাৎপর্য গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম ক'রে নূতন নূতন ভাবধারার সংযোজনে মার্কসের মতবাদকে সমৃদ্ধ করলেন। তিনি মার্কসবাদী দর্শনের বিকাশ ঘটালেন, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায় হিশেবে সাম্রাজ্যবাদের নিয়মধারাকে অনুসন্ধান করলেন, উদ্ভাবন করলেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব, আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের নীতি ও কৌশল, পার্টিসম্পর্কিত শিক্ষা; সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের প্রাথমিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম গঠনের পথনির্দেশকারী তত্ত্ব গড়ে তুললেন। লেনিন মার্কসবাদের সার্বিক বিকাশ ঘটিয়ে তাকে এক নূতন স্তরে উন্নীত করেছেন। এই কারণেই আমরা **মার্কসবাদ-লেনিনবাদের** কথা বলে থাকি।

লেনিনের মৃত্যুর পর ইতিমধ্যে অর্ধশতাব্দীর বেশি কেটে গেছে। এই সময়ের মধ্যে মানবজাতির জীবনে বিশাল পরিবর্তন ঘটে গেছে, সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে শক্তিসম্পর্কের তীব্র পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। নূতন পরিস্থিতিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নবতর বিকাশ আসন্ন হয়ে পড়ল। এই সমস্যা যৌথভাবে পূরণ করছে বিশ্বের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিসকল। মার্কসীয়-লেনিনীয় মতবাদে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রথম অধ্যায়

জগৎ ও তার জ্ঞানসংক্রান্ত দার্শনিক ধারণা

বৈজ্ঞানিক তত্ত্বজ্ঞানের জগতে প্রবেশকারী মানুষের কাছে 'দর্শন' শব্দটি সূচনা করে এমন এক বিষয়ের, যা বোঝার পক্ষে জটিল ও দুরূহ, অথচ অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক, কেননা তাতে রয়েছে বিশ্বের নিগূঢ়তম রহস্য উদ্ঘাটনের প্রতিশ্রুতি। আর সত্যি সত্যিই দর্শন মানুষকে বাস্তব সম্পর্কে সচেতন ও বিবেচনাশীল হতে শেখায়। গ্রীক ভাষায় 'দর্শনের' প্রতিশব্দ যে অর্থ দাঁড়ায় 'জ্ঞানের প্রতি প্রীতি' — সেটা নিরর্থক নয়।

আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ বাস্তবের রূপ কী? সকল বস্তু ও বিষয়ের মূল কী? প্রাকৃতিক ঘটনাপুঞ্জের নির্দিষ্ট শৃঙ্খলার ব্যাখ্যা কী? পৃথিবীতে মানুষের ভূমিকা কী? জগৎ সম্পর্কে তার উপলব্ধিই বা কী? — এই সব প্রশ্ন **বিশ্ববীক্ষার, তথা জগৎসম্পর্কিত বোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি** গড়ে

তোলার এক পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতির ভিত্তি রচনা করে। প্রকৃতি ও সমাজসংক্রান্ত বিজ্ঞানের সাফল্যসাধন সাধারণীকরণের সাহায্যে দর্শন এসবেরই উত্তর দিয়ে থাকে।

২ ॥ বস্তু ও গতি

বস্তু কী?

যে মুহূর্তে আমরা ভাবতে বসি আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ জগতের রূপটা কী, — সেটাই তৎক্ষণাৎ আমাদের সামনে হয়ে দাঁড়ায় প্রথম দার্শনিক প্রশ্ন। মনে মনে ভাবা যাক প্রাকৃতিক বিষয় ও ঘটনাপুঞ্জের কথা। এখানে আছে ক্ষুদ্রতম কণিকা ও বিশাল নক্ষত্রজগৎ, সামান্যতম এককোষী প্রাণী ও অত্যুন্নত জীব। বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় আয়তনে, রূপে, রংয়ে, ঘনত্বে, গঠনের জটিলতায়, বিন্যাসে ও আরও অনেক ধর্মের দিক থেকে। প্রকৃতি অতি বিচিত্র, সেখানে অগণিত বিচিত্রতম গুণের অবস্থান। এই বৈচিত্র্যের মধ্য থেকে সাধারণ এমন কিছু কি খুঁজে পাওয়া সম্ভব, যা জগতের যাবতীয় ঘটনাপুঞ্জকে সম্মিলিত করতে পারে?

বহুকাল থেকেই দার্শনিক ও প্রকৃতিবিদদের প্রয়াস ছিল বাস্তবের সকল বিষয় ও ঘটনাপুঞ্জের একটি প্রাথমিক ভিত্তি খুঁজে বার করার। কেউ কেউ এই প্রাথমিক ভিত্তি দেখতে পেয়েছেন জলে: সবই জল থেকে জাত এবং সব কিছুরই চরম পরিণতি জলে, — এই হল প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক ফালেসের মত। অন্যেরা আবার তা দেখেছেন বায়ুতে, অগ্নিতে বা মৃত্তিকায়। প্রাচীন গ্রীসের বিখ্যাত দার্শনিক ডিমোক্রিটস মনে করতেন যে সমস্ত অবয়ব অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম কণিকা — পরমাণুর সমবায়ে গঠিত;

পরমাণুই হল মহাবিশ্বের 'মূল গাঁথুনি'। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় পরমাণুর আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানীরা এই বিষয়ে নিশ্চিত হলেন যে পরমাণুরও অত্যন্ত জটিল গঠন আছে। পরমাণুর পর আবিষ্কৃত হল ইলেক্‌ট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, পজিট্রন ও আরও অনেক 'প্রাথমিক' কণিকা। দেখা গেল এগুলিও জটিল এবং কোনক্রমেই সব রকম অবয়বসৃষ্টির সরলতম 'নির্মাণসামগ্রী' হিশেবে গণ্য হতে পারে না। প্রকৃতির অফুরান সম্পদকে সরল 'মূল গাঁথুনি' তত্ত্বে ফেলে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। জগৎসৃষ্টির যত ক্ষুদ্র উপাদানই আমাদের জ্ঞানে ধরা পড়ুক না কেন, কিছুদিনের মধ্যে তাদের প্রতিটিরই অভ্যন্তরীণ গঠনে জটিলতা আবিষ্কৃত হয়েছে।

পরন্তু সকল প্রাকৃতিক বিষয় ও ঘটনাপুঞ্জ, —তা সে যত জটিলই এবং যে-কোন ধর্মসম্পন্নই হোক না কেন, — তাদের মধ্যে সাধারণ এমন কিছু পাওয়া যাবে যা সবগুলিকে সম্মিলিত করতে পারে। এদের সবগুলিরই স্বাধীন অস্তিত্ব, — অথবা দর্শনের ভাষায় — **সত্তা** আছে এবং মানুষের কাছে তারা উপস্থিত হয় **বিষয়**রূপে, — যে বিষয়ের অভিমুখে পরিচালিত হয় মানুষের মনন ও তার ব্যবহারিক কার্যকলাপ। এদের সকলের একটিই সাধারণ ধর্ম: তা হল আমরা তাদের সম্পর্কে যাই ভাবি না কেন, এবং আদৌ কিছু না-ই ভাবি, — এসবের ওপরে তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। এই লক্ষণের ভিত্তিতেই মার্কসীয় দর্শন তাদের সকলকে একটি সাধারণ ধারণায় ঐক্যবদ্ধ করেছে: তা হল **বস্তু**। তবে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে-কোন 'বিশুদ্ধ' বস্তু বা 'সাধারণ' কোন বস্তু খুঁজতে যাওয়াটা নিরর্থক। বস্তু থাকে মূর্ত বিষয় ও ঘটনাপুঞ্জের সীমাহীন অসংখ্য রূপের

মধ্যে, — যাদের প্রতিটি আবার অখণ্ড বস্তুজগতের এক একটি অংশ।

কিন্তু আমাদের চেতনার ওপর নির্ভর না করেই যে-কোন ঘটনা তার অস্তিত্ব বজায় রাখছে তার প্রমাণ কী, বস্তুগতভাবেই বা তার পরিচয় কী? বস্তুত, আমরা সর্বপ্রথম তার প্রমাণ পাই আমাদের সংবেদনের সাহায্যে। অন্ধকার ঘরে ঢুকে কোন ভয়প্রবণ মানুষের মনে হতে পারে বুঝি বা ঘরের মধ্যে অজ্ঞাত কেউ রয়েছে। আলো জ্বালানোর পর তার প্রত্যয় হল যে ব্যাপারটা নিছক কল্পনা। বোঝাই যাচ্ছে সব জিনিস নিরীক্ষণ করা সম্ভব নয়, সব জিনিস ইন্দ্রিয়গোচর নয়: বেতার-তরঙ্গ হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায় না, অতিশাব্দিক কম্পন কানে শোনা যায় না, চুম্বকক্ষেত্রের অস্তিত্বও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আবিষ্কার করা যায় না। কিন্তু এদের আবিষ্কার করা সম্ভব যন্ত্রপাতির সাহায্যে, বিজ্ঞানের তথ্য তাদের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে। **বস্তু যে কোন রকম অসাধারণ** রূপই পরিগ্রহ করুক না **কেন, শেষ পর্যন্ত অনুভবের** মাধ্যমে তাকে জানা সম্ভব।

লেনিনের সংজ্ঞা অনুযায়ী বস্তু হল চেতনা-নিরপেক্ষভাবে অস্তিত্বশীল এক বিষয়গত বাস্তবতা, মানুষের অনুভবের মধ্যে যার অবস্থান।

প্রতিটি মানুষ তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানে যে শাশ্বত বিষয় ও ঘটনাপুঞ্জ বলে কিছু নেই। বৈজ্ঞানিক তথ্য বলে যে এমন কি শত শত কোটি ও হাজার হাজার কোটি বর্ষ যাবৎ যার অবস্থান, সেই জ্যোতিষ্কমণ্ডলীরও আদি ও অবসান আছে, আবির্ভাব ও তিরোধান আছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে **বস্তু কালতরঙ্গে শাশ্বত।** কেননা বিষয় বিধ্বংস ও বিনষ্ট হয়ে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না। কোন একটি

উপাদানের নিউক্লিয়াসের তেজস্ক্রিয় বিভাজন অন্য সব উপাদান ও স্বাধীন কণিকাসমূহ গঠনের সূচনা করে। একটি পদার্থের অণুসমূহের বিকার বা বিয়োজনের অর্থ হল অন্য একটি বা একাধিক পদার্থের অণুসমূহের আবির্ভাব। জীবন্ত প্রাণীর এক পুরুষের স্থানে অন্য পুরুষের আবির্ভাব ঘটে, এমন কি যে অণু-পরমাণু নিয়ে জীবদেহ গঠিত মৃত্যুও তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে না। বিজ্ঞানউদ্ভাবিত নিত্যতার নিয়ম প্রতিপাদন করছে যে বস্তুর মধ্যে যত বড় অদ্ভূত পরিবর্তনই আসুক না কেন তা কখনও অবলুপ্ত হয় না, বিনষ্টও হয় না। মানুষের বহু যুগের অভিজ্ঞতাও নাস্তি থেকে বস্তুগত বিষয়ের অবতারণার সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছে। এর অর্থ হল এই যে বস্তু সর্বদাই ছিল এবং সর্বদা থাকবেও।

বস্তু শুধু যে কালেই অনন্ত তা নয়, — **আয়তিতেও সীমাহীন**। প্রকৃতিবিদ্যার নানা আবিষ্কার আমাদের পরিচিত এই জগতের স্থান-সীমানার নিরন্তর প্রসার ঘটিয়ে চলেছে। আধুনিক দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আমরা সহস্র কোটি অথবা ততোধিক আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত নক্ষত্রসমূহ দেখতে পাই। এই দূরত্ব কিলোমিটারে হিসাব করলে ২৩ অঙ্কের সংখ্যায় দাঁড়াবে। কিন্তু জগতের কোথাও কোন সীমা নেই।

প্রতি বছর বিজ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর গঠন সম্পর্কে আমাদের ধারণা গভীর থেকে গভীরতর হতে চলেছে। বিগত শতকের সূচনায় বস্তু বলে যে রূপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল তা হল এক ধরনের অপরিবর্তনীয় যন্ত্রবিজ্ঞানসংক্রান্ত ভরসম্পন্ন বস্তু। তারপর পদার্থবিদরা আবিষ্কার করলেন আর একটি রূপ — তড়িৎ-চুম্বকক্ষেত্র। যখন ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের সন্ধিক্ষণে স্পষ্ট জানা গেল যে

গতির বেগ অনুযায়ী ইলেক্‌ট্রনের ভর পরিবর্তিত হয় তখন যে-সব বিজ্ঞানী পদার্থের ধারণাকে ভরের অপরিবর্তনীয়তার সঙ্গে সম্পর্কিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা দিল। এই পরিস্থিতির সুযোগে কিছু বুর্জোয়া দার্শনিক বস্তুর 'অবলুপ্তি'র কথা বলতে লাগলেন। এইসব বিজ্ঞানবিরোধী ধারণার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে লেনিন দেখালেন যে, যা অবলুপ্ত হয় তা বস্তু নয়, — সেই সীমানাটা, যে পর্যন্ত আমরা তাকে জানতাম। দেখা গেল অপরিবর্তনীয় ভর বলে যে ধর্মকে আগে বস্তুগত বিষয়ের সাধারণ লক্ষণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল তা আসলে সে রকম নয়। আবিষ্কৃত হল দ্রুত সঞ্চরমান বস্তু-কণিকাসমূহের নূতন ধর্ম (ভরের গতিবেগনির্ভর পরিবর্তনশীলতা)। তবে পদার্থের যে-কোন রূপ ও তার নির্দিষ্ট ধর্মকে স্বয়ং পদার্থের সঙ্গে একাকার করে দিলে চলবে না।

মহাবিশ্বের অনন্ত প্রসারের মধ্যে প্রবেশ ক'রে, নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরীণ জটিলতম প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞান এখন পর্যন্ত আমাদের অদেখা আরও নানা ধরনের পদার্থ আবিষ্কার করতে পারে। তবে, যে-কোন চমকপ্রদ গুণেই তারা একে অপরের চেয়ে পৃথক হোক না কেন, ধ্রুব সত্য এই যে বিষয়গত বাস্তবতা হিশেবে তার অস্তিত্ব, আমাদের অনুভবের মধ্যে তার অবস্থান।

গতি — বস্তুর অস্তিত্বের উপায়

প্রকৃতির বিচিত্ররূপী ঘটনাপুঞ্জের দিকে লক্ষ্য করলে সহজেই দেখা যেতে পারে যে তার অভ্যন্তরে সব কিছুই গতিশীল, নিরন্তর পরিবর্তনশীল। কেউ যদি সম্পূর্ণ অনড় কোন বিষয় খুঁজে বার করতে চায় তা হলে দৃঢ়তার সঙ্গে বলা চলে সে প্রয়াস সফল হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। অবশ্য অবয়ব কখনও কখনও বিরত অবস্থায় থাকতে পারে,

কিন্তু বিরতি নিজেই সর্বদা **আপেক্ষিক।** অবয়ব বিরতি লাভ করে কেবল অন্য কোন অবয়বের পরিপ্রেক্ষিতে, যা শর্তাধীনভাবে গতিহীন বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রাস্তার একটি পাথর পৃথিবীর থেকে আপেক্ষিকভাবে গতিহীন। কিন্তু পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে পাথরও পৃথিবীর অক্ষদণ্ডের চতুর্দিকে আহ্নিক গতি এবং সূর্যমণ্ডলকে আবর্তিত ক'রে বার্ষিক গতি সম্পন্ন করে, সূর্য আবার ছায়াপথে পরিভ্রমণ করে, আর ছায়াপথ অন্যান্য নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে রচনা করছে জটিলতম বিক্ষেপ-মার্গ।

এমন কি গতির মোটামুটি সরল যান্ত্রিক রূপের কথা মনে রেখেও সম্পূর্ণ গতিহীন বিষয়ের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। কেননা অবয়বসমূহে ক্রমাগত ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটছে: অণু, পরমাণু ও প্রাথমিক কণিকাসমূহের গতি আছে। জীবপ্রকৃতি এবং সমাজের গতি আরও জটিল। মানুষ এবং অপরাপর প্রাণীর দেহযন্ত্রে জটিল শারীরিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। জীবপ্রকৃতির বিকাশে এক রূপের স্থান অধিকার করে অন্য রূপ। মানবজাতির ইতিহাসে দেখা যায় সমাজজীবনের সর্বস্তরে, — অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে — নিরন্তর বিকাশ ও নবায়ন। কোনও একটি দিনের তরেও মানুষের জ্ঞানসংক্রান্ত কর্মতৎপরতা থেমে থাকে না। সামাজিক সম্পর্কের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নিজেই পরিবর্তিত হয়: পরিবর্তিত হয় তার জীবনের ধরন, দৃষ্টিভঙ্গি, আদর্শবোধ, নৈতিক গঠন আর আচরণ।

বস্তুজগৎ আমাদের সামনে সর্বব্যাপী গতি ও পরিবর্তনের এমন এক সুবিশাল চিত্রের উপস্থাপনা করে, যেখানে জমাট, অপরিবর্তনীয়, চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট কোন কিছুর স্থান

নেই। প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিক হেরাক্লিটসের কথায়, বিশ্বের সব কিছুই প্রবহমান, সব কিছুই পরিবর্তনশীল।

গতি যে সর্বায়ত্ত — এই ঘটনা থেকে এমন সিদ্ধান্তে আসতে পাওয়া যায় যে বস্তু ও গতি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে বাঁধা, একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করে দেখা যায় না। আর সত্যিই আধুনিক বিজ্ঞান অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছে যে বস্তুর অস্তিত্ব শুধু তার গতিতে। যদি হঠাৎ কোন অসম্ভব ঘটনায় এবং কিছু সময়ের জন্য সমস্ত প্রক্রিয়া স্তব্ধ হয়ে যায় তা হলে সমানভাবে জগৎ নিজে, বিষয়গত বাস্তবতা ও বস্তু সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

প্রকৃতপক্ষে পারমাণবিক নিউক্লিয়াস কী? জানা আছে যে এ হল গতিপ্রক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত, পারমাণবিক শক্তির দ্বারা একত্রে সংহত প্রাথমিক কণিকাসমূহের, নিউক্লিয়নের মোট পরিমাণ। এই গতি স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার অর্থ হল নিউক্লিয়াসের বিভাজন, পরমাণুর অস্তিত্বের সম্পূর্ণ অবলুপ্তি। গতি ছাড়া তড়িৎ-চুম্বকক্ষেত্রের কথা ভাবা যায় না, ভাবা যায় না আলোকের কথা, — যা কেবল গতির মধ্যেই বিদ্যমান ফোটন নামে কণিকার প্রবাহ। যে-কোন বস্তুগত বিষয় ও ঘটনাপুঞ্জের কথাই ধরি না কেন, আমরা একই অখণ্ডনীয় সিদ্ধান্তে আসব: হওয়া বা থাকার অর্থ হল গতিতে অবস্থান। **গতি, যাকে আমরা সাধারণভাবে পরিবর্তন**, নবায়নের শাশ্বত প্রক্রিয়া হিশেবে **বুঝে নিয়েছি, তা হল বস্তুর অবিচ্ছেদ্য, মূল ধর্ম, তার অস্তিত্বের সার্বিক রূপ (প্রকৃতি)।**

বস্তুর গতি বিষয়ে আমাদের পরিচিত মূল রূপগুলিকে জটিলতার পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত করলে ক্রমটা এইরকম দাঁড়াবে: যান্ত্রিক (শূন্যদেশে বস্তু-অবয়ব অথবা কণিকাসমূহের

স্থানান্তরণ), ভৌত (তাপ ও বিদ্যুতের গতি এবং পরমাণু ও নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরস্থ গতি), রাসায়নিক (অণুর সংযোজন ও বিয়োজন), জীববিজ্ঞানসংক্রান্ত (জীবদেহের জৈবক্রিয়া ও বিকাশ) এবং সামাজিক (সমাজজীবন ও সামাজিক বিকাশের প্রক্রিয়া)। বস্তুর গতির উল্লিখিত প্রতিটি রূপ নিয়ে পরিপূর্ণ বিজ্ঞানশাস্ত্রসমাহার। বস্তুগত বিষয়ের গতি, পরিবর্তন ও বিকাশের প্রক্রিয়াসমূহ উদ্‌ঘাটন করে বিজ্ঞানশাস্ত্র সেগুলিরই সাহায্যে তাদের ধর্ম ও গঠনপ্রকৃতির বিশ্লেষণ করে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে অনেক সময়ই দেখা গেছে, এমন কি এখনও দেখা যায় বস্তুর গতির উচ্চতর রূপকে নিম্নতর পর্যায়ের রূপে টেনে নামানোর প্রয়াস উদাহরণস্বরূপ, ভৌত ও রাসায়নিক রূপকে, পরমাণু অথবা অণুর যান্ত্রিক স্থানান্তরণে, সামাজিক রূপকে—জীববিজ্ঞানের রূপে (সামাজিক ডারউইনবাদ)। এই ধরনের প্রয়াসের নাম হয়েছে **অধিযন্ত্রবাদ**। এই মতবাদ বৈজ্ঞানিক ভাবনাকে কানাগলিতে নিয়ে ফেলে, কেননা বস্তুর গতির যে-কোন উচ্চতর রূপ তার মধ্যে নিম্নতর রূপেরও অন্তর্ভুক্তি ঘটায় এবং সেই সঙ্গে তার নিজের বৈশিষ্ট্য ও গুণ অক্ষুণ্ণ রাখে। আর সেগুলিই ত আসলে বস্তুর গতির এই বাঞ্ছিত রূপ উপলব্ধির মূল গড়ে তোলে।

৩॥ জাগতিক ঘটনাপুঞ্জের সার্বিক সম্পর্ক ও বিকাশ

গতির উৎস

প্রকৃতি ও সমাজে গতি নিরীক্ষণ করলে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে: এর উৎস কোথায়? সরলতম যে চিন্তাটি আসে

সেটা হল এক বিষয় থেকে অপর বিষয়ে 'ধাক্কা'য় সঞ্চারিত গতি। কিন্তু তা হলে গতির সূত্রপাতকারী প্রেরণার একটি ধারণা মেনে নিতে হয়। ব্যাপারটা তা হলে দাঁড়ায় এই রকম যেন প্রথমে পদার্থ ছিল মৃত, তারপর কোন এক অতিপ্রাকৃত শক্তি আবির্ভূত হয়ে তাকে খানিকটা 'ঠেলে দিল'। গতির সার্বিক উৎস হিশেবে প্রেরণার ধারণাটি তাই 'জগৎ সৃষ্টি' সম্পর্কিত ধর্মীয় কল্পকাহিনীর দিকে টেনে নিয়ে যেতে বাধ্য।

প্রকৃতিতে বাহ্য গতিপ্রেরণার স্থান আছে, কিন্তু তা তার উৎসরূপে আবির্ভূত না হয়ে এক অবয়ব থেকে অপর অবয়বে গতি সঞ্চার করে মাত্র। অর্থাৎ, গতির উৎসের সন্ধান করতে হবে বস্তুগত ঘটনাপুঞ্জের বাইরে নয়, — অভ্যন্তরস্থলে।

ধরা যাক জেট ইঞ্জিনের কার্যপ্রণালীর মূলনীতি। বিশেষ ধরনের পদার্থসমূহ দগ্ধ হয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে রকেটের নল থেকে নির্গত হয় এবং একই সমান শক্তিতে তার উপর বিপরীতমুখী প্রভাব সৃষ্টি করে। দেখা যাচ্ছে **দুই বিরুদ্ধ শক্তির** উপস্থিতি রকেট ওড়ার অবশ্য প্রয়োজনীয় শর্ত। দুই শক্তির সংঘর্ষ, পরস্পরবিরোধিতা তার গতির উৎস। তা হলে প্রকৃতির বেলায় ব্যাপারটা কী রকম ঘটে?

দেখা গেছে, সব বস্তুগত বিষয়ের মধ্যেই বৈপরীত্য আছে। যদি কতকগুলি বিষয়কে সম্পূর্ণ সমপ্রকৃতির বলে মনেও হয় তা হলে একথাই বলতে হবে যে পরস্পরবিরোধী দিকগুলি, উপাদান ও প্রবণতাসমূহ কোন বিশেষ সময় পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে থেকে গেছে। তখন কেবল এই সকল বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করতে হয়, আর তখনই আমরা আবিষ্কার করি তাদের অভ্যন্তরস্থ বিপরীতধর্মী প্রবৃত্তি।

এমন কি সরল যান্ত্রিক গতিকেও বৈপরীত্য ব্যতিরেকে উপস্থাপিত করা যায় না: এই বৈপরীত্য হল ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার, আকর্ষণ ও বিকর্ষণের, কেন্দ্রাতিগ ও কেন্দ্রাভিগ শক্তির। গতির জটিলতর প্রাকৃতিক রূপ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা, সেখানে প্রতি পদক্ষেপে আমরা পজিটিভ ও নেগেটিভ বিদ্যুৎপ্রবাহ, তড়িৎ ও চুম্বকক্ষেত্র, পদার্থ ও ক্ষেত্রের মধ্যে বৈপরীত্যের সম্মুখীন হই। যে-কোন পরমাণু বৈপরীত্যের সমবায়ে গঠিত: তাতে পজিটিভ দিক থেকে রয়েছে সঞ্চলিত নিউক্লিয়াস আর নেগেটিভ দিক থেকে সঞ্চলিত ইলেক্‌ট্রন-আচ্ছাদন। আর পারমাণবিক নিউক্লিয়াস হল এমন দুই পরস্পরবিরোধী কণিকাসমূহের ঐক্য যাদের বিয়োজন ঘটান মোটেই সহজসাধ্য নয়। রাসায়নিক সম্পর্কের মুখ্য রূপগুলির — পারমাণবিক এবং আয়নিক সম্পর্কের ভিত্তিতেও রয়েছে বৈপরীত্যের সমাহার।

জীবপ্রকৃতির দিকে লক্ষ্য করা যাক। এখানেও যে-কোন জীবদেহে চলে এক ধরনের পদার্থের পরিপাক ও অন্য ধরনের পদার্থের নিঃসারণ, চেতন পদার্থের সৃজন ও বিনাশ, আত্তীকরণ ও অনাত্তীকরণের পরস্পরবিরোধী প্রতিক্রিয়া। সমাজেও পরস্পরবিরোধী শক্তির অবস্থান আছে: এক দিকে অগ্রণী ও বিপ্লবী, অন্য দিকে অনুন্নত ও রক্ষণশীল।

বৈপরীত্যসমূহের অবস্থান কিন্তু পৃথক পৃথক ভাবে নয়। ঠিক বিপরীত: একই ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে তাদের অবস্থান, ঐক্যের মধ্যে তাদের প্রকাশ, তারা একে অপরকে ছাড়া 'বাঁচতে' পারে না। মনে মনে একটি বৈপরীত্যকে অপরের থেকে, — উদাহরণস্বরূপ, আত্তীকরণকে অনাত্তীকরণ থেকে পৃথক করতে গেলে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে এর পরিণামে জীবদেহের বিনাশ, তথা ঘটনারই বিলুপ্তি ঘটবে।

পরস্পর অচ্ছেদ্যবন্ধনে গ্রথিত থাকা সত্ত্বেও তারা 'শান্তিতে' ও 'মিলেমিশে' থাকতে পারে না, একমাত্র এই কারণে যে তারা বিপরীতমুখী। এখান থেকেই দেখা যায় পরস্পরবিরোধী শক্তির মধ্যে অবিরাম সংঘর্ষ ও সংগ্রাম, তাদের মধ্যে **বিরোধিতা।**

বিকাশের ক্ষেত্রে তা হলে এই বিরোধিতার ভূমিকা কী? এর অনুসন্ধান করা যাক জীবন্ত প্রাণীর বংশগতি ও পরিবর্তনশীলতার পারস্পরিক ক্রিয়ার মধ্যে। সকল উদ্ভিদ এবং জীব তারই অনুরূপ আকৃতি পুনরুৎপাদনের ক্ষমতা রাখে এবং বংশপরম্পরায় নিজের লক্ষণসমূহ সঞ্চার করতে পারে। কিন্তু বংশধরদের জীবনে কখনই পিতা-মাতার জীবনের পরিস্থিতির হুবহু পুনরাবৃত্তি ঘটে না। পরিবর্তনশীলতা, বংশধরদের জীবনে পিতা-মাতার সঙ্গে মিলহীন কতকগুলি বিশেষ লক্ষণের আবির্ভাব সংসূচিত হয় বাহ্য পরিবেশের পরিবর্তমান পরিস্থিতির প্রভাবে। দেখা যাচ্ছে, বংশগতি ও পরিবর্তনশীলতা হল বৈপরীত্য, তাদের মধ্যে নিরন্তর বিরোধের আবির্ভাব। পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে বংশগতির সংঘর্ষ বাধে, বংশগতির রক্ষণশীলতা ধ্বংস করে ও বিকাশের ক্ষেত্রে নূতন অবদানের সূচনা করে। বংশগতি অর্জিত উপযোগী লক্ষণসমূহ সংহত করে পরবর্তী পুরুষের হাতে তুলে দেয়। পরিণামে নূতন ধরনের জীব ও উদ্ভিদের আবির্ভাব দেখা যায়, বিকাশ ঘটে। এইভাবে, বংশগতি ও পরিবর্তনশীলতার মধ্যে বিরোধিতা হয়ে দাঁড়ায় জীবপ্রকৃতির নিরন্তর বিকাশের অন্যতম উৎস।

সমাজজীবনে বিকাশের নিগূঢ় উৎস হল উৎপাদনী শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে বিরোধিতা, — শোষণযুক্ত সমাজে শ্রেণীগত বিরোধিতা ও শ্রেণী-সংগ্রামের আকারে

যার প্রকাশ। এ সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়সমূহে বিশদ বলা যাবে।

অভ্যন্তরীণ বিরোধিতার কারণে বস্তুগত বিষয়সমূহ পরম শান্তির অবস্থায় বিরাজ করতে পারে না, বৈপরীত্যের সংগ্রাম তাদের মধ্যে 'অস্থিরতা'র সূচনা করে, তাদের জমে যেতে দেয় না, গতির দিকে টেনে নিয়ে যায়। এবং এই বৈপরীত্যের **সংগ্রামই হল সকল বিষয় ও ঘটনাপুঞ্জের বিকাশের উৎস।**

পরিমাণ থেকে গুণে

যে-কোন বিষয়ের কথাই আমরা ধরি না কেন তা নির্দিষ্ট **গুণ** বা নির্দিষ্ট **পরিমাণের** (আকার, আয়তন, ওজন ইত্যাদি) দিক থেকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে পৃথক হতে বাধ্য।

ধরা যাক একটা সাধারণ অ্যালুমিনিয়াম প্লেট। অ্যালুমিনিয়ামের আপেক্ষিক গুরুত্ব — ২·৭, পারমাণবিক ভার —২৭, নিউক্লিয়াস-চার্জের পরিমাণ —১৩, বিগলন-তাপমাত্রা —৬৫৯° সেণ্টিগ্রেড। এ হল তার পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য। এরই পাশাপাশি বলা চলে, অ্যালুমিনিয়াম সাদা-রুপোলি রংয়ের ধাতু, নমনীয়, তাপ ও বিদ্যুৎশক্তির দ্রুত পরিবাহী, স্থায়ী সংযোগের ক্ষেত্রে ত্রিবিধ যোজ্যতা-সম্পন্ন, ক্রিয়ার দিক থেকে ক্ষারীয় ধাতুর কাছাকাছি, সহজেই অক্সিডাইজড হতে পারে ইত্যাদি। এ হল অ্যালুমিনিয়ামের গুণগত বৈশিষ্ট্য। এইভাবে যে-কোন উপাদান, পদার্থ ও বিষয়ের পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য দেখানো যায় আবার গুণগত বিশেষত্বও নির্ধারণ করা যায়।

একটু কাছ থেকে লক্ষ্য করলে সহজেই বোঝা যাবে যে পরিমাণ ও গুণ পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। এই সম্পর্কের

আরও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় রসায়নের ক্ষেত্রে। ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস অকারণে রসায়নকে পরিমাণগত সংবিন্যাসের পরিবর্তন-প্রভাবে অবয়বসমূহের গুণগত পরিবর্তন সংঘটনের শাস্ত্র বলেন নি। প্রকৃতপক্ষে, রাসায়নিক গঠন অনুযায়ী অক্সিজেন ও ওজোনের মধ্যে পার্থক্যটা সম্পূর্ণ পরিমাণগত। উপরন্তু, এরা বিভিন্ন ধর্মসম্পন্ন ভিন্ন দুই পদার্থ। মেথেনের সুসমঞ্জস শ্রেণীবিন্যাসে রাসায়নিক সংযোগও CH_2 গ্রুপগুলির পরিমাণ অনুযায়ী পার্থক্য সূচনা করে। এটা কতখানি তার গুণের ওপর প্রভাব বিস্তার করে তা বোঝা যাবে এই থেকে যে, CH_4 থেকে C_4H_{10} পর্যন্ত চারটি শ্রেণীর মধ্যে সংযোগে হয় গ্যাস, পরবর্তী এগারোটিতে — তরল পদার্থ, আর হাইড্রো-কার্বন C_{16} C_{34} থেকে শুরু ক'রে — কঠিন পদার্থ।

বিখ্যাত রুশ বিজ্ঞানী দ. ই. মেন্দেলেয়েভের 'উপাদানের পর্যাবৃত্ত পদ্ধতি' গড়ে উঠেছে রাসায়নিক উপাদানের ধর্ম ও তাদের পারমাণবিক ভারের উপর নির্ভর করে, — আধুনিক বিজ্ঞানশাস্ত্র আরও নির্দিষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছে যে এই ধর্মগুলি পারমাণবিক নিউক্লিয়াস-চার্জের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল। পারমাণবিক নিউক্লিয়াসের একটি ইউনিটের বৃদ্ধি, অন্য কথায়, পরিমাণের পরিবর্তন নূতন গুণের সূচনা করে।

হয়ত, মনে হতে পারে যে বিষয়ের পরিমাণগত দিকের পরিবর্তন করে আমরা তার গুণের কোন গুরুত্বপূর্ণ হেরফের ঘটাচ্ছি না। কঠিন পদার্থকে কয়েক ডিগ্রী উত্তপ্ত করলে তার মোট অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু যদি গলন-বিন্দু পর্যন্ত উত্তাপ সঞ্চার করা যায় তা হলে কঠিন পদার্থ তরল পদার্থে পরিণত হবে, আর

স্ফুটনাঙ্ক পর্যন্ত বর্ধিত করলে তরল পদার্থ পরিণত হবে গ্যাসে। পরিমাণগত পরিবর্তন গুণগত পরিবর্তন সূচনা করে।

পদার্থের তেজস্ক্রিয় বিভাজনপ্রক্রিয়ার মধ্যেও এই রূপান্তর প্রত্যক্ষ করা যাবে। নির্দিষ্টপরিমাণ শক্তির নিঃসরণ পারমাণবিক নিউক্লিয়াসের অবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং এক পদার্থের পরমাণু অন্য পদার্থের পরমাণুতে পরিণত হয়। এইভাবে, রেডিয়ামের বিভাজনের ফলে হীলিয়াম ও রোডোন গঠিত হয়। পরমাণুর নিউক্লিয়াস কর্তৃক শক্তির বিশোষণও শেষ পর্যন্ত গুণগত রূপান্তরের দিকে পরিচালনা করে।

প্রতিটি রাসায়নিক উপাদানে আছে অনেকগুলি আইসোটোপ, যেগুলি আবার একই ধরনের চার্জের অধিকারী, 'পর্যাবৃত্ত পদ্ধতিতে' একই রকম স্থান অধিকার করে এবং পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য সূচনা করে পরিমাণগতভাবে: পারমাণবিক ভারে, — আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে পরমাণুর নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরস্থ নিউট্রনের সংখ্যায়। এখন যদি স্বল্প পরিমাণ পারমাণবিক ভারসম্পন্ন আইসোটোপের নিউক্লিয়াসের সঙ্গে নিউট্রন যোগ করা যায় তা হলে পারমাণবিক ভারের এক ইউনিট বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু গভীর গুণগত কোন পরিবর্তন সাধিত হবে না, রাসায়নিক উপাদানের মূল ধর্ম বজায় থাকবে। পরমাণুর নিউক্লিয়াসের সঙ্গে যদি এক এক করে নিউট্রন যোগ করতে থাকি তা হলে শেষ পর্যন্ত আমরা সবচেয়ে গুরুভার আইসোটোপ অবধি যেতে পারি। আমরা যদি আবার তার সঙ্গে নিউট্রন যোগ করি তা হলে কী দাঁড়াবে? এর ফলে গুণগত পরিবর্তন ঘটবে: নিউক্লিয়াসের নিউট্রনগুলির একটি ইলেক্‌ট্রন নিঃসারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রোটোনে রূপান্তরিত হবে, নিউক্লিয়াস-চার্জ এক ইউনিট বৃদ্ধি পাবে, 'পর্যাবৃত্ত পদ্ধতি'র শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী পরবর্তী স্থানের অধিকারী নূতন উপাদানে তার রূপান্তর ঘটবে। উদাহরণস্বরূপ, নিউট্রনের দ্বারা ইউরেনিয়ামের (ইউরেনিয়াম-২৩৮) আইসোটোপের নিউক্লিয়াসের উপর আঘাত হানার ফলে তার রূপান্তর ঘটবে নেপচুনিয়ামে, আর এই শেষটির — প্লুটোনিয়ামে।

জীবপ্রকৃতিতে পরিমাণগত পরিবর্তনের গুণগত পরিবর্তনে রূপান্তর পরিলক্ষিত হবে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রজাপতির বিকাশের মধ্যে। এখানে পরিষ্কার গুণগতভাবে কতকগুলি পৃথক পৃথক পর্যায়ের (শূককীট, মূককীট ও অবশেষে পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতিতে রূপান্তর) সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। এক পর্যায় থেকে অপর পর্যায়ে রূপান্তর নির্ভর করে কীটের দেহাভ্যন্তরে নির্দিষ্ট কতকগুলি পরিমাণগত প্রক্রিয়ার উপর। এক্ষেত্রেও পরিমাণগত পরিবর্তন গুণগত পরিবর্তনের সূচনা করে।

সমাজে পরিমাণগত পরিবর্তনের সঙ্গে গুণগত পরিবর্তনের সংযোগ লক্ষ্য করা যাবে শ্রম-সমবায়ের দৃষ্টান্তের মধ্যে। এক যৌথ কর্মিদল পৃথক পৃথক ভাবে তাদের ব্যক্তিগত শক্তি ও সামর্থ্যের চেয়ে অঙ্কের হিসাব ছাপিয়ে বহু বেশি ফল উৎপাদন করে। সমাজবিকাশের ক্ষেত্রে নূতন গুণে রূপান্তরের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল সামাজিক বিপ্লব, যার পূর্বশর্ত ক্রমাগতই সুদৃঢ় হতে চলেছে সমাজের অন্তঃস্থলে।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে পরিমাণগত পরিবর্তন গুণগত পরিবর্তনে রূপান্তরিত হয়। নির্দিষ্ট সীমানা পর্যন্ত এই পরিবর্তন বিষয়ের গুণের উপর যেন কোন প্রভাবই বিস্তার করে না, — কিন্তু কেবল নির্দিষ্ট সীমানা পর্যন্তই। তার বাইরে বেরিয়ে আসামাত্রই দেখা যাবে যে নগণ্য পরিমাণগত পরিবর্তনই গুণগত পরিবর্তনের রূপ নিতে চলেছে, ঘটছে **উল্লম্ফন**, অর্থাৎ এক গুণ থেকে অপর গুণে রূপান্তর। এসব থেকেই বোঝা যায় কীভাবে বস্তুর সার্বিক গতি ও পরিবর্তনপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তার বিকাশ ঘটে, আবির্ভূত হয় নব নব ঘটনাপুঞ্জের।

ধরা যাক পরিমাণগত পরিবর্তন যদি গুণগত পরিবর্তনে রূপান্তরিত না হত। আকাদেমিশিয়ন ভ. ল. কমারোভ এ প্রসঙ্গে জীবপ্রকৃতির অবস্থা সম্পর্কে লিখেছেন: 'পৃথিবীতে জীবন যদি একবার আবির্ভূত হয়েই তারপর থেকে পরিমাণগতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকত, তবে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ আচ্ছাদিত হয়ে যেত জেলির পুরু আচ্ছাদনে, যে রকম জেলি এখনও উৎপাদন করে চলেছে ব্যাক্টেরিয়া, অ্যামিবা ও তাদের কাছাকাছি প্রাণীসমূহ। কিন্তু পরিমাণের গুণে রূপান্তরের ধর্ম আছে। এর ফলে বাহ্য পরিবেশের সঙ্গে নানা ধরনের পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত (রাসায়নিক, পদার্থগত ইত্যাদি) বস্তুপুঞ্জ বিভিন্ন গুণ অর্জন করে থাকে, অথবা অন্যভাবে বলতে গেলে, — পার্থক্য অর্জন করে। এক হয় বহু।'

পদার্থের গতি ও পরিবর্তন — এটা কেবল অবয়বসমূহের মধ্যে শক্তির পরিমাণগত আদান-প্রদান নয়, নিছক বৃদ্ধিও নয়, — এ হল বস্তুজগতের নবায়নের এক শাশ্বত প্রক্রিয়া, পরিমাণগত পরিবর্তনের গুণগত পরিবর্তনে রূপান্তর, উল্লম্ফন, পুরাতনের বিনাশ ও নূতনের আবির্ভাব।

নিম্ন থেকে উচ্চে, সরল থেকে জটিলে

প্রকৃতি ও সমাজের বিকাশের কোন বিশেষ গতিপ্রকৃতি আছে কি? অথবা তারা চিরকাল ফিরে ফিরে এক পূর্বনির্ধারিত গতিপথের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে চক্রাকারে ঘুরছে, এবং এই বদ্ধ চক্রপথে কোন রকম প্রগতির চিহ্নই নেই?

বিজ্ঞানের তথ্যের কথা বাদ দিলেও সাধারণ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে বস্তুজগতের বিকাশে প্রগতি আছে, আছে অগ্রগতি। বিশেষ স্পষ্টভাবে এটা লক্ষ্য করা যাবে জীবপ্রকৃতির ক্ষেত্রে। একমাত্র তার আবির্ভাবের ঘটনাই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে নিম্ন সরল ও অজৈব

রূপ থেকে উচ্চ জটিলতর ও জৈব রূপে উত্তরণের ক্ষমতা প্রকৃতির আছে। জীবপ্রকৃতি গঠনহীন জৈব পদার্থ ও সরলতম এককোষী প্রাণী থেকে মানুষ পর্যন্ত বিকাশলাভের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে। এই আরোহণের পথে প্রতিটি পর্যায় যেন পূর্ববর্তী পর্যায়ের নেতি, তারপর পরবর্তী পর্যায়ের দ্বারা নিজেই নেতি হয়ে দাঁড়াল। এক ধরনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ **নেতির নেতিকরণ** দেখা দিল।

ক্রমবিকাশের ভাবধারার ক্ষেত্রে নেতির অর্থ পুরাতন বিষয়ের সর্বৈব বিনাশসাধন নয়। প্রথমত, তুলনামূলকভাবে সরল ঘটনাপুঞ্জ বারংবার নূতন, জটিলতর ঘটনাপুঞ্জের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থান করতে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, জীবপ্রকৃতিতে ব্যাপারটা তাই অনেকটা এইরকম ঘটে: অত্যুন্নত প্রাণীর পাশাপাশি প্রকৃতিতে অবস্থান করে সাধারণতম প্রাণী। দ্বিতীয়ত, এবং মুখ্যত, প্রগতিশীল বিকাশের প্রক্রিয়ার মধ্যেই নবীন যেন প্রাচীনের অভ্যন্তরে যা কিছু ইতিবাচক ও মূল্যবান ছিল তার সব কিছু নিংড়ে প্রাচীন থেকে আবির্ভূত হয়।

জীবপ্রকৃতিতে বিবর্তনমূলক বিকাশের প্রক্রিয়াবশত প্রতিটি নূতন প্রজাতি পূর্বপুরুষের সঞ্চিত হিতকর লক্ষণসমূহ গ্রহণ করে থাকে।

সমাজের ইতিহাসে কোন নূতন সমাজব্যবস্থাই ফাঁকা জায়গায় আসন পাতে না, তার আবির্ভাব হয় পূর্ববর্তী যুগে রচিত বস্তুগত ও আত্মিক সম্পদ আয়ত্তকরণের ভিত্তিতে।

মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর এক শ্রেণীর 'অতিবিপ্লবী'র আবির্ভাব হয়েছিল, যাদের প্রস্তাব ছিল পুরনো সংস্কৃতির বিলোপসাধন, এই কারণে যে তা বুর্জোয়া সংস্কৃতি, আর

গড়ে তুলতে হবে অতীতের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কবিহীন এক ‘প্রলেতারীয় সংস্কৃতি’। অতিরিক্ত উৎসাহীরা এমন কি প্রতিভাবান রুশ কবি পুশকিনের রচনাবলীকেও ইতিহাসের ‘আঁস্তাকুড়ে’ জলাঞ্জলি দেবার প্রস্তাব দিল। লেনিন তাদের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তিনি দেখালেন যে প্রলেতারিয়েত হল অতীত সংস্কৃতির প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের যোগ্য ধারক এবং বাহক। ফাঁকা জায়গার ওপর সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়া যায় না। তার বিকাশ ও অগ্রগতির জন্য নিজের হৃদয়কে সমৃদ্ধ করতে হবে সেই সব সম্পদের জ্ঞানে, যা একদা মানবজাতি রচনা করেছিল।

তাই, নেতির অর্থ **বিকাশের ধারায় সম্পর্ক ও উত্তরাধিকারের** অস্বীকৃতি নয়। নেতির ফলে যে ঘটনার উদ্ভব হয় তা এক দিকে যেমন পূর্ববর্তী পর্যায়ে যা কিছু মূল্যবান ছিল তার সব রক্ষা করে, অন্য দিকে তেমনি বিষয়ের দিক থেকে নূতন, সমৃদ্ধতর কিছু একটার সূচনা করে। ঠিক এই কারণেই প্রকৃতি, সমাজ এবং জ্ঞানের বিকাশ অর্থ — একই জায়গায় পা ঠোকা নয় — এর অর্থ প্রগতি, অগ্রগতি।

যেহেতু বিকাশের নিম্নতর স্তরের হিতকর বিষয়বস্তু উচ্চতর স্তরে সংলগ্ন থাকে, সেই হেতু ধারাবাহিক নেতির শৃঙখলে পূর্ববর্তী বিকাশের কতকগুলি ধর্মের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা থেকে যায়। প্রগতির উচ্চতর পর্যায়ে যেন প্রাচীনে প্রত্যাবর্তন ঘটে। উদাহরণ দেওয়া যাক। আদিম সমাজব্যবস্থায় উৎপাদনের উপায়ের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করত সামাজিক মালিকানা। তারপর নেতির আবির্ভাব ঘটল। ব্যক্তিগত মালিকানা এবং মানুষে মানুষে শোষণের উদ্ভব হল। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে ব্যক্তিগত মালিকানা নেতিতে চলে আসে। আবার উৎপাদনের উপায়ের উপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু অবশ্যই আদিম সমাজের মতো নয়, — অন্য এক উচ্চতর বনিয়াদের উপর, যার কোন তুলনাই মেলে না।

উল্লিখিত দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় যে প্রগতিশীল বিকাশের অর্থ সরলরেখায় আরোহণ নয়, — এর অর্থ এক জটিল আবর্তনশীল প্রক্রিয়া, যার গতি সর্পিল বৃত্তের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

বিকাশ হল নেতির এক শৃঙ্খল, যার মাধ্যমে নিম্ন থেকে উচ্চে, সরল থেকে জটিলে আরোহণ সম্ভব।

ঘটনাপুঞ্জের সার্বিক সম্পর্ক

বিকাশের প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে আমরা দেখতে পেয়েছি যে বিষয়ের বিপরীত দিকগুলি, পরিমাণগত ও গুণগত পরিবর্তন এবং বিকাশের নিম্নতর ও উচ্চতর পর্যায়ের মধ্যে বিশেষ পারস্পরিক সম্পর্ক আছে। বিপরীত ঘটনাপুঞ্জ এবং দিকগুলির **পারস্পরিক ক্রিয়া** ব্যতিরেকে, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির সঙ্গে **পারস্পরিক সম্পর্ক** ব্যতিরেকে গতি ও বিকাশ অসম্ভব।

বিকাশমান বাস্তবের প্রতি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বিচিত্রতম বিষয় ও ঘটনাপুঞ্জের ঘনিষ্ঠ পারস্পরিক সম্পর্ক এবং পারস্পরিক শর্তাধীনতা।

উদ্ভিদের সবুজ পাতার কথা ধরা যাক — এ হল এক পূর্ণাঙ্গ রাসায়নিক সংযুক্ত উদ্যোগ, যেখানে সৌরশক্তির সাহায্যে অঙ্গারাম্ল পরিণত হয় অম্লজানে। এই অম্লজান ছাড়া কোন জীবজন্তু বা মানুষই বাঁচতে পারে না। ক. আ. তিমিরিয়াজেভ এই কারণেই উদ্ভিদকে আকাশ ও মাটির মধ্যে সংযোগসাধনকারী বলেছেন, তাকে তুলনা করেছেন মানুষের জন্য স্বর্গ থেকে অগ্নির অপহারক প্রমিথিউসের সঙ্গে। তা হলে উদ্ভিদের জীবনদানকারী বিকিরণতেজ কোথা থেকে সঞ্চারিত হয়? এটা হল সূর্যের অভ্যন্তরস্থ জটিল নিউক্লিয়াস রূপান্তরের ফল। কিন্তু সেটাই সব নয়। উদ্ভিদের প্রয়োজন উর্বর জমি, যার এক দিক থেকে উদ্ভব হয়েছে জৈব প্রকৃতির বিকাশপ্রক্রিয়ার মধ্য

দিয়ে, অন্য দিক থেকে যা গড়ে উঠেছে মানুষকর্তৃক রাসায়নিক কারখানায় প্রস্তুত কৃত্রিম সারের সাহায্যে। উদ্ভিদের যথাযথ বৃদ্ধির জন্য চাই আর্দ্রতা ও নির্দিষ্ট ধরনের জলবায়ুর পরিস্থিতি। তাই আবহাওয়াও সাধারণ সম্পর্ক-প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। একমাত্র উদ্ভিদের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক জগতের সম্পর্কের কথাই বলে শেষ করা যায় না, কেননা প্রকৃতিতে সম্পর্কের রূপ অগণন।

মানবজাতির বহু যুগের অভিজ্ঞতা, প্রকৃতিবিদ্যা এবং দর্শনের সুদীর্ঘ ও দুরূহ বিকাশধারা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে কোন ঘটনাপুঞ্জ যত স্বকীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণই হোক না কেন, সেগুলি আমাদের কাছে যত স্বতন্ত্র বলেই মনে হোক না কেন, — তারা সকলেই তাদের জাগতিক বস্তুরূপের ক্ষেত্রে এক অখণ্ড সামগ্রিক রূপের প্রকাশমাত্র।

হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ সূত্রে প্রতিটি বিষয় অবশিষ্ট জগতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পরিণামে সকলের সঙ্গে সব কিছুর সার্বিক সম্পর্ক ও পারস্পরিক ক্রিয়ার অখণ্ড প্রক্রিয়া গড়ে তুলছে।

বস্তুজগতের ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে সম্পর্কের রূপ বহু বিচিত্র।

কেউ যদি নির্বিচারে বিষয়সমূহের যাবতীয় সম্পর্ক অনুসন্ধানের জন্য সংকল্প করে তা হলে সে আক্ষরিক অর্থে বিচ্ছিন্ন ও আকস্মিক ঘটনাসমূহের অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে তলিয়ে যাবে, যার ফলে সাধারণ চিত্রটির কিছুই বোঝা সম্ভব হবে না অথবা খুবই কম বোঝা যাবে। যেটা দরকার, তা হল সামগ্রিকতার মধ্য থেকে সাধারণ, অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় সম্পর্কগুলি নির্ধারণ করা। বিজ্ঞানে এর নাম **নিয়মবদ্ধতা**।

আমাদের পারিপার্শ্বিক জগতের যে-কোন ক্ষেত্রের গভীর অনুসন্ধান করলে তার বিকাশের মধ্যে দেখতে পাব নির্ধারিত

স্বাভাবিক সুশৃঙ্খলা, নিয়মানুগতা, ধারাবাহিকতা ও সুসম্বদ্ধতা।

উদাহরণ হিশেবে জল বিন্দুর মধ্যে কালো কালির ক্ষুদ্র কণিকাসমূহের গতিসঞ্চালনের (ব্রাউনের গতি) উল্লেখ করা যায়। আপাত দৃষ্টিতে এই গতি যেন এলোমেলো, শৃঙ্খলাবিহীন। কিন্তু এর মধ্যে আছে দৃঢ় নিয়মবদ্ধতা, আণব পদার্থবিজ্ঞান সেই নিয়ম আবিষ্কার করেছে ও সূত্রবদ্ধ করেছে।

সপ্তদশ শতকের শেষভাগ থেকে অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে অনেক প্রকৃতিবিদের মনে হয়েছিল যে জীবপ্রকৃতিতে কোন শৃঙ্খলা নেই। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের মধ্য ভাগেই সুইডিশ চিকিৎসক ও প্রকৃতিবিজ্ঞানী কার্ল লিনিয়াস প্রমাণ করলেন যে নির্দিষ্ট সুসম্বদ্ধতা জীবপ্রকৃতির বৈচিত্র্যে অন্তর্নিহিত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে চার্লস ডারউইন তার ব্যাখ্যা দেন প্রজাতি বিবর্তনের বিখ্যাত তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা ক'রে। অসংখ্য রাসায়নিক উপাদানের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য হল কঠোর নিয়মানুগতা, — মেন্দেলেয়েভের 'পর্যাবৃত্ত পদ্ধতি'র দ্বারা তা প্রমাণিত হয়েছে। বিষয়গত শৃঙ্খলা এবং ধারাবাহিকতা মানব-ইতিহাসের পক্ষেও স্বভাবসিদ্ধ। মার্কসবাদ-লেনিনবাদে এগুলির বিজ্ঞানসম্মত অভিব্যক্তি ঘটেছে।

বাস্তবের যে-কোন ক্ষেত্রে আছে গভীর সম্পর্কের বন্ধন, যাকে অখণ্ড সামগ্রিক বিষয়গত এমন বন্ধন হিশেবে মনে করা যেতে পারে, যা বিকাশের চরিত্র ও গতি নির্ধারণ করে। এই বিধিবদ্ধ সম্পর্কের প্রকাশ ঘটেছে **নিয়মাবলীতে।**

বিজ্ঞানশাস্ত্রের অন্তর্গত প্রকৃতির নিয়মসংক্রান্ত বহু আবিষ্কারের-পরিচয় আছে: যেমন, নিউটনের সূত্র, বয়েল-ম্যারিয়তের সূত্র, মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম, বিদ্যুৎশক্তির নিয়ম, আলোর প্রতিফলন ও প্রতিসরণের নিয়ম, আভোগাদ্রোর সূত্র, মেন্দেলেয়েভের পর্যাবৃত্ত সূত্র ইত্যাদি। এখন দেখা যাক নিয়ম বলতে আমরা কী বুঝি।

ধরা যাক আর্কিমিডিসের সূত্রের কথা। প্রথমেই একথা পরিষ্কার যে এই সূত্রে প্রকাশিত হয়েছে ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে (তরল পদার্থে নিমজ্জিত কঠিন পদার্থ ও তরল পদার্থের মধ্যে) সম্পর্ক, বন্ধন। নিঃসন্দেহে এই সম্পর্ক **বিষয়গত:** আমাদের পছন্দসই হোক আর নাই হোক, এমন কি যখন আমরা ছিপের সূতায় ফাতনা পরাই তখনও এর কথা মনে রাখতে হয় বৈকি। একথাও স্পষ্ট যে আর্কিমিডিসের সূত্র নির্দিষ্ট কোন কঠিন পদার্থের সঙ্গে নির্দিষ্ট কোন তরল পদার্থের বিশেষ সম্পর্কের কথা বলে না, — বলে **সার্বিক** সম্পর্কের কথা: যে-কোন কঠিন পদার্থের যে-কোন তরল পদার্থে নিমজ্জন — এই বিধিমতো ফল প্রদান করবে। সম্বন্ধটি **গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়**, কেননা তা উদ্ঘাটন করছে কঠিন ও তরল পদার্থের মধ্যে সম্পর্ক এবং প্রতিবারই তাদের পারস্পরিক ক্রিয়ার সময় অবধারিতভাবে তার প্রকাশ ঘটছে। অবশেষে, পরীক্ষা আমরা যতবারই চালাই না কেন, প্রতিবারই নিয়ম সমর্থিত হবে। এর অর্থ হল এই যে এই নিয়ম ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে **স্থির নির্দিষ্ট** এবং **পৌনঃপুনিক** সম্পর্কের কথা প্রকাশ করছে।

এখন নিয়ম বলতে কী বোঝায় তা আমরা সূত্রাকারে বলতে পারি। নিয়ম হল **ঘটনাপুঞ্জ এবং বিষয়ের পদার্থের বিষয়গত সার্বিক অপরিহার্য, গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক**, যার **বৈশিষ্ট্য — স্থির নির্দিষ্টতা ও পৌনঃপুনিকতা।**

দ্বন্দ্ববাদ —বিকাশসংক্রান্ত মতবাদ

বাস্তবের সকল ক্ষেত্রের অন্তর্নিহিত সাধারণতম সম্পর্ক এবং বিকাশের সাধারণতম রূপের চর্চাকারী **দ্বন্দ্ববাদ** —

জগতের সার্বিক সম্পর্ক ও বিকাশসংক্রান্ত মতবাদ।

'Dialectics' বা দ্বন্দ্ব শব্দটির প্রাথমিক অর্থ হল বিতর্ক পরিচালনার কলাকৌশল, বিরুদ্ধপক্ষের বিচারে স্ববিরোধিতা আবিষ্কারের ক্ষমতা। যদিও এই শব্দটি এখন ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়, তথাপি এখনও বাস্তবের স্ববিরোধসমূহের বিশ্লেষণ দ্বন্দ্ববাদের নিউক্লিয়াস, তার মর্মার্থ। কথাটি বোধগম্যও বটে: কেননা স্ববিরোধসমূহ যে-কোন বিকাশের উৎস, অভ্যন্তরীণ প্রেরণা।

দ্বন্দ্ববাদের মূল রূপটি লেনিন এইভাবে তুলে ধরেছেন: 'এ যেন ইতিপূর্বে উত্তীর্ণ হয়ে আসা পর্যায়সমূহে যে বিকাশ ঘটেছিল তারই পুনরাবৃত্তি, অথচ সেই পুনরাবৃত্তির রূপটি একটু অন্য ধরনের, — আরও উন্নত বনিয়াদের উপর ('নেতির নেতিকরণ'), বলা যেতে পারে সরল রেখায় নয় — সর্পিল বৃত্তের বিকাশ; — উল্লম্ফনরূপে, বিপর্যয়কর ধরনে, বৈপ্লবিক চেহারায় বিকাশ; — 'ক্রমান্বয়ের বিরতি'; পরিমাণের গুণে রূপান্তর; — যা কোন নির্দিষ্ট অবয়ব অথবা নির্দিষ্ট ঘটনার সীমানায় বা নির্দিষ্ট সমাজের অভ্যন্তরে বলবৎ বিভিন্ন শক্তি ও প্রবণতার বিরোধিতা ও সংঘর্ষের দ্বারা সূচিত অভ্যন্তরীণ বিকাশপ্রেরণা; — প্রতিটি ঘটনার **সব** দিক থেকে পারস্পরিক নির্ভরতা এবং ঘনিষ্ঠতম, অচ্ছেদ্য বন্ধন (তাছাড়া ইতিহাস ক্রমেই নব নব দিক উদ্‌ঘাটন করে চলেছে), যে বন্ধন সূচনা করছে গতির এক অখণ্ড নিয়মিত বিশ্বপ্রক্রিয়া, — এই হল বিকাশের মতবাদ হিশেবে... দ্বন্দ্ববাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য।'

জগতের সার্বিক সম্পর্ক ও বিকাশের অনুসন্ধানকালে দ্বন্দ্ববাদের অভিব্যক্তি হল **জ্ঞানক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিরূপে।** বস্তুতপক্ষে, আমাদের যদি এই প্রত্যয় থাকে যে প্রতিটি ঘটনা

অন্যদের সঙ্গে পারস্পরিক বন্ধনযুক্ত এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে বিকাশলাভ করতে থাকে, তা হলে যে-কোন বিষয়ের অধ্যয়নে সে কথাটা ভুলে গেলে চলবে না। পারস্পরিক বন্ধন ও বিকাশের মধ্যে জগৎকে বিচার করতে শিখিয়ে দ্বন্দ্ববাদ বাস্তবের আরও গভীর অনুসন্ধানে সহায়তা করে।

আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের সামনে উদ্‌ঘাটন করছে প্রকৃতি ও সমাজের মধ্যে সীমার আপেক্ষিকতা, চলমানতা ও প্রবহমানতা। নূতন আবিষ্কারগুলি প্রায়শই অভ্যস্ত ধারণা ও কল্পনার সঙ্গে খাপ খায় না, এর জন্য দরকার নূতন সৃজনী দৃষ্টিভঙ্গির, নূতন 'অনভ্যস্ত' ধারণা ও তত্ত্বের উদ্ভাবন। এ প্রসঙ্গে প্রাথমিক কণিকাসমূহসম্পর্কিত আধুনিক তত্ত্ব এবং আপেক্ষিকতার তত্ত্বের কথা উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে। এই নূতন আবিষ্কারগুলি কি আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব হত, যদি আমরা যাত্রা করতাম চিরকালের জন্য স্থির করে দেওয়া অনড় কোন বিশ্বাস থেকে, যদি আবদ্ধ থাকতাম ঊনবিংশ শতাব্দীর চিরায়ত বলবিদ্যা ধারণার মধ্যে?

দ্বন্দ্ববাদ আমাদের সতর্ক করে দেয় ভাবনার একমুখিতা ও অনড়তার বিরুদ্ধে, গোঁড়া বিশ্বাসের বিরুদ্ধে। দ্বন্দ্ববাদ আমাদের শেখায় বিরোধসমূহের সামনে অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে না থেকে তাদের প্রকৃতির অনুসন্ধান করতে, প্রকৃতি ও সমাজের অভ্যন্তরে পারস্পরিক সম্পর্কের আরও গভীর ও পূর্ণ ব্যাখ্যা খুঁজে বার করতে।

ভাবনার সৃজনশীল দ্বান্দ্বিক প্রণালী আয়ত্তে আনার আরও প্রয়োজন এই কারণে যে দ্বান্দ্বিকতা কেবল বাহ্য জগতেরই প্রকৃতিগত নয়, — মানবচৈতন্যের, জগৎসংক্রান্ত বোধেরও প্রকৃতিগত। এই প্রশ্নের দিকে মনোযোগ ফেরানোর আগে বুঝে নিতে হবে চৈতন্যের মূল, তার বস্তুগত ও মানসিক রূপের পারস্পরিক সম্পর্ক।

৪ ॥ চৈতন্য: অত্যুন্নত বস্তুর ধর্ম

বস্তু ব্যতিরেকে চৈতন্য নেই

আমরা জানি যে জগৎ বস্তুগত। এতে চৈতন্য — মানুষের ভাবনা ও অনুভূতির স্থান কোথায়? এগুলিকে কী কোন বিশেষ ধরনের বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করা যায়?

এই জাতীয় ধারণার অর্থ যেন বিজ্ঞানের বিরোধিতা। বস্তুর থাকে যান্ত্রিক, ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম। অনুভব ও মননের সে ধর্ম নেই। এগুলি আমাদের মস্তিষ্কে অবস্থান করে মানসিক রূপে, যেখানে বাহ্য জগতের বিষয় ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের আত্মিক প্রতিফলন ঘটে।

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অভিজ্ঞতা এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহ এই সাক্ষ্য দেয় যে বস্তু ব্যতিরেকে চৈতন্য অসম্ভব। কেউই কখনও এমন কোন অনুভূতি ও বোধের পরিচয় পায় নি, বস্তুর উপর নির্ভর না করে আপনা-আপনিই যার উদ্ভব। চৈতন্যের অবস্থান একমাত্র সেখানেই, যেখানে আছে মানুষের মস্তিষ্ক, — যা মানুষের ভাবনা-চিন্তার যন্ত্র। মস্তিষ্কে আঘাত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চেতনাও বিকারপ্রাপ্ত হয়। বিজ্ঞানের ঘটনা প্রমাণ করছে যে চৈতন্য হল অত্যুন্নত বস্তুর — মানব মস্তিষ্কের ধর্ম। এই ধর্মটা কী?

'চৈতন্য' — এই শব্দটিই আমাদের এমন ধারণা দেয় যে তার সাহায্যে আমাদের জগৎ সম্পর্কে চেতনা হয়, আমরা চেতনা লাভ করি আমাদের চারপাশের ঘটনা সম্পর্কে। আর এর অর্থ হল এই যে চৈতন্যের জন্য প্রয়োজন শুধু মস্তিষ্কের উপস্থিতি নয়, — মস্তিষ্কের উপর প্রতিক্রিয়াসৃষ্টিকারী বস্তুগত বিষয়ের অস্তিত্বও বটে।

ক্রিয়াকলাপসংক্রান্ত অনুভূতির আবির্ভাব সম্পর্কে

উন্নততম স্নায়ুযন্ত্রসংক্রান্ত শারীরতত্ত্ব কী ব্যাখ্যা দিচ্ছে? বহিঃপ্রকৃতির যে-কোন উপাদান (দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোন সামগ্রী থেকে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি) ইন্দ্রিয়ের উপর (বর্তমান ক্ষেত্রে, চোখের উপর) প্রভাব বিস্তার করে। বাহ্য প্রদাহের তেজ রূপান্তরিত হয় স্নায়বিক উত্তেজনায় এবং অতঃপর তা পরিণত হয় অনুভূতিতে: চৈতন্যে উদ্ভাসিত হয় বিষয়ের রূপ।

ধরা যাক এমন কোন মস্তিষ্কের কথা, যেখানে বাহ্য জগতের কোন সঙ্কেতই প্রবেশ করে না। সে মস্তিষ্ক তার উন্নত গঠন হিশেবে যতই বিশিষ্ট হোক না কেন তাতে কোন রকম অনুভূতি, কোন রকম মননের আবির্ভাব সম্ভব নয়। অবশ্য এমন মস্তিষ্কের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু বাহ্য জগতের সঙ্গে মস্তিষ্কের যোগসূত্র ছিন্ন হওয়ার ঘটনাও চোখে পড়ে। এমন সব রোগীর দেখা পাওয়া যায় যাদের দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রবণের শক্তি নেই, গাত্রচর্মের সংবেদনশীলতা একেবারে নেই বললেই চলে। অধিকাংশ সময়েই তাদের চেতনা নিষ্ক্রিয়।

মস্তিষ্ককে কিছু পরিমাণে তুলনা করা চলে চলচ্চিত্রের চলমান ফিল্মের সঙ্গে, যার উপর বাস্তবের চিত্রসমূহের প্রতিফলন ঘটে। ক্যামেরার মুখকে বাহ্য জগৎ থেকে ঢেকে দিলে ফিল্ম পরিষ্কার থেকে যাবে, তাতে কোন রকম ছবিই ফুটবে না। বলাই বাহুল্য, এই উপমাটিকে আক্ষরিক অর্থে নেওয়া চলবে না। চলচ্চিত্রের ফিল্মে বিষয়সমূহের প্রতিফলন ঘটে রসায়নশাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যার নিয়ম অনুযায়ী। মানুষের মস্তিষ্কে বাস্তবের প্রতিফলন হল বহুগুণ জটিল শারীরিক ও সামাজিক প্রক্রিয়া।

সুতরাং, চৈতন্য নিছক মস্তিষ্কের ধর্ম নয়, — এ হল বস্তুজগতের সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়াসূত্রে গ্রথিত মস্তিষ্কের ধর্ম। চৈতন্য হল অত্যুন্নত পদার্থের মানসপ্রকৃতিতে বাহ্য জগৎ প্রতিফলনের ক্ষমতা। এরই ফলে মানুষ তার

পারিপার্শ্বিক জগৎকে জানতে পারে, যথাযথরূপে পরিচালনা করতে পারে তার ক্রিয়াকলাপ।

মানুষ কীভাবে জগৎকে জানে

জ্ঞানক্রিয়াকে মানুষের মস্তিষ্কের উপর নিছক দর্পণসুলভ প্রতিফলনক্রিয়া মনে করা ঠিক হবে না।

মানবসমাজ-অনুসৃত জগৎসংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রক্রিয়া কিছু পরিমাণে ব্যক্তি মানুষের জ্ঞান-বিকাশের পন্থার মতো। প্রাচীনকালে মানুষ বিদ্যুতের সম্পর্কে কিছুই জানত না। বজ্র তার মনে আতঙ্কের সঞ্চার করত, ঈশ্বরের ক্রোধের অভিব্যক্তি বলে মনে হত। এই কারণেই গ্রীসের পৌরাণিক কাহিনীতে জেউস হলেন বজ্রপাণি, অবাধ্যদের উপর তিনি বিজলীর আঘাত হানেন। ক্রমশ প্রকৃতিবিদ্যার ভাণ্ডারে বিদ্যুতের প্রকৃতিসংক্রান্ত তথ্য সঞ্চিত হতে লাগল। ঘর্ষণের ফলে বিদ্যুৎসঞ্চারিত কোন কোন পদার্থের ধর্ম অনুসন্ধান করা হল, আবিষ্কৃত হল বিদ্যুৎপ্রবাহসমূহের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়ার বিধি। এক্ষেত্রেও কিন্তু বিভ্রান্তি দেখা দিল: এক সময় বিদ্যুৎকে ভারহীন 'তরল বিদ্যুতে'র সঞ্চালন বলে ব্যাখ্যার চেষ্টা হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে বিদ্যুতের মূল সূত্রগুলি আবিষ্কারের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য বিজ্ঞান এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে জমা পড়ে গেছে। মানুষ যান্ত্রিক শক্তি এবং তাপশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তর করতে শিখেছে, এর বিপরীত দিকটাও সে করতে পারে। গড়ে উঠল প্রথম বিদ্যুৎস্টেশন, নির্মিত হল বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন। বাষ্পের জায়গায় বিদ্যুৎকে এখন মানুষের কাজে নিয়োগ করা হল। কিন্তু জ্ঞানের প্রক্রিয়া এখানেই থেমে রইল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজ পদার্থবিদ ডি. ম্যাক্সওয়েল উদ্ভাবন করলেন তড়িৎ-চুম্বকক্ষেত্র, যা বিদ্যুৎ, চুম্বকত্ব ও আলোকবিদ্যার এ যাবৎ বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রগুলিকে একত্রিত করেছে। আর আমাদের সামনে ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে নূতন দিগন্ত: বিজ্ঞানীরা তড়িৎ-চুম্বক, মহাকর্ষ

ও নিউক্লিয়াস ক্ষেত্রের সম্ভাব্য ঐক্যের কথা বলছেন। এইভাবে, বৈজ্ঞানিক চিন্তা ধাপে ধাপে ঘটনাপুঞ্জের গভীর থেকে গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করতে থাকে।

লেনিনের ভাষায়, জ্ঞানক্রিয়া হল অজ্ঞান থেকে জ্ঞানে, অপূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত জ্ঞান থেকে পূর্ণতর, সঠিকতর দিকে মননের এক জটিল গতিপ্রক্রিয়া। যেহেতু জগৎ অনন্ত, সেই হেতু জ্ঞানক্রিয়ারও কোন সীমা নেই, — তা অনন্ত।

মানুষের জ্ঞান অগ্রসর হয় পর্যবেক্ষণ এবং সংবেদন থেকে, অথবা দর্শনের ভাষায় বলা চলে, প্রাণবান অনুধাবন থেকে সূত্রসমূহের তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনের দিকে, অতঃপর বাস্তবে তার প্রয়োগে। এই হল সত্য উপলব্ধির, বিষয়গত বাস্তবতা উপলব্ধির দ্বান্দ্বিক পন্থা।

মানুষ সর্বোপরি জগৎকে জানে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে, — দৃষ্টি, শ্রুতি ও স্পর্শের সাহায্যে। এরা যেন প্রণালীর মতো, এই প্রণালীগুলির মধ্য দিয়ে বাহিত বস্তুজগৎসংক্রান্ত জ্ঞান ও তথ্য আমাদের কাছে পেঁছায়।

কিন্তু অনুভূতি যে আমাদের বিশ্বাসযোগ্য জ্ঞান সঞ্চার করে তার নিশ্চয়তা কোথায়? সংক্রমণের সময় কি কোন রকম বিকৃতি ঘটে না? আমরা অনুভূতির প্রকৃতির নির্ভুলতা সম্পর্কে নিশ্চিত, কেন না আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় ও **বাস্তব ক্রিয়াকলাপের** মধ্য দিয়ে একাধিকবার তা যাচাই হয়ে গেছে।

মানুষের সংবেদন ও উপলব্ধি বাহ্য জগতের বিষয়সমূহের সঠিক ধর্মের প্রতিফলন না ঘটালে অবস্থাটা কেমন দাঁড়াত? সেক্ষেত্রে মানুষ তার পারিপার্শ্বিক বাস্তবতার সঙ্গে পরিচিতই হতে পারত না। অবশ্য এমন ঘটনাও ঘটে যখন অনুভূতি 'আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করে'। অর্ধনিমজ্জিত পেন্সিলকে জলের মধ্যে ভাঙ্গা বলে মনে হয়। কিন্তু

এই 'প্রতারণা'ই আবার বস্তুগত ঘটনাপুঞ্জের যথার্থ ধর্মের প্রকাশ ঘটায়, এক্ষেত্রে তা হল অল্প ঘনত্ব থেকে বেশি ঘনত্বে সঞ্চরণকালে আলোকরশ্মির প্রতিসরণক্ষমতা। সুস্থ মানুষের বোধশক্তি বাহ্য জগতের বিষয়সমূহ সঠিকভাবে প্রতিফলন করে থাকে। কেননা ইন্দ্রিয়গুলির উদ্ভবই ত হয়েছে জীবপ্রকৃতির ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী মানিয়ে চলার উপায় এবং তদনুযায়ী দেহযন্ত্রের উৎকৃষ্ট উপযোজন হিশেবে।

কেবল বিষয়ের অনুধাবনই বিকাশের অভ্যন্তরীণ নিয়ম সম্পর্কে জ্ঞান সঞ্চার করতে পারে না। গাছের মাথার দিকে নজর দিয়ে, তার শাখা-প্রশাখা স্পর্শ করে, পাতার মর্মর ধ্বনি কান পেতে শুনে কিন্তু সূর্যরশ্মির প্রভাবে তার সবুজ পাতার অভ্যন্তরে যে গভীর পরিবর্তনপ্রক্রিয়া চলছে তা বোঝা যায় না। কারণটা মোটেই এই নয় যে প্রক্রিয়াগুলি চোখে দেখা সম্ভব নয়। অনুবীক্ষণের সাহায্যে আমরা পাতার অভ্যন্তরীণ জীবনে প্রবেশ করতে পারি, কিন্তু কেবল পর্যবেক্ষণে তুষ্ট থেকে তা বোঝা সম্ভব নয়। বোঝার অর্থ কী? এর অর্থ হল নিয়মের উদ্‌ঘাটন, সমগ্র জটিল পারস্পরিক ক্রিয়ার মধ্য থেকে মৌলিক সম্পর্কগুলি খুঁজে বার করা (বর্তমান ক্ষেত্রে আলোক-সংশ্লেষ প্রণালী)। অনুভূতি সে ধরনের কাজ সম্পন্ন করতে পারে না, কেননা অনুভূতির প্রকৃতিতে আছে যেন একই সূত্রে গ্রথিত প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় লক্ষণসমূহ।

কোন ঘটনার বিকাশের নিয়ম নির্ধারণ করতে গেলে অনুভূতির সাহায্যে লব্ধ অভিজ্ঞতার সাধারণীকরণ ও উপলব্ধির প্রয়োজন আছে। সেগুলিকে পাশাপাশি রেখে তুলনা করতে হবে, মূল জিনিসটিকে পৃথক করে নিতে হবে। আর এখানেই আমাদের আশ্রয় নিতে হবে **বিমূর্ত**

মনন অথবা যুক্তিগ্রাহ্য জ্ঞানের। ইন্দ্রিয়জ্ঞানের ভিত্তিতে তা গড়ে তোলে বিজ্ঞানসম্মত বিমূর্ত কল্পনা, অর্থাৎ ধারণা, যাতে বাস্তবের মৌলিক সম্পর্কগুলির প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়।

পদার্থবিদ্যা কাজে লাগায় 'বেগ', 'ভর', 'গতির পরিমাণ', 'শক্তি' ইত্যাদির ধারণা। এই ধারণাগুলির সবই বিজ্ঞানসম্মত বিমূর্ত কল্পনা। প্রকৃতির কোথাও বিশুদ্ধ রূপে না আছে বেগ, না শক্তি, না ভর। সেখানে আছে বস্তু, — সেগুলি সঞ্চরণ করে হয় দ্রুত গতিতে নয়ত বা ধীর গতিতে এবং স্বল্প বা অধিক পরিমাণে অন্য বস্তুর উপর প্রভাব বিস্তার করে। কিংবা ধরাই যাক না রসায়নশাস্ত্রের 'যোজ্যতা' অথবা জীববিজ্ঞানের 'বংশগতি'সংক্রান্ত ধারণার কথা। বাস্তব ক্ষেত্রেই আবিষ্কার করা সম্ভব যে বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুসকল নির্দিষ্ট অনুপাতে সংযুক্ত হয় কিংবা প্রাণী বংশপরম্পরায় নির্দিষ্ট লক্ষণসমূহ সঞ্চার করে থাকে। কিন্তু সেখানে এমন বিশুদ্ধরূপে না আছে কোন যোজ্যতা, না আছে কোন বংশগতি। 'বস্তু', 'গতি', 'নিয়ম' — এই দার্শনিক ধারণাগুলি সম্পর্কেও ঐ একই কথা বলতে হয়। বৈজ্ঞানিক ধারণার প্রতিষ্ঠা এবং নিয়মের উদ্ভাবনা করে বিজ্ঞানীরা মনে মনে বস্তুর মৌলিক ধর্ম ও সম্পর্কগুলি নির্ধারণ করেন এবং সেগুলিকে যেন বস্তু থেকে 'বিচ্ছিন্ন' বা 'বিমূর্ত' করে নেন। তা থেকেই নাম দেওয়া হয়েছে **বিমূর্ত অথবা বিচ্ছিন্নকৃত মনন।**

বৈজ্ঞানিক বিমূর্তন বাস্তবকে গভীরতর রূপে বুঝতে সহায়তা করে। পৃথক পৃথক বিষয়ের অসংখ্য অপ্রয়োজনীয় লক্ষণ ও ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলায় তাদের গভীর ভিত্তি, মর্ম আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব হয়। তা দিয়ে আমরা ঘটনাপুঞ্জকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি, উদ্ঘাটন করতে পারি তাদের অন্তর্নিহিত নিয়মবদ্ধতা।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, বয়েল-ম্যারিয়ৎ সূত্র সম্পর্কে যখন বলি তখন আমরা কোন গ্যাসের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের কথা বলি না, বলি না গ্যাসের

আধারস্বরূপ পাত্রের গঠন ইত্যাদি সম্পর্কে। কিন্তু আমরা গ্যাসের চাপ ও আয়তনের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কের রূপ উদ্ঘাটন করি, গভীরতর ভাবে গ্যাসের ধর্ম অনুধাবন করতে পারি।

ভাষার সঙ্গে বিমূর্ত ভাবনার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। যখন আমরা ভাবনা প্রকাশ করতে চাই তখন ভাষার শরণাপন্ন হই। মুখে কিছু উচ্চারণ না করেও ভাবা সম্ভব। কিন্তু এক্ষেত্রেও নিজেই যেন নিজের সঙ্গে কথা বলে ভাবনাকে কথার আবরণ পরাই। এমন কেন হয়?

কথাটা এই যে মানুষের মিলিত কার্যকলাপের মধ্য দিয়েই বিমূর্ত মননের আবির্ভাব, আর গোড়া থেকেই তা সামাজিক ফল। কর্মসূত্রে মানুষের কাছে জরুরী হয়ে দেখা দেয় কার্যকলাপসংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা এবং সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের বিনিময়। এই তাগিদ থেকে জন্ম নেয় শ্রমের মধ্য দিয়ে মানুষ পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা সম্পর্কে যে জ্ঞান অর্জন করে তা আদান-প্রদানের শব্দগ্রথিত মাধ্যম — ভাষা ও কথন।

ভাষা হল মানবজ্ঞানের ভাণ্ডারের সংরক্ষণ, হস্তান্তর ও পরিপূরণের এক মহামূল্য উপায়। ভাষা না থাকলে আমাদের কারোই সুযোগ হত না বই পড়ে এবং বিদ্যালয়ে পাঠ করে তিলে তিলে সঞ্চিত মানবজাতির ঐশ্বর্যের দ্বারা মানসিক সমৃদ্ধিলাভের। সেক্ষেত্রে মানুষের জ্ঞানমূলক কার্যকলাপের পারম্পর্য ও স্থায়িত্ব রক্ষার কোন উপায়ই থাকত না, উন্নত ধরনের জীবজন্তুর মানসপ্রকৃতির চেয়ে তার জ্ঞানের সামান্যই তফাৎ দেখা যেত।

একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে কোন কারণে কাউকে যদি ছোটবেলা থেকে মানুষের সংস্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয় এবং

সে যদি কথাও না বলতে শেখে তা হলে বিমূর্ত মননের সামর্থ্যও তার বিকশিত হতে পারে না। এর সমর্থনে নিম্নলিখিত ঘটনার উল্লেখ করা যায়। এক সময় ভারতের কোন এক অঞ্চলে এক বালিকার সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল, জন্মের কিছু দিনের মধ্যেই নেকড়ে তাকে নিয়ে যায়। বেশ কয়েক বছর মেয়েটি নেকড়দের মধ্যে বসবাস করেছিল। সে অবশ্যই কোন কথা বলতে পারত না, মানবিক মননের কোন রকম অস্তিত্ব তার মধ্যে ছিল না।

বিমূর্ত মনন — জ্ঞানক্রিয়ার এক বিশাল হাতিয়ার। একমাত্র এরই সাহায্যে সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞানের জন্ম, যে বিজ্ঞান মানুষের কাছে দুর্বোধ্য ঘটনাপুঞ্জের বিশ্লেষণ করে, উদ্ঘাটন করে প্রকৃতি ও সমাজ বিকাশের নিয়ম।

সত্য ও তার নির্ণায়ক

মানুষের জ্ঞানের উদ্দেশ্য হল **সত্যে** পেণছান, যে সত্যের সাহায্যে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে সঠিকভাবে বোঝা যায়, মানুষের প্রয়োজনমতো পরিবেশকে পরিবর্তন করা যায়।

সত্য বলতেই বা কী বুঝায়? এমন কোন দার্শনিক নেই যিনি নিজের সামনে এ প্রশ্ন রাখেন নি। অতীতের প্রখ্যাত চিন্তাবিদেরা নিজেদের উৎসর্গ করেছেন এই সত্যের অন্বেষায় এবং তাতে পেণছানোর পথের সন্ধানে।

খুব সাধারণভাবে বিজ্ঞানে সত্য বলতে বুঝায় এমন এক বিবৃতি, যাতে আছে বাস্তবের যথাযথ প্রতিফলন, তার কোন ধর্ম অথবা সূত্র।

যে প্রশ্নটি জটিলতর তা হল কীভাবে তা নির্ণয় করা যায়, যে-কোন বিবৃতিই সত্য হতে পারে কিনা। আমাদের জ্ঞানের সত্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ হতে গেলে জানা দরকার **নির্ণায়ক,** যা জ্ঞানের অভ্রান্ততা সমর্থন করতে পারে।

অনেক সময়ই দেখতে পাওয়া যায় লোকেদের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ চলছে। বিতর্ককারীদের প্রত্যেকেই নিজের যুক্তির সত্যতায় দৃঢ় বিশ্বাসী, প্রত্যেকেরই ধারণা যে তার নিজের মত সত্য। তাদের বিচার কে করবে? কোথায় পাওয়া যাবে এমন 'লিট্‌মাস পেপার' যার সাহায্যে সত্য ও বিভ্রান্তির পার্থক্য নির্ণয় করা যেতে পারে? বিজ্ঞানীরা অথবা আবিষ্কারকরা যখন নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করেন তখন তাঁরা শরণাপন্ন হন পরীক্ষা-নিরীক্ষার।

কোন বিজ্ঞানী যদি তাত্ত্বিক গবেষণার ভিত্তিতে বলেন যে অমুক-অমুক ধাতু-সংকরের অমুক-অমুক ধর্ম, তা হলে তাঁর সেই সিদ্ধান্ত সহজেই যাচাই করা যায়: এর জন্য প্রয়োজন কারখানার ল্যাবরেটরিতে নির্দিষ্ট ধাতুসমূহের সংকর পাওয়া গেলেই হল। যে-সব ধর্মের কথা বলা হয়েছে ধাতু-সংকরে যদি সেই সেই ধর্ম থাকে তা হলে বুঝতে হবে বিজ্ঞানী ঠিকই বলেছেন, আর যদি না থাকে, তা হলে তাঁর ভুল হয়েছে। দ. ই. মেন্দেলেয়েভের 'পর্যাবৃত্ত পদ্ধতি'র সত্যতা প্রমাণিত হল তখন, যখন বাস্তব অভিজ্ঞতায় নূতন নূতন উপাদানের সন্ধান পাওয়া গেল, যাদের অস্তিত্ব ও ধর্মের কথা এই পদ্ধতির ভিত্তিতে আগে থাকতেই বলা হয়েছিল। কৃত্রিম উপগ্রহ ও মহাকাশযানের সাফল্যজনক উড্ডয়ন মহাকাশসংক্রান্ত গবেষণাকারী বিজ্ঞানী ও ডিজাইনারদের তাত্ত্বিক অনুমানের সত্যতা প্রমাণ করেছে।

সত্যের সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য **নির্ণায়ক** হল **সমাজে তার প্রয়োগ,** অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক জগতের রূপান্তরক্ষেত্রে মানুষের ক্রিয়াকলাপ, — সর্বোপরি উৎপাদন-ক্রিয়াকলাপ।

প্রয়োগ শুধু প্রকৃতিবিদ্যাসংক্রান্ত তত্ত্বের নয়, সমাজতত্ত্বেরও সত্যনির্ণায়ক বটে। ইতিহাসে বহুবিধ

সামাজিক ও রাজনৈতিক মতবাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সেগুলির মধ্যে অনেক সঠিক সিদ্ধান্ত অথবা অনুমান ছিল, কিন্তু প্রয়োগের পরীক্ষায় তারা সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হতে পারে নি। কেবল মার্কসীয়-লেনিনীয় তত্ত্বই সমাজবিকাশের এবং আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক আন্দোলনের সমস্ত রকম ব্যবহারিক অভিজ্ঞতায়, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম গঠনের বাস্তবক্ষেত্রে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

জ্ঞানের বনিয়াদ — প্রয়োগ

প্রয়োগ কেবল সত্যের মানদণ্ডই নয়, — জ্ঞানেরও সূত্রপাত। গ্যেটের 'ফাউস্ট'-এ বলা হয়েছে: 'গোড়াতে ছিল কাজ'। বাস্তবজ্ঞানের চাহিদারই উদ্ভব মানুষের ব্যবহারিক তাগিদ থেকে। তারপর থেকে এবং আজও প্রয়োগ জ্ঞানের কাছে বিশেষ বিশেষ সমস্যা উত্থাপন করে আসছে। ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস বলেন যে সমাজে প্রযুক্তিগত চাহিদা দেখা দিলে তা বিজ্ঞানকে এমন দ্রুত গতিতে অগ্রসর করে, যা ডজনখানেক বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষেও সম্ভব নয়। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি প্রথমেই পরিচালিত হয় সেই সব সমস্যার দিকে, যেগুলির উদ্ভব ব্যবহারিক তাগিদে।

আর জ্ঞান নিজেও প্রয়োগ ছাড়া নিরর্থক। কল্পনা করা যাক আমরা আমাদের পারিপার্শ্বিক জগতের উপর কার্যত কোন রকম হস্তক্ষেপ না করে তাকে পর্যবেক্ষণ করছি মাত্র। এ ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই বস্তুগত ঘটনাপুঞ্জ বিকাশের সূত্র জানতে পারতাম না। একটা বাদামের ভেতরে কী আছে তাও খোলা না ভাঙ্গলে জানা সম্ভব হত না। বস্তুর অন্তর্নিহিত নিয়মাবলী জানার জন্য প্রয়োজন তার ভেতর দিকটাকে

উল্টে দিয়ে ভেতর থেকেই তাকে দেখা। আর তা একমাত্র বাস্তব ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই সম্ভব।

এই কারণেই প্রকৃতিসংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণার সবচেয়ে বড় উপায় হল পরীক্ষা-নিরীক্ষা। বিপুল পরীক্ষামূলক কাজ ছাড়া প্রাথমিক কণিকাসমূহ অথবা পারমাণবিক নিউক্লিয়াসের গঠন বোঝা সম্ভব নয়। শক্তিশালী সিংক্রো-ফেজোট্রন এবং অন্যান্য যে-সব জটিল যন্ত্রপাতি বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করে থাকেন সেগুলিও প্রয়োগের, অর্থাৎ আধুনিক শিল্পের ফল।

সমাজবিজ্ঞানও বিকশিত হয় ব্যবহারিক ভিত্তিতে। প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী সংগ্রামের অভিজ্ঞতার সাধারণীকরণস্বরূপ মার্কসবাদের আবির্ভাব। পার্টির কর্মসূচি এবং তার কংগ্রেস ও অধিবেশনের গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের যে সৃজনশীল বিকাশের পরিচয় মেলে তা হল সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম গঠনের বাস্তব অভিজ্ঞতার ফল।

এইভাবে, প্রয়োগ জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ভূমিকা গ্রহণ করে, তার বনিয়াদ হিশেবে কাজ করে। প্রয়োগের দ্বারাই প্রমাণিত হয় জগৎকে জানায় এবং তার বিকাশসংক্রান্ত নিয়মাবলী উদ্‌ঘাটনে মানুষের ক্ষমতার পরিচয়। বস্তু অনন্ত এবং অব্যয়, আর সেই কারণে এমন ঘটনাপুঞ্জ সর্বদাই থেকে যাবে যা এখন পর্যন্ত অজ্ঞাত। কিন্তু এমন কোন ঘটনা নেই যা জানা সম্ভব নয়। যা আমরা এই সেদিনও জানতে পারি নি, আজ তা আমাদের কাছে সুপরিচিত। আর যে-সব সমস্যা নিয়ে বিজ্ঞান মাথা ঘামাচ্ছে সেগুলো আগামীকাল সমাধিত হবে নূতন নূতন প্রয়োগসাফল্যের ভিত্তিতে।

প্রয়োগ নিজেও কিন্তু অনড় বা চিরকালের জন্য স্থিরীকৃত একটা কিছু নয়। বিশ বছর আগেও মানুষ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সীমানা ছাড়িয়ে বের হতে পারত না। আজ কৃত্রিম উপগ্রহ ও মহাকাশযান মহাকাশের বিস্তার কেটে চলেছে। প্রয়োগের বিকাশ জগৎসংক্রান্ত জ্ঞানের নূতন নূতন সম্ভাবনা খুলে দেয়।

প্রয়োগ জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে **অপেক্ষবাদ** ও **গোঁড়ামি** চূড়ান্তভাবে খণ্ডন করে।

অপেক্ষবাদীদের প্রতিপাদ্য এই যে জগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানই আপেক্ষিক, স্থির এবং স্থায়ী বলে কিছুই নেই। কাল যা সত্য বলে মনে হয়েছিল আজ তা মিথ্যা বলে প্রতীত। অপেক্ষাবাদ প্রয়োগবিরোধী। বিজ্ঞান যখন কোন ঘটনাপুঞ্জের অন্তর্নিহিত গূঢ় নিয়মাবলী আবিষ্কার করেছে এবং সেই নিয়মাবলী যখন প্রয়োগের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে, তখন বলতে হয় সেগুলো সঠিক, এবং যতক্ষণ ঐ ঘটনাপুঞ্জের অস্তিত্ব আছে ততক্ষণ অবধি সঠিকই থেকে যাবে।

গোঁড়া ব্যক্তিরা ঠিক তার বিপরীত; তাঁরা আমাদের জ্ঞানের অপরিবর্তনীয়তায় বিশ্বাসী। তাঁদের মতে যখন কোন নিয়ম আবিষ্কৃত হয় তখন তাকে চিরকালের জন্য যে-কোন পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য হতে হয়, যন্ত্রবৎ বাস্তবের উপর তার মোহর মেরে দিতে হয়। এ মতবাদও প্রয়োগবিরোধী। এখানে গণ্য করা হয় না যে জাগতিক ঘটনাপুঞ্জ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান কখনই জগতের অফুরান ভাণ্ডারকে নিঃশেষ করতে পারে না। প্রয়োগের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানও বিকশিত হতে থাকে, গভীরতা পেতে থাকে।

নিউটন-আবিষ্কৃত চিরায়ত বলবিদ্যার সূত্রাবলী যে সত্য তা বহুবার প্রয়োগের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে মানুষ যখন আলোকগতির কাছাকাছি গতি ধরে ফেলতে শুরু করল, তখন বোঝা গেল যে নিউটনের সূত্রাবলী হল আইনস্টাইন-উদ্ঘাটিত আরও সাধারণ নিয়মের অন্তর্গত আংশিক ঘটনামাত্র। তাই বলে চিরায়ত বলবিদ্যার নিয়ম কিন্তু মোটেই মিথ্যা প্রমাণিত হল না; সেই নিয়ম

আগের মতোই সঠিকভাবে অপেক্ষাকৃত স্বল্প গতিবেগের ক্ষেত্রে পদার্থের পারস্পরিক যান্ত্রিক ক্রিয়ার পরিচয় দেয়। কিন্তু এখন আমাদের জ্ঞান অপেক্ষাকৃত গভীর, আমাদের জ্ঞানে উদ্ভাসিত হয়েছে আলোকগতির কাছাকাছি গতিবেগ থেকে শুরু করে যে-কোন গতিবেগে পদার্থের পারস্পরিক ক্রিয়াসংক্রান্ত আরও সাধারণ নিয়মসমূহ।

উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি সাক্ষ্য দেয় যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে সর্বদাই এমন কিছু স্থায়ী মর্মবস্তু থেকে যায়, যাকে সত্য বলা চলে। তবে, এই মর্মবস্তু অপরিবর্তনীয় নয়: জ্ঞানবিকাশের প্রক্রিয়ায় তা যেন নূতন নূতন সিদ্ধান্ত ও উপসংহারের দ্বারা ভরাট হতে থাকে।

তত্ত্ব ও প্রয়োগের ঐক্য হল চৈতন্যের সক্রিয়তা এবং তার বিশাল পরিবর্তনক্ষমতাসম্পন্ন ভূমিকা উপলব্ধির চাবিকাঠি। চৈতন্য কদাচ বাইরে থেকে আরোপিত বাস্তবের নিষ্ক্রিয় প্রতিফলন নয়। চৈতন্য জগতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, মানুষের ব্যবহারিক কার্যকলাপের মাধ্যমে তার পরিবর্তন ঘটায়।

আমাদের আশেপাশে চেয়ে দেখলে এমন সামগ্রী কি খুব বেশি চোখে পড়বে যা প্রকৃতির নিজের দান, — মানুষের চৈতন্যের প্রেরণায় তার সৃজনশীল ক্রিয়াকলাপের ফল নয়? ডেস্ক, টেবিল, পদার্থবিদ্যার যন্ত্রপাতি, মায় স্কুলের দালান, কলকারখানা, জটিলতম মেশিনের গঠন — এসবই মানুষ তৈরি করেছে প্রাকৃতিক উপাদান থেকে, সবের উপরই আছে মানুষের উপলব্ধ চাহিদার ছাপ। এমন কি স্বয়ং প্রকৃতি — বন, তৃণভূমি, ক্ষেত্র, বায়ুমণ্ডল — সামাজিক ব্যবহারের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়। চৈতন্যের উদ্ভবের অর্থ ও চরম কারণ হল যাতে বাস্তবকে মানুষের প্রয়োজনের উপযোগী করে গড়ে তোলা যায়। লেনিনের কথায়, চৈতন্য কেবল জগতের প্রতিফলন ঘটায় না, তাকে রচনাও করে। মানুষ তার পারিপার্শ্বিক নিয়ে কখনও তৃপ্ত থাকতে পারে না বলে

বিষয়গত বাস্তবতার পরিবর্তন ঘটায়। চৈতন্যের সক্রিয়তার বিশেষ অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায় সমাজজীবনে। সোভিয়েত দেশে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভাবধারা কমিউনিজম গঠনের ব্যবহারিক রূপের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠে সৃষ্টি করছে এক নূতন জগৎ — কমিউনিজমের জগৎ।

৫ ॥ বস্তুবাদ ও ভাববাদ

জগৎ ও জগৎসংক্রান্ত জ্ঞানের মার্কসীয় দর্শনরূপের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহের পরিচয় নেওয়া গেল। এখন দেখা যাক অন্যান্য দার্শনিক তত্ত্বের মধ্যে এই মতবাদের স্থান কোথায়, শ্রেণী-সংগ্রাম ও রাজনীতির সঙ্গে তার সম্পর্কই বা কী।

দর্শনের দুটি ধারা

ইতিপূর্বে যা বলা হয়েছে তা থেকে দেখা যাচ্ছে যে মার্কসবাদী দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্য হল বাইরে থেকে আরোপিত যে-কোন বহির্গত সংযোগ ও ভাব-কল্পনা ছাড়াই জগৎকে তার নিজের অভ্যন্তরস্থল থেকে ব্যাখ্যা করা। প্রকৃতি, সত্তাকে* গ্রহণ করা হয় বাস্তবে যেমনটি আছে ঠিক তেমনি রূপে। যে মতবাদ জগৎকে সামগ্রিক বস্তু রূপে দেখে, সব কিছুকে বস্তুর মধ্য থেকে ব্যাখ্যা করে থাকে তাকে বলা হয় **বস্তুবাদ**। মার্কসবাদ হল বস্তুবাদের সর্বোচ্চ রূপ।

---

* আগেই বলা হয়েছে যে 'সত্তা' কথাটি এখানে দার্শনিক অর্থে গৃহীত; শব্দটি প্রযুক্ত হয়ে থাকে চৈতন্য বা মনন থেকে ভিন্ন প্রকৃতি, বস্তু ও বাহ্য জগৎ বোঝাতে।

বস্তুবাদের ইতিহাস সুদীর্ঘ। দার্শনিক মতবাদ হিশেবে প্রাচীনকালেই তার উদ্ভব ঘটে। তবে প্রাচীন বস্তুবাদের বৈশিষ্ট্য হল সরল বিশ্বাস, তার কোন নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল না, কেননা বিজ্ঞান নিজেই তখন ভ্রূণ অবস্থায়। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে বস্তুবাদের যে নূতন রূপের উদ্ভব হয় তার প্রয়াস ছিল সকল জ্ঞানের একত্রীকরণ এবং প্রকৃতি অনুশীলনের সাহায্যে বিজ্ঞানের শক্তিবৃদ্ধি। সে সময় সকল বিদ্যার তুলনায় পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছিল বলবিদ্যা। এ থেকেই ব্যাখ্যা করা যায় যে বস্তুবাদও ছিল **বলবিদ্যাগত**; জগতের সব নিয়ম, বলতে গেলে, বলবিদ্যার নিয়ম অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা হত। অপরিণত বিজ্ঞানের ফলে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের বস্তুবাদে আরও একটি যে ত্রুটি দেখা দিয়েছিল তা হল এই বস্তুবাদ জগতের ধারাবাহিক বিকাশ এবং জাগতিক সমস্ত ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের কোন ধারণা দিতে পারল না, অর্থাৎ এটা ছিল, দার্শনিকদের ভাষায়, **অধিবিদ্যামূলক**। শেষত, এ বস্তুবাদ ছিল **অনুধ্যানপরায়ণ,** কেননা মানুষের ব্যবহারগত এবং বৈপ্লবিক পরিবর্তনসাধনসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপের ভূমিকা সম্পর্কে তার ধারণা ছিল না।

মার্কসবাদী দর্শন জগৎকে দেখে থাকে অবিরাম গতি ও বিকাশের রূপে; এই প্রক্রিয়ার মধ্যে সমস্ত ঘটনার অবস্থান হল পারস্পরিক বন্ধন ও মিথস্ক্রিয়ার সম্পর্কে । এর অর্থ হল এই যে মার্কসবাদী দর্শনের বস্তুবাদ দ্বন্দ্ববাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই কারণে সাধারণভাবে মার্কসবাদী দর্শনের নাম হল **দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ।**

বস্তুবাদী দর্শন প্রকৃতিবিদ্যার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কযুক্ত এবং তা পরিচালিত হয় প্রকৃতি অনুশীলনের উদ্দেশ্যে। যাদের অভিপ্রায় জগৎ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জন এবং সেই জ্ঞানকে প্রগতির স্বার্থে কাজে লাগানো — বস্তুবাদী দর্শন সমাজের সেই শ্রেণীর উপকারে আসে। স্বাভাবিক নিয়মেই বস্তুবাদ হল সমাজের অগ্রণী প্রগতিশীল শ্রেণীর দর্শন।

আধুনিক সমাজের সবচেয়ে অগ্রণী ও প্রগতিশীল শ্রেণী হল শ্রমিক শ্রেণী। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও কমিউনিস্ট সমাজ গঠনের জন্য তার প্রয়োজন স্বচ্ছ বিজ্ঞানসম্মত বিশ্ববীক্ষা। ঠিক এই কারণেই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ হল শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্ববীক্ষার দার্শনিক বনিয়াদ।

বস্তুবাদ — দর্শনের অগ্রণী প্রগতিশীল ধারা। কিন্তু বস্তুবাদ ছাড়াও দর্শনে অন্য ধারা, অন্য মতবাদ আছে। তার নাম **ভাববাদ**। দেখা যাক এর মূল কথা কী।

ভাববাদীদের মতে জগতের মূল ভিত্তি হল আধ্যাত্মিক সূচনা, ভাব। বস্তুবাদীদের বিরোধী ভাববাদীরা গোড়া থেকেই প্রকৃতি, বস্তু ও সত্তাকে তাদের অভ্যন্তরীণ রূপ থেকে দেখতে নারাজ। ভাববাদীদের কাছে চৈতন্য, মন, ঈশ্বর — প্রকৃতি এবং বস্তুর স্রষ্টা।

ভাববাদের দুটি মূল ধারা: **বিষয়ীগত** ও **বিষয়গত** ভাববাদ। বিষয়ীগত ভাববাদীদের মতে বাহ্য জগতের সকল বিষয় ও ঘটনাপুঞ্জ মানবচৈতন্যেরই ফলকথা। 'সমগ্র জগৎ — আমার অনুভূতির সমষ্টি' — বিষয়ীগত ভাববাদের অর্থটি এই দাঁড়ায়।

বিষয়গত ভাববাদীরা বলেন যে বস্তুজগৎ — মানবচৈতন্যের অতীত কোন এক পরম বিশ্বব্যাপী চৈতন্যের সৃষ্টি।

ভাববাদ সামগ্রিকভাবে প্রকৃতিবিদ্যা এবং মানুষের ব্যবহারিক তথ্যের বিরোধী।

আধুনিক প্রকৃতিবিদ্যা প্রমাণ করে যে পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্য মানুষ এবং মনঃপ্রকৃতির দ্বারা বিশিষ্ট অন্য যে-কোন প্রাণীর আবির্ভাবের বহু আগে থেকেই ছিল। বাহ্য জগৎ যে মানবচৈতন্যনিরপেক্ষ এটাই কি তার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নয়?

'বিশ্বস্রষ্টা', পরম বিশ্বব্যাপী চৈতন্যসংক্রান্ত ধারণাটিও প্রকৃতিবিদ্যার সঙ্গে একেবারেই খাপছাড়া। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে চৈতন্য হল অত্যুন্নত পদার্থের — মস্তিষ্কের উৎপাদিত ফল। অত্যুন্নত বস্তুনিরপেক্ষ কোন পরম বিশ্বব্যাপী চৈতন্যের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। আর যদি ধরেও নেওয়া যায় যে তা আছে, তা হলে নাস্তি থেকে কীভাবে তার দ্বারা বিশ্বসৃষ্টি সম্ভব? এটাও বিজ্ঞানের সকল নিয়ম বিরোধী। মানুষ মহাকাশ বিজয়ে যাত্রা করেছে, অণু-বিশ্বের গোপন রহস্যে সে প্রবেশ করছে, কিন্তু কোথাও বিশ্বব্যাপী সেই পরম চৈতন্যের ক্রিয়াকলাপের কোন চিহ্নই তার চোখে পড়ে নি, — প্রাকৃতিক কারণ দিয়ে সমস্ত ঘটনাপুঞ্জের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

একবার নেপোলিয়ন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ লাপ্লাসের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, কেন তাঁর রচনায় কোথাও ঈশ্বরের কথা নেই। বিজ্ঞানী সগর্বে উত্তর দেন, 'আমি এই অনুমানের কোন প্রয়োজন দেখতে পাই নি।' এই সময় থেকে বিজ্ঞানের অনেক বড় বড় আবিষ্কার হয়, বিজ্ঞান অনেক দূর অগ্রসর হয়ে যায়। আমরা লাপ্লাসের কথা পুনরাবৃত্তি করে বলতে পারি যে জগতের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যার জন্য মানুষ বিশ্বাত্মাসংক্রান্ত কোন কল্পিত ধারণার প্রয়োজন বোধ করে না।

তথাপি ভাববাদ টিকে থাকার কারণ কী এবং কেনই বা তা বহু লোকের চৈতন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে আসছে? বিজ্ঞানীদের মধ্যেও আবার তার অনুগামী আছেন। ব্যাপারটা এই যে যেমন মানুষের জ্ঞানক্রিয়ার অভ্যন্তরে, তেমনি সামাজিক অবস্থার মধ্যেও তার মূল প্রোথিত।

ভ. ই. লেনিন মানুষের জ্ঞানক্রিয়াকে তুলনা করেছেন বৃক্ষের সঙ্গে, যা ফলই দেয় না, নিষ্ফলা পুষ্পও দিতে পারে।

আগেই বলা হয়েছে যে জ্ঞান হল এক জটিল পরস্পরবিরোধী প্রক্রিয়া। জ্ঞানের দিকে এক তরফা দৃষ্টিকোণের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে ভাববাদী মতাদর্শ।

জ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষের ইন্দ্রিয়ানুভূতির একটা বড় রকমের ভূমিকা আছে। কিন্তু একথাও ভুললে চলবে না যে ইন্দ্রিয়ানুভূতি ছাড়াও আছে বিমূর্ত মনন এবং প্রয়োগ। ইন্দ্রিয়ানুভূতির ভূমিকা মাত্রাতিরিক্ত ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখতে গেলে এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে ইন্দ্রিয়ানুভূতি হল একমাত্র সত্য, যাকে নিয়ে আমাদের কাজকর্ম চলে। বিষয়ীগত ভাববাদীদের কথাটা ঠিক এই রকম: তাঁদের মতে ইন্দ্রিয়ানুভূতিই হল জগতের 'উপাদান'। এ থেকে দাঁড়ায় এই যে ইন্দ্রিয়ানুভূতি কখনই বাস্তব বিষয়সমূহের ধর্মের প্রতিফলন নয়, — তার অস্তিত্ব স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং মানুষ যেন অনেকটা সরল বিশ্বাসে তাকে বাহ্য জগতের বিষয় হিশেবে গ্রহণ করে থাকে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে এখানেই বিষয়ীগত ভাববাদের মূল।

সকলেই ত কতবার আপেল, নাসপাতি, কমলালেবু ও অন্যান্য ফল দেখেছে ও আস্বাদ করেছে। কিন্তু সাধারণভাবে 'ফল' কেউ দেখে নি, আস্বাদও করে নি। 'ফল' — এই ধারণাটি হল আপেল, নাসপাতি ও কমলালেবুর সহজাত সাধারণ ধর্মের বিমূর্তীকরণ, কাল্পনিক বিশেষীকরণ। জ্ঞানের প্রক্রিয়ায় বিমূর্তীকরণ প্রয়োজনীয়, এছাড়া চিন্তা অসম্ভব, যে-কোন বিজ্ঞানেই তার স্থান আছে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে কোনক্রমেই ভুলে গেলে চলবে না বিমূর্তের মধ্যে যে সাধারণ ধর্ম আছে, পৃথক পৃথক বিষয়সমূহ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে তার নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নেই। একথা ভুলে গেলে সহজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে আপেল, নাসপাতি ও কমলালেবুর পাশাপাশি 'ফল' বলেও একটা কিছু আছে এবং এই ধারণাই সকল বাস্তব ফলের মূল, তাদের ভিত্তি। বিষয়গত ভাববাদীরা তা-ই করে থাকেন: তাঁদের মতে ধারণা বা ভাব স্বাধীনভাবে অবস্থান করে এবং পৃথক পৃথক বস্তুর জন্ম দেয়। জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিষয়গত ভাববাদের মূল এখানে।

তবে, মনন-প্রক্রিয়ার পরস্পরবিরোধী গুণই একমাত্র ব্যাপার নয়। ভাববাদের জীবনী শক্তির কারণ খুঁজতে হবে সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে।

স্বাভাবিক নিয়মে বস্তুবাদের সঙ্গে ভাববাদের পার্থক্য এই যে যারা প্রাচীন ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে চায়, ভাববাদ সেই রক্ষণশীল শ্রেণীর স্বার্থ প্রকাশ করে। কিন্তু জগতের নিয়মসংক্রান্ত জ্ঞান সমাজ প্রগতির সহায়ক। এই কারণে ক্ষয়িষ্ণু শ্রেণীগুলি ভাববাদ আঁকড়ে ধরে থাকে, কেননা ভাববাদ জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে, বাস্তব সমস্যাসমাধানের পথ থেকে তাদের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করে এবং টেনে নিয়ে যায় কুহেলিকাচ্ছন্ন জীবনবিরোধী বিমূর্তনের দিকে। ক্ষয়িষ্ণু শ্রেণীসমূহ ভাববাদী চিন্তাধারার প্রবর্তক ও পৃষ্ঠপোষক — আর ভাববাদ টিকে থাকার সেটাই মূল কারণ, এতেই বোঝা যায় কেন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে ভাববাদী তত্ত্বের এমন প্রাচুর্য।

ভাববাদ যে বিজ্ঞানবিরোধী তার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ ধর্মের সঙ্গে তার আত্মীয় সম্পর্ক।

ধর্ম হল মানবচৈতন্যে জগতের কাল্পনিক ও বিকৃত প্রতিফলন। তার মধ্যে প্রকৃতির সামনে মানুষের অসহায়তা ও সামাজিক নির্যাতনের একটা অভিব্যক্তি ঘটে। জগৎ সম্পর্কে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সরাসরি বিপরীত। তারা পরস্পরবিরোধী।

সভ্যতার গোটা ইতিহাস বিজ্ঞান ও ধর্মের সংঘর্ষে পরিপূর্ণ। ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও তাঁর সর্বশক্তিমানতা সম্পর্কে চার্চ যে অন্ধ বিশ্বাস প্রচার করে আসছে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ তার মূলে কুঠারাঘাত হানে। প্রাকৃতিক

ঘটনাপুঞ্জকে স্বাভাবিক কারণ হিশেবে ব্যাখ্যা করে বিজ্ঞান ঈশ্বরের কোন স্থান রাখে নি। অতীতে চার্চ বিজ্ঞানীদের উপর নির্যাতন চালিয়েছে। চার্চের পাণ্ডাদের হাতে অনেক প্রথিতযশা বিজ্ঞানীকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। আজ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির বিপুল শক্তির সামনে ধর্ম পিছু হটতে বাধ্য। চার্চের পাণ্ডারা আজ আর সচরাচর বিজ্ঞানের বিরোধিতা করে না; বরং উল্‌টো — তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যেন ঈশ্বরই মানুষকে জগৎ জানার সামর্থ্য দিয়েছেন।

জন্মমুহূর্ত থেকে আজকের যুগ পর্যন্ত ধর্মের ভূমিকা সচরাচর প্রতিক্রিয়াশীল। ধর্মের প্রয়াস হল মানুষের অন্তঃকরণে সত্তার নশ্বরতা এবং পার্থিব সুখের জন্য সংগ্রামের নিষ্ফলতার ধারণা সঞ্চার করে তাকে নিষ্ক্রিয় এবং উদাসীন করে ফেলা। পুরস্কার হিশেবে ধর্মবিশ্বাসীদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় 'স্বর্গরাজ্যে'র। এ জাতীয় ধারণা অবশ্যই সবচেয়ে বেশি করে শোষক শ্রেণীরই স্বার্থসিদ্ধ করে, কেননা এর ফলে বিপ্লবী সংগ্রাম থেকে শ্রমজীবী জনসাধারণের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করে রাখা সম্ভব। আর সেই কারণেই শোষক শ্রেণী সর্বদাই ধর্ম ও চার্চের পাণ্ডাদের সমর্থন জানিয়ে এসেছে। ধর্ম হয়ে দাঁড়াল জনগণের মনকে দাসত্ববন্ধনে বেঁধে রাখার উপায়; কার্ল মার্কসের সমুজ্জ্বল প্রকাশভঙ্গিতে, ধর্ম — জনগণের আফিং।

মর্মবাণী এবং সামাজিক ভূমিকা — উভয় দিক থেকেই ভাববাদ ও ধর্ম একে অপরের প্রতিরূপ। উভয়েই বিজ্ঞান ও বস্তুবাদবিরোধী।

তাই, **বস্তুবাদ ও ভাববাদ — দর্শনের দুই মূল ধারা, দুই বিরোধী দিক, দুই আপসহীন শিবির।**

দর্শনের মূল প্রশ্ন

বস্তুবাদ ও ভাববাদ — এই দুই বিরোধী শিবিরের বিভাজন-রেখা হল **বস্তু ও চৈতন্যের সম্পর্কসংক্রান্ত প্রশ্নের** ভিন্ন ভিন্ন সমাধান। বস্তুবাদের মূল নীতি — প্রথমে বস্তু, তারপর চৈতন্যের স্বীকৃতি। সমস্ত রকম সামাজিক প্রয়োগ ও প্রকৃতিবিজ্ঞানের ভিত্তিতে বস্তুবাদীরা বলেন যে সত্তা চৈতন্যকে নির্ধারণ করে। অন্য দিকে ভাববাদের মূল নীতি — প্রথমে চৈতন্য, তারপর বস্তুর, সত্তার স্বীকৃতি।

দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির অবস্থান নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে বস্তু ও চৈতন্যের সম্পর্ক নিয়ে যে প্রশ্নটি উঠেছে তার অতিরিক্ত গুরুত্বের কথা স্মরণে রেখে নাম দেওয়া হয়েছে **দর্শনের মূল প্রশ্ন**। এই প্রশ্নের উত্তর অনুযায়ী বিশ্ববীক্ষাসংক্রান্ত অন্যান্য প্রশ্নেরও সমাধান হয়ে থাকে। বস্তুর অগ্রগণ্যতা ও তার চৈতন্যনিরপেক্ষতা যদি সত্যি সত্যিই স্বীকার করে নেওয়া যায়, তা হলে স্বাভাবিকভাবে গতি, দেশ ও কালকে বস্তুসত্তার বিষয়গত রূপে দেখা সম্ভব। আর যদি বস্তুকে দ্বিতীয় স্থান দেওয়া হয় এবং তাকে চৈতন্যের সৃষ্টি বলে গণনা করা হয়, তবে গতি, দেশ ও কালকে দেখতে হয় চৈতন্যের, মনের রূপ হিশেবে। অথবা বিজ্ঞানের নিয়মসংক্রান্ত প্রশ্নের কথাই ধরা যাক না কেন। দর্শনের মূল প্রশ্নের বস্তুবাদী সিদ্ধান্ত সরাসরি পৌঁছে দেয় নিয়মাবলীর বাস্তবতার স্বীকৃতিতে। ভাববাদী সিদ্ধান্ত নিয়মগুলিকে হয় বিশ্বব্যাপী পরমা চৈতন্যের প্রকাশ নয়ত বা মানুষের চেতনার ফল বলে মনে করে। এমন কোন দার্শনিক সমস্যাই নেই যার সমাধান দর্শনের মূল প্রশ্নসমাধানের উপর নির্ভর না করছে।

দর্শনের মূল প্রশ্নের দ্বিতীয় একটি দিকও আছে:

জগতের সঙ্গে আমাদের চৈতন্যের সম্পর্ক কী, অথবা অন্যভাবে বলতে গেলে, জগৎকে আমরা উপলব্ধি করি কি? এই প্রশ্নের সমাধানের মধ্যে নিহিত রয়েছে বস্তুবাদ ও ভাববাদের বৈপরীত্য। বস্তুবাদীরা জোর দিয়ে বলেন: হ্যাঁ, জগৎকে উপলব্ধি করি। ভাববাদীদের মধ্যে উক্ত প্রশ্নের উত্তরে ঐকমত্য নেই। অধিকাংশ আধুনিক বুর্জোয়া দার্শনিকই মূলত মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির অসহায়তা প্রচার করে জগৎকে উপলব্ধির সম্ভাবনা অগ্রাহ্য করে দেন। কোন কোন ভাববাদী আবার অনুরূপ সম্ভাবনার কথা অগ্রাহ্য না করেও মানেন না যে জ্ঞান হল মানুষের চিন্তাশীল মস্তিষ্কের উপর বস্তুর প্রতিফলন। তাঁদের মতে জ্ঞানের শেষ কথা হল বিশুদ্ধ ভাব জগতের সঙ্গে সংযোগসাধন, পরমাত্মার বা বিশ্বব্যাপী পরমা চৈতন্যের, অন্য কথায়, ঈশ্বরের উপলব্ধি। একথা স্পষ্ট যে জ্ঞানক্রিয়া সম্পর্কে এ রকম বোধ প্রকৃতি ও সমাজসংক্রান্ত বিষয়গত নিয়মাবলী অনুসন্ধানের লক্ষ্য নয়।

কিছু কিছু দার্শনিক তাঁদের মতবাদের প্রতিক্রিয়াশীল রূপ আড়াল করার উদ্দেশ্যে বলে থাকেন যে তাঁরা না বস্তুবাদী, না ভাববাদী, তাঁরা নাকি দর্শনের দুই মূল ধারার বৈপরীত্যের ঊর্ধ্বে উঠেছেন।

কিন্তু সত্তা ও চৈতন্যের সম্পর্কসংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর কী করে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব? এটা করা সম্ভব নয়। তাই, সঙ্গত কারণেই বস্তুবাদ ও ভাববাদের একমুখিনতা অতিক্রমের প্রয়াসী, এইসব দার্শনিক আসলে বিশুদ্ধতম ভাববাদ প্রচার করে থাকেন। তাঁরা শুরুতেই ঘোষণা করেন যেন দর্শনের মূল প্রশ্নের কোন অর্থ হয় না এবং দর্শনের কাজ হল 'অনুভূত তথ্যে'র বিশ্লেষণ। কিন্তু তারপর দেখা যাচ্ছে যে 'অনুভূত তথ্যে'র অর্থ — সংবেদন ও বোধ। অনুভূত তথ্য, অর্থাৎ সংবেদন ও বোধ — একমাত্র বাস্তব। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে মূল প্রশ্নের সমাধান ইতিমধ্যেই চলে গেছে ভাববাদের পক্ষে:

বস্তুগত জগতের প্রতি সম্পর্কে সংবেদন ও বোধের স্থান প্রথম বলে বিবেচিত হয়েছে।

ইতিপূর্বে লক্ষ্য করা গেছে যে বস্তুবাদ এবং ভাববাদ দুই পৃথক পৃথক শ্রেণী-স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। বস্তুবাদ বিজ্ঞাননির্ভর এবং তা সমাজের অগ্রণী প্রগতিশীল শ্রেণীর স্বার্থ ব্যক্ত করে। ভাববাদ ধর্মের সঙ্গে যুক্ত এবং বিষয়গতভাবে রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে।

ব্যাপারটা অবশ্য সহজেই মিটে যেত যদি মনে করা যেত যে সব ভাববাদীই জ্ঞানত প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করেন। তাঁদের মধ্যে আবার এমনও আছেন যাঁরা সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনের বহু প্রশ্নে প্রগতিশীল স্থান গ্রহণ করে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ, অনেক ভাববাদী দার্শনিক শান্তির জন্য সক্রিয় সংগ্রাম চালাচ্ছেন। এখানে আমরা একথাই বলতে চাই যে প্রবর্তকরা চান আর নাই চান, ভাববাদী মতাদর্শের বিষয়বস্তুই প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীর স্বার্থ সাধন করে।

মানুষের বুদ্ধির জন্য বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে চলছে তীব্র আপসহীন সংগ্রাম। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা এবং সমাজে সংঘটিত শ্রেণী-সংগ্রাম থেকে এই সংগ্রাম অনেক দূরের। কিন্তু আসলে মোটেই তা নয়। মূল ধারা দুটির প্রত্যেকটিরই প্রয়াস মানুষের নির্দিষ্ট এক ধরনের বিশ্ববীক্ষা বা মননের বিশেষ প্রণালী গড়ে তোলা। আর এরই উপর নির্ভর করছে রাজনৈতিক সমস্যা বোঝার শক্তি। তাই, বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে সংগ্রাম পরিণামে শ্রেণী-সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত।

এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে সত্তা ও চৈতন্যের সম্পর্কসংক্রান্ত প্রশ্নটি যে একটি মূল প্রশ্ন তা শুধু এই কারণেই নয় যে তার সমাধানের উপর অন্যান্য দার্শনিক প্রশ্নও নির্ভর করছে, — এ ছাড়াও অন্য কারণ আছে। দর্শনের মূল প্রশ্নের সমাধানের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসে দার্শনিক তত্ত্বের **পার্টি আনুগত্য,** সমাজে শ্রেণী-সংগ্রামের সঙ্গে, রাজনীতির সঙ্গে তার সম্পর্ক।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের পার্টি আনুগত্য এই যে তা শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ প্রকাশ করে। বুর্জোয়া দার্শনিকরা জোর দিয়ে দেখাতে চেষ্টা করেন দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের পার্টি আনুগত্য যেন জগৎ সম্পর্কে বিষয়গত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অন্তরায়। কিন্তু আসলে তা নয়। শ্রমিক শ্রেণী বাস্তবের নিয়মাবলীকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জানতে আগ্রহী, কেননা জগতের পুনর্গঠনের জন্য এটা তার দরকার। এই কারণে শ্রেণী-স্বার্থ এক্ষেত্রে মোটেই বিষয়গত ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অন্তরায় নয়, বরং তার বিপরীত। বুর্জোয়া পার্টি আনুগত্য হল অবশ্য অন্য কথা। তা সত্যি সত্যি জগৎকে জানার বিষয়গত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পথে বাধা সৃষ্টি করে। আধুনিক বুর্জোয়া শ্রেণী বাস্তবতা বিকাশের নিয়মসংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে আগ্রহী নয়, কেননা এসব নিয়ম পুঁজিবাদের ধ্বংস ডেকে আনে। এ অবস্থায় বুর্জোয়া দার্শনিকদের কাছ থেকে কি অপক্ষপাতিত্ব ও বিষয়ানুগত্য আশা করা যেতে পারে?

মার্কসবাদী দর্শনের পার্টি আনুগত্য, শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ এবং রাজনীতির সঙ্গে তার সম্পর্ক সবচেয়ে পরিষ্কারভাবে পাওয়া যায় সমাজবিকাশের নিয়মসংক্রান্ত মতবাদের মধ্যে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমাজবিকাশের মতবাদ

মানব-ইতিহাস জটিল ও বহুমুখী। বিপ্লব, অভ্যুত্থান, কু দে তা, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, স্বার্থের সংঘাত, মতাদর্শের লড়াই — ইতিহাসে এমন সব ঘটনার অন্ত নেই। উত্তাল প্রবাহের মধ্য থেকে এত নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল এবং এমন অসম প্রকৃতির ঘটনাবলীর তাৎপর্য অনুধাবন কীভাবে সম্ভব? এর কোন নিয়মবদ্ধতা আছে কি, না কি তা সংঘটিত হয় নেহাৎই আকস্মিক ঘটনার খামখেয়ালিপনায়?

এসব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকে সমাজবিকাশের নিয়মসংক্রান্ত মার্কসীয় মতবাদ — **ঐতিহাসিক বস্তুবাদ।** এই মতবাদ ইতিহাসের অন্তর্নিহিত বিষয়গত যুক্তি প্রতিষ্ঠায় এবং জটিল সামাজিক ঘটনাপুঞ্জের মধ্য থেকে বনিয়াদ হিশেবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয় নির্ধারণ ক'রে সেগুলির অভ্যন্তরে প্রবেশে সহায়তা করে।

৬ ॥ ইতিহাসের বস্তুবাদী উপলব্ধি

সামাজিক সত্তা ও সামাজিক চেতনা

প্রকৃতির বিকাশের সঙ্গে সমাজ-ইতিহাসের মৌলিক পার্থক্য আছে। প্রকৃতিতে সচেতন শক্তি নেই, সেখানে বিকাশ ঘটে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। কিন্তু সমাজের ক্ষেত্রে অন্য ব্যাপার। এখানে প্রভাব বিস্তার করছে চেতনা এবং ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মানুষ। মানুষ একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করে তার দিকে এগিয়ে যায়। এমন একটা অলীক ধারণারও সৃষ্টি হতে পারে বুঝি বা চেতনা, ভাব ও উদ্দেশ্য সমাজজীবন নির্ধারণ করে থাকে।

ব্যাপারটা আসলে তা নয়। বাঁচতে হলে মানুষকে মেটাতে হয় খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান ইত্যাদির বৈষয়িক চাহিদা। মানুষ চাক আর নাই চাক উক্ত চাহিদাগুলির খাতিরে তাকে প্রকৃতি ও অন্যান্য মানুষের সঙ্গে নির্দিষ্ট সম্পর্কস্থাপন করতে হয়: সে জমি চষে, বাসস্থান তৈরি করে, পোশাক সেলাই করে, উৎপাদনের হাতিয়ার নির্মাণ করে, তার শ্রমের উৎপন্ন দ্রব্য বিনিময় করে। এসবের মধ্য থেকে উদ্ভূত হয় মানুষের বৈষয়িক জীবন, তার সামাজিক সত্তা। এই সামাজিক সত্তার আছে নিজস্ব বিষয়গত নিয়মাবলী, যা সমাজে নিহিত যে-কোন ভাবধারা ও তত্ত্ব নিরপেক্ষ।

সামাজিক সত্তার সারমর্ম হল মানুষের উৎপাদন ও বৈষয়িক সম্পদসংক্রান্ত শ্রমের ক্রিয়াকলাপ।

শ্রমের কল্যাণেই মানুষ পশু-জগৎ থেকে পৃথক। ইতর প্রাণীরা বৈষয়িক সম্পদ সৃষ্টি করে না, তারা প্রকৃতিতে যা তৈরী অবস্থায়

আছে তাই ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সক্রিয় সম্পর্ক রাখে, তার রূপান্তর ঘটায় এবং শ্রমের দ্বারা তার প্রয়োজনীয় বৈষয়িক সম্পদ তৈরি করে। মানুষ তার সমগ্র ইতিহাস জুড়ে যে-সব ঐশ্বর্য গড়ে তুলেছে শ্রমই তার উৎস। কেবল মানুষের মস্তিষ্ক নয়, তার হাতও অনেক পরিমাণে শ্রমের ফল: হাজার হাজার বছরের শ্রম হাতের উৎকর্ষসাধন করেছে, তাকে পরিণত করেছে জটিলতম ক্রিয়া সম্পাদনের দক্ষ অঙ্গে। একমাত্র শ্রমের কল্যাণেই মানুষের হাত এমন এক চরম উৎকর্ষের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে যার ফলে, ফ্রেডারিখ এঙ্গেলসের কথায়, রাফায়েলের ছবি, তুরভালদসানের ভাস্কর্য ও পাগানিনির সঙ্গীত জীবনরূপ লাভ করতে পেরেছে।

শ্রম সর্বদাই মানবজীবনের শাশ্বত ও স্বাভাবিক অবস্থা এবং সমাজের অস্তিত্ব ও বিকাশের মূল বনিয়াদ।

মানুষ যদি উৎপাদনের সাহায্যে তার বৈষয়িক চাহিদা পূরণ না করতে পারত, তা হলে তার দ্বারা বিজ্ঞান, রাজনীতি ও শিল্পের চর্চা সম্ভব হত না, সম্ভব হত না দার্শনিক মতবাদ ও রাজনৈতিক তত্ত্ব গড়ে তোলা। অর্থাৎ, মানুষের সামাজিক অস্তিত্ব তার চৈতন্য নির্ধারণ করে থাকে।

একই সমাজে যে প্রায়ই বিভিন্ন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদ দেখতে পাওয়া যায়, তার ব্যাখ্যাটা কী? দৃষ্টান্তস্বরূপ, পুঁজিবাদী সমাজে যেমন বুর্জোয়া মতাদর্শ বিদ্যমান, তেমনি বিদ্যমান সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ। বুর্জোয়া মতাদর্শ পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার পরিপোষক। এই মতাদর্শ বুর্জোয়া সমাজে পুঁজিপতির অবস্থান ও তার স্বার্থকে রূপ দিয়ে থাকে। পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের শোষণ করে, তাদের হাতে শাসনের পূর্ণ ক্ষমতা, তারা জীবনের সকল সম্পদ ভোগ করে। স্বভাবতই তাদের স্বার্থরক্ষাকারী এই তত্ত্বগুলি ন্যায়বিচার এবং উৎকর্ষসাধনের কপট আবরণে পুঁজিবাদের জয়গান করে।

এর বিপরীতে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ প্রলেতারীয়দের নিপীড়িত অবস্থার প্রতিফলনস্বরূপ। এই মতাদর্শ তার শ্রেণী-স্বার্থের প্রতিফলন ঘটিয়ে পুঁজিবাদের বিকাশের নিয়মাবলী বিশ্লেষণ করে, প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রামের বিপ্লবী কর্তব্যসমূহ স্থির করে, পুঁজিবাদের উচ্ছেদ এবং সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পথ ও উপায় নির্ধারণ করে।

এইভাবে, সামাজিক চিন্তাধারার বিষয়বস্তু নির্ধারিত হয় যে-সব শ্রেণীর স্বার্থ তারা সাধন করে তাদের সামাজিক সত্তার রূপের দ্বারা।

যে-কোন সামাজিক তত্ত্বের কথাই আমরা ধরি না কেন, তার মূল সর্বদাই সামাজিক সত্তার এবং সমাজজীবনের বৈষয়িক পরিস্থিতির অভ্যন্তরভাগে প্রোথিত। এখান থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে আসা যায়: সমাজবিকাশের বনিয়াদ মানুষের চেতনার মধ্যে খুঁজতে গেলে চলবে না, — খুঁজতে হবে তার সামাজিক সত্তার মধ্যে, **বৈষয়িক সম্পদের উৎপাদন** বিকাশের মধ্যে।

উৎপাদনী শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্ক

সর্বপ্রথম নির্ণয় করতে হয় কোন কোন উপাদান নিয়ে উৎপাদন গঠিত হয়।

উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন — প্রাথমিক উপাদান, যা থেকে মানুষ তার প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করে থাকে। এগুলি হল কাঠ, কয়লা, আকরিক লৌহ ইত্যাদি, অন্য কথায় বলতে গেলে সেই সব সামগ্রী, যেগুলির উদ্দেশ্যে মানুষের শ্রম পরিচালিত, অথবা যাদের বলি **শ্রমের সামগ্রী**। খালি হাতে বৈষয়িক সম্পদের উৎপাদন সম্ভব নয়। এমন কি অতি

সাধারণ কাজও মানুষ সম্পন্ন করে থাকে হাতুড়ি, কুড়ুল অথবা কোদালের সাহায্যে। আধুনিক উৎপাদনব্যবস্থার জন্য চাই মেশিন, কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি। যে-সব বস্তুর সাহায্যে মানুষ যান্ত্রিক, দৈহিক ও রাসায়নিক শক্তির ব্যবহার করে শ্রমের সামগ্রীর উপর প্রভাব বিস্তার করে সেই সব বস্তুকে বলা হয় **শ্রমের হাতিয়ার**। উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমের হাতিয়ারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উপর জোর দিয়ে কার্ল মার্ক্স তাদের নাম দিয়েছেন উৎপাদনের অস্থি ও পেশীব্যবস্থা। শ্রমের হাতিয়ার ছাড়াও উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন কারখানার কর্মশালা, স্টোর রুম, সংরক্ষণশালা, শক্তির উৎস, রেলপথ, বৈদ্যুতিক যোগাযোগব্যবস্থা, জল-সেচন খাল ইত্যাদি। শ্রমের হাতিয়ারসমেত এগুলি হল **শ্রমের উপায়**। শ্রমের সামগ্রী এবং উপায় নিয়ে গঠিত হয় **উৎপাদনের উপায়,** অর্থাৎ বৈষয়িক উপাদানের সামগ্রিক পরিমাণ, — যা ছাড়া উৎপাদন অসম্ভব।

অবশেষে, উৎপাদন মানুষের শ্রমমূলক ক্রিয়াকলাপেরই অন্তর্ভুক্ত। মানুষ ছাড়া যন্ত্র অচল, কেবল যন্ত্রাদি বৈষয়িক সম্পদ উৎপন্ন করতে পারে না। পরিশ্রমী মানুষ **বৈষয়িক সম্পদের স্রষ্টা** — উৎপাদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

সমাজের সৃষ্ট উৎপাদনের উপায় এবং তাতে গতিসঞ্চারের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী মানুষ — এই নিয়ে গঠিত হয় **সমাজের উৎপাদনী শক্তি**। উৎপাদনী শক্তির দ্বারা সমাজ ও প্রকৃতির মধ্যে বৈষয়িক সম্পর্কের চরিত্রবৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয়। তাদের বিকাশের মাত্রা প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভুত্বের সূচক।

উৎপাদনী শক্তিবিকাশের মাত্রা সর্বোপরি বিচার করা যায় উৎপাদনের হাতিয়ার দিয়ে। এগুলির নিজস্ব ইতিহাস আছে: আদিম

মানুষের কাঠ ও পাথরের তৈরী শ্রমের আদিম হাতিয়ার থেকে শুরু ক'রে আধুনিক জটিল স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি, যা মানুষকে কেবল পরিদর্শন ও ব্যবস্থাপনার কাজে রেখে দিয়ে সমস্ত রকম উৎপাদনপ্রক্রিয়া নির্বাহ করে। শ্রমের হাতিয়ার যত উৎকৃষ্ট, বৈষয়িক সম্পদ তত বেশি উৎপন্ন করা সম্ভব। পাথরের কুড়ুল দিয়ে কাঠ কাটতে আদিম মানুষের কখন কখন লেগে যেত পুরো একটা দিন। আজ বৈদ্যুতিক করাতের সাহায্যে সে কাজ সম্পন্ন হয় মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে। শক্তিশালী এক্‌সক্যাভেটর ৭ ঘণ্টায় যে পরিমাণ মাটি তোলে তা ঐ সময়ের মধ্যে কোদাল হাতে হাজার মানুষের পক্ষেও সম্ভব নয়।

উৎপাদনক্ষেত্রে তাপশক্তি ব্যবহারের দ্বারাও উৎপাদনী শক্তির মাত্রা পরিমাপ করা যায়। হাজার হাজার বছর ধরে শক্তির উৎস ছিল প্রধানত মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর পেশীশক্তি। আজ শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্রসমূহ মানুষকে যে তাপশক্তি সরবরাহ করে তা মানুষের পেশীশক্তিকে লক্ষ লক্ষ গুণ ছাড়িয়ে যায়।

উৎপাদনী শক্তি বিকাশের মাত্রার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হল উৎপাদনক্ষেত্রে মানুষের অভিজ্ঞতা, তার জ্ঞান ও দক্ষতা। আজ থেকে ১০০--১৫০ বছর আগে যা ছিল তার সঙ্গে আধুনিক উৎপাদনী শক্তির প্রভেদ কেবল উৎপাদনের হাতিয়ারের উৎকর্ষে নয়, — উৎপাদনের চর্চায়, কর্মীদের শিক্ষা এবং নৈপুণ্যের উচ্চ মানের দিক থেকেও তার প্রভেদ। আধুনিক উৎপাদন বিজ্ঞান ছাড়া একেবারেই নিরর্থক; বিজ্ঞান স্বয়ং সরাসরি উৎপাদনী শক্তিতে পরিণত হয়।

একক ব্যক্তির পক্ষে বৈষয়িক সম্পদের উৎপাদন সম্ভব নয়। এমন কোন সংসার-বিরাগীও যদি কেউ থাকে যে সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে জীবনধারণের সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ নিজেই তৈরি করতে চায়, তবে তাকেও ব্যবহার করতে হবে উৎপাদনের সেই সব হাতিয়ার যার সৃষ্টি এবং উৎকর্ষসাধন হয়েছে সমাজের হাতে, প্রয়োগ

করতে হবে বহু পুরুষসঞ্চিত উৎপাদনসংক্রান্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। আর শ্রমের উপায় বলি, উৎপাদনসংক্রান্ত অভিজ্ঞতা বলি বা শ্রমের উৎপন্ন দ্রব্য বলি — এসবই হল মানুষের সম্মিলিত ক্রিয়াকলাপের ফল, যে প্রক্রিয়ায় তারা নিজেদের মধ্যে **উৎপাদন-সম্পর্ক** রচনা করতে বাধ্য।

উৎপাদন-সম্পর্ক বলতে কী বোঝায়? আমরা জানি যে আদিম সমাজে সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে গোষ্ঠীর সকল সদস্যেরই সমান স্থান ছিল: তারা একত্রে তাদের জীবনধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করত, পরস্পরকে সাহায্য ও সহায়তা করত, মিলিতভাবে উৎপন্ন বৈষয়িক সম্পদ ভোগ করত। এর কারণ কী? কারণ এই যে উৎপাদনের উপায় ছিল সমাজের সকল সদস্যের সম্পত্তি। দাস-সমাজে, সামন্ততান্ত্রিক এবং পুঁজিবাদী সমাজে সম্পর্ক সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান: একে অপরকে শোষণ করে থাকে। শ্রমের উৎপন্ন দ্রব্যের বণ্টনও অসমান। মুষ্টিমেয় শোষক শ্রেণী উৎপন্ন বৈষয়িক সম্পদের প্রধান অংশ হস্তগত করে, আর নির্যাতিত শ্রেণী কাল অতিবাহিত করে দারিদ্র্য ও বঞ্চনার মধ্যে। এর ব্যাখ্যা কী? ব্যাখ্যাটা এই যে শোষক সমাজে উৎপাদনের উপায় নগণ্য, সংখ্যালঘু শোষকদের অধিকারভুক্ত থাকে। সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনপ্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের আবার পরিবর্তন ঘটে: তাদের মধ্যে স্থাপিত হয় শ্রমসহযোগিতার সম্পর্ক, আর বৈষয়িক সম্পদের বণ্টন হয় শ্রম অনুযায়ী। এর কারণ এই যে সমাজতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদনের মূল উপায়সমূহ সমগ্র সমাজের অধিকারভুক্ত।

স্বাভাবিকভাবেই উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে কী সম্পর্ক স্থাপিত হয় তা বলতে গেলে জানা দরকার উৎপাদনের উপায় কার অধিকারভুক্ত। উৎপাদন-সম্পর্ক — সর্বোপরি হল **মালিকানার সম্পর্ক**।

মানুষ তার উৎপন্ন বৈষয়িক সম্পদের অধিকার ভোগ না করে বাঁচতে পারে না, আর সম্পদের অধিকার ভোগের মধ্য দিয়ে মানুষ পরস্পরের মধ্যে রচনা করে বৈষয়িক সম্পর্ক অথবা মালিকানার সম্পর্ক। বৈষয়িক সম্পদ অধিকারের ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট উপায় হিশেবে মালিকানার যে-কোন রূপ ছাড়া উৎপাদন অসম্ভব। বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা জোর দিয়ে বলেন যে মালিকানার অর্থ হল জিনিসের উপর মানুষের অধিকার ও কর্তৃত্ব। বস্তুত জিনিস মালিকানার বিষয় হয়ে দাঁড়াবে একমাত্র তখনই যখন মানুষ উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় নিজেদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক রচনা করে। মালিকানাকে তুলনা করা যেতে পারে ভাষার সঙ্গে। একক মানুষের উৎপন্ন সামগ্রী হিশেবে ভাষার কোন অর্থই হয় না, কেননা সেক্ষেত্রে তার কথা বলার মতো কেউ নেই। ঠিক তেমনি, মানুষে মানুষে সম্পর্কের বাইরে মালিকানারও কোন অস্তিত্ব নেই।

উৎপাদনের উপায়ের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা শোষণের সম্পর্ক সূচনা করে। সামাজিক মালিকানা শ্রমসহযোগিতার সম্পর্ক নির্ধারণ করে। উৎপাদনের উপায়ে মালিকানার রূপের উপর যেমন নির্ভর করছে উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর স্থান, তেমনি নির্ভর করছে শ্রমে উৎপন্ন দ্রব্যের বণ্টন।

উৎপাদনী শক্তি এবং উৎপাদন-সম্পর্ক কীভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত এবং কীভাবেই বা তারা একে অপরকে প্রভাবিত করে?

উৎপাদন-সম্পর্কের সঙ্গে উৎপাদনী শক্তির চরিত্রগত সামঞ্জস্যের নিয়ম

মানবসমাজের আবির্ভাব-মুহূর্ত থেকে মানুষ সর্বদা বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদন করে চলেছে। উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেলে আজ হোক কাল হোক সমাজ সব সঞ্চিত সম্পদ নিঃশেষে ব্যবহার করে ধ্বংস হয়ে যেত। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে উৎপাদন নিত্য নব রূপ লাভ করে উন্নত হয়ে চলেছে; যেমন উৎপাদনী শক্তির, তেমনি উৎপাদন-সম্পর্কেরও পরিবর্তন ঘটছে।

মানব-ইতিহাসের আদিপর্বে উৎপাদনী শক্তি ছিল একেবারে নিম্ন পর্যায়ে। লগুড়, পাথরের কুড়ুল, বল্লম এবং কিছু পরে তীর ও ধনুক — এই ছিল সেকালে উৎপাদনের মূল হাতিয়ার। কঠোর পরিশ্রমের ফলে মানুষ পূরণ করতে সমর্থ হত কেবল তার চাহিদার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম অংশ। আর এই ন্যূনতম অংশও তাদের পক্ষে পাওয়া সম্ভব হত একমাত্র সম্মিলিত শ্রমের ফলে। স্বাভাবিকভাবেই এমন অবস্থায় উৎপাদনের উপায় ও শ্রমজাত উৎপন্ন দ্রব্য ব্যক্তিগত মানুষের অধিকারভুক্ত না হয়ে ছিল যৌথ অধিকারে। সামাজিক মালিকানার কারণ ছিল উৎপাদনী শক্তির বিকাশের নিম্ন মাত্রা। শোষণও ছিল অসম্ভব, কেননা কোন কর্মীর পক্ষেই তার জীবনধারণের উপযোগী উৎপাদনের অতিরিক্ত কিছু উৎপন্ন করা সম্ভব হত না। কৌম সমাজের অভ্যন্তরে প্রভুত্ব করত শ্রমসহযোগিতার সম্পর্ক। উৎপাদন-সম্পর্ক ছিল উৎপাদনী শক্তি বিকাশের মাত্রার অনুরূপ।

প্রায়ই আদিম কৌমব্যবস্থাকে কমিউনিস্ট ব্যবস্থা বলা হয়। কিন্তু এটা ছিল আদিম কমিউনিজম। এর ভিত্তি সমাজের প্রাচুর্য নয়, — দারিদ্র্য ও অনটন। এখানেই তার সীমাবদ্ধতা, তার ধ্বংসের অনিবার্যতাও এতেই অন্তর্নিহিত।

বিকাশের পরবর্তী পদক্ষেপ অনুসরণ করা যাক। শ্রমের হাতিয়ার ক্রমেই উন্নত হতে লাগল। দেখা দিল ধাতুনির্মিত শ্রমের হাতিয়ার। সমাজে শ্রমবিভাগের উদ্ভব হল; কৃষিকার্যের পাশাপাশি আবির্ভূত হল পশুপালন ও অতঃপর হস্তশিল্প। আর শ্রমবিভাগের অনিবার্য ফল হল দ্রব্য-বিনিময়; কেননা কৃষকের দরকার পশুজাত দ্রব্য, আবার পশুপালকের দরকার কৃষিজাত দ্রব্য। এই পারস্পরিক চাহিদা তারা মেটাতে পারে একমাত্র বিনিময়ের মাধ্যমে। কৌম ও কৌলিক গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ মানুষের আদিম সমাজব্যবস্থার উৎপাদন-সম্পর্ক ও উৎপাদনী শক্তির মধ্যে যে সঙ্গতি ছিল তা ভেঙ্গে পড়ল, কেন না শ্রমবিভাগ ও বিনিময়ব্যবস্থার সঙ্গে তা খাপ খায় না।

উৎপাদনক্ষেত্রে প্রগতির ফলে এই সম্পর্কগুলির বিনাশ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল। উন্নততর শ্রমের হাতিয়ার ব্যবহার উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি করল। সেগুলি উৎপাদনের জন্য আর সমগ্র গোষ্ঠীর শক্তি দরকার হল না, — পৃথক পৃথক পরিবারের দ্বারাই তা সম্ভব হয়ে দাঁড়াল। সেই সঙ্গে উৎপাদনের উপায়ের উপর মালিকানাও ধীরে ধীরে পৃথক পৃথক পরিবারের হাতে আসতে থাকে। উদ্ভব হল ব্যক্তিগত মালিকানার এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে মানুষে মানুষে অর্থনৈতিক বৈষম্যের। দলপতি এবং নেতারা তাদের ঐশ্বর্যবৃদ্ধির জন্য নিজ নিজ পরিস্থিতির যে সুযোগ গ্রহণ করতে লাগল তারও ফলে বৈষম্য বৃদ্ধি পেতে শুরু করল। শ্রমের নূতন উপায়ের কল্যাণে কর্মীর পক্ষে জীবনধারণের অতিরিক্ত দ্রব্যের উৎপাদন সম্ভব হল। দেখা দিল মানুষের উপর মানুষের শোষণ, ধনী দরিদ্রকে ক্রীতদাসে পরিণত করল, যুদ্ধবন্দীদের পরিণত করল দাসে। আদিম গোষ্ঠী-সমাজের পরিবর্তে স্থান নিল দাসপ্রথা।

দাসপ্রথাভুক্ত সমাজে উৎপাদনের উপায় দাসপ্রভুদের সম্পত্তি। কর্মীরাও (ক্রীতদাসরা) তাদের অধিকারে; প্রকৃতপক্ষে তারা 'শ্রমের মুখর হাতিয়ার'। দাসপ্রথাভুক্ত সমাজে প্রথম প্রথম উৎপাদন-সপর্ক ও উৎপাদনী শক্তির মধ্যে সঙ্গতি থাকে। উৎপাদনী শক্তির অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে বৈষয়িক ও মানসিক সংস্কৃতি সাধিত হতে পারে একমাত্র বিপুল সংখ্যক ক্রীতদাসকে শোষণের মধ্য দিয়ে। ঠিক এরই ফলে সম্ভব হল উৎপন্ন দ্রব্যের বৃদ্ধি, সামাজিক শ্রমবিভাগের গভীরতা

বৃদ্ধি এবং সংস্কৃতির বিকাশ। মানসিক শ্রম শারীরিক শ্রম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। শারীরিক শ্রম থেকে মুক্ত বিজ্ঞানী, কবি, ভাস্কর ও দার্শনিকের পক্ষে মানসিক ক্রিয়াকলাপে মনোনিবেশ করা সম্ভব হল। এইভাবে বিজ্ঞান ও শিল্পের বিকাশ ঘটল।

তবে, ইতিহাস অলক্ষ্যে অবিরাম তার কাজ চালিয়ে যেতে লাগল। উৎপাদনী শক্তির ক্রমেই উৎকর্ষ হতে থাকে: কৃষিকার্যের উন্নয়ন হয়, ধাতু ও ধাতব যন্ত্রপাতি তৈরীর ক্ষেত্রে মানুষ উত্তরোত্তর সাফল্য লাভ করতে থাকে, হস্তশিল্পীদের নৈপুণ্য বৃদ্ধি পায়। দাসপ্রথাধীন উৎপাদন-সম্পর্ক ক্রমেই উৎপাদনী শক্তির উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। ক্রীতদাস তার কাজে আগ্রহী নয়, যে খাটে পরিদর্শকের চাবুকের ভয়ে, তাই তার শ্রম তেমন ফলপ্রসূ নয়। ধীরে ধীরে দাসপ্রথারও কাল শেষ হয়ে এলো, তার স্থান নিল সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজে উৎপাদনের মূল উপায় থাকে সামন্ত-ভূস্বামীদের অধিকারে। কর্মীদের (কৃষকদের) সম্পত্তি হিশেবে থাকে কেবল চাষের এবং পশুপাল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ছোটখাটো সামগ্রী। কৃষকদের জমি না থাকায় ভূস্বামী তাদের ভূমিদাসে পরিণত করে বলপূর্বক নিজের কাজে খাটায়। ভূস্বামী কৃষকদের ছোট ছোট জমির টুকরো সংস্থান করে, কিন্তু পরিবর্তে কৃষক তাকে ফসলের একটা অংশ দিতে (উৎপন্ন দ্রব্যের উপর খাজনা অথবা কর) এবং তার জমি চাষ করতে (চাষবাবদ খাজনা অথবা বেগার) বাধ্য থাকে।

প্রথম প্রথম নূতন উৎপাদন-সম্পর্কগুলি উৎপাদনী শক্তির মানের উপযুক্ত হয়, তার কিছুটা বিকাশ ঘটায়; কেননা শ্রমের ফলে ভূমিদাসেরও বৈষয়িক আগ্রহ আছে: ফসলের একটা অংশ সে পাবে। এই জন্য সে কাজের উপর বেশি জোর দেয়, আরও সক্রিয়ভাবে শ্রমের হাতিয়ার ব্যবহার করে।

কিন্তু সময়ে সামন্ততন্ত্রের অভ্যন্তরে নূতন উৎপাদনী শক্তি বৃদ্ধি পায়। নগরসমূহের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে হস্তশিল্পের উৎপাদনও বিকশিত হতে থাকে। শ্রমবিভাগ গভীরতর হতে থাকে, ব্যাপকতর হতে থাকে বিনিময়প্রথা, ধীরে ধীরে জাতীয় বাজারের আবির্ভাব ঘটে। পণ্যদ্রব্য ও অর্থের সম্পর্ক সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মর্মমূল

ক্ষয়ে ফেলে। বিকাশ আরও এগিয়ে যায়। প্রাথমিক কারখানা গড়ে ওঠে। তার ফলে হস্তশিল্পের কারিগররা স্থানচ্যুত হয়। প্রথম মেশিনের আবির্ভাব ঘটে। বর্ষণের পর গজিয়ে ওঠা ব্যাঙের ছাতার মতো দেখতে দেখতে গড়ে উঠল কলকারখানা।

নূতন যন্ত্রপাতি আবির্ভাবের ফলে ভূমিদাসত্ব থেকে মুক্ত ও অপেক্ষাকৃত মার্জিত কর্মীর চাহিদা দেখা দিল। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়াল সমাজ-প্রগতির অন্তরায়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সামনে তাকে হটে যেতে হয়।

পুঁজিবাদে উৎপাদনের উপায় পুঁজিপতিদের হাতে কেন্দ্রীভূত। উৎপাদন-কর্মী এইসব উপায় থেকে বঞ্চিত এবং সেই কারণে সে তার শ্রমশক্তি পুঁজিপতিদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য।

পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক উৎপাদনী শক্তির ব্যাপক বৃদ্ধির সম্ভাবনা সূচনা করে। মানুষের ইতিহাসে এতদিন যাবৎ যা গড়ে উঠেছে, যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রগতি তার সব কিছুকে ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু উৎপাদনী শক্তির এমন প্রবল বিকাশ ঘটিয়ে পুঁজিবাদ তার নিজের ধ্বংসের বাস্তব ভিত্তিই গড়ে তোলে। পুঁজিবাদী সম্পর্কের মধ্যে নূতন উৎপাদনী শক্তির যথেষ্ট পরিমাণ জায়গা হয় না। পুঁজিবাদ নূতন যন্ত্রবিজ্ঞানের বিপুল সম্ভাবনাকে মানুষের সমৃদ্ধির কাজে লাগাতে অক্ষম। তাছাড়া পুঁজিবাদের অভ্যন্তরে সৃষ্ট হয় তীব্র পরস্পরবিরোধিতা, যার প্রকাশ ঘটে বেকারত্ব, যুদ্ধ এবং উৎপাদনী শক্তির ধ্বংসের মতো নানা সংকটের মধ্যে। সমাজতন্ত্রে উত্তরণ আসন্ন হয়ে ওঠে।

উৎপাদনী শক্তি এবং উৎপাদন-সম্পর্কের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে উভয়ের মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত ঐক্য আছে: উৎপাদনী শক্তির নির্দিষ্ট মাত্রার জন্য দরকার যথোচিত নির্দিষ্ট উৎপাদন-সম্পর্ক। কেবল দুটিকে একত্র করেই বুঝতে হয় সমাজ-ইতিহাসের কোনও পর্যায়ে কীভাবে, কোন উপায়ে মানুষ বৈষয়িক সম্পদ সৃষ্টি করছে। অন্যভাবে বলা যেতে পারে উৎপাদনী শক্তি এবং উৎপাদন-সম্পর্ক একত্রে বৈষয়িক সম্পদের **উৎপাদনপ্রণালীর** চরিত্র নির্ধারণ করে।

উৎপাদনী শক্তিই হল উৎপাদনপ্রণালীর সবচেয়ে বেশি গতিশীল ও পরিবর্তনশীল দিক। আর এটা বেশ বোঝাও যায়। বৈষয়িক সম্পদ সৃষ্টি করতে করতে মানুষ ক্রমাগত উৎপাদনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে থাকে আর তারই ফলে মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় বর্তমান উৎপাদনের হাতিয়ারের উৎকর্ষসাধন এবং নূতন নূতন হাতিয়ারের উদ্ভাবন। এই জন্য উৎপাদনী শক্তি সর্বদাই গতিশীল। উৎপাদন-সম্পর্কের ব্যাপারটি অন্য রকম। মালিকানার রূপ প্রতিনিয়ত পাল্টায় না, এই রূপ তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল। আদিম সমাজব্যবস্থায় উৎপাদনের উপায়ের উপর যে সামাজিক মালিকানা দেখা যেত তার অস্তিত্ব ছিল কয়েক লক্ষ বছর ধরে। দাস-মালিকানার অস্তিত্ব ছিল কয়েক হাজার বছর ধরে, সামন্ততান্ত্রিক — হাজার বছরেরও বেশি, আর পুঁজিবাদী — কয়েক শ' বছর।

উৎপাদনপ্রণালীর দুদিকের মধ্যে অসম বিকাশের ফলে কী ঘটে থাকে? উৎপাদন-সম্পর্ক উৎপাদনী শক্তি থেকে পিছিয়ে পড়ে এবং তার সঙ্গে বিরোধের সূচনা করে, যার ফলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা গভীরতা প্রাপ্ত হয়ে সংঘর্ষে রূপান্তরিত হয়। উৎপাদন-সম্পর্ক হয়ে দাঁড়ায় উৎপাদনী শক্তির ভবিষ্যৎ বিকাশের প্রতিবন্ধক। এই সংঘর্ষের সমাধান হল পুরনো উৎপাদন-সম্পর্কের বদলে উৎপাদনী শক্তির মাত্রার নূতন সম্পর্কের প্রচলন। নূতন উৎপাদন-সম্পর্ক উৎপাদনী শক্তির ব্যাপক বিকাশ ঘটায় এবং প্রথম প্রথম নিজেরাই তাদের গতি সঞ্চালনকারী হিশেবে কাজ করে। উৎপাদনী শক্তি উৎপাদন-সম্পর্ককে ছাড়িয়ে যায়। আবারও উৎপাদনপ্রণালীর দুদিকের মধ্যে অসঙ্গতি দেখা দেয়। ইতিহাস তার নিজের বিকাশে নূতন উল্লম্ফন সঞ্চার করে।

এইভাবে, উৎপাদনপ্রণালীর দুটো দিকের মধ্যে এক গভীর বন্ধন রয়েছে। উৎপাদন-সম্পর্ক নির্ভর করছে উৎপাদনী শক্তির উপর এবং দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকতেই হবে: উৎপাদনের বিকাশ তাই দাবি করে। অসামঞ্জস্যের ফলে উৎপাদনপ্রণালীর অভ্যন্তরে দেখা দেয় বিরোধ এবং তখন তাকে নূতন উৎপাদনী শক্তির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিবর্তন করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। এই হল **উৎপাদনী শক্তির চরিত্রের সঙ্গে উৎপাদন-সম্পর্কের সামঞ্জস্যকারী নিয়মের** মর্মকথা; এই নিয়মটি হল ঐতিহাসিক প্রগতির মূল চাবিকাঠি।

ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে ঘটনার উদ্দাম আবর্তে রাজনীতিজ্ঞ, রাজা, কূটনীতিবিদ ও সেনানায়কদের প্রবল স্বার্থের সংঘাত আলোড়ন সৃষ্টি করে চলেছে। অনভিজ্ঞ পর্যবেক্ষকের মনে হতে পারে তাঁরা যেন নিজেদের খেয়ালখুশিমতো ইতিহাস রচনা করে। তার মনে এমন কোন সন্দেহেরও উদয় না যে নিগূঢ় ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া বলে একটা কিছু আছে যা নির্ধারিত হয়ে থাকে উৎপাদনপ্রণালীর নিয়মের প্রভাবে এবং উৎপাদনী শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের পারস্পরিক ক্রিয়ায়। এই প্রক্রিয়াই আবার মানব-ইতিহাসের ভিত্তি রচনা করে।

৭ ॥ সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সমাজের মানসিক জীবনযাত্রা

উৎপাদন-বিকাশের নিয়মের পরিচয় লাভের পর ফেরা যাক সেই প্রশ্নে, — কেমন করে সামাজিক সত্তা — সমাজের বৈষয়িক জীবন সমাজ-চৈতন্য, তার মানসিক জীবনযাত্রা নির্ধারণ করে থাকে।

উৎপাদনী শক্তি এবং উৎপাদন-সম্পর্ক সমাজচৈতন্যের বিকাশে কী ধরনের প্রভাব বিস্তার করে দেখা যাক। উৎপাদনী শক্তি থেকে শুরু করা যাক। উৎপাদনের উপায়ের উৎকর্ষসাধন এবং উৎপাদনের ব্যাপারে মানুষের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক। তবে, ব্যাপারটা অযৌক্তিক হবে যদি আমরা উৎপাদনী শক্তির সরাসরি বিকাশ থেকে সামাজিক ভাবধারা ও তত্ত্বকে তুলে দিতে চাই। অনেক পুঁজিবাদী দেশে উৎপাদনক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো একই রকম যন্ত্রপাতির ব্যবহার হয়ে থাকে; কিন্তু রাজনৈতিক ব্যবস্থা, ভাবাদর্শ এবং নৈতিক আদর্শ মূলত একে অপরের বিপরীত। সামাজিক তত্ত্ব, রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং নৈতিক সম্পর্কের ভিত্তি সরাসরি উৎপাদনী শক্তির মধ্যে খুঁজলে চলবে না।

এখানে উৎপাদন-সম্পর্কের ভূমিকা কী? দৃষ্টান্তের জন্য পুঁজিবাদী সমাজের কথাই ধরি। সেখানে প্রভুত্ব করে ব্যক্তিগত মালিকানা এবং শ্রমিকদের উপর বুর্জোয়াদের শোষণের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক। রাজনৈতিক ব্যবস্থা এই উৎপাদন-সম্পর্কগুলির সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ: রাষ্ট্রশক্তি বুর্জোয়াদের অধীনে, তারাই অর্থনীতিতে কর্তৃত্ব করে থাকে। বুর্জোয়া মনোবৃত্তি পুরোপুরি ব্যবসাদারী, বাণিজ্যিক: উৎপাদন-সম্পর্কেও তার প্রতিফলন দেখা যায়, এক্ষেত্রে উৎপাদনের প্রধান উদ্দেশ্য হল ফায়দা ওঠানো, মুনাফার পিছু পিছু ছোটা। বুর্জোয়া দার্শনিক ও রাজনৈতিক তত্ত্ব এবং দৃষ্টিভঙ্গি তাই শেষ পর্যন্ত পুঁজির স্বার্থই রক্ষা করে। আপত্তি উঠতে পারে যে পুঁজিবাদী সমাজেও এমন সব অগ্রণী তত্ত্ব দেখা যায় যা

শ্রমিক শ্রেণী এবং অন্যান্য প্রগতিশীল শক্তির স্বার্থ ব্যক্ত করে থাকে। কথাটা ঠিকই। কিন্তু সেগুলিরও আবির্ভাব ফাঁকা জায়গার উপর নয়। ঐসব তত্ত্বের মধ্যে পুঁজিবাদের বিরোধ প্রতিফলিত হয়।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে পুঁজিবাদী সমাজের তুলনা করা যাক। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সামাজিক মালিকানার ভিত্তিতে মানুষে মানুষে নূতন ধরনের উৎপাদন-সম্পর্ক স্থাপিত হয়। মানসিক ও রাজনৈতিক জীবনের ক্ষেত্রে মতাদর্শগত সম্পর্ক ও সমাজচৈতন্যে কীভাবে তার প্রতিফলন ঘটে? নূতন উৎপাদন-সম্পর্ক অনুযায়ী এসবেরও পরিবর্তন দেখা যায়। সোভিয়েত দেশে — সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা। এখানে মানুষে মানুষে সম্পর্কের ক্ষেত্রে রচনা করছে কমিউনিস্ট নীতিবোধ। সমাজতান্ত্রিক সমাজের মতাদর্শ — মার্কসবাদ-লেনিনবাদ — জনগণের স্বার্থ সাধন করে।

আমরা সঙ্গত কারণে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে সঠিকভাবে বলতে গেলে উৎপাদন-সম্পর্কের যে প্রণালী সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গঠন করে তাই হল সমাজের মানসিক জীবনযাত্রার ভিত্তি। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটা প্রকৃতিগতভাবে **বনিয়াদ,** যার উপর দাঁড়িয়ে থাকে বিভিন্ন সামাজিক মতবাদ ও তত্ত্ব, নানাবিধ মতাদর্শগত সম্পর্ক, রাজনৈতিক, আইন ও সংস্কৃতিসংক্রান্ত সংগঠন ও সংস্থা নিয়ে একত্রিত **উপরিকাঠামো।**

মতাদর্শগত উপরিকাঠামোর ভূমিকা

সমাজজীবনের নানা রূপ। সমাজজীবন অর্থনীতিতে পর্যবসিত হয় না, তা নিজেই হল মানুষে মানুষে অর্থনৈতিক,

রাজনৈতিক, নৈতিক, আইনগত ও অন্যান্য পারস্পরিক জটিল সম্পর্ক। আর, বলাই বাহুল্য যে ইতিহাসে সামাজিক চিন্তা, তত্ত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গির ভূমিকা বিশাল। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিফলনকারী এই সব চিন্তা, তত্ত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের কর্ম পরিচালনা করে এবং কর্মের মাধ্যমে অর্থনীতিসহ সমাজের বিকাশের উপর প্রভাব বিস্তার করে। কার্ল মার্কস বলেছিলেন যে ভাবধারা তখনই ব্যবহারিক শক্তিতে পরিণত হয় যখন জনগণ তাতে অভিভূত হয়ে পড়ে।

ভাবধারায় ভাবধারায় তফাৎ অবশ্যই আছে। অগ্রণী ভাবধারা যেখানে সামাজিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করে, সেক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারা তার বিপরীত, — বিকাশের গতি রুদ্ধ করে দেয়।

বিশেষ বিশেষ ভাবধারার অনুগামী লোকেরা নিজেদের মধ্যে মতাদর্শগত সম্পর্ক রচনা করে, বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সংগঠন ও সংস্থা গড়ে তোলে। মতাদর্শগত সম্পর্ক ও সংগঠন অর্থনীতির উপরও প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

এইভাবে, মতাদর্শগত উপরিকাঠামো কেবল যান্ত্রিকভাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনকে অনুমোদন করে নিশ্চেষ্টভাবে তার অভিব্যক্তিই ঘটায় না। অর্থনীতির উপরও বিপরীত দিক থেকে তার সক্রিয় প্রভাব আছে এবং তা অঙ্গাঙ্গিভাবে সমাজবিকাশের সাধারণ ধারার সঙ্গে জড়িত। যারাই ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে নিছক অর্থনীতিতে পরিণত করার প্রয়াসী, সমাজজীবনের ঐশ্বর্য ও বর্ণাঢ্যতা তাদের হাতে পড়ে মার্কসবাদের সরলীকৃত ও অমার্জিত নীরস পরিকল্পনায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

উদাহরণস্বরূপ, উনিশ শতকের রুশ বাস্তববাদী শিল্পের সমৃদ্ধিকে কীভাবে বোঝা সম্ভব? তাকে ত কেবল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। কেন না দেশে তখন ছিল অনুন্নত সামন্ততান্ত্রিক ও ভূমিদাস ব্যবস্থা। এহেন বনিয়াদের উপর কী করেই বা বিশিষ্ট সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীত সৃষ্টি সম্ভব হল? শিল্প-ভাবনার অনন্যসাধারণ ঊর্ধ্বগামিতার কারণ বোঝা সম্ভব হবে তখনই, যখন আমরা অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গে জীবনের অন্য দিকগুলির প্রতিও দৃষ্টি দিই। দেশে ভূমিদাসত্বের বিরুদ্ধে যে তীব্র রাজনৈতিক সংগ্রাম বিকাশ লাভ করছিল প্রধানত তার দ্বারাই নির্ধারিত হয় রুশ বাস্তববাদী শিল্পের ভাববস্তু। তার উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল লোক-কথার ঐতিহ্য, পাশ্চাত্যের প্রগতিশীল ভাবধারা এবং আরও অনেক কিছু। প্রশ্ন উঠবে — তা হলে অর্থনীতির নির্ধারণকারী ভূমিকাটা কোথায়? একথা ভুলে গেলে ত চলবে না যে রাশিয়ায় রাজনৈতিক সংগ্রাম বলি, লোক-কথার ঐতিহ্য বলি আর অন্যান্য দেশের প্রগতিশীল সামাজিক চিন্তাধারাই বলি — এরাও নির্ভর করছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে তাদের মূল নিহিত। এইভাবে, এখানেও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তার নির্ধারণকারী ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তবে শেষ পর্যন্ত তা শিল্পকে প্রভাবিত করেছে রাজনীতি, নৈতিক ভাবনা, দর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে।

১৯১৭ সনে রাশিয়ায় সংঘটিত মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব মানব-ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কিন্তু একথা ভাবা কি ঠিক হবে যে এই বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল কেবল অর্থনীতি ও উৎপাদনী শক্তি বিকাশের ফলে? বিপ্লবের জয় কি সম্ভব হত, যদি রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণী বিরাট রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় না করতে পারত, যদি ১৯০৫ সনের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাকে যেতে না হত, না গড়ে উঠত কৃষক শ্রেণীর সঙ্গে তার দৃঢ় রাজনৈতিক ঐক্য? অবশ্যই, হত না। বিপ্লবের সংগ্রামী সদর-দপ্তর হিশেবে যে বলশেভিক পার্টি শ্রমিক শ্রেণীর

সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছে তাকে বাদ দিয়ে বিপ্লবের জয় কল্পনাও করা যায় না। এটা স্বাভাবিক যে অক্টোবর বিপ্লব পরিণামে অর্থনৈতিক প্রয়োজনের অভিব্যক্তি ঘটিয়েছে, কিন্তু এই প্রয়োজন নিজেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যেমন শ্রেণীসমূহের রাজনৈতিক সংগ্রামে, তেমনি পার্টির ক্রিয়াকলাপে এবং বুর্জোয়া মতাদর্শ, দক্ষিণপন্থী ও 'বামপন্থী' সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে লেনিন যে মতাদর্শগত সংগ্রাম চালিয়েছিলেন — তাতেও।

সমাজের বিকাশ হল রাজনীতি, মতাদর্শ এবং সমাজজীবনের আর সব দিকের সঙ্গে অর্থনীতির পারস্পরিক ক্রিয়া। কিন্তু এই পারস্পরিক ক্রিয়ার মধ্যে সর্বদাই খুঁজে বার করা দরকার সেই বিশিষ্ট অর্থনৈতিক বনিয়াদটিকে যা সমাজবিকাশের নিয়মবদ্ধতা বুঝতে সাহায্য করে।

সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়?

এবারে আমরা সামগ্রিকভাবে সামাজিক জীবনের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করব। এখন আর আমাদের কাছে তা বিশৃঙ্খল ঘটনা ও তথ্যের স্তূপ কিংবা মানুষের এলোমেলো আচরণের বুনানি বলে মনে হয় না। উৎপাদন-সম্পর্কের প্রণালীতে আমরা দেখতে পেয়েছি সমাজের সেই কাঠামোটি যা তাকে ঐক্য ও পূর্ণতা দান করে থাকে। মানুষের ভাবাদর্শগত সম্পর্ক, তার মানসিক ক্রিয়াকলাপ, দৃষ্টিভঙ্গি, রাজনৈতিক স্বার্থ ও নৈতিক আদর্শ এই কাঠামোর উপর রক্তমাংসের সঞ্চার করে গড়ে তোলে প্রাণবান, বিকাশমান সমাজদেহ। এইভাবে, ঐতিহাসিক বিকাশের প্রতিটি পর্যায়ে সমাজের সকল দিককে তার স্বভাবসিদ্ধ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং

মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক উপরিকাঠামোর সঙ্গে সম্মিলিত করে নিলেই **সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার** সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যাবে।

সমাজের ইতিহাস হল সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশ ও পরিবর্তনের ইতিহাস। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় মানুষের চৈতন্য ও ইচ্ছাশক্তিনিরপেক্ষ বিষয়গত নিয়ম অনুযায়ী, — যে নিয়ম আবার তদুপরি তার ইচ্ছা ও চৈতন্য নির্ধারণ করে থাকে। সবসমেত পাঁচ রকম সমাজব্যবস্থার কথা আমরা জানি: আদিম গোষ্ঠী-সমাজ, দাস-সমাজ, সামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিবাদী ও কমিউনিস্ট সমাজ। উৎপাদনপ্রণালীর পরিবর্তন সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোয় পরিবর্তন সূচনা করে। তারই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অল্পবিস্তর দ্রুত সমগ্র মতাদর্শগত উপরিকাঠামোয় ওলটপালট ঘটে। এক ধরনের সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে আর এক ধরনে উত্তরণ ঘটতে থাকে। আর পরবর্তী প্রতিটি ব্যবস্থার অর্থই হল মানব-ইতিহাসের নূতন পর্যায়।

বুর্জোয়া সমাজবিদ্যায় ঐতিহাসিক আবর্তনের তত্ত্ব প্রচলিত আছে; এই তত্ত্ব অনুযায়ী ইতিহাস গড়ে ওঠে চক্রাবর্তের ধারাবাহিক শৃঙ্খলে: প্রতিটি আবর্তন যেন পূর্ববর্তী আবর্তনের পুনরাবৃত্তি এবং সামগ্রিকভাবে কোন অগ্রগতি নেই। কিন্তু ব্যাপারটি তা নয়।

বিভিন্ন সমাজব্যবস্থায় উৎপাদনী শক্তি বিকাশের স্তরগুলি পাশাপাশি রেখে তুলনা করলেই নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যাবে যে এক ব্যবস্থা থেকে আর এক ব্যবস্থায় উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে মানের নিয়তই উন্নতি ঘটতে থাকে। মানস-সংস্কৃতির বিকাশেও যে অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ইতিহাসের পৃথক পৃথক পর্বে সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে অচলাবস্থা এমন কি পশ্চাদ্‌গতিও দেখা যায়। যেমন, দাস-সমাজব্যবস্থা থেকে সামন্ততন্ত্রে উত্তরণের গোড়ার দিকে ইউরোপে শিল্পকলার বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবনতি লক্ষ্য করা যায়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর সমাজচৈতন্যের নির্ভরতা যে যান্ত্রিক নয়, এটা তার আরও একটা প্রমাণ। তবে, সংস্কৃতির পৃথক পৃথক ক্ষেত্রের কথা না ধরে যদি তাকে সামগ্রিকভাবে নিতে হয়, যদি ইতিহাসের বিচ্ছিন্ন পর্বগুলির মধ্যে তুলনা না করে সামগ্রিকভাবে সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা ধরা যায় তা হলে দেখা যাবে তাদের প্রতিটিই মানস-সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ব্যবস্থার তুলনায় এক ধাপ অগ্রগতির সূচনা করছে।

সমাজবিকাশের প্রকৃতি বৃত্তাকার নয়, — অগ্রগামী: এর গতি নিম্ন থেকে উচ্চে। এই হল সমাজ-প্রগতির পথ।

৮ ॥ শ্রেণী ও শ্রেণী-সংগ্রাম

শ্রেণী বলতে কী বোঝায়?

আদিম গোষ্ঠী-সমাজ বাদে প্রতিটি সমাজেই এমন কিছু কিছু বৃহৎ জনসম্প্রদায় থাকে, যেগুলি একে অপরের থেকে নানা মৌলিক লক্ষণের দ্বারা পৃথক। ক্রীতদাস ও প্রভু, সামন্ত ও কৃষক, পুঁজিপতি ও শ্রমিক — এরাই হল সেই সামাজিক সম্প্রদায়, যাদের বলা হয়ে থাকে শ্রেণী। শ্রেণীর মূল লক্ষণই বা কী রকম?

বুর্জোয়া সমাজে শ্রমিক ও পুঁজিপতির মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তার কথাই বিশ্লেষণ করা যাক। এদের প্রভেদ জীবনযাত্রার প্রণালীতে, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে, নিজস্ব নৈতিক গঠনে, এমন কি সময় সময় ভাষায়, পোশাক-পরিচ্ছদে

ও আচার-আচরণে পর্যন্ত। যে-সব লক্ষণের কথা বলা হল সেগুলি গুরুত্বপূর্ণ হলেও তা থেকে সেই মূল শ্রেণীগত পার্থক্য বেরিয়ে আসে না, যা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে কেন শ্রমিক ও পুঁজিপতি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী, কেনই বা তারা বিভিন্ন ধরনের জীবন যাপন করে। যদি আমরা বলি যে এমনটি ঘটার কারণ হল এই যে পুঁজিপতির আয় বেশি, তাহলে অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে গভীরতর শ্রেণীগত পার্থক্য অন্তর্নিহিত আছে আমরা তার কাছাকাছি পৌঁছুতে পারব: শ্রমিক ও পুঁজিপতির প্রভেদ হল উপার্জনের রূপ ও আয়ের পরিমাণের দিক থেকে। কিন্তু আবার প্রশ্ন ওঠে: পুঁজিপতি কেন শ্রমিকের চেয়ে বেশি সামাজিক সম্পদ পেয়ে থাকে? কারণ একমাত্র এই যে উৎপাদনের উপায় আছে তার হাতে। এরই কল্যাণে পুঁজিপতি অর্থনীতিতে প্রভুত্ব বিস্তার করে, শ্রমিকদের শোষণের সুযোগ পায় এবং তাদের শ্রমের ফল আত্মসাৎ করে।

উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে সম্পর্ক হল শ্রেণীগত পার্থক্যের মূল লক্ষণ। এ থেকে আবার অন্য যে-সব লক্ষণ বেরিয়ে আসে সেগুলি হল: সামাজিক উৎপাদন প্রণালীতে স্থান, সামাজিক শ্রম-সংগঠনে ভূমিকা, প্রতিটি শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পদের সেই অংশের প্রাপ্তি ও পরিমাণের রীতি এবং তার রাজনৈতিক, নীতিগত, মনস্তাত্ত্বিক ও মতাদর্শগত লক্ষণ এবং গুণাবলী।

শ্রেণীর অস্তিত্ব একমাত্র সেখানেই, যেখানে উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে বিভিন্ন জনসম্প্রদায়ের সম্পর্ক বিভিন্ন রকমের। শ্রেণী শাশ্বত নয়। আদিম সমাজে, যেখানে ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না, সেখানে শ্রেণীর উদ্ভবও সম্ভব ছিল না।

শ্রেণীসমূহের আবির্ভাব ঘটে ব্যক্তিগত মালিকানা উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে এবং ব্যক্তিগত মালিকানা বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে তাদের অবসান ঘটবে।

শ্রেণীগত প্রভুত্বের হাতিয়ার

উৎপাদনের উপায়ের উপর কর্তৃত্ব পেয়ে শোষক শ্রেণী বিপুল অর্থনৈতিক শক্তির অধিকারী হয় এবং তাকে ব্যবহার করে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী সমাজ পরিচালনার উদ্দেশ্যে। সমাজ তার কঠোর নীতি বেঁধে দিয়ে ঘোষণা করে উৎপাদনের উপায়ের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা এবং এমন সব নিয়ম-কানুন, যেগুলির ফলে মুষ্টিমেয় শ্রেণীকর্তৃক সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর শোষণ সম্ভব হতে পারে। শোষক শ্রেণীর স্বার্থের বিরুদ্ধে পরিচালিত যে-কোন কার্যকলাপ বে-আইনী এবং দণ্ডনীয় বলে গণ্য। শ্রেণী-সমাজে সামাজিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হয় শাসক শ্রেণীর ইচ্ছা অনুযায়ী গঠিত আইন ও বিধি অনুসারে। এই সব আইন ও বিধিকে সামগ্রিকভাবে বলা হয় **অধিকার**।

কিন্তু কেনই বা সকলে শাসক শ্রেণীর ইচ্ছাকে মেনে নিতে ও তাদের প্রতিষ্ঠিত আইন অনুযায়ী চলতে বাধ্য থাকবে? এর কারণ এই যে শাসক শ্রেণীর হাতে আছে পুলিশ, সেনাবাহিনী, আদালত, কারাগার ইত্যাদির মতো শাসনযন্ত্র। এই সব নিয়ে গঠিত হয় রাজনৈতিক যন্ত্র, নির্যাতিত শ্রেণীকে নিষ্পেষণের হাতিয়ার — **রাষ্ট্র**। ব্যক্তিগত মালিকানা ও শোষণের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সকল সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় **রাষ্ট্র হল শোষিতদের উপর শোষক শ্রেণীর প্রভুত্বের হাতিয়ার**।

সমাজ শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের উৎপত্তি। এর আগে পর্যন্ত সকল মানুষ একত্রে সামাজিক কাজ পরিচালনা করত, শাসনযন্ত্র জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। গোষ্ঠীর দলপতি ও নেতার প্রভাব-প্রতিপত্তি নির্ভর করত তাদের ব্যক্তিগত গুণের উপর: বহুল অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, সাহসিকতা ইত্যাদির উপর। ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে বিত্তবান শ্রেণী সমাজে রাজনৈতিক প্রভুত্ব অধিকার করে বসল। এই সময় থেকে শাসনক্ষমতা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল এবং তা পরিণত হল শোষক শ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতায়, যার প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়াল নির্যাতিত জনগণের প্রতিরোধ দমন করা।

সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রের শ্রেণীগত বিষয়বস্তুর পরিবর্তন সূচনা করে। এর সঙ্গে মিলিয়ে আমরা দাসব্যবস্থাধীন, সামন্ততান্ত্রিক ও বুর্জোয়া শাসনাধীন — তিন প্রধান শোষক রাষ্ট্রের প্রভেদ নির্ধারণ করব।

বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির মধ্যে তুলনা করা যাক। ইংলণ্ডে আছে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে — প্রেসিডেন্টের শাসন, ইতালিতে — সংসদীয় প্রজাতন্ত্র। দুটিই এক ধরনের রাষ্ট্র। তবু তাদের নিজেদের মধ্যে প্রভেদ আছে। প্রভেদটা কিসে? প্রভেদ প্রণালীতে। রাষ্ট্রের প্রণালী নির্ভর করে প্রথমত, **শাসনপ্রণালীর** উপর এবং দ্বিতীয়ত, **রাজনৈতিক তন্ত্রের** উপর। মূলত দু'ধরনের শাসনপ্রণালী আছে: রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র।

রাজতন্ত্র হল উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত একক ব্যক্তির (রাজা, জার অথবা সম্রাটের) শাসন। এক্ষেত্রে রাজাকে নির্ভর করতে হয় শাসক শ্রেণীর উপর, পূরণ করতে হয় সেই শ্রেণীর ইচ্ছা। যদি

তাঁর কার্যকলাপ ও অভিপ্রায় শাসক শ্রেণীর স্বার্থের বিরুদ্ধে যেতে থাকে, তা হলে শাসক শ্রেণী তাঁর বদলে অপেক্ষাকৃত নমনীয় কোন রাজাকে বসানোর পথ বার করে। রুশ সম্রাট প্রথম পাভেল নেপোলিয়নের সঙ্গে জোটের সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করলে অভিজাত শ্রেণীর হাতে নিহত হন: বুর্জোয়া ফ্রান্সের সঙ্গে জোট অভিজাত ভূস্বামীদের স্বার্থের পরিপন্থী হত। এ প্রসঙ্গে জনৈক ঐতিহাসিকের মন্তব্য হল রাশিয়ায় 'স্বৈরতন্ত্র জারহত্যার দ্বারা সীমাবদ্ধ'।

রিপাব্লিক (এই লাতিন শব্দটির অনুবাদে অর্থ দাঁড়ায় 'সাধারণের কাজ') বা **প্রজাতন্ত্রে** শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় নির্বাচনব্যবস্থার মাধ্যমে। বলাই বাহুল্য যে শোষক শ্রেণীর অধিকারভুক্ত সমাজে প্রজাতন্ত্রও শাসক শ্রেণীর স্বার্থ সাধন করে।

রাজনৈতিক তন্ত্র শাসনপ্রণালীর চরিত্র বৈশিষ্ট্যের সূচক। শাসনক্ষমতার অধিকারী শোষক শ্রেণী নির্যাতিত শ্রেণীসমূহের দমনের উদ্দেশ্যে যেমন খোলাখুলি সন্ত্রাসের পন্থা অবলম্বন করতে পারে, তেমনি শাসন করতে পারে গণতান্ত্রিক উপায়ে, কিন্তু অনেক সময়ই 'মিঠে রাজনীতির সঙ্গে চাবুকের রাজনীতি'র সম্মিলন ঘটায়।

আমরা এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় — **গণতন্ত্রের** তাৎপর্য অনুধাবন করতে চলেছি। গণতন্ত্র হল সেই ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা যেখানে সংরক্ষিত রয়েছে শাসন পরিচালনায় জনগণের অংশগ্রহণের অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা, অর্থাৎ নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকার গ্রহণের সুযোগ (আইনের দৃষ্টিতে সকলের সমতা, বাক্-স্বাধীনতা, প্রকাশ ও সভা-সমিতি সংগঠনের স্বাধীনতা, গৃহের অলঙ্ঘনীয়তা প্রভৃতি)।

সাধারণ নির্বাচনের অধিকার সত্ত্বেও আধুনিক বুর্জোয়া গণতন্ত্রে শাসন পরিচালনা করে থাকে বৃহৎ বুর্জোয়াসম্প্রদায়, যারা তাদের সমস্ত অর্থনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োগ করে, রাষ্ট্রযন্ত্র এবং প্রচারযন্ত্রের

সব রকম সুযোগ নেয়, জনসাধারণ যাতে রাষ্ট্রশাসনের সুযোগ না গ্রহণ করতে পারে তার জন্য উৎকোচ, প্রতারণা ও মিথ্যাচারের আশ্রয় নিতে কোন রকম দ্বিধা বোধ করে না। এইভাবে, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি রাষ্ট্রের শ্রেণীগত চরিত্রে পরিবর্তন ঘটায় না।

শোষণভিত্তিক সমাজে রাষ্ট্র সর্বদাই হয়ে দাঁড়ায় শোষক শ্রেণীর প্রভুত্বের হাতিয়ার আর গণতন্ত্র সেখানে উক্ত প্রভুত্বের অন্যতম রূপ নিয়ে থাকে।

সেই সঙ্গে শোষণভিত্তিক সমাজের পরিস্থিতিতে গণতন্ত্র যতই সংকীর্ণ এবং বহিরাঙ্গিক হোক না কেন জনসাধারণের কাছে তা অধিকতর গ্রহণীয় রাষ্ট্ররূপ হিশেবে গ্রাহ্য। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি হল জনগণের কীর্তি, যারা হাজার হাজার বছর ধরে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছে, শাসক শ্রেণীর কাছ থেকে দাবি আদায় করেছে।

শ্রেণীগত সংকীর্ণতা সত্ত্বেও বুর্জোয়া গণতন্ত্র শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে পরিচালিত সংগ্রামের অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ঘোষণাকারী সংবিধানের সুযোগ নিয়ে শ্রমিক শ্রেণী পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উৎখাতের উদ্দেশ্যে বিপ্লবী সংগ্রামে নিজেকে সুসম্বদ্ধ করতে পারে। একচেটিয়া বুর্জোয়া শ্রেণী বিপ্লবী আন্দোলনের বিকাশে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে গণতন্ত্রের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য অকারণে খোলাখুলিভাবে নিজেদের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে নি। ঠিক এই কারণেই শ্রমিক শ্রেণীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল গণতন্ত্রের সংরক্ষণ এবং প্রসারের জন্য সংগ্রাম পরিচালনা।

একমাত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই যথাযথ গণতন্ত্র সম্ভব, সেখানে গণতন্ত্রের মূলনীতি — জনগণের শাসন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা — অর্থনৈতিক সম্পর্কের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

ইতিহাসের চালিকাশক্তি

সমগ্র ইতিহাস শ্রেণী-সংগ্রামে পরিপূর্ণ। গ্রীস ও রোমের দাসব্যবস্থাসম্পন্ন রাষ্ট্রসমূহ বারবার বিদ্রোহী দাসদের আঘাতে কেঁপে উঠেছে। সামন্ততন্ত্রের আমলে কৃষক গণ-অভ্যুত্থান ঘটেছে: ওয়াট টাইলারের নেতৃত্বে ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে 'জাকেরি' অভ্যুত্থান, জার্মানিতে কৃষক যুদ্ধ, রাশিয়ায় বলোৎনিকভ, রাজিন ও পুগাচোভের অভ্যুত্থান, চীনে কৃষক যুদ্ধ। ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্ব থেকে একেবারে বর্তমান সময় পর্যন্ত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে প্রলেতারিয়েতদের শ্রেণী-সংগ্রাম প্রসারিত হয়ে চলেছে।

শ্রেণী-সংগ্রামের কারণ কী? সামাজের ইতিহাসে তার ভূমিকাই বা কী?

শোষক এবং শোষিতের মধ্যে অবধারিত সামাজিক বিরোধিতা থেকে শ্রেণী-সংগ্রাম বৃদ্ধি পেতে থাকে। সমাজে নির্যাতিত শ্রেণী নির্যাতনকারীদের কাছ থেকে যে উৎপীড়ন ভোগ করে থাকে সেই পরিস্থিতিই তাদের বিপ্লবী সংগ্রামের দিকে ঠেলে দেয়।

বুর্জোয়া ভাবাদর্শের মতে বিরোধী শ্রেণীসমূহের স্বার্থের মধ্যে আপস সম্ভব। নিজেরা একটু খেয়াল করলেই ত বোঝা যায় কী করে নির্যাতনকারী ও নির্যাতিতের স্বার্থের মধ্যে আপস হতে পারে? তা হলে ত শোষকদের স্বেচ্ছায় উৎপাদনের উপায়ের উপর মালিকানা ছেড়ে দিতে হয়। কিন্তু ব্যাপারটা ওই যে এমন তারা কখনও করে নি এবং করবেও না। একমাত্র শ্রেণী-সংগ্রামের পথেই তাদের হাত থেকে উৎপাদনের উপায় ছিনিয়ে নিয়ে শোষণের উচ্ছেদ ঘটানো যায়।

আগেই বলা হয়েছে যে উৎপাদনী শক্তি এবং সেকেলে উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে সংঘর্ষের সমাধানের ফলে সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে থাকে। এই সংঘর্ষ বিষয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর মনোভাব কী রকম? এটা স্পষ্ট যে সেকেলে উৎপাদন-সম্পর্কের বিনাশ শোষক শ্রেণীর মোটেই কাম্য নয়। তারা তাদের ঐশ্বর্য ও শাসনক্ষমতা অটুট রাখার জন্য সমস্ত শক্তিতে সেগুলিকে আঁকড়ে ধরে রাখে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অভিজাত-জমিদার শ্রেণী নিজেদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা রক্ষার জন্য কী প্রাণপণ সংগ্রামই না করেছিল, বুর্জোয়া বিপ্লবের কী প্রচণ্ড বিরোধিতাই না তারা করেছিল! আর আধুনিক কালের সাম্রাজ্যবাদীরা? — তারা কি স্বেচ্ছায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রত্যাখ্যানে রাজী? তাদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ থেকেই দেখা যায় যে তারা শেষ শক্তিটুকু পর্যন্ত তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ব্যয় করবে।

অর্থাৎ, এক ধরনের সমাজব্যবস্থা থেকে অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন আপনা-আপনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটতে পারে না, — উৎপাদন-সম্পর্ক প্রগতির পরিপন্থী হয়ে দেখা দিলেও নয়। এটা যাতে সংঘটিত হতে পারে তার জন্য দরকার যে প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী পুরনো উৎপাদন-সম্পর্কের সমর্থন করে আসছে তাদের বাধা ভেঙ্গে ফেলা। এর মধ্যেই নিহিত আছে নির্যাতিত শ্রেণীসমূহের বিপ্লবী সংগ্রামের ঐতিহাসিক তাৎপর্য। তারা সামাজিক বিকাশের পথ থেকে প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী প্রবর্তিত বাধা প্রতিবন্ধ দূর করে। **শোষকভিত্তিক সকল ব্যবস্থায় শ্রেণী-সংগ্রাম হল ইতিহাসের চালিকাশক্তি।** বৈরভাবাপন্ন সমাজে এ ছাড়া সমাজ-প্রগতি অসম্ভব।

শ্রেণী-সংগ্রাম সর্বাপেক্ষা তুঙ্গ রূপ এবং তীব্র আকার ধারণ করে সমাজ-বিপ্লবের আমলে।

সমাজ-বিপ্লব

সমাজের ইতিহাসে ক্রমিক বিকাশের পর্বের সঙ্গে সামগ্রিক সমাজব্যবস্থার আকস্মিক ভাঙ্গন পর্বের প্রভেদ সুস্পষ্ট।

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপে অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগ ক্লান্তিকরভাবে দীর্ঘায়িত হল। রাজবংশের বদল হতে লাগল, যুদ্ধ ও প্রাসাদ-চক্রান্ত চলল, সামন্ততান্ত্রিক অধিকারের কাড়াকাড়ি শুরু হল। তবে, এসব ঘটনায় সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মৌলিক কোন পরিবর্তন দেখা দিল না। সময় সময় গোটা এক একটি দেশ কৃষক বিদ্রোহের অগ্নিশিখায় কবলিত হয়ে পড়ে। সামন্ত-ভূস্বামী ও রাজাদের বিপদের কারণ হয়ে অভিজাত-লোকেরা কৃষকদের অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতার সুযোগে তাদের মধ্যে ভাঙ্গন ধরায়, রক্তের বন্যায় বিদ্রোহ ডুবিয়ে দেয়।

কিন্তু অবশেষে এলো প্রচণ্ড সামাজিক কম্পনের সময়। ষোড়শ শতাব্দীতে নেদারল্যাণ্ডস্, সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্স। তিনটি শতকে প্রধান ইউরোপীয় রাষ্ট্রশক্তির সমাজব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন দেখা দিল। অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যে সামন্ততন্ত্রের পরিবর্তে পুঁজিবাদের আবির্ভাব হল।

সমাজব্যবস্থার মূল এই যে ভাঙ্গন, যার সাহায্যে এক ধরনের সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে আর এক ধরনের ব্যবস্থায় উত্তরণ সম্ভব, — তাকে বলা হয় সমাজ-বিপ্লব। উৎপাদনী শক্তি এবং উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে সংঘর্ষ এর অর্থনৈতিক ভিত্তি। প্রগতিশীল শক্তি তার

সমাধানে এবং পুরনো উৎপাদন-সম্পর্কসমূহের বিলোপসাধন সচেষ্ট। প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী এই সংঘর্ষের সমাধানে বিরোধিতা করে থাকে। বিপ্লবী আন্দোলনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শাসক শ্রেণী রাষ্ট্রের পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহার করে। তাই, **যে-কোন বিপ্লবের প্রধান প্রশ্ন হল শাসনক্ষমতার প্রশ্ন।** রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার ক'রে বিপ্লবী শ্রেণী তার সাহায্যে পুরনো ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে ফেলে এবং নূতন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে।

ইতিহাসের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে বিপ্লব ফরমাইশমাফিক হয় না, তার জন্য আবশ্যক **বৈপ্লবিক পরিস্থিতি,** অর্থাৎ সমাজের এমন একটা অবস্থা, যখন শাসক শ্রেণীর পক্ষে আর চিরাচরিত পদ্ধতিতে শাসন করার উপায় থাকে না এবং নির্যাতিত শ্রেণীও আর চিরাচরিত উপায়ে জীবন নির্বাহ করতে ইচ্ছুক নয়।

যে-কোন বৈপ্লবিক পরিস্থিতিই কিন্তু বিপ্লবে পরিণত হয় না। এর জন্য দরকার ব্যাপক রাজনৈতিক শক্তি। এই শক্তি গঠিত হয় সেই সব শ্রেণী থেকে, যারা বর্তমান ব্যবস্থার বিলোপসাধনে আগ্রহী এবং বিপ্লবের সাফল্যসাধনে পারঙ্গম। এই শ্রেণীগুলি **বিপ্লবের চালিকাশক্তি।** বিপ্লবের রাজনৈতিক শক্তিসমূহ সঙ্ঘবদ্ধ করার জন্য বিপ্লবী শ্রেণীসমূহের আবশ্যক শ্রেণী-সংগ্রামের বিশেষ এক ধরনের অভিজ্ঞতা, রাজনৈতিক পার্টি ও সংগঠন গড়ে তোলা, বিপ্লবী নেতা ও পরিচালক নির্বাচন এবং নিঃস্বার্থ কর্মের প্রতি পূর্ণ নিষ্ঠা।

যে সমস্যা বিপ্লবের সামনে রয়েছে তার সমাধানের উপর নির্ভর ক'রে বিপ্লবের চরিত্রগত প্রভেদ দেখা যায়। বিপ্লব যদি বুর্জোয়া সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা করে তবে তা হয় বুর্জোয়া

বিপ্লব; আর বিপ্লব যদি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্থাপনের দিকে পরিচালনা করে তবে তার চরিত্র হয় সমাজতান্ত্রিক।

সমাজ-বিপ্লবের ক্ষেত্রে নির্যাতিত ও শোষিত শ্রেণীসমূহের বিরাট ভূমিকা বিশেষ শক্তি নিয়ে প্রকাশ পায়। বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের দ্বারা তারা পুরনো সমাজের ভিত্তি চূর্ণ করে। তাদের মধ্য থেকেই সংগঠিত হয় দুঃসাহসী বিপ্লবী সেনাদল, যারা প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতার দুর্গের উপর আঘাত হানে এবং অটল সঙ্কল্প নিয়ে প্রতিবিপ্লবী হামলা থেকে বিপ্লবের জয় রক্ষা করে। নির্যাতিত শ্রেণী হল সব মহান বিপ্লবের প্রধান চালিকাশক্তি। ভ. ই. লেনিনের কথায়, বিপ্লব হল নির্যাতিত ও শোষিতদের উৎসব। জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলে ঘটনাসমূহ এই সময় অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে বিকাশ লাভ করতে থাকে। সমাজ-বিপ্লবকে তুলনা করা যেতে পারে গুমোট-ভাঙ্গা বজ্রবিদ্যুৎসমেত ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে, যার অবসানে সহজে স্বচ্ছন্দে নিঃশ্বাস নেওয়া যায়। বিপ্লব সমাজ-প্রগতির পথ থেকে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা ঝেঁটিয়ে বিদায় করে — কার্ল মার্কস তাই সঙ্গত কারণেই তাকে ইতিহাসের রেল ইঞ্জিন আখ্যা দিয়েছেন।

৯ ॥ জাতি ও জাতিসম্পর্ক

আদিম মানুষের ঐক্যের রূপ

শ্রেণীগত ও সামাজিক যে পার্থক্য মানুষকে পৃথক পৃথক বিশেষ সামাজিক দলে বিভক্ত করে, তার সঙ্গে সঙ্গে স্মরণাতীত কাল থেকে চলে আসছিল তাদের মিলিত জীবনযাত্রার ঐতিহাসিক রূপ।

গোষ্ঠিগত ঐক্যের প্রথম রূপ — কুল ও কৌম গড়ে ওঠে মানুষের রক্তের সম্পর্ক থেকে। 'কুল' শব্দটিই প্রমাণ করে তার অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের সাধারণ — উৎপত্তি। মানবেতিহাসের উষালগ্নে মানুষ প্রকৃতপক্ষে ছিল ঐক্যবদ্ধ এবং সেই ঐক্যের বন্ধন সর্বোপরি গণ্য হত রক্তের সম্পর্কে, একই বংশগত সম্পর্কের ভিত্তিতে (কৌলিক সম্পর্ক স্থাপিত হত হয় মার দিক থেকে নতুবা বাবার দিক থেকে)। এই ধরনের জনগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাস করত। এটা কোন বিশেষ কৌলিক অনুভূতি বা নিছক খেয়ালবশত নয়। কৃষিকার্যের যৌথ পরিচালনা, শ্রমসংক্রান্ত অভিজ্ঞতার সঞ্চয় এবং নবীন পুরুষের শিক্ষাদীক্ষার খাতিরে এর দরকার হত।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কৌলিক ঐক্য প্রসারিত হয়ে চলল এবং তা থেকে পল্লবিত হতে লাগল শাখা-প্রশাখা। এদের মধ্যে কৌলিক ও অর্থনীতিগত সম্পর্ক থেকে গেল, কৌলিক বিস্তৃত ঐক্যে **কৌম** সংগঠিত হল। শয়ে শয়ে এমন কি হাজার হাজার মানুষ এক একটি কৌমের অন্তর্ভুক্ত থাকত। কৌমের অধীনে বসবাস ও শিকারের জন্য নির্দিষ্ট অঞ্চল থাকত। কৌমের সদস্যরা এক ভাষায় কথা বলত, তাদের সকলের ছিল একই ধর্মবোধ, একই আচার-অনুষ্ঠান। কুল ও কৌমের গোষ্ঠীর সমগ্র জীবন গড়ে উঠেছিল স্বতঃস্ফূর্ত গণতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতে। কৌলিক সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব করত কুলের সমগ্র বয়ঃপ্রাপ্ত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত প্রধান। কৌলিক গোষ্ঠী শাসন করত গোষ্ঠী-সভায় নির্বাচিত পরিষদ।

আরও কিছু পরবর্তী পর্যায়ে কৌলিক গোষ্ঠীসমূহের ঐক্য গড়ে উঠতে লাগল। ঐক্য গড়ে উঠল এক দিকে যেমন অর্থনৈতিক, অপর দিকে তেমনি সামরিক কারণে। তথাপি এই বন্ধনের প্রধান হেতু কিন্তু হয়ে থাকল আগের

মধ্যেই রক্তের সম্পর্ক। অর্থনীতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক যে অঞ্চলগত সম্পর্কে পরিণত হল তারই ফলে উদ্ভব হল জাতিসত্তার এবং পরবর্তীকালে আবির্ভাব হল জাতিসমূহের।

জাতিসত্তা ও জাতি

গোষ্ঠীসমূহের জোট বহুদিন ধরে কৌলিক সম্পর্কের ভিত্তিতে টিকে থাকার পক্ষে যথেষ্ট বিস্তৃত সংগঠন ছিল। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অঞ্চলগত নৈকট্য ক্রমেই বড় ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকে, — এমন কি তাতে কুলভুক্ত লোক ছাড়া অন্য লোক অন্তর্ভুক্ত থাকলেও। একই ভূখণ্ডে একত্রে বসবাস, একই ভাষা এবং আচার-ব্যবহার বিশাল বিশাল জনসম্প্রদায়ের সমরূপ ঐতিহাসিক ভাগ্য নির্ধারণ করে থাকে, তাদের চরিত্রের একক মানস-প্রকৃতি এবং তাদের একক সংস্কৃতি গড়ে তোলে। এইভাবে গঠিত হয় **জাতিসত্তা**।

দাসপ্রথা এবং সামন্ততান্ত্রিক আমলে জাতিসত্তার আবির্ভাব ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, দাস আমলে প্রাচীন মিসরীয় এবং প্রাচীন গ্রীস জাতিসত্তার সৃষ্টি হয়। সামন্ততান্ত্রিক যুগে পশ্চিম-ইউরোপীয় জাতিসত্তাসমূহের আবির্ভাব। নবম শতাব্দীতে প্রাচ্য স্লাভ গোষ্ঠীগুলি প্রাচীন রুশ জাতিসত্তার রূপ নেয়।

জাতিসত্তা ঐক্যের অপেক্ষাকৃত পরিবর্তনশীল রূপ। প্রাচীন জাতিসত্তাসমূহের অনেকগুলি বিভক্ত হয়ে গেছে, পরবর্তীকালে অনেকগুলি থেকে বিভিন্ন জাতির সূচনা হয়েছে। এইভাবে, প্রাচীন রুশ জাতিসত্তা থেকে বেরিয়েছে

রুশী, ইউক্রেনীয় ও বেলোরুশীয়। জাতিসত্তার সংঘটনকারী বন্ধন অপেক্ষাকৃত ভঙ্গুর হওয়ার কারণ এই যে তার তখন পর্যন্ত কোন অখণ্ড অর্থনীতি নেই, সাধারণ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্থানীয় পার্থক্য তখনও যথেষ্ট প্রবল, আর একক ভাষা বিভক্ত হয়ে পড়ে বহু উপভাষায়।

পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জাতিসত্তাসকল জাতিতে সংহত হতে থাকে। পুঁজিবাদ স্থানীয় সীমানার চৌহদ্দি ভেঙ্গে ফেলে, গড়ে তোলে সাধারণ জাতীয় বাজার, অর্থনৈতিক জীবনের ঐক্য কোন জাতিসত্তাকে বা অনেকগুলি জাতিসত্তাকে বাঁধে। ফলে আঞ্চলিক ঐক্যের সঙ্গে যুক্ত হয় অর্থনৈতিক ঐক্য, এবং তার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে একক জাতীয় সংস্কৃতি, বিকশিত হতে থাকে জাতীয় আত্মচেতনা এবং দেশাত্মবোধ। **জাতি হল অর্থনৈতিক, আঞ্চলিক, ভাষাগত, সাংস্কৃতিক ও মানসিক সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ মানুষের এক স্থায়ী ঐক্য।**

সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে জাতীয় সম্পর্কসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। তা অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতির উপরও প্রভাব বিস্তার করে।

জাতি বিকাশের দুটি প্রবণতা

জাতীয় সম্পর্কসমূহ বিকাশের দুটি বিপরীত চারিত্রিক প্রবণতা রয়েছে: প্রথমটি হল জাতীয় জীবনের জাগরণ, জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার জন্য প্রয়াস, দ্বিতীয়টি — জাতিসমূহের মধ্যে সম্পর্কের প্রসার, জাতীয় সীমানার চৌহদ্দির ভাঙ্গন এবং সামাজিক জীবনের আন্তর্জাতিকীকরণ।

ম্লেত উভয় প্রবণতাই প্রগতিশীল। এর ফলে সাধারণভাবে মানবসভ্যতার সম্ৃদ্ধি সাধিত হয়। তবে, প‍্ঁজিবাদে তীব্র বিরোধী ক্রিয়ার সঙ্গে এই প্রবণতাগ্লির সংঘাত বাধে এবং তাদের পথ করে নিতে হয় জাতিতে জাতিতে সংঘটিত প্রবল সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে। জনগণের জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়াস নির্যাতনকারী শাসক শ্রেণীর দিক থেকে প্রতিবন্ধকতার সম্ম্খীন হয় এবং তা অর্জিত হতে পারে একমাত্র দৃঢ় সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। প‍্ঁজিবাদী ব্যবস্থায় জাতিতে জাতিতে সম্পর্ক বিকাশ লাভ করে বৈরিতার র‍্পে: কোন জাতি বা জাতিসত্তা কর্তৃক অপর কোন জাতি বা জাতিসত্তাকে দাসত্বে আবদ্ধ করার মাধ্যমে।

এসব থেকেই বোঝা যায় সমাজ-প্রগতি ও শ্রেণী-সংগ্রাম থেকে জাতীয় ম্ক্তি ও বিকাশের প্রশ্নকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব নয়।

জাতীয় স্বাধীনতা ও জাতীয় প্নর‍্জ্জীবনের জন্য নির্যাতিত জাতিসম‍্হের সংগ্রাম প‍্ঁজির জোয়াল থেকে মানবজাতির সামাজিক ম্ক্তির জন্য আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে দৃঢ় সংলগ্ন। একমাত্র ওই পথে সমস্ত জাতি সত্যিকারের জাতীয় সাম্য অর্জন করে নিজেদের সকল সামর্থ্য ও প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারে। এর দ্বারাই আবার জাতিসকলের মধ্যে মৈত্রীর এবং ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ঠতার পরিবেশ গড়ে উঠবে। এর ফলে যখন সমগ্র বিশ্বে উন্নত কমিউনিস্ট সমাজের জয়যাত্রা স‍্চিত হবে তখনই ল্প্ত হবে জাতীয় বিভেদ এবং গড়ে উঠবে মানবসম্প্রদায়ের উন্নততর আন্তর্জাতিক র‍্প — অখণ্ড মানবজাতি।

বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ ও প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতা

ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করা গেছে যে জাতি রূপ নেয় পুঁজিবাদ উদ্ভবের যুগে। স্বাভাবিকভাবে, বুর্জোয়ারা নিজেদের শ্রেণী-স্বার্থে একেবারে গোড়া থেকে জাতীয় চেতনা এবং জাতীয় অনুভূতি স্ফুরণের সুযোগ গ্রহণ করে থাকে। বুর্জোয়ারা তাদের মুনাফাবাজী স্বার্থকে সমগ্র জাতির স্বার্থ বলে ঘোষণা করে। জন্ম নেয় জাতিশ্রেষ্ঠত্বের ধারণা। বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রয়াস হল জাতীয়তাবাদ দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করা, প্রলেতারিয়েতদের শ্রেণী-চেতনা বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতা গড়ে তোলা এবং জনসাধারণকে জাতিবিদ্বেষের দিকে টেনে আনা।

একথা ঠিক যে জাতীয়তাবাদের ঐতিহাসিক ভূমিকার মূল্যায়ন করতে গেলে একটু নির্দিষ্ট হওয়া দরকার। উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত নির্যাতিত জাতির জাতীয়তাবাদের চরিত্র সাধারণভাবে গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল। এক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী ধারণা ও মনোভাবের প্রকাশ ঘটে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের রূপে। কিন্তু এই পরিস্থিতিতেও জাতীয়তাবাদের সদর্থক দিকগুলির সঙ্গে সঙ্গে নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যসমূহ থেকে যায়। তার প্রগতিশীল মর্মবস্তু ভবিষ্যতে বিকাশ লাভ করতে পারে সংকীর্ণ শ্রেণীগত সুযোগ-সুবিধা রক্ষার খাতিরে যারা নির্দ্বিধায় জাতীয় মুক্তিকে বিকিয়ে দিতে পারে সেই প্রতিক্রিয়ার স্বার্থের একমাত্র প্রতিঘাতী শক্তি — শ্রমজীবী শ্রেণী ও জনসংখ্যার বিভিন্ন স্তরের — জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ধারাবাহিক স্বার্থরক্ষার অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ভিত্তিতে।

শ্রমিক শ্রেণী পুঁজির শাসনবিরোধী সংগ্রামে, সমস্ত রকম সামাজিক ও জাতীয় শোষণ থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে গড়ে তোলে **প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতা** এবং সকল জাতি ও প্রজাতির অন্তর্গত জনগণের শ্রেণী-সংহতি। শ্রমিক শক্তির আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বের সংগ্রামী আদর্শ হয়ে দাঁড়াল বিখ্যাত স্লোগান: 'দুনিয়ার মজদুর, এক হও!'

পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থানের অভ্যন্তরেই প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার মূল প্রোথিত। পুঁজি হল এক আন্তর্জাতিক শক্তি এবং তা জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে শ্রমিকদের শোষণ করে থাকে। কোটিপতিদের হাতে যে মুনাফা জমতে থাকে তা গড়ে ওঠে নানা দেশের শ্রমিকদের শ্রমে। দুনিয়াব্যাপী পুঁজির ক্ষমতা ভেঙ্গে ফেলার জন্য দরকার সকল মেহনতী মানুষের, শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক ঐক্য। প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার নীতি সচেতনভাবে শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রবাহিনী — মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলির কার্যকলাপের বনিয়াদে লাগানো হয়েছে।

জাতির আচার-ব্যবহার, সংস্কৃতি, জাতীয় গৌরবের অনুভূতি নিয়ে যে জাতীয় বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে জাতীয় নাস্তিবাদ তার বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করে না, তাই তার সঙ্গে প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার কোন রকম মিলই থাকতে পারে না। জাতীয় স্বার্থের অস্বীকৃতি নিয়ে কথা হচ্ছে না, — কথাটা হচ্ছে মেহনতী মানুষের আন্তর্জাতিক শ্রেণী-স্বার্থের সঙ্গে তার যথাযথ সংযোগ।

বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ কথায় জাতির তারিফ করে, কার্যত তার প্রকৃত স্বার্থের ক্ষতিসাধন করে। জাতীয়তাবাদ ও জাতিদম্ভের পতাকাতলে যে-সব সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বেধে

উঠেছে তা বিপুলতম জাতীয় বিপর্যয়ের সূচনা করেছে। জাতীয়তাবাদ ও বর্ণবৈষম্যের নামে জার্মান ফ্যাশিবাদ মানবজাতিকে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে টেনে নামিয়েছিল তাতে জার্মান জাতিকেও জাতীয় ট্র্যাজিডির মুখে ঠেলে দিয়েছিল। জাতিতে জাতিতে বিচ্ছেদ রচনা ক'রে এবং এক জাতিকে অপর জাতির বিরুদ্ধে নামিয়ে জাতীয়তাবাদ জাতিসমূহের মধ্যে বিদ্বেষ ও শত্রুতার বীজ বপন করে।

প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতা মেহনতী মানুষের সামাজিক শৃঙ্খলমোচনের সঙ্গে জাতিসমূহের ভাগ্য সম্পর্কযুক্ত করে। তা প্রতিটি জাতির জীবনী শক্তির জাগরণ ঘটায়, সমান অধিকারবিশিষ্ট জাতিসমূহের আন্তর্জাতিক ঐক্যে তাদের প্রত্যেকের ভবিষ্যৎ বিকাশের পথ উন্মোচন করে। ইতিহাসের প্রধান শক্তি — আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর সাধারণ স্বার্থ সংরক্ষণ করে প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতা সকল জাতির মূল স্বার্থসমূহের রূপায়ণ ঘটায়।

১০ ॥ ঐতিহাসিক অপরিহার্যতা ও মানুষের ক্রিয়াকলাপ

মানুষ নিজেই ইতিহাস সৃষ্টি করে

যখন বোঝা গেল যে প্রকৃতির মতো সমাজও বিষয়গত নিয়মে বিকশিত হয় তখন সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠতে পারে: তা হলে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় মানুষের ভূমিকাটা কী? মানুষ কি তা হলে ঐতিহাসিক অপরিহার্যতার নিছক একটা অন্ধ হাতিয়ার হয়ে দাঁড়াচ্ছে না?

পৌরাণিক কাহিনীতে মানুষ এবং ঈশ্বরের উপর আধিপত্যসৃষ্টিকারী নিষ্করুণ নিয়তির কথা বর্ণিত আছে।

ভাগ্যদেবীরা পূর্বাহ্নে মানুষের জন্য যে অদৃষ্টলিপি লিখে গেছেন মানুষ কিছুতেই আর তার পরিবর্তন সাধন করতে পারে না। তবে কি ঐতিহাসিক অপরিহার্যতা নিয়তির মতো একটা কিছু? আর নিয়তি যেহেতু আছে সেহেতু সামাজিক ক্রিয়াকলাপ থেকে একেবারে সরে থেকে নিষ্ক্রিয়ভাবে ঘটনার অবশ্যম্ভাবী পরিণামের অপেক্ষা করাই ভালো!

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতিবাদ করতে গিয়ে বুর্জোয়া মতাদর্শবাদীরা দেখাতে চান যে তা যেন **অদৃষ্টবাদের** দিকে, অর্থাৎ জগৎ সম্পর্কে এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গির দিকে পরিচালনা করে যার অনুসারে সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনা আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে। তাদের বিচারে ইতিহাসের নিয়মই যদি অবধারিত গতিতে কমিউনিজমের দিকে পরিচালনা করে তা হলে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের সংগ্রাম করাই বা কেন? বসন্ত বা গ্রীষ্মের আগমনের জন্য সংগ্রামের কথা কি কেউ ভাবতে পারে?

প্রকৃতির নিয়ম থেকে ইতিহাসের নিয়মের প্রভেদ এই যে ইতিহাসের নিয়ম অবধারিতভাবে তার পথ নির্মাণ করে নেয় মানুষের ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে। ঐতিহাসিক অপরিহার্যতা মানুষের ক্রিয়াকলাপবহির্ভূত কোন ভাগ্যবাদী প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রকাশিত হয় না, — সমাজে উৎপাদন-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন বৈষয়িক প্রয়োজনীয়তার ফলে নির্দিষ্ট দিকে বিপুলসংখ্যক মানুষের কর্মশক্তির যে উদ্বোধন ঘটে তাতে এর অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়।

সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক উৎপাদনী শক্তির নিগড়ে পরিণত হতে তার ধ্বংসের বাস্তব প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। এই প্রয়োজনীয়তার প্রকাশ ঘটল বুর্জোয়া এবং যে কৃষকসমাজ সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে পড়েছিল তাদের বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে। এই শ্রেণীগুলির বিপ্লবী সংগ্রাম সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা নির্মূল করল।

বিপুল উদ্দীপনা ও বীরত্বের সঙ্গে বিপ্লবের সৈনিকরা বাস্তিল দুর্গের উপর আঘাত হানল এবং সামন্ততান্ত্রিক প্রতিবিপ্লবের হাত থেকে নূতন ব্যবস্থাকে রক্ষা করল। তাদের বিপ্লবী সংগ্রাম ব্যতিরেকে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা আপনা-আপনি ধসে পড়ত না। এই দৃষ্টান্ত থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে ইতিহাসের নিয়ম স্বয়ংক্রিয় নয়। মানুষ নিজেই তার ইতিহাস সৃষ্টি করে, তবে খেয়ালখুশিমাফিক নয়, — পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে, যার মধ্যে প্রধান উপাদান হল অর্থনৈতিক অপরিহার্যতা, যা অগ্রণী শ্রেণীসমূহের ও সামাজিক দলগুলির স্বার্থ নির্দেশ করে থাকে। উক্ত অপরিহার্যতার বাস্তবায়ন ঘটে এমন সব মানুষের ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে, যারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করে এবং অল্পবিস্তর পরিষ্কারভাবে সামাজিক বিকাশের আসন্ন প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে।

সমাজের সকলেই প্রগতিশীল পরিবর্তনসাধনের জন্য সংগ্রাম করে না। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ঐতিহাসিক অপরিহার্যতার বিরোধিতা করে, কেননা এতে তাদের সচ্ছলতা ও শাসনক্ষমতা হারানোর আশঙ্কা থাকে। প্রতিক্রিয়াশীলদের ক্রিয়াকলাপ সমাজ-প্রগতির অন্তরায় হলেও তারা এই প্রগতিকে রোধ করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, সমস্ত রকম কলাকৌশল প্রয়োগে উপনিবেশ রক্ষার জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের প্রয়াসের ফলে উপনিবেশভুক্ত জনগণের মুক্তি বিলম্বিত হলেও তারা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অগ্নিশিখা নির্বাপণে এবং ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার পতন রোধে সমর্থ হয় নি।

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সক্রিয় সংগ্রামের তাৎপর্য, সমাজতান্ত্রিক চেতনা ও বিপ্লবী তত্ত্বের ভূমিকা এবং উক্ত সংগ্রামে পার্টির ভূমিকা যারা হেয় করে দেখে ভ. ই. লেনিন সেই সব সুবিধাবাদীর বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

এটা প্রত্যক্ষ যে বিপ্লবী শক্তি যত স্পষ্টভাবে নূতন ব্যবস্থার অপরিহার্যতা উপলব্ধি করতে পারবে, যত সক্রিয়ভাবে তার জন্য সংগ্রাম করবে, সমাজ-প্রগতি ততই ত্বরান্বিত হবে।

ঐতিহাসিক অপরিহার্যতা ও মুক্তি

বুর্জোয়া মতাদর্শবাদীরা সচরাচর দেখাতে চান ঐতিহাসিক অপরিহার্যতা যেন মানুষকে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করে। এই দৃষ্টিতে অপরিহার্যতার সঙ্গে মুক্তি খাপ খায় না।

নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই প্রশ্নটা বোঝার চেষ্টা করা যাক। ধরা যাক দুটি লোক গহন অরণ্যের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলল। একজন প্রকৃতির অন্তর্বর্তী অপরিহার্য সম্পর্ককে কোন রকম আমল না দিয়ে প্রথমেই যে পথ চোখে পড়ল সে দিক পায়ে চলতে শুরু করল। সে এই ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারে যে যে-কোন সময় তার গতিপরিবর্তনের 'স্বাধীনতা' আছে এবং ইচ্ছে করলে সে অন্য দিকেও হাঁটা দিতে পারে। অনেক ঘণ্টা হাঁটাহাঁটির পরও ঠিক পথ খুঁজে না পেয়ে সে বুঝতে পারবে যে তার 'স্বাধীনতা' ছিল কেবলই মায়া। আসলে সে মুক্ত ত নয়ই, উপরন্তু এমন এক পারিপার্শ্বিক অবস্থার সম্পূর্ণ অধীনে, যা তার মনে ভীতি এবং নৈরাশ্যের সঞ্চার করে। আর একজন পথহারা অন্য উপায় গ্রহণ করে। সে জানে যে প্রকৃতিতে ভূমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি এবং আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে অপরিহার্য যোগসূত্র আছে। এই যোগসূত্র সম্পর্কে সে বই পড়ে এবং নিজের অভিজ্ঞতার দ্বারা যতখানি জেনেছে সেই অনুযায়ী সে যে পথ বেছে নেবে তাতে তার পক্ষে অবিলম্বে বাড়ি পৌঁছান সম্ভব হবে। অপরিহার্যতা সম্পর্কে জ্ঞান এবং তদনুযায়ী ক্রিয়ার ফলে এই ব্যক্তি পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝতে পারে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কের বিচারে সে সত্যি মুক্ত।

বাস্তব অপরিহার্যতার জ্ঞান মানুষকে ঐতিহাসিক কর্মের স্বাধীনতা জোগায়। এর দৃষ্টান্ত — কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সোভিয়েত জনগণের ক্রিয়াকলাপ। পার্টি সামাজিক বিকাশের নিয়মসংক্রান্ত জ্ঞানে সজ্জিত, যে ঐতিহাসিক অপরিহার্যতা কমিউনিজমের দিকে পরিচালিত করে পার্টি তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জনগণের ক্রিয়া সংগঠন করে। এর ফলাফল সকলেরই জানা আছে: সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র গড়ে উঠেছে, সোভিয়েত জনগণের আস্থা আছে আগামী দিনের প্রতি এবং ইতিহাসের নিয়ম অনুযায়ী সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসগুলিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচিতে যে যাত্রাপথ নির্ধারিত হয়েছে তা ধরে তারা এগিয়ে চলেছে।

অবশ্য সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিজেই অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি ও মতাদর্শগত প্রশ্নে ভুলভ্রান্তির বিরুদ্ধে গ্যারাণ্টি নয়। ঠিক এই কারণেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দাবি হল বাস্তব নিয়মের উপর গুরুত্ব আরোপ, অভিনিবেশসহকারে সেই সব নিয়মের অনুশীলন, সমাজবিকাশের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে কঠোর সামঞ্জস্য রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নিজেদের ক্রিয়াকলাপ নির্ধারণ।

তাই, অপরিহার্যতা মোটেই মুক্তিকে বাদ দিয়ে নয়, এবং অন্য দিক থেকে মুক্তিও অপরিহার্যতা বাদ দিয়ে নয়। **অপরিহার্যতার উপলব্ধি এবং তার বাস্তব প্রয়োগ নিয়েই মুক্তি।**

জনগণ ও ব্যক্তিমানুষ

ইতিহাসের পাতা ওল্‌টালে পাওয়া যাবে এমন বেশ কয়েক শ’ লোকের নাম, যাঁরা সমাজজীবনে বিশেষ গভীর

ছাপ রেখে গেছেন। এ'রা হলেন বড় বড় বিজ্ঞানী, সেনানায়ক, সমাজকর্মী, প্রতিভাবান শিল্পী ও চিন্তাবিদ এবং বিপ্লবী আন্দোলনের নেতা। আলেকজাণ্ডার ম্যাসিডোন, জুলিয়াস সীজার, স্পার্টাকাস, প্রথম পিটার ও নেপোলিয়নের নাম কার না জানা আছে? মনে হতে পারে তাঁরাই বুঝি ইতিহাসের একমাত্র স্রষ্টা।

বিখ্যাত ব্যক্তিমানুষেরা যে ইতিহাসে বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে থাকেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। উদাহরণস্বরূপ, ফ্রান্সের ইতিহাসে রবেস্‌পিয়ারের তাৎপর্য কি অস্বীকার করা যায়? কিন্তু ওই মানুষটির শক্তি কোথায় নিহিত ছিল? তাঁর ক্রিয়াকলাপ, ভাষণ ও ঘোষণাসমূহের অনুশীলন করলে দেখা যাবে যে তিনি সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে ফরাসী জনগণের ব্যাপক আন্দোলনের স্বার্থের অভিব্যক্তি ঘটিয়েছেন। এই কারণে জনগণ তাঁকে নিজেদের নেতা হিশেবে নির্বাচন করেছে, সমর্থন জানিয়েছে। আর অন্য দিকে রবেস্‌পিয়ারের দৌর্বল্যই বা কোথায় ছিল, যার জন্য যে গিলোটিনে বিপ্লবের শত্রুদের শিরশ্ছেদ করা হয়েছিল তার তলায় শেষ পর্যন্ত তাঁকে যেতে হয়েছিল? ক্রিয়াকলাপের শেষ পর্যায়ে তিনি জনসাধারণের আস্থা হারিয়ে ফেলেন। অতএব মহান ব্যক্তিদের ঐতিহাসিক ক্রিয়াকলাপের ভিত্তি হল সমাজের, জাতির বিকাশের গভীর প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত গণ-আন্দোলন।

৭০-এর দশকের রুশ নারোদনিকদের (বৈপ্লবিক আন্দোলনে পেটি বুর্জোয়া ধারা) মধ্যে বহু সাহসী ও প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তাঁরা ছিলেন জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ বীরমাত্র। এই কারণে তাঁদের ক্রিয়াকলাপের অভিপ্রেত ফলপ্রাপ্তি ঘটে নি। ব্যক্তিগত গুণে বিশিষ্ট ব্যক্তিমানুষ যদি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে

এবং সমাজবিকাশের আসন্ন প্রয়োজনের অভিব্যক্তি না ঘটাতে পারে তা হলে তার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

প্রশ্ন উঠতে পারে, যে-সব মহান ব্যক্তির কথা আমরা জানি, ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে তাদের আবির্ভাব না ঘটলে কী অবস্থা হত? কোন আকস্মিক কারণে ক্রমওয়েল যদি শৈশবে মৃত্যুমুখে পতিত হতেন তা হলে কি ইংলণ্ডে বুর্জোয়া বিপ্লব ঘটত না? অবশ্যই, ঘটত। ঘটত, কেননা ইতিহাস সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশের গভীর বাস্তব নিয়মের দ্বারা নির্ধারিত। সপ্তদশ শতকে ইংলণ্ডে বুর্জোয়া বিপ্লব ছিল ঐতিহাসিক অনিবার্যতা। ক্রমওয়েল না থাকলে তাঁর জায়গায় আর কাউকে পাওয়া যেত। তাতে হয়ত বা বহু ঐতিহাসিক ঘটনা অন্যভাবে, অন্য সময়ে ঘটত; কিন্তু বিকাশের মূলধারা একই রকম থাকত।

মহান ব্যক্তিত্বের ভূমিকার বৈশিষ্ট্য এই যে তা ঐতিহাসিক প্রয়োজনকে অন্যদের চেয়ে পরিষ্কার উপলব্ধি করে ও তার স্পষ্টতর অভিব্যক্তি ঘটায়, অগ্রণী শক্তিসমূহ সংগঠন করে এবং উক্ত প্রয়োজনসকল মেটানোর উদ্দেশ্যে এই শক্তিকে সংগ্রামের পথে পরিচালনা করে।

বিভিন্ন যুগের বিশিষ্ট কর্মবীরদের তুলনা করতে গেলে দেখা যাবে যে তাঁদের ক্রিয়াকলাপের ঐতিহাসিক তাৎপর্য সর্বদাই নির্ধারিত হয়েছে সেই সমাজ-আন্দোলনের আয়তনের দ্বারা, যার সমস্যা তাঁরা ব্যক্ত করেছেন। প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী আন্দোলনের ভূমিকা মানবেতিহাসের অন্য কোন সমাজ-আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে না, — তা নিজেদের নেতা ও পরিচালকের কাছ থেকে বিশেষ উন্নত গুণের দাবি করে।

শ্রমিক আন্দোলন পুরোভাগে নিয়ে এসেছে কমিউনিস্ট মতাদর্শের মহান স্রষ্টা, সমগ্র পৃথিবীর শ্রমজীবী মানুষের নেতা কার্ল মার্কস, ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস ও ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনকে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতিষ্ঠাতারা ছিলেন বিশেষ গুণের দ্বারা বিশিষ্ট: তাঁদের ছিল গভীর বৈজ্ঞানিক দূরদর্শিতা, বিপ্লবী আন্দোলনের অভিজ্ঞতাকে সৃজনাত্মক সাধারণীকরণের সামর্থ্য, প্রয়োগের সঙ্গে তত্ত্বকে মেলানোর নৈপুণ্য, সাংগঠনিক প্রতিভা, বিজয়ের দুর্মর আকাঙ্ক্ষা এবং ব্যক্তিগত পৌরুষ ও আকর্ষণীয়তা। শ্রমজীবীদের মুক্তির উদ্দেশ্যে তাঁরা যে বিরাট অবদানের সূচনা করেন তার জন্য মানবজাতি তাঁদের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকে।

বিশিষ্ট কর্মবীরদের ভূমিকা যতই মহান হোক না কেন তাতে অতিপ্রাকৃত কিছু নেই। বুর্জোয়া মতাদর্শবাদীরা ইতিহাসে জনগণের ভূমিকাকে অস্বীকার করে মহান ব্যক্তিদের ক্রিয়াকলাপকে অতীন্দ্রিয় রহস্যময়তার আবরণে আচ্ছন্ন করে দেখানোর প্রয়াসী, ইতিহাসের যদৃচ্ছ স্রষ্টারূপে তাঁদের দেখান এবং অন্ধ ভক্তিতে তাঁদের গুণকীর্তন করেন। ইতিহাসের বস্তুগত উপলব্ধি যে বৈষয়িক উৎপাদন ও **জনসাধারণের ক্রিয়াকলাপের অভ্যন্তরে** ইতিহাসের বনিয়াদকে দেখতে শেখায়, — ব্যক্তিপূজা সেখানে অপরিচিত।

বিশেষ বিশেষ কর্মবীরদের অতি বড় করে দেখানো ও তাঁদের উদ্দেশ্যে গুণকীর্তনকে মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিন সর্বদাই সমালোচনা করে এসেছেন, তাঁরা ছিলেন ব্যক্তিপূজার কঠোর বিরুদ্ধবাদী, বিপ্লবী আন্দোলনের তাতে যে কি বিরাট ক্ষতি হতে পারে তা তাঁরা দেখিয়েছেন।

যে-কোন মহান ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপের ঐতিহাসিক সীমানা বিশেষ যুগের সামাজিক প্রয়োজনের দ্বারা নির্দিষ্ট।

এমন কি বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, যেখানে মানুষের ব্যক্তিপ্রতিভা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, — সেখানেও সাংস্কৃতিক প্রগতি শেষ পর্যন্ত সামাজিক প্রয়োজনের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। মহান বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার সামাজিক প্রয়োগের ভিত্তিতে; মহান শিল্পীদের সৃষ্টিতে নিজ নিজ যুগের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ।

এটা প্রত্যক্ষ যে চার্লস ডারউইনের বিবর্তনতত্ত্ব গড়ে ওঠার মূলে আছে কৃষিক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার বিকাশ। এই তত্ত্বের অপরিহার্যতা যে আসন্ন হয়ে উঠেছিল তার সাক্ষ্য দিচ্ছে ডারউইনের পূর্বসূরীদের প্রকাশিত ধ্যানধারণা। জীববিজ্ঞানের বিকাশের অভিজ্ঞতা সাধারণীকরণের দ্বারা ডারউইন স্বীয় প্রতিভাবলে তাঁদের আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করলেন।

চিরায়ত শিল্পের ক্ষেত্রেও এমন কোন সৃষ্টি খুঁজে পাওয়া যাবে না যা কোন না কোন দিক থেকে সামাজিক স্বার্থের প্রতিফলন ঘটায় নি। ইতিহাসের বিশাল গতিপরিবর্তনের যুগ যে মহান শিল্পসৃষ্টির জন্ম দিয়ে থাকে সেটাও অকারণ নয়। তাই, রেনেসাঁসের যুগে মহান কবি ও শিল্পীদের এমন প্রাচুর্য।

তা হলে, যে সামাজিক প্রয়োজন মহান ব্যক্তিদের জন্ম দেয় তারই বা আবির্ভাব কোথা থেকে? এর আবির্ভাব সর্বোপরি উৎপাদন-বিকাশের পরিণাম হিশেবে। যদি তাই হয়, তা হলে আমাদের এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে ইতিহাসের চূড়ান্ত ভূমিকা গ্রহণ করে সেই সব মানুষ, যারা উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত, যারা সৃষ্টি করছে বৈষয়িক সম্পদ। এই মহান ঐতিহাসিক কার্যটি সর্বদাই করে এসেছে শ্রমজীবী মানুষ।

রাজনীতির ক্ষেত্রে দৃষ্টি দেওয়া যাক। দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায়: ইতিহাসে এমন একটিও বিশাল গতিপরিবর্তনের

সন্ধান পাওয়া যাবে না যেখানে জনসাধারণ চূড়ান্ত ভূমিকা গ্রহণ করে নি। কি বিপ্লবের ক্ষেত্রে, কি মুক্তিযুদ্ধে — সর্বদাই প্রধান শক্তি ছিল জনসাধারণ। এমন কি শান্তিপূর্ণ সময়েও, যখন শাসকসম্প্রদায় সাধারণ মানুষকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে দিতে চায় নি, তখনও রাজনীতির উপর তার প্রভাব পড়েছে। শোষকদের স্বার্থ সংরক্ষণকারী রাজা, প্রেসিডেণ্ট এবং মন্ত্রীদেরও জনগণের দাবি অগ্রাহ্য করার উপায় ছিল না। শ্রমজীবী জনগণ তাদের সংগ্রামের দ্বারা শাসক শ্রেণীর ক্ষুধাকে সীমিত করেছে, কখনও কখনও তাদের পিছু হটতেও বাধ্য করেছে।

আপাত দৃষ্টিতে অনন্যসাধারণ ব্যক্তিমানুষেরা মানসিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে থাকেন। বিজ্ঞানী, লেখক, কবি, শিল্পী ও সঙ্গীতশিল্পী — এঁরাই হলেন মহান ব্যক্তিমানুষের নিরবচ্ছিন্ন ধারা। কিন্তু মহান মননশক্তি কোথা থেকে তার চিন্তাধারা ও প্রেরণা লাভ করে? সকলেরই জানা আছে যে বিজ্ঞান বিকশিত হয় প্রয়োগের ভিত্তিতে, উৎপাদনের সাফল্যের ভিত্তিতে। অর্থাৎ, বৈজ্ঞানিক ভাবধারার উৎস নিহিত আছে সেই বিশাল উৎপাদনসংক্রান্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে, যা বৈষয়িক সম্পদের প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীরা — জনসাধারণ তিলে তিলে সঞ্চয় করে।

চিরায়ত শিল্পের কথা বলতে গেলে, আমরা সাহিত্যের ইতিহাস থেকে ভালো করেই অবহিত আছি জনগণের সঙ্গে তার সংযোগ গভীর। আমাদের মধ্যে এমন কে আছে লোকসঙ্গীত, লৌকিক বীরগাথা ও কাহিনী যার হৃদয় স্পর্শ করে না! জনগণই হল মহান কবি, শিল্পী ও গীতকার। প্রকৃত শিল্পী তাঁর শিল্পের ভাববস্তু ও শিল্পরূপ আহরণ করেন জনজীবন ও লোকশিল্প থেকে। মাক্সিম গোর্কির কথায়: 'মানুষ সৃষ্টি করেছে জিউসকে, ফিডাস তাঁকে মর্মরে রূপায়িত করেছেন।'

যেভাবেই দেখি না কেন, সমাজজীবনের এমন কোন ক্ষেত্র নাই যেখানে জনগণ চূড়ান্ত ভূমিকা গ্রহণ করে নি। আর ঐতিহাসিক বিকাশের প্রক্রিয়ায় এই ভূমিকা ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাচ্ছে। তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ — আধুনিক যুগে, যখন মানবজাতির উত্তরণ ঘটতে চলেছে কমিউনিজমের দিকে। কমিউনিস্ট সমাজ গঠনের বিপুল ঐতিহাসিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না ব্যাপক শ্রমজীবী জনসাধারণ এতে অংশগ্রহণ করছে।

প্রলেতারিয়েতের মানসিক অস্ত্র

মার্কসীয় দর্শনের মূল তত্ত্ব — দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের পরিচয় আমরা লাভ করেছি। এখন দেখা দরকার এই দর্শনের সামাজিক তাৎপর্য কোথায়।

দর্শন চলে আসছে বহু শতাব্দী হল। কিন্তু দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তা জনগণ ও বিপ্লবী সংগ্রাম থেকে দূরে ছিল।

কিংবদন্তী অনুযায়ী, প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক ডিওজেনাস সারা জীবন এক পিপের মধ্যে কাটান। তাঁর একটি মাত্রই দুশ্চিন্তা ছিল: লোকে যেন তাঁর শান্তিভঙ্গ না করে, তাঁর ভাবনার ব্যাঘাত না ঘটায়। অবশ্য এটা ঠিকই যে অতীতের সব দার্শনিকই ডিওজেনাসের মতো ছিলেন না। তাঁদের অনেকেই নিজ নিজ সময়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তবে, এ'দের মধ্যে সবচেয়ে প্রগতিশীল দার্শনিক মতবাদও যথাযথ বিজ্ঞানসম্মত ছিল না। সমাজসংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে অতীতের দার্শনিকেরা ভাববাদী পন্থা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের দার্শনিক তত্ত্ব জনসাধারণকে দারিদ্র্য থেকে উদ্ধারের এবং শোষণ থেকে মুক্তির পথ বাতলাতে পারে নি।

মার্কসীয় দর্শন সেই প্রলেতারিয়েতের স্বার্থের অভিব্যক্তি ঘটাল, যার ঐতিহাসিক ব্রত হল শোষণমূলক ব্যবস্থার ধ্বংসসাধন এবং কমিউনিজম গঠন। কীভাবে এটা করা যায়? — এই হল প্রশ্ন, যার উত্তর দর্শনকে খুঁজে বার করতে হবে। কার্ল মার্কসের কথায়: 'দার্শনিকেরা নানাভাবে জগৎকে **ব্যাখ্যা করে গেছেন,** কিন্তু তাঁদের কাজটা হওয়া উচিত জগতের **পরিবর্তনসাধন।'**

জগতের বিজ্ঞানসম্মত চিত্র তুলে ধরে এবং সমাজের বিকাশের নিয়ম উদ্‌ঘাটন করে মার্কসবাদী দর্শন প্রলেতারিয়েতের মনোবলে পরিণত হয়েছে। তা হয়ে দাঁড়িয়েছে মুক্তিআন্দোলনের মস্তিষ্ক, যার হৃৎপিণ্ড হল শ্রমিক শ্রেণী। ব্যাপক জনগণের দর্শন হিশেবে মার্কসবাদ সেই ক্রিয়াশীলতার অধিকারী, অতীতের দার্শনিক তত্ত্বসমূহে যার অভাব পরিলক্ষিত হয়। দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রামের মতাদর্শগত ভিত্তিতে, কমিউনিজম গঠনের তত্ত্বগত বনিয়াদে পরিণত হয়েছে। আধুনিক যুগের জটিল পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিসমূহ তাদের রাজনীতি গড়ে তোলার জন্য এর উপর নির্ভর করে থাকে।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের দর্শনকে বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের অস্ত্র হিশেবে গ্রহণ করে মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতারা পুঁজিবাদী সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সার্বিক বিশ্লেষণে সমর্থ হয়েছেন, পুঁজিবাদী শোষণের অন্তর্নিহিত কারণ ও কৌশল উদ্‌ঘাটন করেছেন, শেষতম বৈরভাবাপন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা — পুঁজিবাদের ধ্বংসের অপরিহার্যতা প্রতিপাদন করেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

পুঁজিবাদ ও তার পতন

কার্ল মার্কস তাঁর অনন্যসাধারণ রচনা 'পুঁজি' গ্রন্থে লিখেছেন: 'বর্তমান রচনায় আমার গবেষণার বিষয়বস্তু হল উৎপাদনের পুঁজিবাদী প্রণালী এবং তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ উৎপাদন ও বিনিময়ের সম্পর্ক'। উৎপাদন এবং বৈষয়িক সম্পদ বণ্টনের নিয়ম উদ্‌ঘাটন করে মার্কস দেখিয়েছেন যে পুঁজিবাদের ধ্বংসের অনিবার্যতা এবং সমাজতন্ত্রের জয়ের মূল কারণ নিহিত রয়েছে সমাজজীবনের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অভ্যন্তরে।

১১ ॥ পুঁজিবাদী উৎপাদন

পুঁজিবাদের ধর্ম হল **পণ্য-উৎপাদনের** একাধিপত্য। পণ্য এবং পণ্য-বিনিময়ের মধ্যে নিহিত আছে বুর্জোয়া সমাজের সকল বিরোধ।

পুঁজিবাদের বহু আগে থেকে উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময় প্রথা প্রচলিত থাকলেও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আগে পর্যন্ত অর্থনীতি মূলত চলত

প্রাকৃতিক নিয়মে। প্রতিটি সামন্ততান্ত্রিক খামার ছিল একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন, ক্বচিৎ বহির্বিশ্বের সঙ্গে বিনিময়ের সংযোগ হত, কেননা জমিদার ও তার বশংবদদের ব্যবহারের জন্য যা প্রয়োজন ভূমিদাস ও হস্তশিল্পীদের শ্রমে তার প্রায় সব কিছুই তৈরি হত। কৃষি অর্থনীতি ছিল প্রাকৃতিক। কৃষকেরা কেবল শস্য-উৎপাদন ও পশুপালন নিয়েই থাকত না, তাঁতের কাজ, জুতো তৈরি এবং খামারের সাজসরঞ্জাম প্রস্তুতের কাজও তাদের করতে হত। অবশ্য প্রাকৃতিক অর্থনীতির আমলেও কিছু কিছু শ্রমজাত উৎপন্ন দ্রব্য (লবণ, লোহা, মশলাপাতি ও বিলাসসামগ্রী) পণ্য হিশেবে বাজারে বিনিময় হত, তবে এই ধরনের বিনিময়ের ভূমিকা দ্বিতীয় শ্রেণীর, কেননা বিক্রয়ের জন্য উৎপন্ন দ্রব্যের নেহাৎই নগণ্য অংশ নির্দিষ্ট থাকত।

পুঁজিবাদী আমলে কারখানা, ফ্যাক্টরী ও কৃষিখামারগুলি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নিয়মিতভাবে পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন করে থাকে। পুঁজিবাদী সমাজে জীবনের সকল দিক পণ্য-অর্থ সম্পর্কে পরিপূর্ণ। পণ্য-বিনিময় — বুর্জোয়া সমাজের সবচেয়ে ব্যাপক, প্রাত্যহিক এবং লক্ষ লক্ষ বার চোখে পড়া সম্পর্ক। সবই হয়ে দাঁড়ায় কেনা-বেচার বস্তু: 'বাড়ি-ঘর, জমি-জমা, পদমর্যাদা, দেশ, রাজপদ, আকাঙ্ক্ষা, তৃপ্তি, বিবেক, মান-সম্মান, স্ত্রী, স্বামী, সন্তান, প্রভু, ভৃত্য, জীবন, শোণিত, দেহ, আত্মা — সব।' বুর্জোয়া সমাজ সম্পর্কে একথা লিখেছেন ইংরেজ লেখক ডি. বেনিয়ান।

পণ্য ও পণ্য-উৎপাদন

পণ্য-উৎপাদন বলতে কী বোঝায়? পণ্য-উৎপাদন হল সামাজিক অর্থনীতির এমন এক ব্যবস্থা যাতে দ্রব্য প্রস্তুত হয় ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য নয়, — বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে।

সামাজিক কোন পরিস্থিতিতে শ্রমের ফল পণ্য হয়ে দাঁড়ায়?

শ্রমের ফল পণ্যে রূপান্তরিত হতে গেলে, প্রথমত, থাকা দরকার সামাজিক শ্রমবিভাগ, যে পরিস্থিতিতে প্রতিটি ব্যক্তি তার নিজের জন্য

যা দরকার তা তৈরি না করে অন্য কোন এক বিশেষ ধরনের উৎপাদনে নিযুক্ত থাকে। আর দ্বিতীয়ত, সেক্ষেত্রে উৎপাদনের উপায়কে হতে হবে পৃথক পৃথক কতিপয় ব্যক্তির অথবা গোষ্ঠীর মালিকানাধীন। উক্ত দুই পরিস্থিতিতে পণ্যের কেনা-বেচা অর্থনৈতিক অপরিহার্যতা হয়ে দাঁড়ায়।

তিন জাতীয় পণ্য-উৎপাদন প্রচলিত আছে: **সাধারণ পণ্য-উৎপাদনব্যবস্থা**, যাতে দ্রব্য প্রস্তুত করে খুচরো উৎপাদনকারীরা — হস্তশিল্পী ও কৃষকেরা; **পুঁজিবাদী পণ্য-উৎপাদন**, ভাড়াটে শ্রমিকদের শ্রম শোষণ করে পুঁজিপতিরা যে উৎপাদন পরিচালনা করে থাকে; **সমাজতান্ত্রিক পণ্য-উৎপাদন**, — সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় যার প্রচলন; এ সম্পর্কে পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

সাধারণ পণ্য-উৎপাদন বিশেষ কোন সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। উৎপাদনের বিভিন্ন প্রণালীর মধ্যে তার প্রচলন ছিল এবং আছে। আদিম সমাজব্যবস্থা যখন ভেঙ্গে পড়তে থাকে তখন তার আবির্ভাব, দাসব্যবস্থাসম্পন্ন সমাজব্যবস্থা এবং সামন্ততান্ত্রিক পরিস্থিতিতে তার প্রচলন ছিল, পুঁজিবাদের আমলে, এমন কি পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের সন্ধিক্ষণেও তা চলতে থাকে।

পুঁজিবাদী পণ্য-উৎপাদনের আবির্ভাব সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অভ্যন্তরে।

হস্তশিল্প ও কৃষি এবং নগর ও গ্রামের মধ্যে সামাজিক শ্রমবিভাগ বৃদ্ধির ফলে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি ক্রমেই বাজার-সম্পর্কের দিকে আকৃষ্ট হতে লাগল এবং অর্থের নিয়ন্ত্রণে এসে পড়ল। এইভাবে, পণ্য-সম্পর্কের বিকাশ সামন্ততন্ত্রের বিনাশের ভিত্তি রচনা করল। ফ্রেডারিখ এঙ্গেলসের কথায়, নাইটদের দুর্গপ্রাকার নূতন হাতিয়ারের

যারা গুলিবিদ্ধ হওয়ার অনেক আগেই তার ভিতের নীচে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে রেখেছিল অর্থ। এইভাবে, সামন্ততন্ত্রের ভাঙ্গন পর্বে সাধারণ পণ্য-উৎপাদনের মধ্য থেকে পুঁজিবাদী পণ্য-উৎপাদন উদ্ভূত হল।

সাধারণ পণ্য-উৎপাদন ও পুঁজিবাদী পণ্য-উৎপাদনের মূল লক্ষণগুলির তুলনা করা যাক।

পুঁজিবাদী পণ্য-উৎপাদনের মতো সাধারণ পণ্য-উৎপাদন সামাজিক শ্রমবিভাগ ও উৎপাদনের উপায় এবং শ্রমের ফলের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে থাকে। এখানেই তাদের একরূপতা। কিন্তু পুঁজিবাদী পণ্য-উৎপাদনের সঙ্গে হস্তশিল্পী ও কৃষকদের সাধারণ পণ্য-উৎপাদনের প্রভেদ এই যে এক্ষেত্রে শ্রমের ফলের ব্যক্তিগত মালিকানা উৎপাদনকারীদের। পুঁজিবাদে শ্রমের ফল তাদেরই ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়, যারা তা উৎপাদন করে নি এবং উৎপাদনের পেছনে এক মুহূর্তের শ্রমও ব্যয় করে নি, অথচ উৎপাদনের উপায়ের মালিক। এখানেই সাধারণ পণ্য-উৎপাদনের সঙ্গে পুঁজিবাদী পণ্য-উৎপাদনের মূল প্রভেদ নিহিত।

পণ্যদ্রব্যের ধর্ম

পণ্য হল শ্রমের ফল, যা উৎপন্ন হয়েছে বিনিময়ের উদ্দেশ্যে। স্বভাবতই, তাকে মানুষের কোন না কোন চাহিদা পূরণের উপযোগী হতে হবে, নতুবা কেউই তা খরিদ করবে না। মানুষের কোন না কোন চাহিদা পূরণে বস্তুর শক্তিকে বলা হয় তার **ব্যবহারিক মূল্য।**

রুটি, চিনি, মাখন, দুধ, মাংস বা সসেজের ব্যবহারিক মূল্য এই যে সে-সব পণ্যদ্রব্য খাদ্যের ব্যাপারে মানুষের চাহিদা মেটায়। জুতো, চটি ও বুটের ব্যবহারিক মূল্য এই যে সে-সব সামগ্রী মানুষের পাদুকার চাহিদা মেটায়। শ্রমের ফল, যা সরাসরি মানুষের ব্যক্তিগত চাহিদা মেটায়, একমাত্র তারই যে ব্যবহারিক মূল্য আছে, তা নয়। উৎপাদনের উপায়, যার সাহায্যে বৈষয়িক সম্পদ গড়ে ওঠে, তারও ব্যবহারিক মূল্য আছে।

মানুষ পণ্যদ্রব্য তার নিজের ব্যবহারের জন্য পেতে পারে যদি সে তা খরিদ করে। উদাহরণস্বরূপ, একই সমান অর্থমূল্যে পাওয়া যেতে পারে একটি রেফ্রিজারেটর অথবা চারপ্রস্থ পুরুষের পোশাক কিংবা তিনটি সেলাইকল। অন্যভাবে বলতে গেলে একটি রেফ্রিজারেটরের দাম চারপ্রস্থ পোশাকের সমান ইত্যাদি। এ থেকে কী দাঁড়ায়? দাঁড়াচ্ছে এই যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন ধরনের পণ্যদ্রব্যের মধ্যে এমন কিছু একটা সাধারণ ব্যাপার আছে যাতে বিশেষ অনুপাতে একের সঙ্গে অপরকে সমপর্যায়ভুক্ত করা যায়। পদার্থবিদ্যাসংক্রান্ত, রাসায়নিক অথবা অন্য কোন প্রাকৃতিক বস্তুর ধর্ম এমন কোন সাধারণ গুণের অধিকারী নয়। সকল পণ্যের একটি সাধারণ ধর্ম আছে: **তারা সকলে মানুষের শ্রমের ফল**। এর জন্যই তারা পরস্পরের সঙ্গে তুলনীয়। এক পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে অপর পণ্যদ্রব্যের অনুপাত নির্ধারণ করে মানুষ আসলে তাতে নিযুক্ত শ্রমের অনুপাত নির্ধারণ করে। পণ্যে রূপায়িত শ্রম পণ্যের মূল্য গঠন করে। এক্ষেত্রে শ্রম নিজে মূল্য নয়, — তা একমাত্র সেই পরিস্থিতিতেই মূল্য গঠন করে, যখন দ্রব্য উৎপন্ন হয় বিনিময়ের উদ্দেশ্যে।

মূল্য জিনিসটা কী তা বোঝা সহজ নয়, কেননা মার্কস তাঁর 'পুঁজি' গ্রন্থে বলেছেন, তার মধ্যে পদার্থের কণামাত্র নেই। যা হোক, আমরা ধীরে ধীরে মূল্যের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব।

যেহেতু মূল্য হল পণ্যদ্রব্যে শ্রমের রূপায়ণ, সেহেতু তার পরিমাণ নির্ভর করে পণ্যদ্রব্যের উৎপাদনে যে পরিমাণ শ্রম ব্যয়িত হয়েছে তার উপর। শ্রমের স্থিতিকাল, শ্রমিকের কাজের সময় শ্রমের পরিমাণ নিরূপণ করে থাকে। অর্থাৎ, শ্রম ও মূল্যের পরিমাপ কাজের সময় দিয়ে নির্ধারিত হয়। কাজের সময় স্বয়ং নিরূপিত হয় ঘণ্টা, দিন ইত্যাদির দ্বারা।

পণ্যদ্রব্য-উৎপাদনের জন্য যত বেশি শ্রম ব্যয়িত, মূল্যও তত বেশি। খুব সাধারণ দৃষ্টান্তের সাহায্যে এটা সহজেই প্রমাণিত হয়। খনি মজুর ১০ ডলার মূল্যের পরিমাণ আকরিক লৌহ উত্তোলন করল। ব্লাস্ট-ফার্নেস শ্রমিক এই আকরিক থেকে যে ঢালাই লোহা তৈরি করল অতঃপর তার মূল্য হয়ে দাঁড়াল ৩০ ডলার। লোহা থেকে তৈরি হল ইস্পাত — যার মূল্য হল ৯০ ডলার। এ থেকে যে পরিমাণ পিন তৈরি করা যায় তার মোট মূল্য হবে ৩০০ ডলার, অথবা তৈরি করা যেতে পারে ৯০০ ডলার মূল্য পরিমাণের পেন্সিল নাইফের ব্লেড, কিংবা ৩ হাজার ডলার মূল্য পরিমাণ ঘড়ির স্প্রিং। এসব পণ্যদ্রব্যের জন্য লেগেছে একই পরিমাণ ইস্পাত। তা হলে ব্লেড পিনের চেয়ে এবং স্প্রিং ব্লেডের চেয়ে বেশি দামী হল কেন? এর কারণ এই যে উক্ত পণ্যদ্রব্যসমূহের উৎপাদনে বিভিন্ন পরিমাণ শ্রমের প্রয়োজন হয়েছে।

পণ্য-উৎপাদনকারীরা সকলে একই রকম পরিস্থিতিতে কাজ করে না, তারা বিভিন্ন ধরনের শ্রমের হাতিয়ার গ্রহণ করে, নানা ধরনের নৈপুণ্যের অধিকারী হয়ে থাকে; একই ধরনের পণ্যদ্রব্য-উৎপাদনে তারা আবার বিভিন্ন পরিমাণ সময়

নিয়ে থাকে। কিন্তু বাজারে এক জাতীয় পণ্যের একই রকম মূল্য। সুতরাং, কোন পণ্যের মূল্যের পরিমাণ উৎপাদনের অথবা উৎপাদনকারীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে না, — তা নির্ধারণ করে থাকে শ্রমের প্রভুত্বকারী পরিস্থিতি, **সামাজিক দিক থেকে প্রয়োজনীয় শ্রমসময়।**

ধরা যাক, তিনটি উৎপাদনকারীদল জুতো তৈরি করতে পারে। একদল একজোড়া জুতো তৈরি করে ৭ ঘণ্টায়, অন্য দল — ১০ ঘণ্টায় আর তৃতীয় দল —১৪ ঘণ্টায়। এখানে প্রথম ও তৃতীয় দলটির লোক-বল অল্প, তাই তারা বাজারে অল্প পরিমাণ জুতো ছাড়তে পারে, বেশির ভাগই কিন্তু প্রস্তুত করে থাকে দ্বিতীয় দলটি।

তা হলে সামাজিক দিক থেকে প্রয়োজনীয় সময় কোনটা হবে? এখানে সেই সময়টা, যা দ্বিতীয় দল ব্যয় করে থাকে, — অর্থাৎ ১০ ঘণ্টা। এর কারণ? কারণ এই যে যে-সব প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট শাখা (ভালোই হোক আর মন্দই হোক) পণ্যের মূল পরিমাণ উৎপন্ন করছে তাদের কাছাকাছি অথবা সমান শ্রমসময়ই সামাজিক দিক থেকে প্রয়োজনীয় সময় বলে পরিগণিত।

এবার আমরা মূল্যের অর্থটিও নির্ধারণ করতে পারব। মূল্য হল **সামাজিক দিক থেকে প্রয়োজনীয় শ্রম, যা পণ্যদ্রব্যের উৎপাদনে ব্যয়িত হয়।**

মূল্য হল এক ঐতিহাসিক ঘটনা, যা কেবল পণ্য-উৎপাদনের সহজাত। এর অস্তিত্ব সেখানে এবং তখনই সম্ভব যেখানে শ্রমের ফল পণ্য হিশেবে দেখা দেয় এবং একের সঙ্গে অপরের বিনিময় চলে। প্রাকৃতিক অর্থনীতির পরিস্থিতিতে উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে আসে না, তাদের মূল্যে তাই সামাজিক অপরিহার্যতা বলে কিছু নেই। কমিউনিস্ট সমাজব্যবস্থায়ও, যখন পণ্য-উৎপাদনব্যবস্থার অবসান ঘটবে, তখন আর এ সম্পর্কে কোন কথা উঠবে না। সুতরাং, মূল্য

বস্তুর নিজস্ব ধর্ম নয়, — পণ্য-উৎপাদনকারী মানুষদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের সূচক।

বস্তুর ইউনিট উৎপাদনে সামাজিক দিক থেকে প্রয়োজনীয় যে-সময় ব্যয়িত হয় তা অপরিবর্তনীয় থাকে না। উৎপাদনী শক্তির বিকাশ, প্রকৌশল ও বিজ্ঞান ইত্যাদির প্রগতির মাত্রা অনুযায়ী তা হ্রাসপ্রাপ্ত হতে থাকে।

যেমন, ১৭৮৪ সনে ইংলণ্ডে এক পাউণ্ড সুতোর দাম উঠে দাঁড়িয়েছিল ১৩০ পেন্সের বেশি আর ১৮২৩ সনে তা নেমে দাঁড়ায় প্রায় ১১ পেন্স পর্যন্ত। ব্যাপারটা হল এই যে সুতো তৈরির কলের উদ্ভাবন ও প্রসারের পর সুতোর মূল পরিমাণটা তৈরি হতে লাগল কলকারখানায় আর তার মূল্যের পরিমাণ এখন নির্ধারিত হতে লাগল যান্ত্রিক উৎপাদনের সাহায্যে। কারখানায় সুতোর উৎপাদনে যে সময় লাগে তন্তুবায়-হস্তশিল্পীরা চরকার সাহায্যে কাজ করে তার চেয়ে অনেক বেশি সময় ব্যয় করত, অথচ তাদের তৈরী সুতোর দাম কারখানার তৈরী সুতোর দামে নেমে গেল; প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে না পারায় তন্তুবায়রা সর্বস্বান্ত হয়ে গেল।

দেখা যাচ্ছে পণ্যের এক ইউনিটের মূল্য নির্ভর করছে **শ্রমের উৎপাদনশীলতার** উপর। শ্রম যত উৎপাদনশীল, পণ্যের উৎপাদনে যত স্বল্প সময় ব্যয়িত হয় তার মূল্যও তত কম হয়।

সময়ের ইউনিটের হিসাবে (এক ঘণ্টায়, এক দিনে) কী পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন হয় তার দ্বারা **শ্রমের উৎপাদনশীলতা** পরিমাপ করা হয়ে থাকে। এটা নির্ভর করে সর্বোপরি শ্রমের হাতিয়ার ও তার প্রকৌশলগত উৎকর্ষের উপর: যন্ত্র যত উন্নত, শ্রমিকদের শ্রমও তত ফলপ্রসূ হবে। কর্মীদের কারিগরি যোগ্যতা এবং প্রয়োগকৌশল ব্যবহারে তাদের নৈপুণ্যের দ্বারাও শ্রমের উৎপাদনশীলতা নিরূপিত হয়ে

থাকে। বিজ্ঞানের বিকাশের মানও বিরাট তাৎপর্য বহন করে। উৎপাদনে তার সাম্প্রতিক সাফল্য যত দ্রুত বদ্ধমূল হতে থাকে, সমাজে শ্রমের উৎপাদনশীলতা ততই উপরে ওঠে। শেষত, শ্রমের উৎপাদনশীলতা প্রাকৃতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে: কৃষিক্ষেত্রে — জমির উর্বরাশক্তি ও অনুকূল আবহাওয়ার উপর; খনিজ শিল্পে — খনিজ সম্পদ ও তৈলবাহী বোর হোল ইত্যাদির উপর।

শ্রমের উৎপাদনশীলতা সকল প্রতিষ্ঠানে একযোগে বৃদ্ধি পায় না; স্বভাবত গোড়ায় তার উন্নতি ঘটে প্রকৌশলগত দৃষ্টিতে অগ্রণী পৃথক পৃথক কতকগুলি পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানে, যেগুলির মালিকসম্প্রদায় উক্ত পন্থায় তাদের মুনাফা বৃদ্ধি করে থাকে।

ধরা যাক, অধিকাংশ কারখানায় কোন শিল্পের শাখায় আট ঘণ্টা শ্রমসময়ের মধ্যে প্রতিটি শ্রমিক ৮টি করে পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন করে। ১ ঘণ্টার পরিশ্রমে শ্রমিক ২ ডলারের সমান নূতন মূল্য সৃষ্টি করে, আর সারা দিনের কাজে —১৬ ডলারের সমান।

এখন ধরা যাক যে এগুলির মধ্যে কোন একটি কারখানায় এক ধরনের উৎকর্ষ সাধিত হতে চলেছে। এই নূতন কৌশলের অবলম্বনে অথবা কার্যক্ষেত্রে নূতনত্বের প্রবর্তনায় শ্রমের উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেল। তখন এই কারখানাটিতে ৮ ঘণ্টা কার্যকালের মধ্যে আর ৮টি পণ্যদ্রব্য তৈরি হবে না, — হবে ১৬টি। এর ফলে ইউনিটগত পণ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাস পাবে, এখন তা আর ২ ডলারের সমান না হয়ে হবে ১ ডলারের সমান।

কিন্তু অগ্রণী শিল্পপ্রতিষ্ঠানে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই ধরনের পণ্যের সামাজিক মূল্যে কোন পরিবর্তন দেখা দিল না। আগের মতোই পণ্যদ্রব্যের প্রতিটি ইউনিট ২ ডলারের সমান রয়ে গেল। উৎপাদনের নূতন পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে, পুঁজিপতি অন্যান্য পুঁজিপতিদের তুলনায় প্রতিটি পণ্যদ্রব্যে ১ ডলার ক'রে বেশি

দামে উঠিয়ে তার পণ্য বিক্রী করবে। এই বাড়তিটা পণ্যের সামাজিক মূল্য ও তার বিশেষ মূল্যের মধ্যে যে ফারাক, তার সমান।

অন্যান্য পুঁজিপতিও বেশি পরিমাণে মুনাফা লুঠতে চায়, তারাও অগ্রণী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির প্রকৌশল ব্যবহারের দিকে হাত বাড়ায়, উৎপাদনের উৎকর্ষসাধন এবং শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উপায় খোঁজে। কিন্তু শ্রমের সর্বাঙ্গীণ উৎপাদনশীলতা বেড়ে যাওয়ায় আবার পণ্যের মূল্য হ্রাস পেয়ে যায়।

নির্দিষ্ট শাখার অধিকাংশ শিল্পপ্রতিষ্ঠানই যদি শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে দেয় তা হলে বলা যেতে পারে সামাজিকভাবে সাধারণ এবং আদর্শ হয়ে দাঁড়াবে ৮ ঘণ্টায় একজন শ্রমিকের উৎপাদন ৮ টির জায়গায় ১৬টি পণ্যদ্রব্য; আর তখন পণ্যদ্রব্যের ইউনিটগত উৎপাদনের জন্য সামাজিক দিক থেকে প্রয়োজনীয় শ্রমসময়টি ১ ঘণ্টা থেকে আধঘণ্টায় নেমে আসবে এবং তার সামাজিক মূল্যও অর্ধেক কমে যাবে।

পরিণামে সব পুঁজিপতিই সমান অবস্থায় এসে দাঁড়াবে। অন্যদের চেয়ে আরও বেশি করে মুনাফা পাবার উদ্দেশ্যে বৃহৎ পুঁজিপতিরা আবার তাদের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য উঠে পড়ে লাগবে, এবং তখন আবার সমগ্র প্রক্রিয়াটির গোড়া থেকে পুনরাবৃত্তি হবে, — তবে এখন তা হবে উৎপাদনী শক্তি বিকাশের উচ্চতর স্তরে।

শ্রমের উৎপাদনশীলতাবৃদ্ধি যে-কোন সমাজব্যবস্থার পক্ষে অর্থনীতিগতভাবে অপরিহার্য, কেননা তা সমাজের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের মূল পূর্বশর্ত। এর মধ্যে যেমন প্রকাশ পায়

উৎপাদনী শক্তির বিকাশের নূতন স্তর, তেমনি প্রকাশ পায় উৎপাদন-সম্পর্কের চরিত্র, অর্থাৎ উৎপাদনপ্রণালী, তার বৈশিষ্ট্য, গতি ও বিকাশ।

উৎপাদনের প্রতিটি প্রণালী পূর্ববর্তী প্রণালীর তুলনায় শ্রমের উচ্চতর উৎপাদনশীলতা সৃষ্টি করে, সমাজকে আরও বেশি পরিমাণ উৎপন্ন দ্রব্য সরবরাহ করে ও তাকে সমৃদ্ধতর করে। শ্রমের উৎপাদনশীলতাবৃদ্ধির মধ্যে পুরনো সমাজব্যবস্থার সামনে নূতনের সব রকম শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত হয়।

ভ. ই. লেনিন দেখিয়েছেন যে, 'শ্রমের উৎপাদনশীলতাই শেষ পর্যন্ত নূতন সমাজব্যবস্থার বিজয়ের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে প্রধান ঘটনা। পুঁজিবাদ শ্রমের যে উৎপাদনশীলতা সৃষ্টি করেছে, ভূমিদাসব্যবস্থাধীন সমাজে তা দেখা যায় নি। পুঁজিবাদের উপর চূড়ান্ত জয়লাভ করা যায় এবং যাবেও, কেননা সমাজতন্ত্র শ্রমের নূতন ও আরও উন্নত ধরনের উৎপাদনশীলতা সৃষ্টি করছে।'

অর্থ

যে সমাজে পণ্যের বিনিময়ব্যবস্থা আছে, সেখানে অর্থের প্রচলন অবশ্যম্ভাবী। অর্থ হল এমন এক পণ্য যা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পণ্যজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সাধারণ সমতুলের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। অর্থের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভূত হল নূতন অর্থনৈতিক শক্তি, যার অধিকার এনে দিল সম্পদ ও শাসনক্ষমতা। এঙ্গেলসের কথায়: 'উদ্ভাবিত হল পণ্যের পণ্য, যার মধ্যে অন্যান্য সব পণ্য লুকিয়ে থাকে, — এ এমন এক যাদুশক্তিসম্পন্ন উপকরণ যা ইচ্ছেমতো যে-কোন প্রলোভনজনক অভীষ্ট বস্তুতে পরিণত হওয়ার ক্ষমতা রাখে। যারা এই জাতীয় পণ্যের অধিকারী হল তারাই উৎপাদন জগতের উপর প্রভুত্ব কায়েম করে বসল।' পণ্য-অর্থ সম্পর্কের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে

অর্থের শাসনক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অত্যুন্নত পণ্য-উৎপাদনব্যবস্থাসম্পন্ন বুর্জোয়া সমাজে অর্থ মানুষের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে, তাকে অর্থের দাসে পরিণত করে। অনোরে দ্য বালজাকের কথায়: এই জগতে 'সনদের চেয়েও যা ওপরে, যা পবিত্র, বরণীয়, মহৎ, চিরনবীন, সর্বশক্তিমান — তা হল পাঁচ-ফ্রাঙ্কের মুদ্রাটি।'

অর্থের তাৎপর্য একমাত্র সামাজিক ও উৎপাদন-সম্পর্কের সূচক হিশেবে। ডানিয়েল ডিফোর উপন্যাসের নায়ক রবিন্সন ক্রুসো যখন একাকী নির্জন দ্বীপে এসে পড়ল, তখন জাহাজ থেকে যে-সব জিনিস সে বাঁচাতে পেরেছিল তার মধ্যে অর্থ ছাড়া আর সব কিছুই তার কাজে এসেছিল। রবিন্সনের পক্ষে কারও সঙ্গেই কোন কিছু বিনিময় করার মতো সম্ভাবনা ছিল না, তাই বুর্জোয়া সমাজের পরম মূল্যবান বস্তু — অর্থ — তার শক্তি হারিয়ে ফেলল, হয়ে দাঁড়াল তুচ্ছ, নেহাৎই অসার বস্তু। 'বাজে আবর্জনা,' রবিন্সন অর্থ সম্পর্কে বলল, 'তোকে দিয়ে আমার এখন হবেটা কী? হেঁট হয়ে মেঝে থেকে যে তোকে তুলব সেটুকু দাম পাওয়ার যোগ্যতাও তোর নেই।'

সোনা হল সর্বস্বীকৃত আর্থিক পণ্য। সোনা তার নিজস্ব স্বাভাবিক ধর্মবশত অর্থের সামাজিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনের অধিকতর উপযোগী। মূল্য ক্ষতিগ্রস্ত না করে তাকে সহজে ভাঙ্গা যায় আবার জোড়া যায়; সহজেই সংরক্ষণ করা যায়, কেননা তা জারণ-প্রবণ নয়, পর্যাপ্ত মূল্যের সোনার আয়তন এবং ওজনও বিশেষ একটা হয় না।

অর্থ অনেকগুলি কাজ সম্পাদন করে। প্রথমত, তার কাজ হল **মূল্যের পরিমাপ** নির্ধারণ, অর্থাৎ অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের মূল্য পরিমাপন।

প্রতিটি পণ্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থে বিক্রীত হয়, — অর্থের সেই পরিমাণের দ্বারা সূচিত হয় পণ্যের মূল্য। অর্থের দ্বারা পণ্যের যে মূল্য প্রকাশিত হয়, তাকে বলা হয় **দর**।

সকল পণ্য নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনায় নিজেদের মূল্য প্রকাশ করে বলে মাপের ইউনিট অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সোনার মাপের ইউনিট হতে পারে একমাত্র তার ওজনগত পরিমাণ। দরের পরিমাণ হল সোনার সেই ওজনগত পরিমাণ যা কোন নির্দিষ্ট দেশে সমস্ত পণ্যদ্রব্যের দর পরিমাপের আর্থিক ইউনিট বলে ধরা হয়।

পণ্যের দর মূল্যের আর্থিক মাধ্যম হওয়ায় চাহিদা ও সরবরাহের সাম্য অবস্থায় তা নির্ভর করে দুটি পরিমাণের উপর: পণ্যের নিজের মূল্য ও সোনার মূল্যের উপর। পণ্যের মূল্য যত কম তার দর তত নীচে; মূল্য যত বেশি তার দর তত উপরে। এবং বিপরীতভাবে, সোনার মূল্য যত নীচে, পণ্যের দর তত উপরে। এইভাবে, পণ্যের দর সরাসরি পণ্যের মূল্যের অনুপাতে এবং বিপরীত দিকে সোনার মূল্যের অনুপাতে পরিবর্তিত হতে থাকে।

মহার্ঘ ধাতুসমূহের মূল্যের পরিবর্তন দরের ক্ষেত্রে এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আমেরিকা আবিষ্কারের পর দরের ক্ষেত্রে যে বিপ্লব ঘটে গেল তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে সমৃদ্ধিপূর্ণ আকরিকের সন্ধান পাওয়া যেতে সোনার দর পড়ে গেল আর পণ্যের দর বৃদ্ধি পেতে লাগল।

অর্থ আদর্শগতভাবে মূল্যমান নির্ধারণের কাজ করে। তার মানে এই যে পণ্যের মূল্য নিরূপণের জন্য যে নগদ অর্থ থাকতেই হবে এমন নয়। অসংখ্যবার ক্রয়-বিক্রয় প্রক্রিয়ার

পুনরাবৃত্তি এবং অর্থের দ্বারা পণ্য-বিনিময়ের ফলে বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়েই মনে মনে পণ্যকে তার মূল্যের উপযোগী নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের (সোনার) সমপর্যায়ভুক্ত করে ফেলে।

'মূল্যের পরিমাপ' এবং 'দরের পরিমাণ' — এই দুটি ধারণাকে একাকার করে দেখলে চলবে না: এদের মধ্যে মৌলিক তফাৎ আছে। প্রথমত, মূল্যের পরিমাপ হিশেবে সোনা অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত, সে তাদের মূল্য প্রকাশ ও পরিমাপ করে, আর দরের পরিমাণ হিশেবে সোনা নিজের সঙ্গেই নিজে সম্পর্কিত, অর্থাৎ পণ্যের দরের সূচক হিশেবে নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনার জামিন হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত, মূল্যের পরিমাপ হিশেবে অর্থের কার্যপ্রণালী স্বতঃস্ফূর্ত, আর দরের পরিমাণ নির্ধারিত হয় রাষ্ট্রকর্তৃক আইনসঙ্গত পদ্ধতিতে।

অর্থের সাহায্যে পণ্যের যে বিনিময় হয়ে থাকে তাতে অর্থ কাজ করে **প্রচলনের মাধ্যমরূপে**। এই কাজ সম্পাদন করতে গেলে অর্থকে আদর্শ না হয়ে বাস্তব হতে হবে। প্রচলনের প্রক্রিয়ায় অর্থ সব সময় হাত বদল হতে থাকে — আজ হয়ত পণ্য-উৎপাদনকারী নিজের পণ্য বিক্রী করে তা হাতে পেল, কাল সে তা খরচ করবে অন্যের কাছ থেকে পণ্য খরিদ করে। প্রচলনের মাধ্যমরূপে অর্থের ভূমিকা কেবল পণ্য-বিনিময়ের ক্ষণিক মধ্যস্থ। তাই, অর্থ মূল্যের প্রতীক বা চিহ্নে — কাগজী মুদ্রায় বদল করা যায়। একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ যা তা হল এই যে যারা এই মূল্যের প্রতীক গ্রহণ করছে তাদের জানা দরকার যে তাদের কাছ থেকেও পণ্যের বিনিময়ে অন্যেরা এ অর্থ গ্রহণ করবে। এই কারণে কাগজী মুদ্রাকে নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের সর্বত্র অবশ্যই গ্রহণীয় হওয়া দরকার।

প্রচলনের জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তা স্থির করা যায় মুদ্রার ইউনিটের আবর্তন-সংখ্যা দিয়ে পণ্যের দরের মোট পরিমাণকে ভাগ করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোন দেশে সমস্ত পণ্যদ্রব্য বিক্রি ক'রে এক বছরে যে মোট পরিমাণ দর পাওয়া গেল তা ১০ হাজার কোটি মুদ্রার ইউনিটে দাঁড়ায় আর মুদ্রার প্রতিটি ইউনিট যদি বছরে গড়পড়তা ৫ বার আবর্তন করে থাকে, তা হলে প্রচলনের জন্য অর্থের প্রয়োজনীয় পরিমাণ হবে ২ হাজার কোটির সমান। আর মুদ্রার প্রতিটি একক ১০ বার আবর্তিত হলে প্রয়োজন হবে মাত্র ১ হাজার কোটি। এইভাবে, মুদ্রার আবর্তন যত দ্রুত হবে, প্রচলনের জন্য তার প্রয়োজনও তত কমতে থাকবে।

পত্র-পত্রিকায় পুঁজিবাদী দুনিয়াতে মুদ্রা-প্রচলনব্যবস্থার ভাঙ্গনসংক্রান্ত নানা পারিভাষিক শব্দ প্রায়ই চোখে পড়ে। তাই, সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিশেবে হলেও, এক্ষেত্রের সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঘটনাসমূহের পরিচয় লাভ করা আবশ্যক।

প্রচলনের জন্য যে পরিমাণ সোনার প্রয়োজন সেই অনুযায়ী কাগজী মুদ্রা যদি চালু করা যায় তা হলে তার ক্রয়ক্ষমতা স্বর্ণমুদ্রার ক্রয়ক্ষমতার সমান হবে। কিন্তু সাধারণত বুর্জোয়া রাষ্ট্র তার ব্যয়নির্বাহের উদ্দেশ্যে, বিশেষ করে যুদ্ধবিগ্রহের সময়, পণ্য-আবর্তনের চাহিদার কথা বিবেচনা না করে অতিরিক্ত পরিমাণ কাগজী মুদ্রা চালু করার পন্থা গ্রহণ করে। এই ধরনের মাত্রাতিরিক্ত কাগজী মুদ্রা চালু করার ফলে তাদের অবচয় ঘটে, **মুদ্রাস্ফীতি** দেখা দেয়। মুদ্রাস্ফীতি ভারী বোঝা হয়ে চাপে জনসাধারণের কাঁধে, সর্বোপরি শ্রমিক ও কর্মচারীদের উপর, কেননা দৈনন্দিন দ্রব্যসামগ্রীর দরের তুলনায় মজুরি মন্থর গতিতে বাড়ে। এতে খেত-খামারজীবী ও কৃষকদের মতো ক্ষুদ্র পণ্য-উৎপাদনকারীরাও দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এ ব্যবস্থায়

বুর্জোয়াদের গায়ে খুব কমই আঁচড় পড়ে, আর অপেক্ষাকৃত বড় পুঁজিপতিরা ত লাভবানই হয়ে থাকে।

মুদ্রাস্ফীতি যখন পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিপদ সূচনা করে, তখন বুর্জোয়া রাষ্ট্র মুদ্রাব্যবস্থা দৃঢ় করার জন্য ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। এই উদ্দেশ্যে নানা ধরনের মুদ্রাসংস্কার এবং সর্বোপরি **মুদ্রার মূল্যহ্রাস** — মুদ্রার ইউনিটের স্বর্ণপরিমাণ হ্রাস করা হয়।

অর্থ **সঞ্চয়ের উপকরণ** অথবা **সম্পদ** গড়ে তোলার উপায় সাধন করে। অর্থের এই কাজটির বৈশিষ্ট্য এই যে যেহেতু তা দিয়ে ইচ্ছেমতো যে-কোন জিনিস অর্জন করা যায়, সেই হেতু তা হয়ে দাঁড়ায় সামাজিক সম্পদের সার্বিক রূপায়ণ, তার সঞ্চয়ের উপকরণ। প্রচলনের বাইরে চলে গিয়ে তা সম্পদরূপে জমে থাকে। একমাত্র পুরোদামের (সোনার) মুদ্রা এবং সোনা, রুপো ও দামী পাথরের তৈরী সামগ্রীই সম্পদ হাত পারে।

অর্থ সব সময় নগদ নাও হতে পারে। পণ্যের কেনা-বেচা অনেক সময় ধারেও হতে পারে। এর কারণ বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদনসময়ের স্থিতিকালে প্রভেদ এবং পণ্যসমূহের উৎপাদন ও বাজারের মরসুমী চরিত্র। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শিল্পপুঁজিপতি বসন্তে ট্র্যাক্টর প্রস্তুত করে বাজারে ছাড়ল। কৃষি খামারজীবীর এমন ট্র্যাক্টর দরকার বটে, কিন্তু অর্থ তার হাতে আসবে একমাত্র শরৎকালে, ফসল ওঠার পর। সে ট্র্যাক্টর কেনে ধারে, অর্থাৎ অর্থের পরিশোধ স্থগিত রেখে। এক্ষেত্রে অর্থ হল **মূলশোধের উপায়**। পণ্য আদান-প্রদান ছাড়া অন্যান্য পরিশোধের ক্ষেত্রেও, — দৃষ্টান্তস্বরূপ, কর প্রদানের ক্ষেত্রে — অর্থ ঐ একই কাজ সম্পাদন করে।

আন্তর্দেশীয় অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অর্থের আবির্ভাব **তার বিশ্বগ্রাহ্য** রূপে। এই ভূমিকায় অর্থ জাতীয় সাজ খুলে ফেলে তার প্রাথমিক রূপে — স্বর্ণপিণ্ডরূপে প্রকাশ পায়। রাষ্ট্রসমূহের পরস্পরের মধ্যে হিসাবের ব্যাপারে সোনাকে পরিমাপ ধরা হয়।

জাতীয় মুদ্রাও বিশ্বগ্রাহ্য অর্থ হিশেবে ব্যবহার করা যেতে পারে যদি তা যে-কোন রাষ্ট্রের ব্যাঙ্কের চাহিদা অনুযায়ী স্বচ্ছন্দে নির্ধারিত গতিতে সোনায় পরিণত করা যায়, অর্থাৎ অনায়াস পরিবর্তনযোগ্য অথবা রূপান্তরযোগ্য মুদ্রা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত বিশ্বগ্রাহ্য মুদ্রার ভূমিকা পালন করে আসছিল মুখ্যত ইংলণ্ডের স্টার্লিং-পাউণ্ড, পরে মার্কিন ডলার এই ভূমিকা পেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ডলার কেবল সোনার মতোই ভালো বলে গণ্য হতে লাগল না, — মুদ্রার ধাতুর দরকে নিয়ন্ত্রণ করে তা, বলতে গেলে, উঠে গেল সোনারও উপরে। ১৯৩৪ সনে নির্ধারিত সোনার দর একই জায়গায় স্থির হয়ে রইল: ৩১·১ গ্রাম ট্রোই সোনা —৩৫ ডলার। কিন্তু বিশ্ব বাণিজ্যে ৩০ বছরেরও বেশি সময়ের মধ্যে ডলারে পণ্যের দর গড়পড়তা ২·৫ থেকে ৩ গুণ বৃদ্ধি পেল। ফলে কৃত্রিমভাবে সোনার যথার্থ মূল্যের হানি হল।

৬০-এর দশকের গোড়ায় যথেষ্ট পরিমাণ সোনা দিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সঙ্গতি রক্ষার সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করল। সমস্ত পুঁজিবাদী দেশে দেখা দিল মুদ্রাস্ফীতি। তবে, মুদ্রার অবচয়ের গতি বিভিন্ন ধরনের। এই কারণে পণ্যমূল্য ও মুদ্রার গতিপথের মধ্যে অসামঞ্জস্যের উদ্ভব হয়। উক্ত বিরোধসমূহের উপশম ঘটায় হয় অবচিত মুদ্রার মূল্য হ্রাস অথবা যে-সব মুদ্রার অবচয় অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে সম্পন্ন হচ্ছে, সেগুলির পুনর্মূল্যায়ন, অর্থাৎ ঊর্ধ্বগতিসাধন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুদ্রাস্ফীতি প্রবলতম আকার ধারণ করে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার ডলারের সোনায় পরিবর্তনযোগ্যতা উঠিয়ে দিতে বাধ্য হয় এবং ১৯৭১ সনের ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৩ সনের ফেব্রুয়ারির মধ্যে দু' দু'বার মুদ্রা হ্রাস ঘটায়, যাতে সোনার দর আউন্সপিছু

৪২·২ ডলার পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের মুদ্রার সঙ্গে সম্পর্কের বিচারে ডলারের গতিপথ সরকারীভাবে ১৭·১ শতাংশ নিম্ন করা হয়। এতে কিন্তু পরিস্থিতির স্থিরতা এলো না। পুঁজিবাদের মুদ্রাব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে গভীর সংকটে ভুগছে। এই সংকটের মূলে আছে অনেকগুলি কারণ — সর্বোপরি সাম্রাজ্যবাদের সামরিক হঠকারিতা ও অস্ত্রপ্রতিযোগিতা।

মূল্যসংক্রান্ত নিয়ম

উৎপাদন সংগঠন করে পুঁজিপতিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্নভাবে নিজ নিজ দায়িত্বে ও ঝুঁকিতে কাজ করে থাকে। এই কারণে একই ধরনের পণ্যদ্রব্যের উৎপাদনে কত সংখ্যক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নিযুক্ত থাকবে, দু'এক বছর বাদে কী পরিমাণ পণ্য উৎপন্ন হবে, কতখানি পণ্যদ্রব্য বাজারে ছাড়া হবে এবং লোকে কতটা কিনতে পারবে — আগে থাকতে এসব কেউই স্পষ্ট বলতে পারে না। এটা স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের সূচনা করে, এ থেকে জন্ম নেয় **উৎপাদনের নৈরাজ্য** — সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদী অর্থনীতির সংগঠনহীনতা ও পরিকল্পনার অভাবই এতে প্রকাশ পায়। নিজের শিল্পপ্রতিষ্ঠানে পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী পুঁজিপতিকে হতে হয় বাজারের দাস, যেখানে অর্থনীতির নিয়মগুলি তাদের স্বাভাবিক কাজ করে চলে।

উৎপাদনের নৈরাজ্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত আছে **প্রতিদ্বন্দ্বিতা** — উৎপাদন ও বিক্রয়ের আরও লাভজনক অবস্থার জন্য, আরও বেশি মুনাফা ওঠানোর জন্য পুঁজিপতিদের মধ্যে কঠোর সংগ্রাম। পুঁজিবাদী দুনিয়ায় কেউই সম্পদের মালিককে বাধ্য করতে পারে না তার

সঙ্গতিকে এমনভাবে কাজে লাগাতে, যাতে তা সমাজের পক্ষে বেশি লাভজনক হয়।

এমন ধরনের উৎপাদন কীভাবে বজায় থাকতে পারে, তার বিকাশই বা কী করে সম্ভব?

যে নিয়ম স্বতঃস্ফূর্তভাবে পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে তা হল **মূল্যসংক্রান্ত নিয়ম।**

মূল্যের নিয়ম অনুসারে সামাজিক দিক থেকে প্রয়োজনীয় যে পরিমাণ শ্রম পণ্যের উৎপাদনে ব্যয়িত হয়েছে সেই অনুযায়ী পণ্যের বিনিময় হয়ে থাকে। পণ্যের জন্য যে দর দেওয়া হচ্ছে তাকে অবশ্যই তার মূল্যের অনুরূপ হতে হবে। কিন্তু বাজারে দর নির্ধারিত হয় স্বভাবিক নিয়মে — চাহিদা ও সরবরাহের প্রভাবে। চাহিদার চেয়ে পণ্যের সরবরাহ যদি বেশি থাকে তা হলে দর মূল্যের নীচে নেমে যায়; এবং তার বিপরীত। চাহিদা যখন সরবরাহের অনুরূপ হয় তখন দর মূল্যের অনুরূপ হয়ে থাকে। দরের অস্থিরতার প্রভাবে পুঁজিপতিরা যে-সব শিল্পক্ষেত্রে পণ্যের দর তার মূল্যের নীচে, সে-সব ক্ষেত্র থেকে পুঁজি সরিয়ে এনে এমন সমস্ত শিল্পে খাটায়, যেখানে তা মূল্যের উপরে।

ধরা যাক, মোটরগাড়ির মূল্য ৪ হাজার ডলারের সমান, অথচ বাজারে সেই অনুযায়ী চাহিদা নেই: চাহিদা কী রকম হতে পারে তা ধরতে না পেরে পুঁজিপতিরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত মোটরগাড়ি তৈরি করে ফেলেছে। দরের অস্থিরতার স্বাভাবিক নিয়মের দ্বারা বাজারে তৎক্ষণাৎ এর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে মোটরগাড়ির দর তার মূল্যের নীচে পড়ে যাবে এবং তার দর ৪ হাজার ডলার না হয়ে মাত্র ৩ হাজার ডলারে দাঁড়াবে। মূল্যের নীচে দর নেমে যাওয়ায় মোটরগাড়িনির্মাণ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিকেরা উৎপাদন হ্রাস করতে বাধ্য হবে, আর বেশ কিছু পুঁজিপতি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এ'টে উঠতে না

পেরে তাদের পুঁজি ওখান থেকে সরিয়ে এনে এমন সব ক্ষেত্রে খাটাবে যেখানে দর মূল্যের উপরে। আগে যেখানে ২ লক্ষ ৫০ হাজার মোটরগাড়ি উৎপন্ন হত এখন সেখানে ধরা যাক উৎপন্ন হচ্ছে মাত্র ১ লক্ষ ৭০ হাজার। কিন্তু এবারেও দেখা গেল পুঁজিপতিরা আন্দাজ করতে পারে নি: আসলে ২ লক্ষ মোটরগাড়ির চাহিদা আছে। দর আবার উঠে গেল মূল্যের ঊর্ধ্বে, — উদাহরণস্বরূপ, ৪৫০০ ডলারে। তখন আবার শুরু হবে উৎপাদনের প্রসার এবং অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে নূতন নূতন পুঁজি ও শ্রমের স্রোত বইতে থাকবে; দর এবারে নড়ে উঠবে — তা মূল্যের নীচে এসে ঠেকবে। উৎপাদন নূতন করে হ্রাসপ্রাপ্ত হবে, দর মূল্যের ঊর্ধ্বে চড়বে ইত্যাদি।

মূল্যকে ঘিরে দরের এই স্বতঃস্ফূর্ত অস্থিরতাই পুঁজিবাদী পণ্য-উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের একমাত্র সম্ভাব্য উপায়। শিল্পের যে-কোন ক্ষেত্রে কম বেশি লাভজনক উৎপাদনের ফলে দরের যে অস্থিরতা দেখা দেয় তা উৎপাদনের পরিমাণগত প্রসার ও সঙ্কোচন নির্ধারণ করে। এই হল **মূল্যসংক্রান্ত নিয়মের** মর্মকথা; **এই নিয়ম পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পণ্যের বিনিময় এবং উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে উৎপাদনের উপায় ও শ্রমের বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।**

বাজারে দর, চাহিদা ও সরবরাহের অস্থিরতা উৎপাদনকারীদের মধ্যে বৈষম্যের সূত্রপাত করে, এক শ্রেণীকে নিঃস্ব করে দেয় ও অপর শ্রেণীকে ঐশ্বর্যবান করে — এটাই মূল্যসংক্রান্ত নিয়মের ক্রিয়াকলাপের অবশ্যম্ভাবী ফল। পুঁজিপতি যদি পুঁজিবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত না হতে চায়, তার যদি নিঃস্ব হওয়ার ইচ্ছে না থাকে, তা হলে তাকে পণ্যের দাম শস্তা করে দিতে হবে, নিজের শিল্পপ্রতিষ্ঠানে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং উৎপাদনের প্রকৌশলের উৎকর্ষ সাধন করতে হবে।

ধরা যাক, কোন পণ্য মূল্য অনুযায়ী বিকোয়, — প্রতিটি ২ ডলারে। এর অর্থ হল এই যে উক্ত পণ্যের চাহিদা সরবরাহের সমান, কেননা একমাত্র এই পরিস্থিতিতেই দর মূল্যের সমান হয়ে থাকে। অগ্রণী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতে যখন শ্রমের উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেল এবং তার ফলে উৎপাদনও দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়াল, তখন ঐ পণ্যের সরবরাহ চাহিদার উপরে উঠে যাওয়ায় তার দর অবধারিতভাবে মূল্যের নীচে পড়ে যাবে, — হয়ত প্রতিটির জন্য ১·৫ ডলার পর্যন্ত।

অগ্রণী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিকের কাছে এটা ভয়ঙ্কর কিছু নয়, কেননা এমন পরিস্থিতিতেও সে পণ্যের বিশেষ মূল্যের চেয়ে চড়া দরে তা বিক্রী করতে থাকবে। এমনভাবে দর নেমে যাওয়ায় মাঝারি কারবারের মালিকেরাই অত্যন্ত বিপদে পড়ে যাবে। তাদের আয় খুবই কমে যায়, আর তার ফলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সামর্থ্য না থাকায় তাদের সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই, পুঁজিপতি হিশেবে তারা যদি নিজেদের টিকিয়ে রাখতে চায় তা হলে তাদের নিজ নিজ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতে উৎপাদনের নূতন নূতন পদ্ধতির প্রচলন ও নূতন নূতন যন্ত্রপাতি স্থাপন করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সংগ্রাম কিছু পরিমাণে উৎপাদনের নূতন প্রকৌশল প্রচলনে ও আধুনিকীকরণে উৎসাহের সঞ্চার করে। আবার সেই সঙ্গে উৎপাদনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও নৈরাজ্য উৎপাদনী শক্তির বিনাশ ডেকে আনে, শ্রমজীবীদের অশেষ দুর্দশার সূচনা করে। এটা কীভাবে ঘটে, তা বুঝতে গেলে পুঁজির দ্বারা শ্রমশোষণের কৌশলের পরিচয় নিতে হয়।

১২ ॥ পুঁজির দ্বারা শ্রমশোষণ

উদ্বৃত্ত মূল্য

পুঁজিবাদী উৎপাদন একটি বিশেষ উদ্দেশ্যের বশবর্তী: পুঁজির সমৃদ্ধিসাধন। কীভাবে এবং কার দ্বারা এই সমৃদ্ধি সাধিত হয়?

বাজারে পণ্য বিক্রয় ক'রে মুনাফা অর্জনের আগে তা উৎপন্ন করা দরকার, আর মূল্য স্থাপন করতে পারে শ্রম, — একমাত্র শ্রমই। পুঁজিপতি দাস-মালিক নয়, সামন্তও নয়, তার কোন ক্রীতদাস ও ভূমিদাস নেই, যাদের সে নিজস্ব সম্পত্তির মতো যদৃচ্ছা পরিচালনা করতে পারে। তবে তার আছে উৎপাদনের উপায়, আর সমাজে আছে প্রলেতারীয় শ্রেণী, — যে-শ্রেণী এসব উপায় থেকে বঞ্চিত। শ্রমিক পুঁজিপতির ব্যক্তিগত অধীনতা থেকে মুক্ত বটে, তবে বাঁচার জন্য পুঁজিপতির কাছেই তাকে ভাড়া খাটতে হয়, নিজের **শ্রমশক্তিকে** বিক্রী করতে হয়। শ্রমশক্তি ক্রয়ের দ্বারা পুঁজিপতি এমন এক পণ্য অর্জন করে যা মূল্য গড়ে তুলতে সমর্থ।

পণ্য হিশেবে শ্রমশক্তি বিক্রী হয়ে থাকে নির্দিষ্ট মূল্য অনুযায়ী। মানুষ পরিশ্রম করতে একমাত্র তখনই সমর্থ, যখন তার অত্যাবশ্যক চাহিদা মেটে। একজন শ্রমিকের দিনে কিছু পরিমাণ রুটি, মাংস, মাখন ও চিনির দরকার, তার জুতো-জামা কিছুটা ক্ষয় হয়, ঘর গরম রাখার জন্য কিছু পরিমাণ কাঠ ও কয়লা তার খরচ হয়: তাকে পরিবারের ভরণপোষণ করতে হয়। ফলে শ্রমশক্তির মূল্য দাঁড়াচ্ছে শ্রমিকের নিজের এবং তার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় জীবনধারণের উপকরণের সমান।

বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন সময়ে শ্রমশক্তির মূল্য এক রকম হয় না। তা নির্ভর করে প্রাকৃতিক অবস্থা এবং ঐতিহাসিকভাবে সৃষ্ট জনজীবনের মানের উপর। অর্থনৈতিক কারণ — উৎপাদনের বিকাশ, প্রকৌশলগত প্রগতি ইত্যাদিও এর উপর প্রভাব বিস্তার করে। এক দিক থেকে শ্রমের উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধিতে শ্রমিকদের জীবনধারণের উপকরণের মূল্য হ্রাস পায়, এবং তার ফলে শ্রমশক্তির মূল্য নেমে

আসে। অন্য দিক থেকে, শহরের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবহণের ব্যয় বাড়তে থাকে। গ্যাস, টেলিফোন ইত্যাদির মতো জীবনযাত্রার নূতন নূতন উপকরণের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি পায়। সংস্কৃতিক্ষেত্রে নূতন নূতন চাহিদা দেখা দেয়। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে আধুনিক শ্রমিক সংবাদপত্র, সিনেমা, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি ছাড়া চলতে পারে না। আর যেহেতু শ্রমিক ও তার পরিবারের চাহিদা বৃদ্ধি পায় সেহেতু শ্রমশক্তির মূল্যও অধিক হয়।

কিন্তু সবচেয়ে প্রধান যে জিনিসটি শ্রমশক্তির মূল্যের পরিমাণের উপর প্রভাব বিস্তার করে তা হল নিজের অবস্থার উন্নতির জন্য বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতদের শ্রেণী-সংগ্রাম।

শ্রমশক্তি ক্রয় ক'রে পুঁজিপতি উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে তা যোগ করে। কারখানা গড়ে উঠল, কাঁচা মাল আনা হল, শ্রমিক মেশিনে কাজ শুরু করে দিল — চাকা ঘুরতে লাগল।

শ্রমশক্তি ও উৎপাদনের উপায়ের ভূমিকা ভিন্ন ভিন্ন। শ্রমশক্তি নূতন মূল্য সৃষ্টি করে, কিন্তু উৎপাদনের উপায় কোন রকম মূল্য সৃষ্টি করতে পারে না। শ্রমশক্তির সাহায্যে উৎপাদনের উপায়ের মূল্য বজায় থাকে এবং ক্রমে ক্রমে উৎপাদনের উপায়ের ক্ষয়ক্ষতি হয়ে পুনরুৎপাদিত পণ্যের উপর গিয়ে পড়ে। কোন যন্ত্র যদি দশ বছর কাজ করার ক্ষমতা রাখে তবে বলতে হয় প্রতি বছর তা তার মূল্যের এক-দশমাংশ হারায়, আর এই অংশটি গিয়ে পড়ে পুনরুৎপাদিত পণ্যের মূল্যের উপর। কাঁচা মাল, — উদাহরণস্বরূপ তুলো, প্রস্তুত অবস্থায় সম্পূর্ণভাবে নূতন উৎপন্ন দ্রব্য — সূতী কাপড়ের অন্তর্ভুক্ত এবং তার মূল্যও সম্পূর্ণরূপে উক্ত কাপড়ের মূল্যে গিয়ে বর্তাবে।

যদি ভেতরের প্যাড, বোতাম ইত্যাদি সমেত ওভারকোটের কাপড়ের মূল্য হয় ৫০ ডলার আর দর্জি তার কাজের জন্য ৩০ ডলার নেয়, তা হলে তৈরী ওভারকোটের মূল্য হবে ৮০ ডলার। দর্জির শ্রমের দ্বারা পুরনো মূল্য ৫০ ডলার বজায় থাকছে এবং ওভারকোটের ওপর

িগয়ে পড়ছে। শ্রমের বর্তমান প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে দর্জি যে নূতন মূল্য তৈরি করেছে তা হবে ৩০ ডলার।

পুঁজিবাদী উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় শ্রমিক যে নূতন মূল্য গড়ে তোলে তা পরিমাণের দিক থেকে তার শ্রমশক্তির মূল্যকে ছাড়িয়ে যায়।

ধরা যাক, এক ঘণ্টার পরিশ্রমে শ্রমিক ২ ডলারের সমান মূল্য গড়ে তোলে, কিন্তু শ্রমশক্তির দৈনিক মূল্য ১০ ডলারের সমান।

সেক্ষেত্রে মূল্য পুষিয়ে নেওয়ার জন্য শ্রমিককে ৫ ঘণ্টা পরিশ্রম করতে হবে। শ্রমিক কিন্তু অন্য কোন শ্রমের পরিমাণ বিক্রী করে না, — বিক্রী করে নিজের শ্রমশক্তি, আর তার খবরদারি করে থাকে সেই মালিক, যে তা ক্রয় করেছে। সেই কারণে শ্রমিককে গোটা দিন পরিশ্রম করতে হয়। যদি দিনের স্থায়িত্ব হয় ৮ ঘণ্টা তবে সেই সময়ের মধ্যে শ্রমিক ১৬ ডলারের সমান মূল্য গড়ে তোলে। এইভাবে, উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় শ্রমিক তার পরিশ্রমের দ্বারা নিজের শ্রমশক্তির মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্য সৃষ্টি করে।

বিনামূল্যে এই যে অন্তরটি পুঁজিপতি হস্তগত করল তা হল তার সমৃদ্ধির উৎস — **উদ্বৃত্ত মূল্য**।

এইভাবে, **পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের মূল নিহিত আছে উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎপাদনে এবং পুঁজিপতিদের দ্বারা তা আত্মসাৎ করার মধ্যে**। ভাড়াটে শ্রমের প্রথা ভাড়াটে দাসত্বপ্রথা ছাড়া আর কিছুই নয়।

দেখা যাচ্ছে শ্রমদিন দুটি অংশে বিভক্ত: প্রথম অংশে (শ্রমের প্রয়োজনীয় সময়) শ্রমিক যে মূল্য সৃষ্টি করে তা তার শ্রমশক্তির মূল্যের সমান; দ্বিতীয় অংশে (শ্রমের উদ্বৃত্ত সময়) সে সৃষ্টি করে পুঁজিপতির জন্য উদ্বৃত্ত মূল্য। এই কারণে শ্রমিক তার নিজের জন্য যত বেশি সময় পরিশ্রম করে, পুঁজিপতির জন্য সময় তত কম পড়ে এবং ঠিক তার

বিপরীত। এটা সম্পূর্ণ বোঝা যায় যে পুঁজিপতির সর্বদাই প্রয়াস থাকে কী করে উদ্বৃত্ত সময়টা আরও বাড়ানো যায়, শ্রমিকদের আরও শোষণ করা যায় এবং তাদের শ্রম থেকে আরও বেশি পরিমাণ ফায়দা ওঠানো যায়।

উদ্বৃত্ত মূল্যপ্রাপ্তি হল পুঁজিপতির ক্রিয়াকলাপের মূল প্রেরণা। অধিকাংশক্ষেত্রেই উৎপাদন কিসের — জামা, জুতো, মাংস, রুটি, চিনির মতো মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তুর অথবা মানুষের মৃত্যু ও বিনাশের হাতিয়ারের — সেটা তার কাছে বড় কথা নয়। তবে ব্যবহারিক মূল্য উৎপাদনে সে বাধ্য, কেননা তা উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদনের পক্ষে প্রয়োজনীয় শর্ত। কার্ল মার্কসের কথায়, ইস্পাতের উৎপাদন — উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদনের উপলক্ষমাত্র।

ভাড়াটে শ্রমিকদের শোষণের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎপাদন হল **পুঁজিবাদের মূল অর্থনৈতিক নিয়ম**। দেখাই যাচ্ছে এই নিয়ম যেমন পুঁজিবাদী উৎপাদনের উদ্দেশ্য উদ্‌ঘাটন করছে তেমনি প্রকাশ করছে তার সাফল্যের উপায়।

উদ্বৃত্ত মূল্য গড়ে ওঠে একমাত্র বৈষয়িক উৎপাদনের ক্ষেত্রে এবং আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে তার সম্পূর্ণটাই বুঝি শিল্পপুঁজিপতিদের হস্তগত হয়। আসলে নিরন্তর সংগ্রাম ও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন পুঁজিপতিগোষ্ঠীর মধ্যে উদ্বৃত্ত মূল্যের বণ্টন হয়ে থাকে। গোড়ায় উদ্বৃত্ত মূল্যের সম্পূর্ণটাই শিল্পপতিদের হেফাজতে থাকে, আর তাদের কাছ থেকে কারবারী, ব্যাঙ্কার প্রমুখ নিজ নিজ অংশ পায়। পণ্য উৎপন্ন করলেই ত আর চলবে না, তা বিক্রীও করতে হবে। শিল্পপতি সচরাচর পাইকারিভাবে তার পণ্য কারবারী-পুঁজিপতির কাছে বিক্রী করে, সে আবার খরিদ্দারের কাছে পণ্য নিয়ে যায়। শিল্পপতি নিজে পণ্য বিক্রয়ের কাজে নামলে তাকে কারবারী প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, কর্মচারী নিয়োগ ইত্যাদির জন্য অতিরিক্ত অর্থ ঢালতে হয়। এই কারণে শিল্পপতি পণ্য-বিক্রয়ের

কাজটা কারবারী-পুঁজিপতির হাতে অর্পণ করে এবং তার জন্য উদ্বৃত্ত মূল্যের একটা অংশ তাকে সে ছেড়ে দিতে বাধ্য।

সুতরাং, পুঁজিবাদী সমাজে বাণিজ্যিক মুনাফা, লগ্নি, ব্যাঙ্কের লাভ ইত্যাদি সমস্ত রকমের অনুপার্জিত আয়ই উদ্বৃত্ত মূল্যের কোন না কোন রূপ, আর পুঁজিবাদী সমাজে সব অনুপার্জিত আয়েরই একটিমাত্র উৎস — বৈষয়িক উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকের উদ্বৃত্ত শ্রম। অর্থাৎ, যে পুঁজিপতির কাছে শ্রমিক কাজ করছে কেবল সেই নয়, — সামগ্রিকভাবে গোটা পুঁজিপতি শ্রেণী তাকে শোষণ করছে।

পুঁজি

পুঁজিবাদী সমাজে উৎপাদনের উপায় অর্থের বিনিময়ে কেনা-বেচা হয়ে থাকে, অর্থাৎ তা মূল্যসম্পন্ন পণ্যরূপে গণ্য হয়। উৎপাদনপ্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয় পুঁজিপতির দ্বারা উৎপাদনের উপায় ও শ্রমশক্তি খরিদ করা থেকে। এদের সংযোগের ফলে পণ্যের উৎপাদন। অতঃপর পুঁজিপতি তার প্রতিষ্ঠানে তৈরী জিনিস উৎপাদনে যে পরিমাণ অর্থ ঢেলেছে তার চেয়ে বেশি দামে তা বিক্রী করে। **ভাড়াটে শ্রম শোষণের পথে যে মূল্য উদ্বৃত্ত মূল্য নিয়ে আসে তা-ই পুঁজি।**

বুর্জোয়া মতাদর্শবাদীরা জোর দিয়ে বলেন যে পুঁজির প্রথম আবির্ভাব হয় তার মালিকদের কর্মনিষ্ঠতা ও অন্যান্য সদ্‌গুণের ফলে: মিতব্যয়ীরাই হয়ে দাঁড়াল পুঁজিপতি, আর নিষ্কর্মা ও অমিতব্যয়ীরা পরিণত হল ভাড়াটে শ্রমিকে। সাদাসিধে মানুষদের উদ্দেশ্যে এই ধরনের উদ্ভট কল্পনার মুখোশ খুলে দিয়েছেন কার্ল মার্কস। লুণ্ঠন, বলপ্রয়োগ, কৃষকদের কাছ থেকে জমির স্বত্বাপহরণ এবং উপনিবেশের উপর শোষণের ফলেই পুঁজির উদ্ভব। আর যদি মেনেও নেওয়া যায় যে প্রথম পুঁজির জন্ম ছিল শ্রমে,

তাতেও তার মূলরূপের কোন হেরফের হয় না, কেননা এটা ত ঠিক যে বহু বছর কেটে যাবার পর গোটা পুঁজি পরিণত হয়েছে উদ্বৃত্ত মূল্যে, অর্থাৎ শোষণের ফলে। পুঁজিপতিরা ত উদ্বৃত্ত মূল্য থেকেই তাদের সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করে থাকে। যারা উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করে, সেই ভাড়াটে শ্রমিকদের উপর শোষণ যদি না থাকত, তা হলে দেখতে দেখতে পুঁজিপতিদের প্রাথমিক পুঁজি নিঃশেষ হয়ে যেত, তাদের আর কিছুই থাকত না।

ধরা যাক, কোন পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানে যে পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ করা হয়েছে তা ১ লক্ষ ডলারের সমান, অন্য দিকে ভাড়াটে শ্রমিকেরা প্রতি বছর ২০ হাজার ডলার উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপন্ন করে। আরও ভাবা যাক, পুঁজিপতি গোটা উদ্বৃত্ত মূল্যই তার ব্যক্তিগত ব্যবহারে খরচ করে। সেক্ষেত্রে পাঁচ বছরে সে উদ্বৃত্ত মূল্যের যে পরিমাণ খরচ করে তা তার প্রাথমিক পুঁজির সমান পরিমাণ। সুতরাং, ভাড়াটে শ্রমিকের উপর শোষণ না চালালে পাঁচ বছর বাদে পুঁজিপতির অর্থের কিছুই অবশিষ্ট থাকত না: মালিক শ্রমিকদের কাছ থেকে উদ্বৃত্ত মূল্য নিংড়ে নিয়ে তার পুঁজি অটুট রাখছে।

কার্যত মালিক সমস্ত উদ্বৃত্ত মূল্যটাই খরচ করে ফেলে না। মুনাফার লালসা তাকে উৎপাদন সম্প্রসারণে উদ্বুদ্ধ করে এবং এই উদ্দেশ্যে সে তার লাভের কিছু অংশ ব্যয় করে। আর উৎপাদন সম্প্রসারণ ও শোষিত শ্রমিকের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে পুঁজিপতির উদ্বৃত্ত মূল্যের যোগান বৃদ্ধি পায়। এক কথায়, মন্ত্র পড়তেই খাবার-আনা এহেন টেবিল-ক্লথের কথা রূপকথায়ও শোনা যায় না: মালিকের ভোগবিলাসের পরিমাণ বাড়ছে, আর তার ঐশ্বর্যও ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।

এ থেকে দুটো সিদ্ধান্তে আসা যায়। প্রথমত, গোটা পুঁজি এবং সব রকম পুঁজিই হল শোষণের ফল। দ্বিতীয়ত, অর্থের পরিমাণ, — তা সে যত বেশিই হোক না কেন, অথবা

মোট উৎপাদনের উপায় — কলকারখানা, কাঁচা মাল, জ্বালানি, যন্ত্রপাতি মানেই কিন্তু পুঁজি নয়। এগুলি পুঁজি হতে পারে কেবল নির্দিষ্ট কয়েকটি শর্তে: যখন তাতে থাকে উৎপাদনের উপায়ের উপর ব্যক্তিগত মালিক শ্রেণী এবং পণ্যের হিশেবে যারা নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রয় করে সেই ভাড়াটে শ্রমিক শ্রেণী। **অর্থাৎ, পুঁজি হল পুঁজিপতি ও শ্রমিকের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের একটি রূপ, আর তার মূলকথা — শ্রমশোষণ।**

পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের উপায় সামাজিক মালিকানায় রূপান্তরিত হয়, শ্রমশক্তি তখন আর পণ্য হিশেবে থাকে না এবং ঐতিহাসিক পর্যায়রূপে পুঁজির অবসান ঘটে।

পুঁজির সঞ্চয় ও প্রলেতারিয়েতের অবস্থার অবনতি

পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের উৎস হল উদ্বৃত্ত মূল্য। এর একটি অংশে পুঁজিপতি তার ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটায়, আর অপর অংশ সে উৎপাদন সম্প্রসারণের কাজে লাগায়: এটাই আবার পুঁজিতে রূপান্তরিত হয় অথবা পুঁজীকৃত হয়। এই প্রক্রিয়ার নাম — **পুঁজির সঞ্চয়।**

পুঁজির সঞ্চয়ের ফলে পুঁজিপতির পক্ষে উৎপাদনের সম্প্রসারণ, আরও অধিক সংখ্যক শ্রমিকের উপর শোষণ এবং অধিকতর পরিমাণ উদ্বৃত্ত মূল্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখা যায়। তখন যেন সমাজের এক মেরুতে কেন্দ্রীভূত হয় বিপুল সম্পদ, বেড়ে চলে শোষক শ্রেণীর ভোগবিলাস ও পরজীবিতা, আর অপর মেরুতে প্রলেতারিয়েতের উপর শোষণের মাত্রা

চড়ে; যারা নিজেদের শ্রমে সমস্ত সম্পদ সৃষ্টি করে এবং যারা সেই সম্পদ হস্তগত করে — তাদের মধ্যে ব্যবধান বাড়তে থাকে; পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের এমনই নিয়ম।

পুঁজিবাদের সূচনাপর্বে হাতে-খড়ি পাওয়া মালিক যে কেবল প্রলেতারিয়েতের কাছ থেকে যতখানি পারত ঝেড়েপুঁছে নিত তা-ই নয়, — পুঁজি বাড়ানোর উদ্দেশ্যে সে প্রায়ই ছোটখাটো খরচ বাঁচাত। এই কারণে সাহিত্যে বিশাল সম্পত্তি ফুঁকে-দেওয়া বেহিসাবী অভিজাত চরিত্রের পাশাপাশি ডম্বি, নুসিন্‌গেন ও হবস্যাকের মতো হিসাবী ও কৃপণ শিল্পপতি, ব্যাঙ্কার ও মহাজনদের দেখতে পাওয়া যায়। সেকালের পুঁজিপতিরা প্রায়ই কারখানায় দিন ও রাত কাটাত, তারা নিজেদের শ্রমিকদের নামে চিনত, অফিসের খাতাপত্র নিজেরাই রাখত।

পুঁজির সঞ্চয়ের ফলে অপেক্ষাকৃত সফল যে-সব ব্যবসায়ী বিপুল সম্পত্তি জমিয়ে ফেলল তারা আর খাতা-কলমের কাজের ঝঞ্ঝাট নিজের উপর রাখল না। ডম্বি ও হবস্যাকের বংশধররা কোটি কোটি ফ্রাঙ্ক, ডলার অথবা স্টার্লিং-পাউণ্ডের অধিকারী, — তাই এখন আর তাদের খরচা বাঁচানোর কোন প্রশ্ন আসে না; তারা গিল্‌টি করা সোনার পাতে মোড়া সুইমিং পুলসমেত প্রাসাদ তৈরি করে, ইংলণ্ডে কেল্লা কিনে আমেরিকায় চালান করে নিয়ে আসে, আদরের কুকুরের জন্য বল নাচের আসর দেয়, এমন কি চতুষ্পদ প্রাণীকে উত্তরাধিকার দিয়ে যায়।

পুঁজিবাদ কেবল যে কিছুসংখ্যক পরজীবীকে অপরের শ্রম শোষণ করে বাঁচার এবং ভোগবিলাসের পথ পরিষ্কার করে দেয় তা-ই নয়, এতে প্রলেতারিয়েতের এক অংশ বেকার ও নিঃস্ব হয়ে পড়ে, তারা জীবনধারণের উপকরণ থেকে বঞ্চিত হয়।

বেকারত্ব — পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নিত্য সঙ্গী, পুঁজিবাদ বিকাশের একেবারে সূচনাপর্বেই তার পরিচয় পাওয়া গেছে। টেকনিক্যাল উন্নতি এবং আরও উৎপাদনশীল যন্ত্রপাতি প্রয়োগের ফলে শ্রমশক্তির চাহিদা কমে গেল।

প্রথম প্রথম যদিও বা বেকারত্বের রূপটি ছিল সাময়িক, -- অল্পবিস্তর দ্রুতই তা কেটে গেল, কিন্তু পরবর্তীকালে তা হয়ে দাঁড়াল স্থায়ী: সমাজে দেখা দিল বিপুল সংখ্যক মানুষ, যারা কর্মের অধিকার থেকে বঞ্চিত, — শ্রমের তথাকথিত রিজার্ভ ফোর্স। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৭১—১৯৭২ সনের মধ্যে পৃথক পৃথক মাসের হিসাব অনুযায়ী বেকারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৫ লক্ষ। বেকারত্বের কারণ কী? জনসাধারণের এক অংশ যে বেঁচে থাকার উপযোগী রুটির সংস্থান থেকে বঞ্চিত তার জন্য কি নূতন যন্ত্রপাতিকে দায়ী করতে হয়? ইতিহাস থেকে আমরা ভালোভাবে জানি যে যন্ত্রের বিরুদ্ধে আক্রোশ প্রকাশ করার সময় লুড্ডাইটদের চিন্তাটাও এই রকম ছিল। বলাই বাহুল্য, যন্ত্রপাতি এখানে কোন ব্যাপারই নয়। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে উৎপাদনক্ষেত্রে ব্যাপক যন্ত্রপাতির প্রচলন সত্ত্বেও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে কোন বেকারত্ব নেই এবং থাকা সম্ভবও নয়।

বেকারত্বের কারণটি নিহিত রয়েছে পুঁজিবাদী অর্থনীতিব্যবস্থার মধ্যে। যন্ত্রবিজ্ঞানে অগ্রগতি হওয়ায় অপেক্ষাকৃত স্বল্প শ্রমের ব্যয়ে অধিকতর দ্রব্যের উৎপাদন সম্ভব হয়, শ্রমদিনের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং মজুরি বৃদ্ধি পায়। তবে, পুঁজিপতি শ্রমিকদের জন্য নূতন যন্ত্রপাতির প্রচলন করে না, — সে তা করে নিজের সম্পদবৃদ্ধির জন্য। এই কারণে তার আচরণটা হয় একেবারে বিপরীত ধরনের: সে শ্রমিকদের এক অংশ ছাঁটাই করে, আর বাকিদের আরও প্রখরভাবে কাজ করতে বাধ্য করে। কেন সে এমন করতে পারে? কারণ এই যে বেকারত্ব যত বাড়ে কর্মীরা তত বেশি তাদের কাজের জায়গা আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়: জীবিকা

হারানোর আশঙ্কা বেত্রতাড়নার চেয়েও বেশি। এইভাবে, পুঁজিপতিরা বেকারত্বের সুযোগে শ্রমিক শ্রেণীর কর্মরত অংশ দাবিয়ে রাখে।

এ সম্পর্কে খোলাখুলি লিখেছে 'ওয়াল-স্ট্রীট জার্নাল' সংবাদপত্র: 'রাজমিস্ত্রি যদি গেটের সামনে এমন দুজন বেকারকে দেখে যারা তার স্থান দখলের জন্য লোলুপ, তবে সে আরও বেশি ইঁট বসাতে থাকবে এবং তার জন্য সে কোন রকম অতিরিক্ত বা বর্ধিত মজুরি দাবি করবে না।'

আর ঐ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই কাজ হারানোর অর্থ যে কী, তা বোঝা যাবে কোন এক মার্কিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত ডেভিড হিউমের পত্র থেকে: 'আমি বৃত্তিতে ইঞ্জিনিয়র। ছ'বছর ফিলাডেল্ফিয়া অঞ্চলের ধাতু-উৎপাদন কারখানায় কাজ করেছি। গত বছরের ৩০ শে নভেম্বর আমি এই মর্মে নোটিশ পেলাম যে ৩০ শে ডিসেম্বর থেকে আমাকে ছাঁটাই করা হবে। আমি আমার খারাপ স্বাস্থ্যের কথা এবং স্ত্রী যে অন্তঃসত্ত্বা সে কথা বলে কাজে বহাল রাখার জন্য অনুনয়-বিনয় করলাম। কোম্পানি উদাসীনভাবে আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করল। আমার এবং আমার স্ত্রীর ওপর যে বোঝা নেমে এলো তাতে আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমি হাসপাতালে ভর্তি হলাম, কিন্তু এক সপ্তাহ বাদে বেরিয়ে আসতে হল, কেননা উদ্বেগে আমার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ল। শিশু অকালে ভূমিষ্ঠ হল, বারো ঘণ্টা বাদে মারা গেল। আমি আবার হাসপাতালে ভর্তি হলাম। কিন্তু তাতে ত খরচ দিতে হয়। ডাক্তারের খরচ, হাসপাতালে বেড, প্রসবালয়ে জায়গা ও বাচ্চার কবরের জন্যও খরচ যোগাতে হয়। শিগ্গিরই আমরা আমাদের ঘর, আমাদের সব জিনিসপত্র হারাতে চলেছি। আমাদের কোথাও যাবার ঠাঁই নেই। আমাদের বাঁচার ইচ্ছে নেই।'

আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞান — মানববুদ্ধির অপূর্ব সৃষ্টি, তা মানুষের শ্রমভার লাঘব করে, তার জীবনে আরও স্বাচ্ছন্দ্য আনে। অথচ, তার পুঁজিবাদী ব্যবহার প্রলেতারিয়েতের জীবনযাত্রার অবনতি ঘটায়। কেবল যে বেকাররাই ভুক্তভোগী

ো নয়, — কেননা শ্রমের প্রখরতাবৃদ্ধির অর্থ অকালে কর্মশক্তি হারানো ছাড়া আর কিছুই নয়। যে-সব মজুরের পুঁজিবাদী উৎপাদনে প্রচলিত তথাকথিত শ্রমের স্পীড-আপ ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাদের অনেককেই ৪০—৪৫ বছর বয়সে পঙ্গু হয়ে পড়তে দেখা যায়।

প্রলেতারিয়েতের অবস্থার অবনতি এক সরল রেখায় অবিরাম ঘটে না, নির্দিষ্ট পরিস্থিতি এবং কোন দেশের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে তা তীব্র হতে পারে আবার মন্দও হতে পারে। শ্রমজীবীদের জীবনের অধিকারের উপর পুঁজিপতিদের আক্রমণ শ্রমিক শ্রেণীর কাছ থেকে দৃঢ় প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়; ধর্মঘট ইত্যাদি ধরনের সুদৃঢ় বিক্ষোভ প্রকাশের মধ্য দিয়ে প্রলেতারিয়েত মজুরির কিছুটা বৃদ্ধি, শ্রমদিনের পরিমাণ হ্রাস জাতীয় কিছু কিছু অধিকার আদায় করে নেয়। কিন্তু এতেও পুঁজিবাদী দুনিয়ায় যে প্রলেতারিয়েতের উপর শোষণ সামগ্রিকভাবে বেড়েই চলেছে সে সত্যের কোন বদল হচ্ছে না।

বিশষ করে শ্রমজীবীদের সবচেয়ে বড় বিপদ হল **অর্থনৈতিক সংকট** — উৎপাদনের বিপর্যয়কর অবনতি। পুঁজিপতিরা সর্বদাই দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা করে; এতে তারা উদ্বুদ্ধ হয় কেবল মুনাফার লোভে নয়, — প্রতিদ্বন্দ্বিতার খাতিরেও বটে। অথচ, জনগণের আয় বাড়ে না অথবা বাড়লেও অত্যন্ত ধীর গতিতে। অন্যভাবে বলতে গেলে পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের চাহিদা তার উৎপাদন থেকে ক্রমাগত পিছিয়ে পড়তে থাকে। সময় সময় এই পশ্চাৎপদতার মাত্রা বেড়ে ওঠে; তখন এত বিপুল পরিমাণ উৎপন্ন দ্রব্য জমে যায় যে মাঝারি ধরনের পুঁজিপতি ও খামারের মালিকরা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে, হাজার হাজার কলকারখানা বন্ধ হয়ে

যায়, বেকারত্ব আকস্মিকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং মজুরি কমে যায়।

আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে সংকটের কারণ বুঝি বা অতি উৎপাদন। আসলে পণ্য যে ক্রেতা পায় না তার কারণ এই নয় যে সেগুলি অনাবশ্যক, — কারণ কেনার সঙ্গতির অভাব: উপযোগের সুযোগ নির্ধারণ করে উদরের চাহিদা নয়, — মানিব্যাগের অন্তর্বস্তু। ফলে প্রাচুর্যের মধ্যে দুর্ভিক্ষের মতো অস্বাভাবিক ঘটনা দেখা যায়। দোকান ও গুদামগুলো খাদ্যদ্রব্যে ঠাসা, পণ্যদ্রব্য উপচে পড়ছে, কিন্তু পুঁজিপতিদের পক্ষে নামমাত্র মূল্যে যাওয়ার চেয়ে পচাও লাভের। যে-কোনভাবেই হোক না কেন তাদের চেষ্টা হল দরের অবনতি রোধ করা, যাতে পরে তাদের ক্ষতিটা পুষিয়ে যায়।

১৯৩৪ সনে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে ২৪ লক্ষ মানুষ অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। ওদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিনষ্ট করা হয়েছে ১০ লক্ষ ওয়াগনেরও বেশি শস্য (যা ১০ কোটি মানুষের এক বছরের অন্নসংস্থানের পক্ষে যথেষ্ট), ২ লক্ষ ৬৭ হাজার ওয়াগন কফি, ২ লক্ষ ৫৮ হাজার টন চিনি, ২৬ হাজার টন চাল, ২৫ হাজার টন মাংস এবং অন্যান্য বহু খাদ্যদ্রব্য।

যুদ্ধোত্তর পর্বে, ১৯৭৪-৭৫ সনে পুঁজিবাদ বিশেষভাবে গুরুতর সংকটে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে ১৯৭৪ সনের তুলনায় ১৯৭৫ সনে শিল্পোৎপাদন ৮ শতাংশেরও বেশি হ্রাস পায়; এক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে — ৯ শতাংশের উপরে, জাপানে — ১০-এর উপরে। শিল্পের সমস্ত শাখা সংকটগ্রস্ত হয়ে পড়ে — সর্বাধিকভাবে হয় মোটরগাড়ি নির্মাণ ও ইস্পাত ঢালাই শিল্প, কেননা উক্ত দুই শিল্প ১৯৬৯ ও ১৯৭০-এর পর্যায়ে পিছিয়ে যায়। বেকারের সংখ্যা ১ কোটি ৫০ লক্ষ বৃদ্ধি পায়,

তার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে —৮০ লক্ষের উপর। সংকটের সঙ্গে সঙ্গে আসে দরের স্থায়ী বৃদ্ধি, যার ফলে জনসাধারণের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে ওঠে।

অর্থনৈতিক সংকটসমূহ পুঁজিবাদী উৎপাদনের বিকলাঙ্গ রূপের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। গত দশ বছরে বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলিতে 'সংকটরোধমূলক' বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে, কিন্তু যেখানে উৎপাদনের উদ্দেশ্য মানুষের কল্যাণসাধন নয় — মুনাফার পশ্চাদ্ধাবন — পুঁজিবাদের মর্মশূলস্বরূপ ঘটনার সেই গভীর কারণগুলি এতে তিরোহিত হয় না।

১৩ ॥ সাম্রাজ্যবাদ

পুঁজিবাদের শেষ পর্যায়

উনিশ শতকের শেষভাগে সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি নিবদ্ধ হল মধ্য আমেরিকায় ও দক্ষিণ আফ্রিকায়, যেখানে তখন চলছিল স্পেন-মার্কিন ও অ্যাংলো-বুয়র যুদ্ধ। এই দুই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে রক্তলিপ্ত পথ বেয়ে পুঁজিবাদ প্রবেশ করল তার বিকাশের সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ পর্যায়ে — **সাম্রাজ্যবাদে।**

'সাম্রাজ্যবাদ' ধারণাটিকে কেবল বলপূর্বক অপর দেশ অধিকারের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত করে দেখলে চলবে না। পুঁজিবাদের বিকাশ বুর্জোয়া সমাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এমন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা করল যার ভিত্তিতে পুঁজিবাদ তার বিকাশের শেষ পর্যায়ে প্রবেশ করল বলা চলে।

সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে সাম্রাজ্যবাদ নিজে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা থেকে পৃথক কোন সমাজব্যবস্থা নয়। সাম্রাজ্যবাদের যুগে আগের মতোই উৎপাদনের উপায়ের উপর পুঁজিবাদী মালিকানা বুর্জোয়া সমাজের অর্থনৈতিক বনিয়াদ গড়ে তোলে, — তা সে

মালিকানা ব্যক্তিগত, যৌথসংস্থাভুক্ত বা রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী—যে-কোন নির্দিষ্ট রূপেই প্রকাশ পাক না কেন। অর্থনীতির ভিত্তিপ্রস্তর থেকে যাচ্ছে উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎপাদন, ভাড়াটে শ্রমিক শ্রেণীর উপর পুঁজিপতি শ্রেণীর শোষণ।

সাম্রাজ্যবাদের আমলে উদ্বৃত্ত মূল্যের নিয়ম, পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের সাধারণ নিয়ম, প্রতিদ্বন্দ্বিতার নিয়ম ইত্যাদি পুঁজিবাদের সেই একই অর্থনৈতিক নিয়ম কাজ করে চলে।

ভ. ই. লেনিন সাম্রাজ্যবাদের সর্বাঙ্গীণ চরিত্রটি তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে সাম্রাজ্যবাদ হল প্রথমত একচেটিয়া, দ্বিতীয়ত পরজীবী অথবা পচনশীল পুঁজিবাদ এবং তৃতীয়ত মুমূর্ষু পুঁজিবাদ। ভ. ই. লেনিনের কথায়, সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দিতে গেলে তাকে **একচেটিয়া পুঁজিবাদ** রূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

একচেটিয়া কারবার অর্থ কী এবং একচেটিয়া পুঁজিবাদের সঙ্গে একচেটিয়া পুঁজিবাদের পূর্বাবস্থার পার্থক্য কোথায়? একচেটিয়া কারবার হল এক বৃহৎ পুঁজিবাদী জোট, যা একচেটেভাবে, অর্থাৎ একক শাসনাধিকারসম্পন্ন হয়ে অর্থনীতির কোন এক ক্ষেত্রে, এমন কি বিভিন্ন ক্ষেত্রেও প্রভুত্ব করে। উৎপাদন ও পুঁজির সমাবেশের স্বাভাবিক নিয়মে তার উদ্ভব।

শিল্প পুঁজিবাদের যুগে স্বাধীন প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে স্থানচ্যুত করল। **উৎপাদনের সমাবেশ শুরু হয়, অর্থাৎ বৃহত্তর শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতে তার সমাবেশ** ঘটতে থাকে। পুঁজির সঙ্গে উদ্বৃত্ত মূল্যের অংশ সংযুক্ত হয়ে পুঁজিও ক্রমেই বৃহত্তর আকার নিয়ে সমাবিষ্ট হতে থাকে। পুঁজির সমাবেশের সঙ্গে সঙ্গে তার **কেন্দ্রীকরণও** ঘটে। এটা হল বহু পুঁজির স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অথবা বলপূর্বক সংযুক্তি:

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত তখনই, যখন গড়ে ওঠে শেয়ার-হোল্ডার কোম্পানি; বলপূর্বক হয় তখনই, যখন প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সংগ্রামে বৃহৎ কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে সর্বস্বান্ত করে ফেলে।

বৃহৎ পুঁজিপতিদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিশেষ তীব্র ও ধ্বংসাত্মক আকার ধারণ করে। তারা প্রত্যেকেই বাজার কুক্ষিগত করায় এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিনাশসাধনে তৎপর। আর সেটা সম্ভবপর না হলে তারা দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ, দরনির্ধারণ ইত্যাদির ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে সমঝোতায় আসার চেষ্টা করে। শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে খুচরো শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির চেয়ে কয়েক ডজন বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে এমন সমঝোতায় আসা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়। এইভাবে, পুঁজি ও উৎপাদনের সমাবেশ এবং কেন্দ্রীকরণের ফলে একচেটিয়ার উদ্ভব ঘটে।

বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে গড়ে উঠল বিশাল বিশাল একচেটিয়াগোষ্ঠী, কয়লা, তৈল, ইস্পাত ইত্যাদির বিশেষ ধরনের সাম্রাজ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধাতু-শিল্পে আধিপত্য বিস্তার করে পাঁচটি একচেটিয়া শিল্পপ্রতিষ্ঠান, সেগুলির মধ্যে বৃহত্তম হল 'স্টীল ট্রাস্ট্' ও 'বেট্লেহাম স্টীল কর্পরেশন'। ইস্পাতের চার-পঞ্চমাংশ উৎপাদন তাদের হাতে। তৈল-শিল্পে প্রাধান্য বিস্তার করছে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ সংস্থা — 'স্ট্যান্ডার্ড অয়েল', রাসায়নিক শিল্প নিয়ন্ত্রণ করছে 'দ্যুপোঁ দ্য নেমুর' নামে সংস্থা, বিদ্যুৎ-শিল্পে — 'জেনারেল ইলেক্ট্রিক' আর মোটরগাড়িনির্মাণে প্রভুত্ব করছে 'জেনারেল মোটরস্', 'ফোর্ড মোটরস' ও 'ক্রেস্লার' নামে একচেটিয়া।

পশ্চিম জার্মানিতে রাসায়নিক শিল্পে প্রভুত্ব করছে 'ইগ ফারবেনইণ্ডুস্ট্রি' সংস্থার উত্তরাধিকারীরা, যন্ত্রপাতিনির্মাণে — মানেস্মান ও ক্লেক্নারের সংস্থাসমূহ; ইস্পাত-উৎপাদন আছে ফ্লিক, টিস্সান এবং অন্যান্যদের সংস্থার অধীনে।

ইংলণ্ডে উৎপাদনের পৃথক পৃথক শাখায় প্রভুত্ব করে সামরিক ধাতুনির্মাণের সংস্থা 'ভিক্কার্স', রাসায়নিক ট্রাস্ট 'ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজ', তেলের একচেটিয়া কারবারী 'রয়েল ডাচ শেল'। ফ্রান্সে চারটি একচেটিয়া গোষ্ঠী ৮০ শতাংশ ইস্পাত-উৎপাদন নিজেদের হাতে কেন্দ্রীভূত করেছে। 'পেশিনে ইউজিন' ট্রাস্ট অ্যালুমিনিয়ামের ৮০ শতাংশ উৎপাদন এবং টেক্সটাইল ফার্ম 'বুস্সাক' — সুতী বস্ত্রের ৭০ শতাংশ উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

আর্থিক ব্যবস্থা, বাণিজ্য ইত্যাদির ক্ষেত্রেও বৃহৎ একচেটিয়া কারবারের আধিপত্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কতিপয় শক্তিমান আর্থিক যোগানদারগোষ্ঠী দেশের গোটা অর্থনীতি পরিচালনা করে এবং তার নীতি নির্ধারণ করে। এরা হল মর্গান, রক্‌ফেলার, দ্যুপোঁ, মেল্লন্ এবং অন্যান্যরা। আন্তর্জাতিক একচেটিয়াব্যবস্থার অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের পুঁজিপতিদের মধ্যে জোটেরও উৎপত্তি হয়। তারা বাজার ও কাঁচা মালের উৎস নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেয়।

সাম্রাজ্যবাদে যে স্বাধীন প্রতিদ্বন্দ্বিতার জায়গায় একচেটিয়া অধিকার দেখা যায় তার অর্থ কিন্তু সমস্ত রকম প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিলোপ নয়। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে অসংখ্য মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং খুচরো পণ্য-উৎপাদনকারী, বহু সংখ্যক কৃষক ও হস্তশিল্পী থেকে যায়। তাদের অবশ্যই একচেটিয়া ঐক্যের বিরুদ্ধে যোঝার মতো সামর্থ্য নেই এবং সেই কারণে একচেটিয়া কারবারীদের তারা বিশেষ ধরনের কর দিতে বাধ্য। তাই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অধিকাংশ কৃষিখামারজীবী তাদের উৎপন্ন দ্রব্য পাইকারিভাবে বৃহৎ বাণিজ্য কোম্পানিগুলির কাছে বিক্রি করে থাকে, কোম্পানিগুলি অতঃপর সেগুলিকে খুচরোভাবে আবার বিক্রি করে। একচেটিয়ার অধিকারের সামনে কৃষিখামারজীবী অসহায়, ওরা যে দর বেঁধে দেয় সেই দরই তাকে মেনে নিতে

হয়। এই সুযোগে একচেটিয়া কারবারীরা পাইকারী দর নামিয়ে খুচরো দর চড়িয়ে দেয়। দরের অন্তর (তথাকথিত কাটা) তাদের অবিশ্বাস্য রকম মুনাফা আমদানি করে। সেই সঙ্গে প্রতি বছর হাজার হাজার কৃষিখামারজীবী নিঃস্ব হয়ে পড়ে।

এই দৃষ্টান্ত থেকে একচেটিয়া দর গড়ে ওঠার কৌশল বোঝা সম্ভব হবে। সাম্রাজ্যবাদের আমলে অধিকাংশ পণ্যদ্রব্যই স্বাধীনভাবে বাজারে সাজিয়ে দর অনুযায়ী বিকোন যায় না: একচেটিয়া কারবারীদের দর চড়ানোর সুযোগ আছে, যার ফলে তারা শ্রমিক এবং সমাজের অন্যান্য শ্রমজীবী স্তরের মানুষকে লুণ্ঠন করে **বাড়তি মুনাফা** পেতে পারে।

অঢেল পুঁজি সঞ্চয় করে একচেটিয়া কারবারীরা তা খাটানোর চেষ্টা করে। জাতীয় অর্থনীতিতে পুঁজির লাভজনক বিনিয়োগে তুষ্ট না থেকে একচেটিয়া কারবারীরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের ক্রিয়াকলাপের নূতন নূতন ক্ষেত্র খুঁজতে থাকে, আরও বেশি পরিমাণ **পুঁজি রপ্তানি করে,** দেশের বাইরে শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত পুঁজি রপ্তানি হত মুখ্যত উপনিবেশগুলিতে এবং অর্থনীতিগতভাবে অনুন্নত ও অনগ্রসর দেশসমূহে। এসব জায়গায় অর্থবিনিয়োগে বিপুল লাভের সম্ভাবনা, কেননা মালিক ইউরোপে বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিককে যে পরিমাণ মজুরি দিত এখানে তার চেয়ে অনেক কম দেওয়া যায়।

পুঁজিপতিরা ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে তাদের পুঁজি ঢালতে লাগল, আর তার ফলে অবিরাম স্রোতের ধারায় তাদের কাছে প্রবাহিত হতে লাগল আফ্রিকার সোনা ও হীরা, নিকট ও মধ্য প্রাচ্য থেকে তেল, মালয় থেকে রবার, দক্ষিণ

আমেরিকার দেশগুলি থেকে তামা ও টিন, কফি ও ফলমূল। পরিষ্কার বোঝা যায়, যে-সব রাষ্ট্রশক্তির ঔপনিবেশিক অধিকার ছিল, সেই সব দেশের একচেটিয়া কারবারীদের পরিস্থিতি বেশি সুবিধাজনক হল। আর যারা, লেনিনের কথায়, সাম্রাজ্যবাদী ভোজের টেবিলে যোগ দিতে দেরি করে ফেলল, তারা সবাই আরও মরিয়া হয়ে ঔপনিবেশিক লুণ্ঠনে অংশগ্রহণের জন্য নিজেদের 'ভাগ' দাবি করতে লাগল। এ থেকেই দুনিয়ার রাজ্যসীমানা পুনর্বণ্টনের জন্য সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সূচনা।

পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করে এই কারণে যে পুঁজিবাদী দেশগুলির বিকাশ অত্যন্ত অসমান, — তা আমাদের মনে করিয়ে দেয় দূরপাল্লার দৌড় প্রতিযোগিতার কথা, যেখানে অংশগ্রহণকারীর অবস্থার নিরন্তর হেরফের হচ্ছে। যে-সব দেশ এই সেদিনও অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে সবচেয়ে বেশি শক্তিমান ছিল, আজ তারা পাশে সরে দাঁড়িয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীদের সামনের পথ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। আগামীকাল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের মধ্যে শক্তির সম্পর্ক আবার বদলায়। আর আগে বেরিয়ে আসার জন্য ব্যস্ত তাদের প্রত্যেকেরই চেষ্টা (সাময়িকভাবে হলেও) বাজার পুনর্বণ্টনের ব্যাপারে প্রাধান্যের সুযোগ নিয়ে নিজেদের স্বার্থে প্রভাবের ক্ষেত্র ও সীমানা কাজে লাগানো। যারা আরও শক্তিমান, তারা বিশ্বপ্রভুত্বের দাবি করে। ভ. ই. লেনিন **সাম্রাজ্যবাদের যুগে পুঁজিবাদের অসমান বিকাশের** যে **নিয়ম** তুলে ধরেছেন তারই ক্রিয়াস্বরূপ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রশক্তিগুলির মধ্যে পরস্পর বৈরভাবাপন্ন জোট বেঁধে ওঠে, তীব্র বিরোধহেতু ফাটল সৃষ্টি হয়।

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে পরিবর্তনের সঙ্গে তার রাজনৈতিক পরিবর্তন সম্পর্কযুক্ত।

ভ. ই. লেনিন একাধিকবার উল্লেখ করেছেন যে সাম্রাজ্যবাদের চরিত্রই হল 'গণতন্ত্র থেকে প্রতিক্রিয়ার দিকে গতিপরিবর্তন'। জনসাধারণের উপর শোষণ তীব্র করে একচেটিয়া বুর্জোয়া প্রায়ই জনগণের প্রতিরোধ দমনের উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসমূলক শাসনব্যবস্থার আশ্রয় নেয়। একচেটিয়া অধিকারের এই ধরনের সন্ত্রাসমূলক একনায়কতন্ত্রের সবচেয়ে খোলাখুলি রূপ হল ফ্যাশিবাদ।

তবে সুখের বিষয় এই যে সবই একচেটিয়া কারবারীদের ইচ্ছের উপর নির্ভর করে না এবং তাদের পক্ষে সর্বদাই সন্ত্রাসমূলক ব্যবস্থা কায়েম করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। একচেটিয়া শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে শ্রমিক শ্রেণী এবং সমাজের সকল প্রগতিশীল শক্তি, যারা প্রতিক্রিয়ার বিজয়কে মেনে নিতে পারে না।

রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ

বিশ শতকের প্রথম কয়েক দশকের মধ্যেই বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সঙ্গে পুঁজিবাদী একচেটিয়া অধিকার একাঙ্গীভবনের লক্ষণ দেখা দিল, যার ভিত্তিতে ভ. ই. লেনিন একচেটিয়া পুঁজিবাদের রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদে ক্রমপরিণতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করেছেন।

এই ঘটনার প্রকৃতিটিই বা কী? এই প্রশ্নের জবাব পেতে হলে লক্ষ্য করা দরকার প্রথমত, একচেটিয়া অধিকার ও বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কী কী পরিবর্তন

ঘটেছে এবং দ্বিতীয়ত, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে রাষ্ট্রের ভূমিকাটিই বা কীভাবে পরিবর্তিত হল।

বুর্জোয়া রাষ্ট্র তার আবির্ভাবের মুহূর্ত থেকেই ছিল পুঁজিপতিদের শ্রেণীপ্রভুত্বের হাতিয়ার; তা সামগ্রিকভাবে উক্ত শ্রেণীর ইচ্ছা ও স্বার্থের অভিব্যক্তিমূলক। স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতিপথনির্ধারণে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করত বৃহৎ বুর্জোয়া। পরন্তু শাসক শ্রেণীর বিভিন্ন স্তরের মধ্যে স্বাধীন প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগে শাসনক্ষমতায় প্রাধান্য বিস্তারের জন্য যে সংগ্রাম চলত তা থেমে যেত একমাত্র তখনই যখন শোষকরা জনসাধারণের বিপ্লবী আন্দোলনকে দমন করার জন্য নিজেদের শক্তি সঙ্ঘবদ্ধ করত। পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের পর্যায়ে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা পালটাতে থাকে। উৎপাদনের সমাবেশ এবং পুঁজির কেন্দ্রীকরণের ফলে একচেটিয়ার উচ্চ গোষ্ঠীর হাতে এমন প্রভূত অর্থনৈতিক ক্ষমতা এলো যে শাসনক্ষমতা অধিকারের সংগ্রামে অন্যান্য বুর্জোয়াগোষ্ঠী তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এঁটে উঠতে পারে না।

একচেটিয়া কারবারের অর্থনৈতিক প্রভুত্ব যত দৃঢ় হতে লাগল ততই তারা রাষ্ট্রযন্ত্রের একচ্ছত্র অধিকার ও শাসনক্ষমতা সম্পূর্ণ দখলের প্রতি তাদের খোলাখুলি আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগল। প্রথম প্রথম পুঁজির ক্ষমতা যদিও বা মূলত এজেন্টদের মাধ্যমে কাজ করত (পার্লামেন্টের প্রতিনিধি ও মন্ত্রীদের খরচ যুগিয়ে, রাজনৈতিক পার্টির নেতাদের উৎকোচে বশীভূত করে), কালে সেই লজ্জাও ঘুচে গেল, তারা উইংসের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বড় বড় রাষ্ট্রীয় পদের জন্য দাবি জানাতে লাগল। এই প্রক্রিয়া

গত কয়েক বছরের মধ্যে বিশেষ ব্যাপক আকার ধারণ করেছে।

রাষ্ট্রযন্ত্রে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা দখলের পর একচেটিয়া কারবারীরা তাকে এমন রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে যাতে তা দেশের অভ্যন্তরে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব ভালোভাবে তাদের উদ্দেশ্যসাধনের সহায়ক হয়। বেশ কিছু পরিমাণে তাদের প্রভাবে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ভূমিকায় মৌলিক পরিবর্তন দেখা দেয়। 'বেশ কিছু পরিমাণে' বলছি কেন? কারণ এই যে এই প্রক্রিয়ায় অন্যান্য উপাদানেরও প্রভাব আছে। একচেটিয়া অধিকারের শাসনে জর্জরিত শ্রমিক শ্রেণী এবং সর্বস্তরের মেহনতী জনসাধারণ এই আধিপত্যের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে সংগ্রাম করে এবং বহু ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যও অর্জন করে থাকে। তবে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপে পরিবর্তন প্রধানত একচেটিয়া অধিকারের স্বার্থপ্রণোদিত।

এই পরিবর্তন সর্বোপরি প্রকাশ পায় অর্থনীতিতে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান হস্তক্ষেপে। অতীতে অবস্থাটা কেমন ছিল তা আবার স্মরণ করা দরকার। স্বাধীন প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগে বুর্জোয়া রাষ্ট্র অর্থনীতিতে কমই হস্তক্ষেপ করত, ব্যক্তিগত মালিকদের — পুঁজিপতিদের ক্রিয়াকলাপের পূর্ণ স্বাধীনতা দিত। সেকালের বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা রাষ্ট্রকে 'নৈশপ্রহরী' আখ্যা দেন — এটাই বোঝানোর জন্য যে তা বর্তমান নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষা করে, — আর অন্যান্য ব্যাপারে তার কিছুই করার নেই। আধুনিক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র সক্রিয়ভাবে শ্রম ও পুঁজির সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, ব্যাপক জাতীয় স্তরে অর্থনীতি বিকাশের কর্মসূচি রচনার চেষ্টা করে, বৈজ্ঞানিক গবেষণার পেছনে অর্থ যোগানোর

দায়িত্ব নেয়, জাতীয় আয়ের অংশ পুনর্বণ্টন করে, উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত — অনেক সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরের অধিকারী হয়।

আপত দৃষ্টিতে এসবই সামাজিক বিকাশের আসন্ন চাহিদার উপযুক্ত, কেননা আধুনিক উৎপাদনের সামাজিক চরিত্রের একান্ত দাবি হল জাতীয় অর্থনীতিতে পরিকল্পিত সূচনা নির্ধারণ, আর তা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণকারী ভূমিকার উন্নয়ন ব্যতিরেকে সম্ভব হতে পারে না। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজে যে-সব প্রক্রিয়া চলছে তাকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য বৈষয়িক পূর্বশর্তের প্রস্তুতি বলা যায়। কিন্তু এ হল মাত্র একটা দিক। অপর দিকটি এই যে একচেটিয়া অধিকারের সঙ্গে রাষ্ট্রযন্ত্রের একাঙ্গীভবনের পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক জীবনে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ সর্বোপরি এবং মূলত একচেটিয়া অধিকারেরই স্বার্থসাধন করে।

শ্রম ও পুঁজির সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ ক'রে আধুনিক বুর্জোয়া রাষ্ট্র বাহ্যত নিরপেক্ষ সালিসের অর্থাৎ বিচারকের ভূমিকা গ্রহণ করে, — যার কাছে উভয় পক্ষই সমান। আসলে কিন্তু তার সব শক্তি ও সহানুভূতিই পুঁজিপতির প্রতি। তাই, বুর্জোয়া দেশগুলিতে গণস্বার্থবিরোধী আইন গৃহীত হয়, যার ফলে সরকার ধর্মঘট বেআইনী ঘোষণা করতে পারে, দরবৃদ্ধি সত্ত্বেও মজুরি 'ফ্রিজ' করে দিতে পারে, ইত্যাদি আরও অনেক কিছু করতে পারে।

আধুনিক কালে বহু পুঁজিবাদী দেশের রাষ্ট্রযন্ত্র অর্থনৈতিক বিকাশের কর্মসূচি উদ্ভাবন করছে। এই সব কর্মসূচির উদ্দেশ্য হল পুঁজিবাদী উৎপাদনের স্থিরতা আনয়ন, বেকারত্ব হ্রাস এবং অংশত হলেও নৈরাজ্য ও

প্রতিদ্বন্দ্বিতার ধ্বংসাত্মক ক্রিয়া দূরীকরণ। এ ধরনের কর্মসূচি গ্রহণের নির্দিষ্ট কিছু কিছু ফল থাকলেও তার বাস্তবায়ন এমনভাবে হয়ে থাকে যাতে একচেটিয়া কারবারীদের স্বার্থের হানি না হয়। তার চেয়েও বড় কথা এই যে একচেটিয়া কারবারীরা এটাকে নিজেদের চেহারা আড়ালের উপকরণ হিশেবে ব্যবহার করে। একচেটিয়া কারবারীরা আনুষ্ঠানিকভাবে নানা রকম রাষ্ট্রীয় সুপারিশ পালনের ব্যাপারে অংশ নিয়ে, অর্থাৎ যেন সার্বিক জাতীয় স্বার্থের সেবা করে, সমৃদ্ধ হতে থাকে।

বুর্জোয়া কর্মসূচিকে জাতীয় অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার সঙ্গে একাকার করে দেখলে চলবে না। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের তৈরী পরিকল্পনাকে যে ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী কোম্পানীগুলোর জন্যই হতে হবে এমন নয়, — তার চরিত্র মূলত সুপারিশমূলক ও পূর্বাভাস ধরনের। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও একচেটিয়া যৌথকারবারসমূহ রাষ্ট্রের কাছ থেকে উৎপাদনের কোন নির্দিষ্ট দায়িত্ব পায় না এবং নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সংগ্রামের ফলে পরিকল্পনামতো ক্রিয়াকলাপকে সংগঠিত করার ও অর্থনীতির বিকাশের ক্ষেত্রে আনুপাতিকতা বজায় রাখার সাধ্য তাদের থাকে না।

রাষ্ট্রীয় বাজেটের মাধ্যমে জাতীয় আয়ের পুনর্বণ্টন একচেটিয়া অধিকারের সমৃদ্ধিসাধনে বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে। জনসাধারণের উপর কর চাপিয়ে, তা থেকে বিপুল পরিমাণ সঙ্গতি সংগ্রহ ক'রে বুর্জোয়া রাষ্ট্র তার অতি নগণ্য অংশ শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ও অন্যান্য সামাজিক প্রয়োজনে ব্যয় করে। সঙ্গতির মূল অংশ চলে যায় সামরিক ব্যয়ে, সমরবাদ অবিরত পুষ্ট হতে থাকে। ১৯৭০ সনে 'ন্যাটো' জোটভুক্ত

দেশগুলির সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ১০,৩০০ কোটি ডলার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমরবাদ সবচেয়ে সাঙ্ঘাতিক রূপ গ্রহণ করেছে। গত ৫ বছরে সামরিক উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৪০, ০০০ কোটির বেশি ডলার ব্যয়িত হয়।

এইভাবে, শ্রমজীবী জনগণ সমরবাদের সমস্ত ভার বহন করে, আর সামরিক উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য সরকার যে অর্থ পরিশোধ করে তা চলে যায় অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণে বিশিষ্টতা অর্জনকারী বৃহৎ শিল্প করপরেশনগুলির হাতে। আধুনিক বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলি বিজ্ঞানের পেছনেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে থাকে।

রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির বৃদ্ধি সম্পর্কযুক্ত। তা গড়ে ওঠে তিনটি উপায়ে: রাষ্ট্রীয় বাজেটের অর্থে নূতন নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান (প্রধানত সামরিক) নির্মাণের পথে, রাষ্ট্রকর্তৃক পুঁজিবাদী কোম্পানীগুলির শেয়ারের কিছু অংশ কেনার মধ্য দিয়ে এবং পৃথক পৃথক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অথবা গোটা শিল্পক্ষেত্রের বুর্জোয়া জাতীয়করণের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া সম্পত্তির প্রসার প্রায়ই ঘটে থাকে রাষ্ট্র কর্তৃক শিল্পের সেই সমস্ত শাখা হাতে নেওয়ার চেষ্টা থেকে, যেগুলির জন্য বিরাট পরিমাণ পুঁজির বিনিয়োগ দরকার হয় (যেমন, পরমাণুশিল্প) অথবা যেগুলি যথেষ্ট পরিমাণ লাভজনক নয় (যেমন, কয়লা ও বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন)।

ইংলণ্ডে কয়লা-শিল্প, গ্যাস-উৎপাদন কারখানা ও বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদনব্যবস্থা রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীভূত। রাষ্ট্রের অধীনস্থ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ২০ শতাংশেরও বেশি শ্রমিক ও কর্মচারী

নিযুক্ত। ফ্রান্সে রাষ্ট্রীয় সেক্টর মোট উৎপন্ন দ্রব্যের প্রায় ১৫ শতাংশ উৎপন্ন করে। বিমান শিল্পের প্রায় ৮০ শতাংশ, প্রায় গোটা কয়লা-শিল্প ও বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদনব্যবস্থা রাষ্ট্রের হাতে জমা আছে। ইতালিতে রাষ্ট্রীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ২০ শতাংশের বেশি শ্রমিক ও কর্মচারী নিযুক্ত।

নিজস্ব শ্রেণীচরিত্রের দিক থেকে এই সব সম্পত্তি — রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া মালিকানা। এটাও বোধগম্য, কেননা রাষ্ট্র এই সম্পত্তি অধিকার ও সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে সর্বোপরি একচেটিয়া বুর্জোয়ারই স্বার্থ রক্ষা করে।

রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া মালিকানার পুঁজিবাদী স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে শ্রমিক শ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টিগুলি সেই সঙ্গে শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ শাখাগুলিকে ব্যক্তিগত পুঁজির হাত থেকে অপসারণের দাবিতে সংগ্রাম পরিচালনা করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে কিছু কিছু শিল্পশাখার জাতীয়করণে এবং ১৯৬২ সনে ইতালিতে বিদ্যুৎশক্তি-শিল্পের জাতীয়করণেও এই সংগ্রাম বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বর্তমানে কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিসমূহের অধিকাংশ কর্মসূচিতে আছে জাতীয়করণের দাবি। এক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের সংগ্রাম কেবল জাতীয়করণের উদ্দেশ্যে নয়, — তাদের সংগ্রামের উদ্দেশ্য — রাষ্ট্রীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির উপর যথার্থ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের প্রতিষ্ঠা।

রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের আরও একটি চরিত্রলক্ষণ হল ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সঙ্ঘের মতো ('বারোয়ারি বাজার') আন্তঃরাষ্ট্রীয় একচেটিয়া সমবায়ের উদ্ভব।

পর্যালোচনা করে দেখা গেল যে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের অর্থ হল একচেটিয়া বুর্জোয়াসম্প্রদায়ের দৃঢ়

প্রতিষ্ঠা এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পরমায়ু বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে একচেটিয়া শক্তির সংযোগ। একচেটিয়া পুঁজিবাদের রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদে পরিণতির অর্থ সাম্রাজ্যবাদের থেকে পৃথক কোন নূতন পর্যায়ে উত্তরণ নয়। এটা সেই একই পুঁজিবাদ, — সাম্রাজ্যবাদী পর্যায়ে বিকাশমাত্র।

'রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদে'র ধারণাকে 'রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদে'র বিস্তৃততর ধারণার সঙ্গে এক করে দেখলে চলবে না। রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ আছে কেবল উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে, আর নির্দিষ্ট ব্যবস্থারূপে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ অর্থনীতিগতভাবে অনুন্নত দেশগুলিতেই থাকা সম্ভব; তাছাড়া পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পর্বে সোভিয়েত অর্থনীতিতে এবং আরও কতকগুলি সমাজতান্ত্রিক দেশের অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ এক অন্যতম ব্যবস্থা ছিল।

১৪ ॥ পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট

পুঁজিবাদে বিরোধের তীব্রতাবৃদ্ধি

ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার যে অভ্যন্তরীণ প্রেরণা এবং সমাজ-বিপ্লবের যে অর্থনৈতিক বনিয়াদের ফলে এক ধরনের উৎপাদনপ্রণালী থেকে অপর ধরনে উত্তরণ ঘটে তা গড়ে ওঠে উৎপাদনী শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের সঙ্ঘর্ষ থেকে। আমাদের চোখের উপর এ ধরনের তীব্র সঙ্ঘর্ষের দৃষ্টান্ত, — **উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র এবং অধিকারের ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী রূপের মধ্যে বিরোধ,** যাকে বলা যায় পুঁজিবাদের মূলগত বিরোধ।

পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমের সামাজিকীকরণের মাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে, এবং যেমন পৃথক পৃথক

শিল্পপ্রতিষ্ঠানে, তেমনি উৎপাদনের সর্বক্ষেত্রে ও সমগ্র জাতীয় অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক বন্ধন ও পারস্পরিক নির্ভরতা দৃঢ় হতে থাকে।

আধুনিক কারখানায় জুতো তৈরি করতে গেলে দরকার — গবাদি পশুপালন, চামড়ার কারখানায় চামড়া-প্রসেসিং এবং রাসায়নিক রঞ্জকের সাহায্যে তা রাঙানো। অন্যান্য ফ্যাক্টরিকে কাপড় ও সুতোর উৎপাদন করতে হবে, যন্ত্রনির্মাণ কারখানাগুলিকে জুতোর কারখানার জন্য সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে হবে, আবার তাদের জন্য দরকার হবে আকরিক উত্তোলন ও লোহা গলানো। এগুলি সমেত সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানেরই জ্বালানি, বিদ্যুৎশক্তি, মেশিন চালানোর তেল ইত্যাদি **আবশ্যক।**

বিপুল পরিমাণে শ্রমকে সংঘবদ্ধ ক'রে পুঁজিবাদ উৎপাদনকে **সামাজিক চরিত্র** প্রদান করে। কিন্তু উৎপাদনপ্রক্রিয়ার সামাজিক চরিত্রের ক্ষেত্রে অধিকারের রূপটি থেকে যায় ব্যক্তিগত: কেননা উৎপাদনের উপায় থাকে পুঁজিপতিদের অধিকারে, এমন কি শ্রমের ফলও তাদের সম্পত্তিরূপে গণ্য। ব্যক্তিগত মালিকানা উৎপাদনবৃদ্ধির প্রতিবন্ধক, এতে উৎপাদনী শক্তির বিকাশ মন্থর হয়ে আসে।

সুতরাং, উন্নত পুঁজিবাদী দেশের অর্থনীতির উচ্চ স্তর এবং বিরাট সম্ভাবনা সত্ত্বেও উৎপাদন দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায় না, এমন কি কোন কোন বছর একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। দীর্ঘকাল যাবৎ উৎপাদনক্ষমতার ন্যূন পরিমাণ ব্যবহার, বেকারত্ব এবং অর্থনীতির সমরমুখী রূপায়ণ — এই হল আধুনিক পুঁজিবাদের সাধারণ ঘটনা।

পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক বহুকাল থেকেই আর উৎপাদনী শক্তির চরিত্র অনুযায়ী হয় না, — উৎপাদনী শক্তির সঙ্গে তার সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। উৎপাদনের সামাজিক

চরিত্র এবং অধিকারের ব্যক্তিগত উপায়ের মধ্যে বৈরিতা ও আপসহীন বিরোধ এখন বিশেষ তীব্র আকার ধারণ করেছে। রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ **সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সমস্ত রকম বৈষয়িক পূর্বশর্তের** আয়োজন করে রেখেছে। বৃহৎ যন্ত্রশিল্প এবং উৎপাদনব্যবস্থা সামাজিকীকরণের অত্যুন্নত পর্যায় এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যাতে নৈরাজ্য ও সংকটের অবসান ঘটে এবং সমগ্র সমাজের স্বার্থে উৎপাদনী শক্তির নিয়মিত বিকাশ সুনিশ্চিত হয়। কিন্তু এর জন্য দরকার উৎপাদনের উপায়ের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উচ্ছেদ।

এর অর্থ অবশ্যই এমন নয় যে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত জনগণের দৃঢ় সংগ্রাম ছাড়া আপনা-আপনিই পুঁজিবাদের তিরোধান ঘটে। সাম্রাজ্যবাদকে মুমূর্ষু পুঁজিবাদরূপে চিহ্নিত করার সঙ্গে সঙ্গে ভ. ই. লেনিন **সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বমুহূর্ত** বলে তার চরিত্রবৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছেন। স্বভাবতই একচেটিয়া বুর্জোয়া বিনাযুদ্ধে হার মানে না, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে বাঁচানোর জন্য সে আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু যা অনিবার্য তাকে ঠেকিয়ে রাখার মতো ক্ষমতা তার নেই: পুঁজিবাদের বিরোধ চরম তীব্রতা লাভ করে তার বিনাশ ঘটায়।

জনসাধারণের উপর শোষণের তীব্রতা বৃদ্ধি করার ফলে একচেটিয়া বুর্জোয়া তাদের কাছ থেকে ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। পুঁজিবাদী নির্যাতনের কবল থেকে মুক্তিলাভ এবং সমাজের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে **প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী আন্দোলন** উত্তরোত্তর শক্তি অর্জন করতে থাকে।

উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির জনগণকে দাসে

পরিণত করে একচেটিয়া বুর্জোয়া কোটি কোটি জনসাধারণকে বিনাশের মুখে ঠেলে দেয়: হয় স্বাধীনতা অর্জন, নয়ত ধ্বংস — এছাড়া অন্য কোন পন্থা তাদের নেই। এর ফলে সাম্রাজ্যবাদী দাসত্বের বিরুদ্ধে **জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের** তরঙ্গ উত্তাল হয়ে ওঠে।

শাসনক্ষমতায় ফাশিস্তদের ডেকে নিয়ে এসে এবং যুদ্ধের সূচনা করে একচেটিয়া বুর্জোয়া তার লালসা পরিতৃপ্তির জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ বলি দেয়, লড়াইয়ের আগুনে জনগণের বহু বছরের শ্রমলব্ধ ঐশ্বর্য বিনষ্ট করে। তাই, **গণতন্ত্র ও শান্তির জন্য জনগণের সংগ্রাম শক্তিশালী হতে থাকে।**

একক প্রবাহে সম্মিলিত হয়ে এই বিশাল শক্তিসমূহ সাম্রাজ্যবাদের বিনাশ ঘটায়। পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগ সূচিত হয়।

পুঁজিবাদের বিকাশ যেহেতু অসমান, সেহেতু কোন সমাজের সমাজতন্ত্রে উত্তরণও সঙ্গে সঙ্গে হতে পারে না। পুঁজিবাদের বিনাশ ও সমাজতন্ত্রের বিজয় এক দীর্ঘ প্রক্রিয়া, যার ব্যাপ্তি গোটা এক যুগ, — **পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের যুগ।**

পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের পর্যায়সমূহ

পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের কালে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ বিরোধের তীব্রতা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় যে পৃথক পৃথক দেশকে নিজের প্রভুত্বে রাখার মতো শক্তি আর তার থাকে না; ফলে সেই দেশগুলিকে সে হারায় এবং তারা সমাজতন্ত্রের পথ অনুসরণ করে। অন্য দিকে,

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার আবির্ভাবের ঘটনাটি নিজেই এবং তার বৃদ্ধি ও দৃঢ় প্রতিষ্ঠা সাম্রাজ্যবাদের পতনের গতি আরও দ্রুত করে।

পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের প্রথম পর্যায় শুরু হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের ফলে। অক্টোবর বিপ্লব শ্রমিক আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে এবং সমাজের সামগ্রিক বিকাশে বিপুল প্রেরণা সঞ্চার করে। বলা যেতে পারে যে ১৯১৭ সনের অক্টোবরের পর ইতিহাসের রেল ইঞ্জিন মেইন লাইনে পড়ে পূর্ণবেগে কমিউনিজমের দিকে ছুটে চলে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট তীব্র ও ঘনীভূত হল; ইউরোপ ও এশিয়ার অনেকগুলি দেশে পুঁজিবাদের পতনে এই সংকটের **দ্বিতীয় পর্যায়** শুরু হল। সমাজতন্ত্র আর নির্দিষ্ট একটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না, — তা এক বিশ্বব্যবস্থায় পরিণত হল। সেই সঙ্গে জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের ফলে প্রাক্তন উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলির স্থলে গড়ে উঠল স্বাধীন রাষ্ট্র।

৫০-এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের **তৃতীয় পর্যায়** শুরু হল। এর বিশেষত্ব এই যে এর সূচনা বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত নয়। ইতিপূর্বে পুঁজিবাদ এতদূর শক্তিমান ছিল যে তার পক্ষে শান্তিপূর্ণ সময়ে জনসাধারণের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন এবং দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ জনগণের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন দমন সম্ভব হত; বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে পারস্পরিক বিবাদের ফলে দুর্বল হয়ে পড়ায় মুক্তি আন্দোলনের বিপুল সাফল্য নিবারণের ক্ষমতা সাম্রাজ্যবাদীদের হল না।

আজ যে শান্তিপূর্ণ সময়েও তা করার ক্ষমতা তাদের নেই, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ভাঙ্গনই তার উজ্জ্বল প্রমাণ। বিশেষভাবে এই ঘটনা সকলেরই জানা আছে যে বৃহত্তম সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রশক্তির নাকের ডগায় ক্ষুদ্র দেশ কিউবার নির্ভীক জনসাধারণ কেবল স্বাধীনতাই অর্জন করে নি, — সমাজতন্ত্র গঠনেরও পথ নিয়েছে।

সমাজতন্ত্রবিরোধী সংগ্রামের পরিস্থিতিতে পুঁজিবাদী দেশগুলির শাসকগোষ্ঠী জনগণের উপর নির্যাতনের স্বরূপ ঢাকার নানা রকম কৌশল উদ্ভাবনের এবং নিজেদের প্রতিষ্ঠাকে দৃঢ় করার জন্য বৈজ্ঞানিক-টেকনিক্যাল অগ্রগতির সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা করে, জনসাধারণকে বিপ্লবী আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে কিছু কিছু সংস্কারের পথ অবলম্বন শ্রেয় বলে মনে করে।

কিন্তু পুঁজিবাদ নূতন পরিস্থিতিতে যতই মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করুক না কেন, তার সাধারণ সংকট ঘনীভূতই হতে থাকে। অধিকার আদায়ের জন্য শ্রমিক শ্রেণীর এবং অন্যান্য স্তরের মেহনতী জনসাধারণের সংগ্রাম প্রতি বছরই নূতন শক্তি অর্জন করে (প্রত্যক্ষ প্রমাণ তুলে ধরা যাক: ১৯৫৮ সনে পুঁজিবাদী দুনিয়ায় ধর্মঘটীদের সংখ্যা যেখানে ছিল ২ কোটি ৬০ লক্ষ সেখানে ১৯৭৫ সনে ৭ কোটি ৫০ লক্ষের বেশি মানুষ ধর্মঘটে যোগ দিয়েছে)। বিশ্ব সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের সম্মিলিত শক্তিপ্রয়োগের বিশেষ আগ্রহ সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধ থেকে যায়। ৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মূল কেন্দ্রগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠল: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম ইউরোপ ও জাপান। সাম্রাজ্যবাদের উপর জাতীয় মুক্তির ক্রমবর্ধমান শক্তির চাপে পড়তে থাকে, তা ছাড়া এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশে স্বাধীনতা ও সমাজ-প্রগতি অর্জনের জন্য সংগ্রাম কার্যত সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী নির্বিশেষে শোষণ-সম্পর্কের বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনের রূপ নিতে লাগল। লাতিন আমেরিকায় বিরাট পরিবর্তন চলতে থাকে।

দেখা যাচ্ছে, সাধারণ সংকটকে সাময়িক অর্থনৈতিক সংকটের সঙ্গে একাকার করা ঠিক নয়; এই কারণেই একে **সাধারণ** বলা যায়, কেননা কেবল অর্থনীতির ক্ষেত্রেই নয়, — পুঁজিবাদী সমাজের রাজনীতি এবং মতাদর্শের ক্ষেত্রেও তা বিস্তৃত। নিজের প্রভুত্বকে কায়েম রাখার উদ্দেশ্যে রাজনীতিক্ষেত্রে একচেটিয়া বুর্জোয়াকে প্রায়ই বেওনেটশক্তির আশ্রয় নিতে হয়, আর মতাদর্শগতভাবে মানুষের বুদ্ধির লড়াইয়ে তার শোচনীয় পরাজয় ঘটে।

আদর্শহীনতা

বুর্জোয়া মতাদর্শবাদীদের এমন কোন চিন্তাধারা নেই যাকে তাঁরা উদার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তাধারার বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে পারেন।

শাসনক্ষমতা পাওয়ার সময় বুর্জোয়ারা মুক্তি, সাম্য ও সৌভ্রাত্রের স্লোগান তুলে জনগণকে তাদের পক্ষে টানে। বুর্জোয়া সংবিধানগুলিতে এই সব স্লোগান আজও শোভাবর্ধন করে আসছে। কিন্তু জনসাধারণের আজ আর তার শূন্যগর্ভতা বুঝতে বাকি নেই। এই মুক্তি বা স্বাধীনতা হল পুঁজিপতিদের শ্রমিককে শোষণের স্বাধীনতা, প্রতিক্রিয়াশীলদের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হওয়ার স্বাধীনতা, নিউজ পেপার ম্যাগনেটদের যুদ্ধের উন্মত্ত জিগির তোলার স্বাধীনতা; আর শ্রমিকদের হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রমের 'স্বাধীনতা', কমিউনিস্টদের কারান্তরালে দিনযাপনের 'স্বাধীনতা', পুলিশের লাঠির আঘাতে শান্তি-সংগ্রামীদের জর্জরিত হওয়ার 'স্বাধীনতা'।

বুর্জোয়াদের পতাকায় কোন এক কালে যে-সব আদর্শের কথা লেখা হয়েছিল আজকের দিনে বুর্জোয়া তা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে, পদদলিত করেছে। বৃহৎ ও সুসংগঠিত মতাদর্শসংক্রান্ত সংস্থাকেন্দ্রগুলির নূতন নূতন আদর্শ

অনুসন্ধানের সমস্ত রকম চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে।

জনগণের আরও ব্যাপক অংশ ক্রমেই উপলব্ধি করছে যে একমাত্র সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট ব্যবস্থাতেই যথার্থ মুক্তি, সাম্য ও সৌভ্রাত্র সুনিশ্চিত হতে পারে। একচেটিয়া সর্বগ্রাসী শাসনক্ষমতার বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণী ও জাতিসমূহের সংগ্রাম যত তীব্র আকার ধারণ করে, সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী সমাজ সম্পর্কে ততই ঘন ঘন ফাঁকা বুলির আশ্রয় নেয়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বনিয়াদ রক্ষা ও তা মজবুত করার উদ্দেশ্যে আংশিক আপস-মীমাংসার পথে যায়। এতেও কিন্তু নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহৃত হয় না, — তা প্রথমেই গিয়ে পড়ে কমিউনিস্টদের উপর। কমিউনিস্ট পার্টি ও তার সদস্যদের অধিকার সংকুচিত করে দেওয়া হয়, এমন কি বহু দেশে তাদের কার্যকলাপ অবৈধ ঘোষিত হয়।

বুর্জোয়া মতাদর্শের ঘনীভূত সংকটের অন্যতম প্রত্যক্ষ প্রকাশ হল কমিউনিজমবিরোধিতা।

সংস্কৃতির অবক্ষয়ের মধ্যেও বুর্জোয়া মতাদর্শের সংকট প্রকাশ পায়। বইয়ের দোকানের কাউণ্টারে, রঙ্গমঞ্চে, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনের পর্দায় নৃশংসতা ও বলপ্রয়োগের কীর্তনকারী, ব্যভিচারের গুণগানসূচক ও পাশবিক প্রবৃত্তির উদ্দীপক অপকৃষ্ট রচনার দুর্বার স্রোত চলেছে। চিত্রকলায় আধুনিক প্রবণতা হয়ে দাঁড়াচ্ছে রেখা ও বিন্দুর অর্থহীন সমাবেশ, যার মাধ্যমে মানবমনের গোপন রহস্যের উদ্‌ঘাটন করা হচ্ছে বলে দাবি জানানো হয়। সঙ্গীতে সুর ও তানের বদলে — উৎকট বেসুরো ধ্বনির সমাবেশ। ভাস্কর্যে এমন উদ্ভট অসঙ্গত নির্মাণকর্ম দেখা যায়, যা মনের মধ্যে এক বিরূপ ধারণারই সঞ্চার করে।

বিকাশের পুঁজিবাদী পর্যায় যে অনিবার্য এমন কথা মেনে নেওয়া সঙ্গত হবে কি না। এই প্রশ্নে আমাদের জবাব হবে নেতিবাচক।'

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অভিজ্ঞতা পূর্বতন ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলির জনগণকে জাতীয় পুনরুজ্জীবন ও সমাজপ্রগতির সোজাসুজি ও বিস্তৃত পথ নির্দেশ করে। কিন্তু এ পথ আঁকড়ে ধরে দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে যেতে হলে নির্দিষ্ট পরিস্থিতি অপরিহার্য। যে-সব দেশ নিজেদের সামাজিক অর্থনৈতিক বিকাশের দিক থেকে অত্যন্ত পিছিয়ে আছে, সেখানে তা গড়ে তোলা বেশ কঠিন। মুক্তিপ্রাপ্ত জাতিগুলির সামনে বিপদ বড় কম নয়। নবীন রাষ্ট্রগুলি যাতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে না পারে, যাতে সেখানে পুরনো ব্যবস্থাদি বজায় থাকে তার জন্য সাম্রাজ্যবাদ ও অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া চেষ্টার ত্রুটি করে না। কিছু কিছু মুক্তিপ্রাপ্ত দেশ ইতিমধ্যেই প্রতিবিপ্লবী শক্তিসমূহের কার্যকলাপের ফলে ভাগ্যের ওলট-পালট সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। প্রতিক্রিয়াকে পঙ্গু করে দিতে এবং পশ্চাৎগতি রুখতে হলে যে-সব প্রগতিশীল ও দেশপ্রেমিক শক্তি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, সামন্ততন্ত্রবিরোধী, গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়ার জন্য সংগ্রামরত — তাদের ঐক্য দৃঢ় করা অত্যন্ত আবশ্যক।

সাম্প্রতিক কালে বহু দেশে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম বস্তুত শোষণসম্পর্কবিরোধী সংগ্রামে পরিণত হতে চলেছে। স্বাধীন বিকাশের পথ অবলম্বনকারী বেশ কিছু সংখ্যক দেশের শাসক পার্টি ও রাজনৈতিক কর্মীদের ঘোষণায় সমাজতন্ত্র গঠন তাদের রাজনীতির উদ্দেশ্য বলে প্রকাশ পেয়েছে। এসব দেশে স্বল্প অথবা বেশি

দিনের আইনলঙ্ঘনের ঘটনার সামিল। উদাহরণস্বরূপ, অনবধানজনিত কাজে গুরুতর ত্রুটি, আচার-ব্যবহারে ত্রুটি ইত্যাদির কথা বাদ দেওয়া যায় না। চারপাশের লোকজনের দ্রুত প্রতিক্রিয়া এবং তাদের অবলম্বিত ব্যবস্থা যে সত্বর সকলের সমর্থন লাভ করবে — এই বিশ্বাস বিচ্ছিন্ন অমিতাচারের ঘটনা দমনের পক্ষে যথেষ্ট হবে।

আজ রাষ্ট্রসংস্থা যে-সব ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করে থাকে — অর্থনীতি ও সংস্কৃতিসংক্রান্ত কার্যপরিচালনা, উঠতি পুরুষের লালনপালন ও শিক্ষাদান এবং শ্রম ও উপযোগ সংগঠন — কমিউনিজমে তা অন্তর্ধান করবে না, — সমাজের বিকাশ অনুযায়ী পুনর্গঠিত হবে। এক্ষেত্রে কার্যপরিচালনা করবে নির্দিষ্ট সামাজিক কর্মকৌশল, সামাজিক আত্মনিয়ন্ত্রণের রাষ্ট্রহীন ব্যবস্থা। উক্ত কর্মকৌশলে রাজনৈতিক চরিত্র না থাকলেও তা যে-কোন রাষ্ট্রের চেয়ে শক্তিশালী হবে তার বিপুল নৈতিক কর্তৃত্বের বলে।

রাষ্ট্রের তিরোধান — জটিল সামাজিক প্রক্রিয়া। এটাও অত্যন্ত স্পষ্ট যে এমন কি কমিউনিস্ট সামাজিক আত্মনিয়ন্ত্রণব্যবস্থা গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই তা প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক পরিপূর্ণতা লাভ করবে না। এই কারণে রাষ্ট্র তিরোহিত হওয়ার পরও যে কিছু সময়ের জন্য কমিউনিস্ট পার্টি বজায় থাকবে এমন মনে করার যথেষ্ট ভিত্তি আছে। সামাজিক আত্মনিয়ন্ত্রণের সকল শাখায় অব্যাহত ও সুশৃঙ্খল কর্মব্যবস্থা নিশ্চিত করে পার্টি তার ঐতিহাসিক ব্রত সমাধা করবে এবং সমগ্র সমাজের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যাবে।

মানুষে বাস করছে ভয়ঙ্কর নিঃস্বতার মধ্যে, যেখানে কোন কে মার্কিন সাংবাদিকের ভাষায়: 'বস্তিতে ইঁদুর মানুষকে গ্রাস করছে'।

বুর্জোয়া প্রচার যত উদ্যমই দেখাক না কেন পুঁজিবাদের সেই গঠনগত ত্রুটি গোপন করে রাখার ক্ষমতা তার নেই, যা মানুষের উপর মানুষের শোষণ, এক জাতির উপর অপর জাতির উৎপীড়ন এবং সামাজিক বৈষম্যের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে এবং তাই থেকে গেছে।

ইতিহাস অনেক আগেই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে। সাম্রাজ্যবাদ আজ দণ্ডিত, কেননা সমাজবিকাশের বিষয়গত নিয়মবদ্ধতা আমাদের শতকের কর্মসূচিতে রেখেছে সমাজতন্ত্রে বৈপ্লবিক উত্তরণ।

চতুর্থ অধ্যায়

পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগ

১৫ ॥ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র গঠন

শ্রমিক শ্রেণীর ঐতিহাসিক ব্রত

অর্থনীতির যে নিয়মে পুঁজিবাদের বিকাশ পরিচালিত হয় তা উদ্‌ঘাটন করে মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতারা দেখিয়েছেন যে উক্ত ব্যবস্থা তার সমাধিরচনাকারী প্রলেতারিয়েতকেই বড় করে তুলছে।

প্রলেতারিয়েতই কেন পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয়? এর কারণ, জীবন ও শ্রমের পরিস্থিতি প্রলেতারিয়েতকে বুর্জোয়া সমাজের সবচেয়ে অগ্রণী, সবচেয়ে বিপ্লবী শ্রেণী করে তোলে।

শ্রমিকের কাজ হল মেশিন ও যন্ত্রপাতি নিয়ে, আর তার জন্য দরকার বিশেষ জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা। শ্রমিককে ন্যূনতম বিদ্যা হলেও পুঁজিপতিদের তা দিতে হবে, কেননা তা না হলে তার পক্ষে যন্ত্র চালানো সম্ভব নয়। আর যার শ্রম যত জটিল, তার বোধশক্তি, জরুরী ঘটনাসমূহ

উপলব্ধির, নিজের শোচনীয় অবস্থা বোঝার এবং মুক্তির জন্য সংগ্রামের প্রয়াস তত বেশি।

সকল শ্রমজীবী শ্রেণীর মধ্যে প্রলেতারিয়েত যে কেবল **সবচেয়ে বোধশক্তিসম্পন্ন** তাই নয়, — এছাড়াও প্রলেতারিয়েত **সবার চেয়ে বেশি সংগঠিত** শ্রেণী; কেননা শ্রমিকেরা পরিশ্রম করে কলকারখানায়, যেখানে শ্রমের প্রক্রিয়া নির্ভর করে তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার উপর, যেখানে প্রত্যেকেই দিনের পর দিন বন্ধুত্বের হাত অনুভব করতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, নিজেকে তারই মতো পরাধীন মেহনতী মানুষের সমবায়ে গড়ে ওঠা বিশাল সেনাবাহিনীর অংশ বলে মনে করে। ধর্মঘটে অংশগ্রহণ ক'রে প্রলেতারিয়েত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বুঝতে পারে যে সংহতি এবং সংগঠিত ক্রিয়াকলাপের সামর্থ্য হল শ্রেণীশত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের শক্তিশালী অস্ত্র।

প্রলেতারিয়েতের বোধশক্তি ও সাংগঠনিক ক্ষমতা তাকে **সেরা বিপ্লবী শ্রেণীতে** পরিণত করেছে। এর আরও কারণ হল এই যে পুঁজিবাদে তার এমন কিছুই থাকে না যা হারানোর ভয় তাকে করতে হবে। অপর শ্রমজীবী শ্রেণী — কৃষকসম্প্রদায়ও নিষ্ঠুর শোষণের মুখে পড়ে। কিন্তু যেহেতু কৃষকের নিজস্ব জমির টুকরো আছে, সেহেতু তার চেতনার মধ্যে মেহনতী মানুষের এবং ক্ষুদ্র মালিকের দৃষ্টিভঙ্গির দ্বন্দ্ব চলে: প্রথমটি তাকে সামনে — সমাজতন্ত্রের দিকে আকর্ষণ করে, দ্বিতীয়টি — পেছনে — পুঁজিবাদের দিকে। কিন্তু প্রলেতারিয়েতের শ্রমশক্তি ছাড়া আর কিছুই নেই। মার্কসের কথায়, তাদের শৃংখল ছাড়া আর কিছুই হারানোর নেই, কিন্তু তারা অর্জন করবে সমগ্র বিশ্ব।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব

ঐতিহাসিক ব্রত পালন করায় প্রলেতারিয়েত সেই **সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের** — গভীরতম সমাজ-বিপ্লবের চালিকাশক্তি ও অধিনায়ক হয়ে দাঁড়ায়, যার মূল দায়িত্ব হল উৎপাদনের উপায়ের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা এবং মানুষের উপর মানুষের শোষণের উচ্ছেদ ঘটানো। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধন ক'রে প্রলেতারিয়েত কেবল নিজেকেই মুক্ত করে না, — সে সমস্ত শ্রমজীবী জনগণ এবং গোটা সমাজকে মুক্ত করে। আর যেহেতু জনসাধারণের মূলগত স্বার্থ প্রলেতারিয়েতদের স্বার্থের সঙ্গে মিলে যায়, সেহেতু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে যে ব্যাপক জনসাধারণ এবং সর্বোপরি মেহনতী কৃষকসম্প্রদায় যোগদান করে সেটা স্বাভাবিক। লেনিনের কথায়, শ্রমিক ও কৃষকদের বিপ্লবী ঐক্য পুঁজিবাদের উপর জয়ের শর্তস্বরূপ। এই কারণে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কোন 'সক্রিয় বিপ্লবী' দলের ষড়যন্ত্র বা ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া কু'য়ের মতো হতে পারে না, — তাকে হতে হবে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি-পরিচালিত শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে কোটি কোটি মানুষের আন্দোলন ও সংগ্রাম।

প্রশ্ন হতে পারে: তা হলে যে-সব দেশে সামন্ততন্ত্রের অবশেষ রয়ে গেছে (যেখানে জমিদারি প্রথা, সম্প্রদায় অনুযায়ী সমাজের স্তরবিভাগ আছে, সাধারণ নির্বাচনের অধিকার, অন্যান্য গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতার অস্তিত্ব নেই) সেখানে প্রলেতারিয়েতের দায়িত্ব কী হবে? গোঁড়া ব্যক্তিদের মতে (রুশ মেনশেভিকরাও যাদের দলে পড়ে) সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম — বুর্জোয়াদের কাজ: বুর্জোয়ারা বুর্জোয়া বিপ্লব সম্পন্ন করে পুঁজিবাদী সম্পর্ক কায়েম করুক,

তারপর পুঁজিবাদ উৎখাতের জন্য প্রলেতারিয়েতের পালা আসবে। এই অবাস্তব তত্ত্বের বিরোধিতা করে ভ. ই. লেনিন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে প্রলেতারিয়েতের প্রাধান্যের কথা উত্থাপন করেছেন। সাম্রাজ্যবাদের যুগে বুর্জোয়ারা সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক সংগ্রামের সামর্থ্য রাখে না, আগুনের থেকেও তাদের বেশি ভয় প্রলেতারিয়েতকে, আর সেই কারণেই তাদের চেষ্টা থাকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে সামন্তদের সঙ্গে আপসে আসার, তাদের সঙ্গে জনবিরোধী জোট বাঁধার। একমাত্র প্রলেতারিয়েতই কৃষকসম্প্রদায়ের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারে। আর বিপ্লবের ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করে প্রলেতারিয়েত স্বভাবতই গণতান্ত্রিক সমস্যার সমাধান অপূর্ণ রাখতে পারে না, জনসাধারণকে আরও এগিয়ে নিয়ে চলে, — নিয়ে চলে সমস্ত রকম শোষণ ধ্বংস করার পথে। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে রূপান্তরিত হয়।

আগেই বলা হয়েছে যে যে-কোন বিপ্লবের মূল প্রশ্ন হল ক্ষমতা দখলের প্রশ্ন। সামনে যে সুবিপুল সমস্যা পড়ে রয়েছে তার সমাধান করতে গেলে শ্রমিক শ্রেণীকে ক্ষমতা দখল করতে হবে। কী উপায়ে সে এটা করবে তা নির্ভর করে যে দেশে বিপ্লব ঘটছে তার নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতির উপর। জনসাধারণের বিপ্লবী আন্দোলনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শোষক শ্রেণী যদি খোলাখুলি বলপ্রয়োগের আশ্রয় নেয় এবং সেই উদ্দেশ্যে পুরোদমে সামরিক আমলাতান্ত্রিক দমননীতি প্রয়োগ করে তা হলে শ্রমিক শ্রেণীকে শাসনক্ষমতা অধিকার করতে হয় সশস্ত্র সংগ্রামের পথে।

তবে, শোষক শ্রেণী সর্বদাই বলপ্রয়োগের আশ্রয় নিতে পারে না। শ্রমিক শ্রেণীর দিকে পাল্লা যখন স্পষ্টতই ভারী দেখা যায়, তখন শোষক শ্রেণীও সশস্ত্র বলপ্রয়োগের আশ্রয়

নিতে পারে না অথবা নেওয়ার সিদ্ধান্তে আসতে পারে না; তখন ক্ষমতার হস্তান্তর শান্তিপূর্ণ উপায়ে হতে পারে। অবশ্য পথ শান্তিপূর্ণই হোক আর অশান্তিপূর্ণই হোক, তার লক্ষ্য হল শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে জনগণের বিপ্লবী সংগ্রাম এবং **প্রলেতারীয় একনায়কত্বের** প্রতিষ্ঠা।

প্রলেতারীয় একনায়কত্ব

পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য সমাজকর্তৃক রাষ্ট্রপরিচালনা প্রলেতারিয়েতের দিক থেকে হওয়া দরকার, — সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পর্কে সমগ্র মার্কসীয়-লেনিনীয় মতবাদের এটাই হল মূল কথা। বস্তুত, এক নজরে একটু ধারণা করে দেখাই যাক না যে শ্রমিক শ্রেণী শাসনক্ষমতা অর্জন করে উৎপাদনের উপায়কে সামাজিক মালিকানায় হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে 'অবসর গ্রহণ করল'। পরিণামে কী হতে পারে? পরের দিনই বুর্জোয়া আবার শাসনক্ষমতায় ফিরে আসবে, সবই আগের মতো থেকে যাবে।

কেবল ডিক্রি জারি করেই পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব নয়। ডিক্রির পেছনে থাকা দরকার জনগণের সংগঠিত শক্তি, — যে শক্তি তাকে জীবনে রূপায়ণের ক্ষমতা রাখে, কার্যত বিপ্লবের কর্তব্য সাধন করতে পারে। যে শোষক শ্রেণী সমস্ত রকম উপায়ে, — কখনও কখনও সশস্ত্র সংগ্রামের আশ্রয়ে পর্যন্ত মরিয়া হয়ে বিপ্লব ঠেকাতে থাকে, তাদের কাছ থেকে মেহনতী জনগণের স্বার্থ ও সামাজিক সম্পত্তিকে রক্ষা করা প্রয়োজন।

কিন্তু এটাই সব নয়; কেননা উৎপাদনের উপায় সামাজিক মালিকানায় হস্তান্তরিত হওয়ার পরও নূতন সমস্যা দেখা দেয়: বৈজ্ঞানিক উপায়ে অর্থনীতির বিন্যাস সাধন, উৎপাদনী শক্তির দ্রুত বৃদ্ধি সুনিশ্চিতীকরণ এবং সমাজতন্ত্র গঠনসম্পর্কিত অন্যান্য বহু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জনসাধারণকে সংগঠিত করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। প্রলেতারীয় রাষ্ট্র ব্যতিরেকে এর কোনটাই সম্ভব নয়।

বুর্জোয়াসম্প্রদায় এবং শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে তার লেজুড়েরা মার্কসবাদের উপর আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হিশেবে প্রলেতারীয় একনায়কত্বকে যে বেছে নিয়েছে, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। বলপ্রয়োগের কপট নিন্দা করে তারা শ্রমিক শ্রেণীকে নিরস্ত্র করতে চায়। প্যারিস কমিউন তার সময়ে বিপ্লবের শত্রুদের বিরুদ্ধে নরম নীতি গ্রহণ করেছিল। যে-সব বুর্জোয়াকে কমিউন ক্ষমা করল, তারাই আবার প্রাশীয় হানাদারদের সঙ্গে জোট বেঁধে ফরাসী প্রলেতারিয়েতের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের বিনাশ করল। অথচ, সমগ্র বিশ্বের বুর্জোয়া প্রেস কমিউনারদের আখ্যা দিল বলপ্রয়োগকারী ও হত্যাকারী বলে।

পুঁজিবাদের গোটা ইতিহাসই হল জনসাধারণ এবং ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশের জাতিসমূহের উপর ক্রমাগত বলপ্রয়োগ ও অভূতপূর্ব নৃশংসতার ইতিহাস। এও কি বলা দরকার যে এর সঙ্গে প্রলেতারীয় বিপ্লবের স্বল্পকালীন বলপ্রয়োগের কোন রকম তুলনাই চলতে পারে না, কারণ শেষ পর্যন্ত সব রকম বলপ্রয়োগের অবসান ঘটানোই সেই স্বল্পকালীন বলপ্রয়োগের উদ্দেশ্য। সার্জন যেমন সাহস নিয়ে অপারেশন করে দীর্ঘকালীন ও সংকটজনক পীড়া থেকে রোগীকে সারিয়ে তোলেন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবও তেমনি পুঁজিবাদের ক্ষতজনিত যাতনা থেকে সমাজকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে।

এই অপারেশনে যা প্রধান তা জনবিরোধী অপরাধের জন্য শোষকদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা গ্রহণ নয়। প্রলেতারিয়েত প্রাক্তন মালিকদের পরিশ্রম করার এবং নিজেদের শ্রমে সমাজের আর দশজন

মানুষের পাশাপাশি বসবাসের সুযোগ দিয়ে থাকে। কিন্তু তারা প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপে লিপ্ত হলে, জনসাধারণের অর্জিত সাফল্যের উপর হামলা করলে তাদের দমন করা হয়। এখানেই মুষ্টিমেয় পরজীবীগোষ্ঠীর হাত থেকে জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষাকারী প্রলেতারীয় একনায়কত্বের উচ্চ নীতিবোধ ও মানবিকতার পরিচয়।

শোষক শ্রেণী সম্পর্কে একনায়কত্ব হওয়ায় প্রলেতারীয় শাসন একই কালে **শ্রমজীবীদের কাছে গণতন্ত্র।**

এছাড়া আর অন্য কিছু হবারও নেই: কেন না প্রলেতারিয়েত এবং জনসাধারণের অন্যান্য শ্রমজীবী শ্রেণী ও স্তরের স্বার্থ একই। শ্রমিক শ্রেণী সমাজের দ্বারা রাষ্ট্রপরিচালনা ক'রে নিজে কোন বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে না, — বরং তার উল্‌টো: সমাজতান্ত্রিক গঠনের সবচেয়ে কঠিন কর্মক্ষেত্রে সে সর্বদাই অগ্রণী, সে তার দৃষ্টান্তের সাহায্যে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে, বিপ্লবী উদ্দীপনায় সকলকে সংক্রামিত করে।

কীভাবে প্রলেতারিয়েতের উচিত নিজের একনায়কত্বকে সংগঠিত করা, যাতে তার সামনে উপস্থিত ঐতিহাসিক সমস্যার সমাধান সে করতে পারে? বুর্জোয়া রাষ্ট্রের তৈরী যন্ত্রকে বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে ব্যবহার করা কি নেহাৎই অসম্ভব? না হয় শাসন ব্যাপারে দক্ষ আমলারাই প্রচার ও নির্দেশ পত্রাদি লেখার কাজ চালিয়ে যাক (অবশ্যই, প্রলেতারীয় শাসনপ্রদত্ত নূতন নির্দেশাদি অনুযায়ী); বিচারকেরা বিচার করে দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করুক (কেবল বিপ্লবী আইনের ভিত্তিতে); জেনারেলরা সেনাবাহিনীর খবরদারি করুক (কেবল প্রলেতারীয় সদর-দপ্তরের হুকুমমতো); আর জেলাররাও কয়েদীদের জেলখানায় ধরে রাখুক (কেবল বিপ্লবের শত্রু ও সমাজবিরোধী অপরাধীদের)...

কিন্তু এই ধরনের সিদ্ধান্তের ফলে রাষ্ট্রযন্ত্র হয়ে পড়ত অন্তঃসারশূন্য। আমলারা প্রলেতারীয় সরকারের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কার্যকলাপে লিপ্ত হত, জেনারেলরা বিপ্লববিরোধী ষড়যন্ত্রের আয়োজন করত, বিচারকরা বিপ্লবী আইন-কানুনকে বিকৃত করতে থাকত। এর কারণ এই যে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের গোটা যন্ত্রটাই এমনভাবে তৈরী, যাতে জনসাধারণকে দমন করে রাখা যায়, আর রাষ্ট্রীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকে হয় শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধিরা নয়ত আমলারা, যারা সামগ্রিকভাবে পুরনো ব্যবস্থার অনুরাগী।

অর্থাৎ, প্রলেতারিয়েতের দায়িত্ব হল **বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভেঙ্গে ফেলে নূতন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করা**। এই রাষ্ট্র — ঐতিহাসিক দিক থেকে উচ্চ ধরনের রাষ্ট্র, যার সংগঠনের রূপ ও কার্যকলাপ জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা এবং কমিউনিস্ট সমাজ গড়ে তোলার অনুকূল।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উপর সফল আঘাত হানতে হলে প্রলেতারিয়েতকে তার আশু ও চূড়ান্ত লক্ষ্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে, আর সেই জ্ঞান দিতে পারে বিজ্ঞানভিত্তিক কমিউনিজমের তত্ত্ব। এটা ছাড়া শ্রমিক আন্দোলন অন্ধকারে মাথা খুঁড়ে মরত, সঠিক পথের সন্ধানে হাতড়ে বেড়াত মাত্র। শ্রমিক আন্দোলনকে কমিউনিজমের বিজ্ঞানের সঙ্গে কে যুক্ত করতে পারে? কে পারে জনসাধারণকে তাদের দুর্দশার কারণ বুঝিয়ে দিয়ে তা থেকে বেরিয়ে আসার পথ বাতলাতে? যত বড় প্রতিভাবান এবং সাহসীই হোক না কেন কোন একজন অথবা জনাকয়েক মানুষের সাধ্য নয় এই সমস্যার সমাধান করা। এর সমাধান করতে পারে কেবল **পার্টি — শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রণী ফৌজ, অগ্রবাহিনী,**

যা কমিউনিজমের কর্মে নিষ্ঠ সবচেয়ে সচেতন ও দৃঢ় বিপ্লবীদের সম্মিলিত করে।

পার্টির ভূমিকা কেবল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তাধারা প্রসারের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। যোদ্ধা ও নির্মাণকারীরা যত সচেতনই হোক না কেন, কিসের জন্য সংগ্রাম এবং কী গঠন করা দরকার — এসব তারা যত ভালোভাবেই বুঝুক না কেন, তাদের এমন কোন জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ পরিচালক আছেন কি না, যিনি সংগ্রাম ও নির্মাণকর্ম সংগঠন করেন, সম্ভাব্য বাধাবিপত্তির আঁচ করতে পারেন এবং তা অতিক্রমের জন্য জনসাধারণকে জোটবদ্ধ করতে পারেন, — এর উপর শেষ পর্যন্ত তাদের সাফল্য নির্ভর করছে। কমিউনিস্ট পার্টিই হল বিপ্লবী সেনাদলের সেই সাহসী সেনানায়ক, কমিউনিস্ট গঠনকর্মের প্রাজ্ঞ কারুকার।

উত্তরণপর্বের আবশ্যকতা

অক্টোবর বিপ্লবের জয় রুশ দেশের প্রলেতারিয়েত ও তার কমিউনিস্ট পার্টির সামনে যে-সব জটিল প্রশ্ন হাজির করেছিল সেগুলি পরিণামে দাঁড়াল একটি প্রশ্নে: কোথা থেকে শুরু করা যায়? প্রশ্নটার উত্থাপনার মধ্যেই পূর্ববর্তী অন্য সব বিপ্লব থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মূলগত প্রভেদ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। যেমন, বুর্জোয়া বিপ্লব জয়লাভ করল তখনই, যখন সমাজে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার রূপ গড়ে উঠেছে, তার দায়িত্ব ছিল পুঁজিবাদী সম্পর্কের পথ থেকে সামন্ততান্ত্রিক বাধা দূর করে অবাধ বিকাশ সুনিশ্চিত করা। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নূতন ব্যবস্থার কোন তৈরী রূপ খুঁজে বার করে না: পুঁজিবাদী সম্পর্ক যেমন

সামন্ততন্ত্রের গর্ভে বর্ধিত হয়, তেমনিভাবে সমাজতান্ত্রিক সম্পর্ক পুঁজিবাদের গর্ভে বেড়ে উঠতে পারে না। উপযুক্ত বৈষয়িক বনিয়াদের উপর নির্ভর করে (এগুলির মধ্যে প্রধান হল উৎপাদনের সামাজিক প্রকৃতি) তাকে অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক রূপ গড়ে তুলতে এবং সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ সুনিশ্চিত করতে হয়।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এই সুমহান সৃজনশীল দায়িত্বই পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে **উত্তরণপর্বের** — পুরনো পুঁজিবাদী সম্পর্কের ভাঙ্গন এবং নূতন সমাজতান্ত্রিক সম্পর্ক কায়েমের আবশ্যকতা নির্ধারণ করেছে। 'কোথা থেকে শুরু করা যায়?' — এ প্রশ্নের জবাব পেতে গেলে উত্তরণপর্বের মূল সমস্যাসমূহকে পৃথক করে নিয়ে সেগুলি সমাধানের সবচেয়ে ফলপ্রসূ উপায় খুঁজে বার করা দরকার। অন্য কথায় বলতে গেলে জীবনের অভিজ্ঞতাই সমাজতন্ত্র গঠনের বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনার দাবি জানিয়েছে। ভ. ই. লেনিন নির্মিত এই ধরনের পরিকল্পনাকেই কমিউনিস্ট পার্টি তার সমস্ত রকম কার্যকলাপের ভিত্তি হিশেবে রেখেছে। দেশের শিল্পায়ন, কৃষিব্যবস্থার যৌথীকরণ, সাংস্কৃতিক বিপ্লব, — এই হল উত্তরণপর্বের তিনটি প্রধান সমস্যা, সমাজতন্ত্র গঠন সম্পর্কে লেনিনীয় পরিকল্পনার তিনটি মূল ভাব।

লেনিন শিল্পায়নকে আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞানের ভিত্তিতে জনগণের অর্থনীতির সকল শাখার পুনঃসঞ্জীকরণ, শ্রমের উৎপাদনশীলতার দ্রুত বৃদ্ধি এবং জনগণের ঐশ্বর্যবৃদ্ধির একমাত্র উপায় হিশেবে বিবেচনা করেছিলেন। একমাত্র শিল্পায়নের মাধ্যমেই দরিদ্র ও শক্তিহীন রুশ দেশকে শক্তিমান

ও সমৃদ্ধিপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করা যায়, জনগণের সমৃদ্ধিকে সুনিশ্চিত করা যায়।

উক্ত ভাবনার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি ঘটেছে ভ. ই. লেনিনের সেই বিখ্যাত সূত্রটির মধ্যে: **'কমিউনিজম অর্থ হল সোভিয়েত শাসন, যোগ সমগ্র দেশের বৈদ্যুতীকরণ'**। এতে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে প্রথমত, কমিউনিজমের রাজনৈতিক দিকটি: সোভিয়েত শাসনই হল সেই রাজনৈতিক সংগঠন, যা ব্যাপক জনসাধারণকে সুযোগ দেয় সমাজের সব কিছুকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার, — যা তাদের সৃজনী প্রেরণার সঞ্চার করে, মেহনতী মানুষের স্বার্থে প্রকৃতিকে রূপান্তরের সুমহান সংকল্পকে বাস্তবে পরিণত করার সুযোগ দেয়। আর দ্বিতীয়ত, কমিউনিজমের অর্থনৈতিক দিক: সমগ্র দেশের বৈদ্যুতীকরণ এবং উৎপাদনী শক্তির বিপুল বিকাশ কমিউনিস্ট অর্থনীতি গড়ে তোলার দিকে পরিচালনা করবে, বৈষয়িক সম্পদের প্রাচুর্য সুনিশ্চিত করবে, সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মহান কমিউনিস্ট নীতির জীবনায়নে সহায়তা করবে। লেনিনের পরিচালনায় তৈরী 'রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় বৈদ্যুতীকরণ' পরিকল্পনায় কেবল বিদ্যুৎস্টেশনের জাল নির্মাণের কথাই ভাবা হয় নি; এতে শিল্পের সমস্ত শাখার পরম্পরাযুক্ত সমন্বিত বিকাশের কথা বিবেচনা করা হয়েছে, এবং আসলে এটাই ছিল শিল্পায়ন পরিকল্পনা। সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক বিকাশসংক্রান্ত প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনাগুলির মূলে ছিল 'রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় বৈদ্যুতীকরণ'।

ভারী শিল্প গড়ে তোলার ভিত্তিতে উত্তরণপর্বের আরও একটি যে জটিলতম সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়েছিল তা হল **ব্যক্তিগত, বিচ্ছিন্ন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষি খামারকে বিশাল যৌথ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে পুনর্গঠন**।

লেনিনীয় সমবায়ী পরিকল্পনার মর্মকথা এতেই নিহিত। সোভিয়েত রাষ্ট্র এমন শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক শিল্প গড়ে তুলছে যা কৃষি উৎপাদনের পুনর্গঠনে এবং তার জন্য

আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহে **সক্ষম**। কৃষকেরা ধীরে ধীরে যৌথ ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হতে থাকে; এর জন্য অতি সাধারণ সমবায়ব্যবস্থার, অর্থাৎ শ্রমশক্তি ও উপকরণের একত্রীকরণপ্রণালীর আশ্রয় নেওয়া হয়। ট্র্যাক্টর, কম্বাইন ও অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ভিত্তিতে বাস্তবে যৌথ শ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর কৃষকেরা স্বেচ্ছায় যৌথখামারে যোগ দেয়, কৃষি খামারের ব্যক্তিগত পরিচালনা বর্জন করে।

সর্বশেষে সমাজতন্ত্র গঠনের জন্য দরকার **সাংস্কৃতিক বিপ্লব।**

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মর্মকথা হল সংস্কৃতির **সুদূর** প্রসার (বিজ্ঞান ও শিল্পের সকল মূল্যবান বস্তু ব্যাপক জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে) ও **গভীরতার** বিকাশ (দেশের বিজ্ঞান, যন্ত্রপাতি ও শিল্পকে চরম উৎকর্ষ দান করতে হবে, তাকে পূর্ণ বিকশিত করে তুলতে হবে)।

কিন্তু সর্বাগ্রে প্রয়োজন অজ্ঞতা ও অশিক্ষার উচ্ছেদ। বিপ্লব-পূর্ব রাশিয়ায় জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ ছিল অশিক্ষিত, তরুণসম্প্রদায়ের মধ্যে চার-পঞ্চমাংশ ছেলেমেয়ে। কোন এক পত্রিকার হিসাব অনুযায়ী রাশিয়াতে তখন যে গতিতে শিক্ষার বিকাশ চলছিল তাতে সর্বস্তরে প্রাথমিক শিক্ষা পৌঁছুতে অন্তত ১২৫ বছর লাগার কথা, আর মধ্য এশিয়ার জাতিসমূহকে সাক্ষরতা দান করতে হলে — ৪৬০০ বছর!

এই কারণে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের সমস্যা ও গণশিক্ষা সংগঠনের ব্যাপারটা এত জরুরী ছিল।

পুঁজিবাদী রাশিয়ার সংগঠিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিশেষজ্ঞদের নিজের পক্ষে টেনে আনা সোভিয়েত শাসনের কাছে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ছিল। তাদের বুঝিয়ে জনগণের মহান কাজে আকর্ষণ করার প্রয়োজন ছিল।

ভ. ই. লেনিন মাক্সিম গোর্কিকে বলেছিলেন: 'বুদ্ধিজীবীদের বলুন, তাঁরা আমাদের দিকে আসুন। আপনার মতে তাঁরা সর্বান্তঃকরণে ন্যায়ের স্বার্থ রক্ষা করেন, তাই ত? তা হলে? আমাদের কাছে আসুন না: আমরাই জনগণকে নিজের পায়ে দাঁড় করানোর ও জগতের কাছে জীবনের সমস্ত সত্য প্রকাশ করার বিরাট ভার নিয়েছি, আমরা সকল জাতিকে মানবজীবনের সোজা পথ, — গোলামী, নিঃস্বতা ও লাঞ্ছনার হাত থেকে অব্যাহতির পথ দেখাচ্ছি।'

সেই সঙ্গে শত শত সহস্র সহস্র তরুণ বিশেষজ্ঞ গড়ে তোলার এবং সেই উদ্দেশ্যে উচ্চ ও মাধ্যমিক বিশেষ শিক্ষার বিস্তার আবশ্যক হয়ে পড়েছিল।

সমস্যার বিশালতায় ও নূতনত্বে, বাধাবিপত্তিতে ও সাময়িক অসাফল্যে ভীত না হয়ে সোভিয়েত কমিউনিস্টরা সমাজতান্ত্রিক গঠনসংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে এগিয়ে গেল। নূতন সমাজ গঠনের লেনিনীয় পরিকল্পনা অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েও ব্যাপক ও অভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন হল।

আলোচনার ফলাফল বিশ্লেষণ করে এখন আমরা পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিজ্ঞানভিত্তিক সব পথ স্পষ্টই দেখতে পাই।

সামাজিক বৈষম্য, জনসাধারণের দৈন্য ও দুর্দশার অবসান ঘটাতে হলে উৎপাদনের উপায়কে সর্বাগ্রে ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে সমগ্র সমাজের সম্পত্তিতে পরিণত করতে হবে। এটা করতে পারে একমাত্র নিপীড়িত ও হতভাগ্য শ্রেণীর বিপ্লব, যার নেতৃত্বে রয়েছে প্রলেতারিয়েত ও কমিউনিস্টদের পার্টি। প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব ছাড়া, বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের ভাঙ্গন এবং নূতন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পত্তন ছাড়া বিপ্লব জয়লাভ করতে পারে না।

আগেকার যে-সব বিপ্লবের কথা আমরা জানি তার সবগুলিই শোষণের এক রূপের বদলে আর এক রূপ নিয়ে এসেছে। **সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব চিরকালের জন্য মানুষের উপর মানুষের নিপীড়নের অবসান ঘটায়, সমাজের সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রশস্ত পথ উন্মুক্ত করে।** এখানেই তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য, তার অম্লান মহিমা।

আমাদের সময়ে এ সত্য বহু আগেই তত্ত্ব থেকে প্রয়োগের ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। শ্রমিক শ্রেণী ও তার কমিউনিস্ট অগ্রবাহিনীর পরিচালনায় সোভিয়েত দেশের জনসাধারণ সমাজতান্ত্রিক মূলনীতিতে অর্থনৈতিক বনিয়াদ, সামাজিক সম্পর্ক, রাজনৈতিক উপরিকাঠামো ও সমাজের চিন্তাধারা পুনর্গঠন করেছে, গড়ে তুলেছে সমাজতন্ত্র। ঐ একই সমস্যাসমূহের সমাধান বর্তমানে করছে ইউরোপ ও এশিয়ার বহু দেশ, যেখানে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয় হয়েছে। তাদের যৌথ অভিজ্ঞতায় মার্কসীয়-লেনিনীয় মতবাদ জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করছে।

আমাদের যুগের বিষয়বস্তু

মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সমগ্র বিশ্বে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে বৈপ্লবিক উত্তরণের যুগ সূচনা করেছে। কঠোর শ্রেণী-সংগ্রামের ফলে এবং আন্তর্জাতিক রঙ্গমঞ্চে সমাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের, প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার শক্তির মধ্যে বিরোধী সংগ্রামের পরিস্থিতিতে এই উত্তরণ ঘটে।

অন্তিম শোষণভিত্তিক ব্যবস্থা বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করে না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অস্তিত্বকাল বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের হাতে যে-সব অর্থনৈতিক ও

সামরিক সঙ্গতি আছে, রাজনৈতিক ক্ষমতা, আন্তর্জাতিক প্রভাবের কৌশল এবং প্রচারের যে-সব শক্তিশালী আধুনিক উপায় আছে — তার সবগুলি প্রয়োগ করে থাকে। তারা বিপ্লবী আন্দোলনের যে-কোন দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে, প্রতি আক্রমণের পথে নামে এবং ইতিহাসের নিয়মিত গতির চাকা ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।

কিন্তু এ ধরনের প্রয়াস শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বিপ্লবী শক্তির সামনে সময় সময় যত কঠিন বাধাই আসুক না কেন, সে শক্তি প্রত্যয়ের সঙ্গে সামনে এগিয়ে যায়, নূতন নূতন ক্ষেত্র জয় করে নেয় এবং সর্বত্র প্রতিক্রিয়াকে কোণঠাসা করে ফেলে। যে মতাদর্শের পতাকাতলে আধুনিক কালের সবচেয়ে শক্তিমান রাজনৈতিক আন্দোলন — কমিউনিস্ট আন্দোলন পরিচালিত, দুনিয়ার ঘটনাবলীর বিকাশ সেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভাবগত যাথার্থ্যের অসংখ্য সাক্ষ্য বহন করে।

আমাদের বিপ্লবী মতবাদের বিজয় এ যুগের তিনটি মূল বিপ্লবী শক্তির — বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, শ্রমিক আন্দোলন এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের কার্যকলাপের মধ্যে জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করেছে।

১৬ ॥ বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপ ও এশিয়ার অনেকগুলি দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয় আমাদের যুগে অক্টোবর বিপ্লবের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হয়ে দাঁড়াল। একটি দেশের পরিধি ছাড়িয়ে পদক্ষেপ বিস্তার করে সমাজতন্ত্র এক বিশ্বব্যবস্থায় পরিণত হয়। তার বিকাশের বাস্তব

অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে লেনিনীয় মতবাদ — আন্তর্জাতিক, তা সকল দেশে প্রয়োগের উপযোগী এবং তা সকল জাতির পক্ষে সমাজতন্ত্র গঠনের সঠিক পথ নির্দেশ করে।

বাস্তব অভিজ্ঞতা নূতন পৃথিবী গঠনে মার্কসীয়-লেনিনীয় মতবাদের দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার যুক্তিযুক্ততা সম্পূর্ণভাবে প্রমাণ করল। প্রথমটি — সমাজতন্ত্রে উত্তরণের ক্ষেত্রে অখণ্ড নিয়মবদ্ধতা ও রূপগত বৈচিত্র্যসম্পর্কিত চিন্তা; দ্বিতীয়টি — আন্তর্জাতিকতাবাদ ও মুক্ত জাতিসমূহের ভ্রাতৃপ্রতিম মৈত্রীর ভিত্তিতে নূতন ধরনের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গঠনের চিন্তা।

রূপ — বিচিত্র, নিয়মবদ্ধতা — অখণ্ড

পুঁজিবাদে দেশগুলি যেমন অসমমাত্রায় বিকাশ লাভ করে, সেই হেতু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকেও তাদের অগ্রগতি এক রকম নয়: কোনও কোনও দেশের অর্থনীতি অপেক্ষাকৃত বিকশিত, আবার কারও বা পশ্চাৎপদ; কেউ হয়ত রাজনীতিগতভাবে স্বয়ম্ভর অথবা অন্ততপক্ষে আধা-স্বাধীন ছিল, কেউ বা সাম্রাজ্যবাদী দাসত্ব-বন্ধনে বাঁধা ছিল; সমাজের গঠনে মৌলিক পার্থক্য দেখা যায় (যেমন, শ্রমজীবী শ্রেণীগুলির মধ্যে প্রলেতারিয়েত অথবা কৃষকসম্প্রদায়ের প্রাধান্য, জাতীয় বুদ্ধিজীবীদের উপস্থিতি অথবা অনুপস্থিতি, সামন্ততান্ত্রিক জের বজায় থাকার মাত্রা এবং পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিকাশমানতা, — যার উপর বুর্জোয়া শ্রেণীর অবস্থানের স্থায়িত্ব নির্ভর করছে ইত্যাদি); ঐতিহাসিক বিকাশের বিশেষত্ব, জাতীয় চরিত্র এবং মুক্তি ও বিপ্লবী আন্দোলনের ঐতিহ্যও কম তাৎপর্য বহন করে

না। যে-কোন দেশের বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া বিকাশের উপর বিশ্বের পারস্পরিক শক্তিসম্পর্ক এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, অর্থাৎ বাইরের ঘটনাসকল স্বল্প প্রভাব বিস্তার করে না।

স্পষ্টই বোঝা যায় যে সমাজতন্ত্র গঠনের প্রাথমিক পরিস্থিতিই যদি বিভিন্ন হয়, তা হলে সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনের রূপ, পদ্ধতি এবং গতিও এক রকম কদাচ হতে পারে না। বিজয়ী শ্রমিক শ্রেণী এবং তার কমিউনিস্ট অগ্রবাহিনীর সামনে তখন জটিল সমস্যা হাজির হয়: মার্কসীয়-লেনিনীয় মতবাদের সাধারণ মূলতত্ত্বকে নিজের দেশের বাস্তব পরিস্থিতিতে প্রয়োগ এবং নূতন সমাজ গঠনের এমন রূপ ও পদ্ধতির অনুসন্ধান, যা ন্যূনতম ব্যয়ে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের তত্ত্বভিত্তিক লক্ষ্যে পেঁছানোর সহায়ক হবে। বিপ্লবীদের কাছে আছে ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলির সমাজতান্ত্রিক গঠনের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা, কিন্তু তা সব সময় অনুকরণ নাও করা যেতে পারে: এক দেশের পক্ষে যা খাটে, অন্যত্রও তা যে বাঞ্ছিত ফল দেবে এমন কথা বলা যায় না। এই কারণে যা প্রয়োজন, তা হল অন্যান্য দেশের সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে সৃজনশীল মানসিকতা নিয়ে, দেশের বৈশিষ্ট্য এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার অবস্থানের কথা স্মরণে রেখে ব্যবহার করা।

সমাজতন্ত্র একটি দেশের পরিধি ছাড়িয়ে পদার্পণের বহু আগেই ভ. ই. লেনিন বলেছিলেন যে ইতিহাসের গতিতে অনিবার্যভাবে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের রূপে প্রাচুর্য দেখা দেবে। লেনিনের এই পূর্ব-অনুমান প্রত্যক্ষ প্রমাণিত হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, যখন সমাজতন্ত্র পরিণত হল এক বিশ্বব্যবস্থায়। যে-সব দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জয়লাভ করেছে তার মধ্যে আছে অতি শিল্পোন্নত দেশ, কৃষিপ্রধান

দেশ, আছে পূর্বতন আধা-ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিক দেশ। আর এখানেই সমাজতান্ত্রিক গঠনের রূপ ও পদ্ধতিগত বৈচিত্র্যের সূত্রপাত।

এদের মধ্যে অধিকাংশ দেশে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পথে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব এই যে সেখানে বিপ্লব জয়লাভ করেছে শক্তিশালী ফাশিস্তবিরোধী আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে, — যেখানে প্রলেতারিয়েত এবং তার সংগ্রামী কমিউনিস্ট অগ্রবাহিনীর নেতৃত্বে সর্বাধিক ব্যাপক স্তরের জনসাধারণ (কৃষক শ্রেণী, শহরের পেটি বুর্জোয়া, বুদ্ধিজীবীসম্প্রদায় এবং মাঝারি বুর্জোয়াদের দেশপ্রেমিক মনোভাবসম্পন্ন একাংশ) একক জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

এর ফলে অনেক দেশে ক্ষমতা দখল করা গেছে শান্তিপূর্ণ উপায়ে — সামরিক অভ্যুত্থান এবং গৃহযুদ্ধ ছাড়াই। যেমন ঘটেছিল ১৯৪৮ সনের ফেব্রুয়ারিতে চেকোস্লোভাকিয়ায়, যখন প্রাগের প্রলেতারিয়েতের বিখ্যাত বিক্ষোভ-মিছিল এবং দেশের সমগ্র মেহনতী মানুষের ইচ্ছাশক্তির সামনে প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে পিছু হটে যেতে হয়, কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হল।

জনগণের শাসনক্ষমতা কায়েমের পথে যারা বাধা সৃষ্টির প্রয়াস করেছিল, সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে সেই সব প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে অবশ্যই কঠোর সংগ্রাম পরিচালনা করতে হয়। কিন্তু সে-সংগ্রাম গৃহযুদ্ধের সীমানায় পেঁছাল না, কেননা সোভিয়েত ইউনিয়ন নবীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির উপর সাম্রাজ্যবাদীদের হামলার পথ বন্ধ করে দেয়, তাছাড়া স্থানীয় বৃহৎ বুর্জোয়ারও বাইরের খোলাখুলি সমর্থন ছাড়া শ্রমজীবী জনসাধারণের শাসনক্ষমতার বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে নামার মতো যথেষ্ট শক্তি ছিল না।

এখানেই সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের রূপ ও সময়গত স্বকীয়তার সূত্রপাত। বিতাড়িত শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধিদের রাজনৈতিক অধিকার অংশত সঙ্কুচিত হয়েছে মাত্র, আবার কোন কোন দেশে আদৌ হয়

না। বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের ভাঙ্গন তৎক্ষণাৎ আসে না, — তা সম্পন্ন হয় ধীরে ধীরে।

পুরনো রাষ্ট্রব্যবস্থার বহু দপ্তর ও সংস্থা লোপ না পেয়ে রূপান্তরিত হল, সেগুলি নূতন শ্রেণীগত বিষয়ে পরিপূরিত হয়ে জাতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হল; পুরনো বিশেষজ্ঞদের ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো হল, আর তার ফলে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ভাঙ্গন এড়ানো সম্ভব হল। কমিউনিস্ট-পরিচালিত বহু সমাজতান্ত্রিক দেশের সরকারে কৃষক শ্রেণী,বুদ্ধিজীবীসম্প্রদায় এবং জনসংখ্যার অন্যান্য স্তরের আংশিক প্রতিনিধিত্বমূলক অন্যান্য পার্টি অংশগ্রহণ করে থাকে। বৃহৎ জমিদারী স্বত্ব উচ্ছেদের পর প্রথম প্রথম জমির উপর কৃষকদের ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় ছিল — কৃষকের স্বেচ্ছায় সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জমি ধীরে ধীরে সামাজিক মালিকানায় পরিণত হল। কোন কোন দেশে জনগণের শাসনক্ষমতা বুর্জোয়া শ্রেণীকে উৎপাদনের উপায়ের আংশিক মূল্য পরিশোধ করে — এমন সম্ভাবনা মার্কসও অনুমান করেছিলেন; তিনি বলেছিলেন যে কোন কোন পরিস্থিতিতে 'পুরো পাওনা মিটিয়ে' বুর্জোয়াদের কাছ থেকে কিনে নেওয়াও প্রলেতারিয়েতের পক্ষে লাভজনক।

পূর্বতন ঔপনিবেশিক এবং পরাধীন দেশগুলিতে বিপ্লবের পথ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল। চীনে, কোরিয়ায় ও ভিয়েৎনামে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব উদ্ভূত হয় স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত জনযুদ্ধ থেকে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পূর্বতন আধা-উপনিবেশ কিউবায় ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে পরিচালিত দুঃসাহসী বিপ্লবীদলের 'মনকাদা' সেনানিবাসের উপর বীরত্বপূর্ণ আক্রমণের সূত্রপাত এবং অতঃপর 'গ্রান্‌মা' থেকে গেরিলাবাহিনীর অবতরণ — সশস্ত্র সংগ্রামের ভিত্তি রচনা করে। শ্রমিক আন্দোলন এবং বিপুল কৃষক শ্রেণীর সমর্থনপুষ্ট দেশপ্রেমিকদের আঘাতে পচা শাসনব্যবস্থা ধ্বংসে পড়ল।

যে-কোন দেশে অথবা দেশপুঞ্জে সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পথ যে বড় রকমের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট — এ ঘটনা থেকে কিন্তু এমন সিদ্ধান্তে আসা যায় না যে প্রতিটি দেশে নিজের বিশেষ ধরনের 'জাতীয়' সমাজতন্ত্র গড়ে ওঠে।

সমাজতন্ত্রের প্রকৃতিতে রুশ অথবা চীন, জার্মান অথবা পোলিশ সমাজতন্ত্র বলে কিছু নেই, — থাকতে পারে না। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল রূপ মানবসমাজের বিকাশের বাস্তব চাহিদা প্রকাশ করে এবং তা সকল দেশ ও জাতির জন্য এক রকম না হয়ে যায় না।

ঠিক এই কারণে রূপে ও পদ্ধতিতে সকল রকম বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর অনিবার্যভাবে **পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সাধারণ নিয়মবদ্ধতার** অধীন।

প্রলেতারিয়েত, শ্রমজীবী জনসাধারণ উৎপাদনের উপায় পুরো পাওনা মিটিয়ে নিয়ে নিতে পারে, আবার মূল্য পরিশোধ না করেও নিতে পারে, বুর্জোয়া শ্রেণীর হাত থেকে স্বত্ব তৎক্ষণাৎ ছিনিয়ে নিতে পারে, ধীরে ধীরেও নিতে পারে। কিন্তু সকল পরিস্থিতিতেই উৎপাদনের উপায় সামাজিক মালিকানার অধীন হওয়া দরকার, অন্যথায় সমাজতন্ত্রের কথা বলে লাভ নেই। এটা কোন বাছাইয়ের ব্যাপার নয়, — সামাজিক বিকাশের নিয়মানুবর্তিতা।

প্রলেতারীয় একনায়কত্ব একক পার্টিব্যবস্থার রূপ নিতে পারে, আবার বহু পার্টিব্যবস্থারও নিতে পারে, যখন শাসনক্ষমতায় থাকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের পরিচালিত পার্টি জোট। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই শ্রমিক শ্রেণী ও তার রাজনৈতিক অগ্রবাহিনীর পক্ষ থেকে সমাজের উপর রাষ্ট্রীয় পরিচালনা অপরিহার্য; সব ক্ষেত্রেই সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাজ হবে রাষ্ট্র-পরিচালনায় ব্যাপকতম জনসাধারণের অন্তর্ভুক্তি এবং তাদের স্বাধীন উদ্যোগ ও সৃজনী কর্মোদ্যমের বিকাশ, — অন্য কথায় বলতে গেলে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র সুনিশ্চিত করা। এটাও নির্বাচনের বিষয় নয়, — সামাজিক বিকাশের নিয়মানুগতা, — যার

পদ্ধতি অনিবার্যভাবে সমাজতান্ত্রিক আদর্শবোধেরই বিকৃতি সূচনা করে, নূতন সমাজ গঠনের পথ জটিল করে তোলে এবং কৃত্রিম বাধা-বিপত্তিতে তাকে ঘিরে ফেলে।

অন্ধকারে বিভ্রান্ত না হয়ে নিজের সমগ্র রাজনীতিকে যুক্তিসঙ্গত বৈজ্ঞানিক বনিয়াদের উপর দাঁড় করাতে হলে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সাধারণ নিয়মানুগতা জানা যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। তা সম্ভব করে তোলে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব, — যে তত্ত্ব সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের বিকাশের অভিজ্ঞতায় পরীক্ষিত হয়েছে, সমৃদ্ধি লাভ করেছে।

যে-কোন রূপেই হোক না প্রলেতারীয় একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা ও প্রলেতারীয় বিপ্লব ব্যতিরেকে, কৃষকসম্প্রদায়ের মূল জনসমষ্টি এবং শ্রমজীবীদের অন্যান্য স্তরের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর জোট ব্যতিরেকে সমাজতন্ত্রে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। উৎপাদনের মূল উপায়ের উপর সামাজিক মালিকানার প্রতিষ্ঠা ছাড়াও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কৃষিব্যবস্থার ক্রমিক সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম গঠন এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির নিয়মিত বিকাশ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। মতাদর্শ এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পাদন, শ্রমিক শ্রেণী, মেহনতী জনগণ এবং সমাজতান্ত্রিক উদ্দেশ্যের প্রতি নিষ্ঠাবান অসংখ্য বুদ্ধিজীবী গড়ে তোলা, জাতীয় নিপীড়নের অবসান ঘটানো এবং জাতিতে জাতিতে সমাধিকার ও ভ্রাতৃসুলভ মৈত্রীর প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। সর্বশেষে, বিদেশী ও অভ্যন্তরীণ শত্রুর দুরভিসন্ধি থেকে সমাজতন্ত্রের অর্জিত সাফল্যকে রক্ষা

করা এবং প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার নীতি অনুযায়ী অন্যান্য দেশের শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে নির্দিষ্ট দেশের শ্রমিক শ্রেণীর সংহতি বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রগতির এই হল মুখ্য সাধারণ নিয়মানুগতা। ১৯৫৭ সনে মস্কোতে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিসমূহের প্রতিনিধিদের সভায় গৃহীত ঘোষণাপত্রে তা সূত্রবদ্ধ হয়েছে।

এই সব নিয়মের অনুসরণে এবং বিশেষ বিশেষ বাস্তব পরিস্থিতির উপযোগী বহু বিচিত্র ধরনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক রূপের প্রয়োগ ঘটিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পথে অবতীর্ণ দেশগুলির জনগণ সমগ্র সমাজব্যবস্থার আমূল রূপান্তর সাধন করেছে। যে-সব রাষ্ট্র নিয়ে বর্তমানে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গঠিত, সেখানে উৎপাদনের উপায়ের উপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এগুলির মধ্যে অধিকাংশ রাষ্ট্রেই কৃষি অর্থনীতির সমবায়ীকরণ সম্পন্ন হয়েছে। কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিসমূহের সিদ্ধান্তে উল্লেখ করা হয়েছে যে কোন কোন দেশে সমাজতন্ত্রের বনিয়াদ অথবা ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে, আবার কোন কোন দেশ উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের কাজে নেমেছে।

পরিষ্কার বোঝা যায় যে সমাজতন্ত্রের সফল গঠন যেমন বিষয়গত, তেমনি বিষয়ীগত পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে, নির্ভর করে কতটা ধারাবাহিক উপায়ে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তাধারা বাস্তবে পরিণত হবে এবং সমাজবিকাশের প্রক্রিয়ায় বৈজ্ঞানিক চরিত্র কী পরিমাণ নেতৃত্ব দেয়, তার উপর। এই সব দাবি লঙ্ঘন এবং সমাজতন্ত্র গঠনের উদ্ভাবিত তত্ত্ব ও বাস্তবে পরীক্ষিত পথ ও পদ্ধতি থেকে বিচ্যুতি সমাজতন্ত্রের বিরাট ক্ষতি সাধন করতে পারে,

ন্তন সমাজ গঠনের কাজে মারাত্মক বিঘ্ন ঘটাতে, এমন কি তাকে পিছিয়ে দিতে পারে।

ন্তন ধরনের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

একক দেশের সীমানা থেকে সমাজতন্ত্রের বহির্গমন এবং বিশ্বব্যবস্থায় তার র্পান্তরের ফলে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সামনে এক সমস্যার উদ্ভব হল: সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগ্নলির মধ্যে সম্পর্কের র্পটি কেমন হওয়া উচিত?

এই সমস্যা সমাধানের প্রাথমিক প্র্বশর্তগ্নলি স্নুস্পষ্ট। সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য চিরকালের জন্য জাতিতে জাতিতে অনাস্থা ও শত্র্তার অবসান ঘটানো এবং প্থিবীতে চিরন্তন শান্তি ও মুক্ত জাতিসম্হের মধ্যে মৈত্রী প্রতিষ্ঠা। এবং এটা সম্প্র্ণ বোঝা যায় যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসম্হের মধ্যে সম্পর্কের গোটা গঠনকর্ম ঠিক এই উদ্দেশ্যেরই অধীন হতে হবে।

ব্যাপারটা কেবল এমন নয় যে এটা কমিউনিস্ট আদর্শবোধ এবং ন্যায়পরায়ণতা ও কল্যাণ সম্পর্কে আমাদের ধারণার উপযোগী। সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসরমান জাতিসম্হের মধ্যে দৃঢ়বন্ধন তাদের পক্ষে এক বিষয়গত অপরিহার্যতা। কেবল তত্ত্ব নয়, — প্রয়োগ নিজে এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপই তা আবিষ্কার করেছে: নিজের উদ্ভবের ম্হ্র্ত থেকে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের হ্মকির সঙ্গে সংঘর্ষের কারণে বিপ্লবের স্বার্থরক্ষার খাতিরে, সমাজতন্ত্রের গঠন সফল করে তোলার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক দেশগ্নলির জাতিসম্হকে নিজেদের শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হয়। ঠিক অন্র্পভাবে অর্থনৈতিক অবরোধের বির্দ্ধে দাঁড়াতে

হলে, পুঁজিবাদী বাজারে বাণিজ্যের যে লুণ্ঠনব্যবস্থার আধিপত্য চলছে তা থেকে রেহাই পেতে গেলে এবং জাতীয় অর্থনীতির দ্রুত বিকাশের অনুকূল সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করতে হলে তা একমাত্র ভ্রাতৃপ্রতিম সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিশ্বব্যাপী বিকাশের পথেই সম্ভব। সর্বশেষে, নিজেদের বৈদেশিক নীতির সমন্বয় সাধন করে আন্তর্জাতিক রঙ্গমঞ্চে ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টরূপে কার্য পরিচালনার দ্বারা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি নিজেদের রাজনৈতিক প্রভাব প্রচন্ড বৃদ্ধি করে, বিশ্বের ঘটনা-প্রবাহের উপর নিজেদের প্রভাবপ্রতিপত্তি অর্জন করে।

সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাধারণ রূপ, একই মার্কসীয়-লেনিনীয় মতাদর্শ, সরাসরি রাজনৈতিক আগ্রহ — এসবই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ঐক্যের অপরিহার্যতা নির্দেশ করে। আর এক্ষেত্রে নিছক রাষ্ট্রসমূহের জোটের কথা বলা হচ্ছে না, — বলা হচ্ছে নীতিগতভাবে নূতন ধরনের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের কথা।

সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্রগুলির সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র নূতন কী সূচনা করে তা আরও গভীরভাবে অনুধাবন করতে গেলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস স্মরণ করলেই যথেষ্ট হবে। পৃথিবীতে রাষ্ট্রের উদ্ভব প্রথম ঘটতে না ঘটতেই তাদের পরস্পরের মধ্যে নৃশংস সংগ্রাম শুরু হল, যেহেতু শাসনক্ষমতার অধিকারী শোষক শ্রেণীগুলির চেষ্টা ছিল যে-কোন মূল্যে নিজের অধিকার-ভুক্ত এলাকার সম্প্রসারণ ও অন্যান্য জাতিকে দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ করা। একের পর এক সংঘটিত যুদ্ধ অশেষ দুর্গতি ডেকে আনত, আর স্বল্পকালীন অবকাশমুহূর্তে নূতন সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি নেওয়া হত। ছল, বল, কৌশল — সব রকম উপায়ই গ্রাহ্য বলে গণনা করা হত, যদি তা প্রতিবেশীদের উপর জয়লাভের, অন্যান্য রাষ্ট্রকে অধীনস্থ করার এবং সাম্রাজ্য গড়ে তোলার সহায়ক হয়।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দস্যুবৃত্তির চূড়ান্ত পরিচয় পাওয়া যায় সাম্রাজ্যবাদের যুগে। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির নিজেদের মধ্যে, তাছাড়া দুর্বল দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ত বটেই, — অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি হয়ে দাঁড়াল চরম যুক্তি। যেমন, বিভিন্ন সময়ে মার্কিন রাজনীতিবিদরা সরকারীভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির চরিত্র নিরূপণ করেছেন নিম্নলিখিত ভাষায়: 'বৃহৎ লগুড়ের' রাজনীতি, 'ডলার কূটনীতি', 'নিউক্লিয়ার ব্ল্যাকমেলে'র রাজনীতি, 'শক্তির অবস্থান'জনিত রাজনীতি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের বিরুদ্ধে ও বিপ্লবী আন্দোলনবিরোধী আক্রমণমূলক সামরিক-রাজনৈতিক জোট গড়ে তুলল। কিন্তু জোটসম্পর্কও তাদের পরস্পরের মধ্যকার তীব্র বিরোধিতার অবসান ঘটায় না, বিক্রির বাজার এবং পুঁজি-বিনিয়োগের ক্ষেত্র অধিকারের জন্য সংগ্রাম অপসারিত হয় না।

কার্ল মার্কসের কথায়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চৌহদ্দিতে 'এক রাষ্ট্রের লাভ অর্থ অপর রাষ্ট্রের লোকসান'। কেবল তত্ত্ব নয়, — অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেও আজ আমরা বলতে পারি: সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার চৌহদ্দিতে প্রতিটি রাষ্ট্রের লাভ অর্থ একই সঙ্গে বাকি সব রাষ্ট্রেরও লাভ।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নূতন আদর্শ অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে সম্পন্ন রূপ নিয়ে দেখা দেয় না। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে নূতন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের জটিল ব্যবস্থা সুবিন্যস্ত করে তোলা দরকার। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নূতন আদর্শ গঠিত হতে থাকে বেশ দীর্ঘ ঐতিহাসিক পর্ব ধরে, যে পর্ব সমাপ্তি থেকে এখনও দূরে।

সর্বসাধারণের স্বীকৃতি অনুযায়ী আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিরাট ভূমিকার অধিকারী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বহু দেশে সমাজতান্ত্রিক

বিপ্লবের জয় পর্যন্ত অনেকটা সহজসাধ্য হয়ে দাঁড়াল এই কারণে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে পঙ্গু করে দিয়েছে, হস্তক্ষেপ মেনে নেয় নি, অবরোধের দ্বারা নবীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের শ্বাসরোধের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়েছে, তাদের নিজস্ব শিল্প গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

যুদ্ধপরবর্তী প্রথম বছরগুলিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য যে-সব দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জয়লাভ করেছে তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং আগ্রাসন ঘটলে জোটবদ্ধতা ও পারস্পরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়। সাম্রাজ্যবাদী 'ন্যাটো' ব্লক সংগঠনের প্রত্যুত্তরে ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের প্রতিরক্ষামূলক জোট গড়ে তুলল (১৯৫৫ সনের মে মাসে)। **ওয়ারশ চুক্তির** এই সংগঠন — সাধারণ সেনাপতিত্বে সম্মিলিত সামরিক শক্তির সংগঠন। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের মিলিত প্রতিরক্ষাব্যবস্থা এবং সর্বোপরি সোভিয়েত ইউনিয়নের নিউক্লিয়াস-রকেট শক্তি — সমাজতন্ত্রের ভরসামূলক রক্ষাকবচ হিশেবে কাজ করছে, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির যুদ্ধবাজ চক্রগুলিকে সংযত করে রেখে দিয়েছে।

বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্তর্গত দেশগুলির ঐক্য ও সংহতি আপনা-আপনি, বলতে গেলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসবে এমন কথা ভাবাটা নেহাৎই সরলীকরণ। কেননা জাতিতে জাতিতে নূতন সম্পর্ক গড়ে তুলতে হচ্ছে শতাব্দীব্যাপী জাতিবিদ্বেষ, অবিশ্বাস ও জাতীয়তাবাদী কুসংস্কারে অপরিচ্ছন্ন জমির উপর। উত্তরাধিকারসূত্রে পুঁজিবাদ থেকে আন্তঃরাষ্ট্রীয় কিছু কিছু বিতর্কমূলক সমস্যা দেখা দিতে পারে। কখনও কখনও বিভিন্ন দেশের নির্দিষ্ট ধরনের জাতীয় স্বার্থগত অমিলও দেখা যায়। যদিও প্রভাবের পর্যায়বিশেষে এ ধরনের বাধা-বিপত্তি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ভ্রাতৃসুলভ সহযোগিতার প্রভাবের সঙ্গে কোনও রকম তুলনায়ই আসতে পারে না,

তব্ সেগ্লিতে অতিক্রম করতে গেলে নিরন্তর ও বিপ্ল প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

ঠিক এই কারণেই আধ্নিক পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিসম্হের সঠিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রাজনীতি এবং সমাজতান্ত্রিক সহযোগিতার অন্তর্ভুক্ত সকল দেশের সাধারণ স্বার্থের সঙ্গে নিজ নিজ দেশের জাতীয় স্বার্থকে মেলানোর কাজে তাদের দক্ষতা বিরাট তাৎপর্য বহন করে।

মান্ষের ভাবনা-চিন্তা ছাঁচে-ফেলা নয়, এমন কি সকলে যদি একই মত পোষণ করে, তব্ সমাজতান্ত্রিক গঠনকর্ম ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সব সময় প্রোপ্রি এক রকম হয় না। কিন্তু আসল ব্যাপারটা এই যে মতের মিল এবং উদ্দেশ্যের অভিন্নতা খোলাখ্লি আলোচনার ভিত্তিতে মিলিত সিদ্ধান্ত রচনা সম্ভব করে তোলে। এই উদ্দেশ্যে কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগ্লি পারস্পরিক পরামর্শ ও আলাপ-আলোচনা চালায়, প্রতিনিধিদল বিনিময় করে এবং খোলাখ্লি বন্ধ্ত্বপূর্ণ পরিবেশে তাদের আগ্রহের সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগ্লির মধ্যে স্বাভাবিক বন্ধ্ত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যমূলক — সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের কর্মসূচিসংক্রান্ত একাধিক দলিলে স্থিরীকৃত **মূলনীতিসমূহের** অন্সরণ। সেগ্লি হল সমাধিকার, স্বাধীনতা ও জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা এবং পরস্পরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকা। সেই সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক দেশগ্লির মধ্যে সম্পর্ক কেবল এই সব নীতিতেই শেষ হয়ে যায় না, তাদের বনিয়াদ হিশেবে

কাজ করে **সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতাবাদের** নীতি। যে বিপুল ও বহুমুখী পারস্পরিক সহায়তা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির শক্তি দশগুণ বৃদ্ধি করে তার সবটাই অধিকার করে থাকে আন্তর্জাতিকতাবোধ, এবং আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতি বিশ্বাসই বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্যজনক বিকাশ ও পরাক্রমবৃদ্ধির ক্ষেত্র রচনা করে।

প্রলেতারিয়েতের অবাঞ্ছিত জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের সমস্ত এবং সর্ববিধ প্রকাশের বিরুদ্ধে চরম সংগ্রাম পরিচালনা — আন্তর্জাতিকতাবাদের সঙ্কল্প।

জাতীয়তাবাদের পুষ্টিসাধনকারী ক্ষেত্র — পেটি বুর্জোয়া পরিবেশ। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণীর পাশাপাশি কৃষক জনসাধারণ এবং শহরের পেটি বুর্জোয়াসম্প্রদায়ও অংশগ্রহণ করে। আগেই বলা হয়েছে (চতুর্থ অধ্যায়ের ১৫ ধারা দ্রঃ) যে পুঁজিবাদে এই সব স্তরের জীবনের পরিস্থিতি তাদের চেতনার দ্বৈধতা ও বিরোধিতার জন্ম দেয়। সর্বজাতীয় ক্ষেত্রে সঞ্চারিত ক্ষুদ্র মালিকের স্বার্থপরতা জাতীয় স্বার্থপরতার রূপ পরিগ্রহ করে, — যার অর্থ হল এক দিকে বাইরের জগৎ থেকে স্বদেশের সীমানার মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে ফেলার, স্বতন্ত্র করে রাখার এবং বিচ্ছিন্নকরণের প্রয়াস, আর অন্য দিকে নিজের জাতিকে আর সবার চেয়ে উপরে প্রতিষ্ঠার, তার উপর নিজের চিন্তা ও কর্মের রূপ চাপিয়ে দেবার এবং নিজের অগ্রাধিকার কায়েমের চেষ্টা। 'শক্তিমান ব্যক্তি'কে উপাসনার এবং জাতিকে গৌরব ও পরাক্রমের দিকে নিয়ে যাবেন এই বিশ্বাসে 'অভ্রান্ত' মহানায়ককে ঈশ্বরীকরণের প্রবণতা এর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত।

প্রলেতারিয়েতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল পেটি বুর্জোয়া জনসাধারণকে প্রলেতারীয়, মার্কসীয়-লেনিনীয় মতাদর্শ আয়ত্তে আনতে সাহায্য করা, আন্তর্জাতিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ করা ও বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের পথে পরিচালনা করা। বিশেষ করে যে-সব দেশে কৃষিজীবী জনসাধারণের বিপুল প্রাধান্য, সেখানে এই কাজের গুরুত্বের

প্রতি ভ. ই. লেনিন অবিরাম নির্দেশ করেছেন। পেটি ব্র্জোয়া জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিপদ বিশেষ করে বড় হয়ে দাঁড়ায় যখন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পাদনকারী এবং ক্ষমতাশীল পার্টির কর্মিবৃন্দের মধ্যে তার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে তাদের প্রতিকূল পরিণাম বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের জন্য দেশের অভ্যন্তরস্থ দাবি এবং আদর্শবোধের বিকৃতমাত্র ঘটায় না, — আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতাবাদের মূলনীতির লঙ্ঘনও সূচনা করে। জাতীয়তাবাদী কুসংস্কার সমাজতন্ত্রবিরোধী প্রবণতার পুষ্টি সাধন করে, সমাজতন্ত্রের উদ্দেশ্যসাধনের পথে বড় রকমের ক্ষতিসাধনে সহায়তা করে।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে মাওবাদী হুমকি অতিক্রমের পথ যত জটিল ও কঠিনই হোক না কেন, চীনের কমিউনিস্টরা, শ্রমিক শ্রেণী ও জনসাধারণ বর্তমান সংকট থেকে বেরিয়ে এসে, সমাজতন্ত্র গঠনের পরীক্ষিত লেনিনীয় নীতিতে এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রী ও সহযোগিতার রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তনের মতো শক্তি খুঁজে পাবে।

পেটি বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিভিন্ন প্রকাশের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত দুনিয়ার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলি সকল সমাজতান্ত্রিক দেশের ঐক্যবৃদ্ধিতে সজাগ থাকে। এই পথে সময় সময় ‘ইতিহাসের আকস্মিক আঁকাবাঁকা গতি’র সাক্ষাৎ মেলে। কিন্তু নূতন আদর্শের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার কাজ যতই জটিল ও কঠিন হোক না কেন, তা সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদিত হবে, কেননা তা বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিকাশের বাস্তব প্রয়োজন এবং উক্ত ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত সকল দেশের স্বার্থের পরিপোষক।

বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিব্যবস্থা

সমাজতন্ত্রপ্রতিষ্ঠিত নূতন আদর্শের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের শ্রেষ্ঠত্ব চাক্ষুষ প্রকাশ পায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক সহযোগিতাক্ষেত্রে।

প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক দেশের জনগণের আগ্রহ — যাতে অন্য সব সমাজতান্ত্রিক দেশে শিল্প ও কৃষিব্যবস্থা বৃদ্ধি পায়, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। আর সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সাফল্য বহুল পরিমাণে নির্ভর করে তাদের অর্থনৈতিক পারস্পরিক সহায়তার উপর, যার রূপও আবার বিভিন্ন: পারস্পরিক লাভজনক বাণিজ্য, ক্রেডিট (ঋণব্যবস্থা), শিল্পপ্রতিষ্ঠানাদি নির্মাণে সাহায্য, বৈজ্ঞানিক ও টেকনিক্যাল জ্ঞানের বিনিময়।

এ ধরনের সাহায্য স্বভাবতই দিয়ে থাকে সর্বোপরি, অর্থনৈতিক দিক থেকে সবচেয়ে উন্নত দেশগুলি। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্যে ভ্রাতৃপ্রতিম সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে বহু কলকারখানা নির্মিত হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের উল্লেখযোগ্য ক্রেডিট সরবরাহ করেছে, বিশেষজ্ঞ গড়ে তুলতে সাহায্য করছে, বেশ কয়েক হাজার নক্সা ও অন্যান্য কারিগরী দলিল অর্পণ করেছে, যার ফলে উৎপাদনব্যবস্থা দ্রুত গড়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক সহযোগিতার অন্তর্ভুক্ত উন্নততর দেশগুলি তাদের ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলিকে যে সাহায্য দিয়ে থাকে তা থেকে কোন বিশেষ সুবিধা খোঁজে না। তারা মানবপ্রেমীর ভূমিকায়ও অবতীর্ণ হয় না। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে ‘দাক্ষিণ্য প্রকাশকারী’ ও ‘মুখাপেক্ষী’ বলে কোন ভাগ নেই। প্রতিটি দেশের জনগণ নূতন সমাজ গঠনের জন্য প্রথমে

অভ্যন্তরীণ সম্পদ সমাবেশ করে। কিন্তু এক্ষেত্রে তারা বাকি সব সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে সহযোগিতা করে এবং সাফল্য অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে তা গোপন করে ফেলে না, — বরং নিজের অভিজ্ঞতা ও নিজের সাফল্যের ভাগ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের জনগণকে দেওয়ার চেষ্টা করে। এইভাবে সমাজতান্ত্রিক সহযোগিতায় বন্ধুত্বপূর্ণ পারস্পরিক সহায়তার বহুমুখী সম্পর্ক এসে যুক্ত হতে থাকে।

চেকোস্লোভাকিয়া ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলিকে যন্ত্রনির্মাণশিল্প বিকাশে সাহায্য করে। জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র শ্রেষ্ঠ অপ্‌টিক্যাল যন্ত্রপাতি নির্মাণের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার ভাগ দেয়, পোল্যান্ড সাহায্য করে খনিসংক্রান্ত যন্ত্রাদি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তার সাফল্য দিয়ে, ইত্যাদি। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি সাধারণ ভোগ্যবস্তুসহ নিজেদের উৎপন্ন দ্রব্য বিনিময় করে। সোভিয়েত জনসাধারণ সাগ্রহে চেকোস্লোভাক জুতো, পোল্যান্ডের আসবাবপত্র, বুলগেরীয় সিগারেট ও হাঙ্গেরীয় সিল্ক ক্রয় করে আর ভ্রাতৃপ্রতিম সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সোভিয়েত ঘড়ি, ক্যামেরা ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের বিরাট চাহিদা আছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি যত বেশি পরিমাণে সম্ভব অর্থনৈতিক সহযোগিতার সুযোগ গ্রহণ করে। যে-সব দেশের কয়লা অথবা তেলের অতিরিক্ত মজুত আছে অথবা যারা যন্ত্রনির্মাণশিল্পে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে, তারা শিল্পের ঐসব ক্ষেত্র এমন পরিমাণে উন্নত করে তোলে, যাতে কেবল নিজেদেরই প্রয়োজন মেটে না, — ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলিকেও উক্ত পণ্যদ্রব্য সরবরাহ করা যায়। পরিবর্তে

অন্যেরা নিজস্ব উৎপন্ন দ্রব্য তাদের যোগান দেয়। এতে অনেক সুবিধা: প্রতিটি দেশের পক্ষে নিজের সকল প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহের উপযোগী কলকারখানা গড়ার অপরিহার্যতা আর থাকে না; শিল্প ও কৃষির যে-সব শাখা বিকাশের সবচেয়ে উপযুক্ত প্রাকৃতিক অবস্থা আছে এবং যেগুলিতে বিপুল অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে, ঠিক সেগুলিই বিকাশের সুযোগ পাওয়া যায়।

ইতিহাসগতভাবে পৃথিবীর দেশগুলির মধ্যে অঞ্চলভিত্তিক **আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের** সূচনা হল। তার তাৎপর্য এই যে এক একটি দেশ নির্দিষ্ট ধরনের দ্রব্য-উৎপাদনে বিশিষ্টতা অর্জন করছে, সে-সব দ্রব্য বিশ্বের বাজারে সরবরাহ করে সেখানেই তার প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য ক্রয় করছে। একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ ব্যাপারটাই প্রগতিশীল, কেননা এতে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পুঁজিবাদের পরিস্থিতিতে তা বিকৃত রূপ পরিগ্রহ করে। বুর্জোয়ারা তাকে মুনাফার উৎস এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলির উপর শোষণের উপায়ে পরিণত করে।

ইতিপূর্বেই আমরা বলেছি যে উপনিবেশ ও স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদীরা দু-একটি পণ্যদ্রব্যের উৎপাদনে জাতীয় অর্থনীতি বিশেষীকরণের চেষ্টা করে। ফলে ঐ দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের সম্পূর্ণ অধীনস্থ হয়ে পড়ে, তাদের কাঁচা মালের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায় এবং নির্মম রাহাজানীর স্থলে পরিণত হয়। যেমন, ছোট্ট দেশ ভেনেজুয়েলা ২০ কোটি টনের উপর তেল উৎপাদন করে, কিন্তু কোন কারণে সে যদি এই তেল বিক্রি করতে না পারে, তবে তার সর্বস্বান্ত ও দুর্ভিক্ষগ্রস্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। সাম্রাজ্যবাদীরা এর সুযোগ গ্রহণে রপ্ত।

সমাজতন্ত্রে ব্যাপারটা অন্য রকম। আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ এখানে পঁুজিবাদের সৃষ্ট সকল বিকৃত স্তর থেকে নিজেকে সাফ করে, তা বিস্তৃত হয় ও গভীরতা লাভ করে। সমাজতন্ত্র এক দেশের উপর অপর দেশের শোষণের অবসান ঘটায়, আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের ক্ষেত্রে সমাধিকারের সূচনা করে, দেশসমূহের মধ্যে বিরোধিতা অপসারণ করে এবং ধীরে ধীরে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত সকল দেশের জাতীয় অর্থনীতির সুষম বিকাশের পরিস্থিতি গড়ে তোলে। এসব থেকে এমন সিদ্ধান্তে আসা যায় যে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিব্যবস্থায় **আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের এক নূতন আদর্শ** সৃষ্ট হতে চলেছে, যার প্রতিষ্ঠা — স্বেচ্ছামূলকতা ও সমাধিকারের ভিত্তিতে এবং যা উক্ত ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত সকল দেশের অর্থনীতির সাধারণ উন্নয়নের কাজ করছে।

আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক শ্রমবিভাগের সূত্রপাত খুব একটা বেশি দিন হল নয় এবং তা এখনও সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ করে নি। কেন, তাও বোঝা যায়: কেননা, বিশ্ব সমাজতন্ত্রব্যবস্থার বয়স সাকুল্যে পঁচিশ বছর, কিন্তু দেশগুলির মধ্যে বিশেষীকরণ ও সমবায়ীকরণের বিন্যাসসাধনের জন্য সময় প্রয়োজন। ইতিমধ্যে অনেক কিছু অর্জিত হয়েছে, কিন্তু আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের সুযোগ-সুবিধা পেতে গেলে আরও বেশি কিছু করার প্রয়োজন আছে। ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনৈতিক সহযোগিতাসংক্রান্ত জটিল সমস্যাসমূহ 'পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহায়তা পরিষদ' নামে এক সাধারণ সংস্থার সহায়তায় সমাধিত হতে চলেছে।

বহু দেশের সম্মিলিত প্রয়াসে শক্তিসম্পন্ন অর্থনৈতিক সমাহার গড়ে উঠছে।

যেমন, ১৯৬৩ সন থেকে প্রায় ৫ হাজার কিলোমিটারব্যাপী 'দ্রুজ্‌বা' (মৈত্রী) পাইপ-লাইন কাজ করছে। এই তৈলবাহী পাইপ-লাইন ভলগা তীরবর্তী অঞ্চল ও ইউক্রেনকে চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও হাঙ্গেরির সঙ্গে যুক্ত করেছে। বিস্তারের দিক থেকে তা পুঁজিবাদী একচেটিয়া অধিকারে নির্মিত বৃহত্তম তৈলবাহী পাইপ-লাইন — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'বিগ ইঞ্চ' ও 'ট্র্যান্স-অ্যারাবিয়ান'কে ছাড়িয়ে যায়। ১৯৬৪ সনে যেখানে 'দ্রুজ্‌বা' পাইপ-লাইন দিয়ে ৮৩ লক্ষ টন তেল পাম্প করে সরবরাহিত হয়েছে, সেখানে ১৯৭৫ সনে তা দিয়ে কোটি কোটি টন তেল ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলিতে প্রবেশ করেছে।

এখন অতিকায় গ্যাস-লাইন নির্মিত হতে চলেছে, যা দিয়ে সাইবেরিয়ার গ্যাস চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, বুলগেরিয়া ও হাঙ্গেরিতে যাবে।

ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সম্মিলিত বিদ্যুৎশক্তিব্যবস্থা 'মির্‌' (শান্তি) চালু হয়ে গেছে। এতে ১০ কোটিরও অধিক জনসংখ্যাবিশিষ্ট অঞ্চলে বিদ্যুৎ যোগানো হচ্ছে।

১৯৭১ সনে বুখারেস্টে অনুষ্ঠিত 'পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহায়তা পরিষদে'র ২৫তম অধিবেশনে ১৫ থেকে ২০ বছর মেয়াদী 'সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক নৈকট্যবৃদ্ধির সর্বাঙ্গীণ কর্মসূচি' গৃহীত হয়েছে। এটি এক বিরাট ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক শ্রমবিভাগ যে ক্রমে বড় রকমের পরিপূর্ণতা অর্জন করতে চলেছে, — এ ঘটনা তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

ভ. ই. লেনিন যে 'সকল জাতির প্রলেতারিয়েত নিয়ন্ত্রিত সাধারণ পরিকল্পনার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ এবং পরিপূর্ণ বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা'র প্রবণতা উল্লেখ করেছেন, তা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বর্তমানে যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংহতি ঘটতে চলেছে তার মধ্যে এই প্রবণতা

বিশেষ করে প্রত্যক্ষ হয়ে দেখা দিয়েছে। সংহতির অর্থ — সহযোগিতার সর্বোচ্চ পর্যায়। এর লক্ষ্য — 'পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহায়তা পরিষদ'ভুক্ত দেশগুলির অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতাসাধন, শিল্পের বিভিন্ন শাখার (কাঁচা মাল ও জ্বালানির উৎপাদন, কিছু কিছু ধরনের যন্ত্রপাতিনির্মাণ ইত্যাদি) বিকাশে সম্মিলিত পুঁজি-বিনিয়োগ, বিশেষীকরণ ও সমবায়ীকরণপ্রক্রিয়ার গভীরতাসাধন এবং জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনাসমূহের ঘনিষ্ঠ সমন্বয়করণ। সংহতি — সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনীতির ভবিষ্যৎ উন্নয়নে এবং সমাজতান্ত্রিক সহযোগিতার শক্তিবৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিকাশের অর্থ মোটেই এমন নয় যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি অন্যান্য দেশ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিজস্ব এক চক্রের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকছে। বরঞ্চ বিপরীত, তাদের চেষ্টা — সকল রাষ্ট্রের সঙ্গে পারস্পরিক লাভজনক অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা।

মুখ্য বিপ্লবী শক্তি

বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা আধুনিক বিশ্বে মুখ্য বিপ্লবী শক্তির ভূমিকা গ্রহণ করেছে। একথার তাৎপর্য কী?

সর্বোপরি **সমাজতন্ত্রের দৃষ্টান্তস্থলরূপে।** যেখানে মানুষের উপর মানুষের এবং এক জাতির উপর অপর জাতির শোষণের স্থান নেই, এমন এক নূতন সমাজ সৃষ্টি ক'রে

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির জাতিসমূহ বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরাট প্রাধান্য। অর্থনৈতিক বিকাশের বিপুল গতি, উৎপাদনের পুঁজিবাদী প্রণালীর সঙ্গে সম্পর্কিত বেকারত্ব ও অন্যান্য সামাজিক দুঃখ-দুর্দশার অবসান, সামাজিক ভরণপোষণ ও গণশিক্ষার বিস্তৃত ব্যবস্থা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রস্ফুরণ — সমাজতন্ত্রের এই সব সাফল্য মার্কসীয়-লেনিনীয় ভাবধারার দ্রুত সম্প্রসারণে সহায়তা করে, সমাজের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের উদ্দেশ্যে পরিচালিত প্রচারকার্যের সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট ও সক্রিয় রূপ উপস্থাপন করে।

বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ায় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভূমিকার আরও একটি পরিচয় এই যে তা **সাম্রাজ্যবাদের শক্তিকে পঙ্গু করে দিয়ে** বিপ্লবী আন্দোলন বিকাশের অনুকূল সম্ভাবনা গড়ে তোলে। নিজেদের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক শক্তি ও রাজনৈতিক প্রভাবের উপর ভিত্তি ক'রে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি 'প্রতিবিপ্লব রপ্তানি'র সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতিকে প্রতিরোধ করে এবং বিশ্বব্যাপী থার্মো-নিউক্লিয়ার যুদ্ধ সূচনার উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদের সর্বাপেক্ষা প্রতিক্রিয়াশীল ও আগ্রাসী চক্রসমূহের অভিসন্ধি ব্যর্থ করে দেয়। বহু যত্নের মূল্যে গড়ে তোলা সোভিয়েত ইউনিয়নের নিউক্লিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র-ক্ষমতা সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসীদের যুদ্ধলিপ্সা সংযত করে রেখে দিয়েছে, শান্তিকে সুরক্ষিত করছে।

সর্বশেষে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি **বিপ্লবী আন্দোলনে সর্বাঙ্গীণ উৎসাহদান করে,** জাতীয় স্বাধীনতা এবং স্বাধীনভাবে নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের উদ্দেশ্যে সংগ্রামরত

পার্টিসমূহকে সরাসরি বৈষয়িক, নীতিগত এবং প্রয়োজনমতো (যেমন, ভিয়েৎনামে) সামরিক সাহায্য পর্যন্ত প্রদান করে।

১৭ ॥ শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলন

কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের প্রভাব বৃদ্ধি

পুঁজিবাদের অভ্যন্তরীণ বিরোধের তীব্রতা প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রাম উন্নতগামী করে। এই সংগ্রাম ক্রমে গণচরিত্র লাভ করে।

পুঁজিবাদী দুনিয়াজুড়ে ধর্মঘটের তরঙ্গ বয়ে চলেছে, — কখনও এদেশে, কখনও ওদেশে তা বিশেষ উত্তাল আকার ধারণ করছে। ধর্মঘট এবং শ্রমিক শ্রেণীর অন্যান্য সংগঠিত ক্রিয়াকলাপ নিজের স্বার্থরক্ষার সংগ্রামে তার দৃঢ়তাবৃদ্ধির প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে অধিকাংশক্ষেত্রে শ্রমজীবীরা ধর্মঘটে নামে কেবল অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া নিয়ে নয়, — রাজনৈতিক দাবিতেও বটে। জাপানে শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষকসম্প্রদায়ের সংগ্রাম — দেশকে মার্কিন নিউক্লিয়ার পরীক্ষাঘাঁটিতে পরিণত করার বিরুদ্ধে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার রক্ষার জন্য এবং নিগ্রোবৈষম্য ও দলননীতির বিরুদ্ধে অভিযান সংগঠিত হচ্ছে। লাতিন আমেরিকায় শ্রমিক শ্রেণী ও অন্যান্য স্তরের শ্রমজীবী জনসাধারণের তৎপরতা বৃদ্ধি পেতে চলেছে; এখানে শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম প্রধান দাবি — উত্তর আমেরিকার একচেটিয়া অধিকারের পরিসমাপ্তি।

শ্রমিক শ্রেণী ও অন্যান্য স্তরের মেহনতী মানুষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ — এমন এক স্বকীয়

বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিমাপযন্ত্র, যা জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান সাংগঠনিকতা ও চেতনার পরিচয় দেয়। শ্রমিক আন্দোলন গুণগতভাবে এক নূতন পর্যায়ে প্রবেশ করে, তার চাহিদার স্তর বৃদ্ধি পায়। মজুরিবৃদ্ধি, শ্রমদিনের দৈর্ঘ্যহ্রাস এবং সামাজিক বীমা ও পেন্সনব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকেরা উৎপাদন পরিচালনায় অংশগ্রহণ, মেহনতী মানুষের সাংস্কৃতিক বিকাশ ও শিক্ষার মান উন্নয়নের উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলা এবং তাদের যোগ্যতার উপযুক্ত সমাদরের দাবিতে সংগ্রাম করে চলে। তারা চায় বিপুল সামাজিক স্বার্থে পরিপূর্ণ, প্রাণশক্তিতে ভরপুর জীবন নিয়ে বাঁচতে, — আর তার জন্য দরকার গণতান্ত্রিক মুক্তি এবং সামাজিক অধিকারের সম্প্রসারণ। স্বভাবতই, এই সব প্রয়াস নিজেই একচেটিয়া আধিপত্যের বিরোধী, তা তার ভিত্তিমূল কাঁপিয়ে দেয়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অস্থিরতা ডেকে আনে ও বৃদ্ধি করে। এমন কোন বছর যায় না, যখন পুঁজিবাদী দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত কোন না কোন দেশে তীব্র সামাজিক রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয় না। এই সবই শ্রেণী-সংগ্রামের এমন এক নূতন পর্যায়ের পূর্বাভাস সূচনা করছে, যা পুঁজিবাদের খোদ রক্ষাদুর্গে তার অস্তিত্বকে বিপন্ন করে ফেলতে পারে।

শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামে অগ্রবাহিনী হিশেবে আছে কমিউনিস্ট পার্টি, যা অক্লান্ত প্রয়াসে সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির মুখোশ খুলে ধরছে এবং শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করছে।

বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ৯০টি দেশে কমিউনিস্ট পার্টি আছে এবং ৫ কোটি মতো মানুষ তার সঙ্গে যুক্ত।

বহু পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে কমিউনিস্ট পার্টির উপর নির্যাতন এবং কমিউনিস্টবিরোধী প্রচার তাদের ক্রিয়াকলাপ পরিচালনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে এবং স্বভাবতই তাদের বৃদ্ধির গতিরোধ করছে। একথা বললেই যথেষ্ট হবে যে বহুসংখ্যক কমিউনিস্ট পার্টি আধা-বেআইনী অবস্থায় অথবা সম্পূর্ণ গুপ্ত থেকে কাজ করে। তৎসত্ত্বেও বহু পুঁজিবাদী দেশের কমিউনিস্ট পার্টি বাস্তব উদ্দেশ্য হিশেবে অদূর ভবিষ্যতে কমিউনিস্ট পার্টিকে ব্যাপক জনগণের পার্টিতে পরিণত করার দায়িত্ব নিয়েছে। ব্যাপক আকারের কমিউনিস্ট পার্টি আছে ফ্রান্সে (৪ লক্ষের উপর সদস্যসংখ্যা), ইতালিতে (১৭ লক্ষের উপর সদস্যসংখ্যা) ও ফিনল্যান্ডে (প্রায় ৫০ হাজার সদস্যসংখ্যা)। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যসংখ্যা ৫ লক্ষের উপর, জাপানের কমিউনিস্ট পার্টির — প্রায় ৩ লক্ষ এবং পর্তুগালের ও আর্জেণ্টিনার —১ লক্ষাধিক।

কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাফল্য কেবল পার্টির সদস্যসংখ্যা দ্বারাই নির্ধারিত হয় না, — জনগণের মধ্যে তার প্রভাববৃদ্ধির দ্বারাও নির্ধারিত হয় বটে। পুঁজিবাদী দেশগুলির কমিউনিস্ট পার্টিসমূহ অনেক বৃহৎ ট্রেড ইউনিয়ন সঙ্ঘের উপর বিপুল প্রভাবের অধিকারী। কমিউনিস্ট পার্টির ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক প্রভাব এই ঘটনা থেকেও বিচার করা যেতে পারে যে শাসনসংস্থার নির্বাচনে কমিউনিস্ট প্রার্থীদের পক্ষে ভোটদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে চলেছে।

পুঁজিবাদী দেশগুলির কমিউনিস্ট পার্টি কী ধরনের কর্তব্য স্থির করে?

শ্রমিক শ্রেণী — শান্তি ও গণতন্ত্রের সংগ্রামে মুখ্য শক্তি

পুঁজিবাদী সমাজের সমাজতান্ত্রিক সমাজে বৈপ্লবিক রূপান্তর ও কমিউনিজম গঠন তাদের সংগ্রামের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল, এবং আজও রয়ে গেছে। এই চূড়ান্ত লক্ষ্যে পেঁছানোর উদ্দেশ্যেই আধুনিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের রণনীতি ও কৌশল পরিচালিত।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কোন বিদ্রোহ নয়, কোন রাষ্ট্রীয় অভ্যুত্থানও নয়, — পুঁজিবাদের বিকাশ এবং তার সমস্ত বিরোধিতার তীব্রতায় সৃষ্ট এক নিয়মানুগ সামাজিক প্রক্রিয়া। বিপ্লব ফরমাইশমাফিক সম্পন্ন হয় না, — হয় তখনই, যখন তার পক্ষে অপরিহার্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পূর্বশর্ত পরিণতি লাভ করবে, শ্রমিক শ্রেণীর চেতনা ও সংঘবদ্ধতা, বিপ্লবী কার্যকলাপের প্রতি তার আকর্ষণ এবং পুঁজিবাদের উপর আঘাত হানার উদ্দেশ্যে জনগণকে পরিচালনা করার দৃঢ় সংকল্প উন্নত মানে পেঁছুবে। অর্থাৎ, কৃত্রিম উপায়ে ঘটনাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না, এগিয়ে যাওয়া যায় না, — তাতে শ্রেণী থেকে পার্টির এবং বিপ্লবী সেনাবাহিনী থেকে সংগ্রামী অগ্রবাহিনীর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার আশংকা থাকে। রাজনীতিক্ষেত্রে এ ধরনের হঠকারিতা সন্ত্রাসবাদীদের স্বভাবসিদ্ধ, এবং মার্কসীয়-লেনিনীয় তত্ত্বের সঙ্গে তার বিন্দুমাত্র মিল নেই।

তবে এর অর্থ মোটেই এমন নয় যে জনগণের বিপ্লবী অগ্রবাহিনীকে ঘটনার নিষ্ক্রিয় অপেক্ষায় বসে থাকতে হবে।

বরং উলটো: তাদের সামনে আছে জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করার, তাদের চেতনা ও সংঘবদ্ধতার উৎকর্ষসাধনের এবং কমিউনিজমের ভাবধারা প্রচারের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। জনসাধারণকে বিপ্লবের দিকে পরিচালনার রণনীতি ও কৌশল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির কাছে কঠোরতম পরিস্থিতির মধ্যেও আসন্ন চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য ধৈর্যসহকারে শক্তি সঞ্চয়ের দক্ষতা দাবি করে। জাতীয় স্বাধীনতার জন্য, নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা ও সম্প্রসারণের জন্য এবং জাতীয় অর্থনীতির সামরিকীকরণ, ফ্যাশিবাদ ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই সমস্যা সাফল্যজনকভাবে সমাধিত হতে পারে। ভ. ই. লেনিন মন্তব্য করেছেন যে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক পথে পরিচালিত রাজনৈতিক রূপান্তর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, 'তাকে কাছিয়ে আনে, তার ভিত্তিভূমি সম্প্রসারণ করে এবং পেটি বুর্জোয়া ও আধা-প্রলেতারীয় জনসাধারণের নূতন নূতন স্তরকে সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রতি আকর্ষণ করে'। **এইভাবে, গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম — সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের অঙ্গীভূত অংশ বলা যেতে পারে।**

আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজে গণতন্ত্রের প্রধান শত্রু — জাতির বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থবিরোধী পরাক্রান্ত একচেটিয়া কারবারগুলি। প্রতি বছরই একচেটিয়া আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিস্তৃত হয়ে চলেছে। আন্দোলনে নূতন নূতন সামাজিক দল সামিল হচ্ছে। বৃহৎ পুঁজি ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষককুলের এবং শহরের মধ্যবিত্ত স্তরের (ক্ষুদ্র মালিক ও ব্যবসায়ী, কারিগর ও কর্মচারীদের অংশ) স্বার্থ পদদলিত করে। উক্ত সামাজিক স্তরগুলি হয়

সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে, নতুবা একচেটিয়া কারবার অথবা ব্যাঙ্কের দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়। বোঝাই যাচ্ছে যে এরা সবাই নিজেদের স্বার্থরক্ষার খাতিরে ক্রমেই আরও সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে থাকে।

আমাদের কালে বুদ্ধিমার্গীয় শ্রমে রত কর্মীর সংখ্যা ও তাদের প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ হল বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রচণ্ড অগ্রগতির, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষাব্যবস্থা প্রসারের প্রত্যক্ষ ফল। ইতিপূর্বে বুর্জোয়া সমাজে বুদ্ধিমার্গীয় শ্রম বিশেষ সুবিধাজনক স্থান অধিকারের বিরাট সম্ভাবনা সৃষ্টি করত। নিজেদের অবস্থায় ও ধ্যান-ধারণার প্রকৃতিতে বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশ ছিল বুর্জোয়াদের কাছাকাছি এবং তাদেরই স্বার্থ সাধন করত। আজ ক্রমে বুদ্ধিজীবীসম্প্রদায়ের আরও বিস্তৃত স্তর শ্রমিকদের মতোই ভাড়াটে শ্রমের বাহিনী পরিপূর্ণ করছে, মহাজনী পুঁজির দ্বারা নির্মমভাবে শোষিত হচ্ছে। তাদের স্বার্থ শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছে। একচেটিয়া পুঁজির রাজনীতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে আচ্ছন্ন লাভের প্ররোচনা, মুনাফাচিন্তা বিজ্ঞানী ও শিল্পীর এবং সংস্কৃতি ও শিক্ষাক্ষেত্রে নিযুক্ত কর্মীদের সৃজনী সম্ভাবনা ও উদার প্রয়াসের চতুর্দিকে ক্রমেই দুর্বহ বেষ্টনী রচনা করতে থাকে। বুর্জোয়া সমাজের ঘনীভূত মানসিক সংকট ও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার আকর্ষণী শক্তির প্রভাবে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী ও একচেটিয়া অধিকারের মধ্যে সংঘর্ষ তীব্র আকার ধারণ করে। বুদ্ধিজীবীসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের পথ গ্রহণ করে, আর তার ফলে বুদ্ধিমার্গীয় ও শারীরিক শ্রমের কর্মীদের মধ্যে জোটের বিস্তৃত সম্ভাবনা প্রকাশ পায়। সাম্প্রতিক কালে পুঁজিবাদী দুনিয়া

বিপজ্জনক আরও একটি ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে। তা হল 'যুববিদ্রোহ'। তরুণ শ্রমিক, ছাত্র ও শিক্ষার্থীরা তীব্র সংকটে জর্জরিত একচ্ছত্র একচেটিয়া আধিপত্যভুক্ত সমাজে নিজেদের কোনও ভবিষ্যৎ দেখতে পায় না। তারা পরিবর্তন দাবি করে। প্রায়ই যুবসম্প্রদায়ের বিরোধী ক্রিয়াকলাপ স্বতঃস্ফূর্ত চরিত্র বহন করে এবং সময় সময় সন্ত্রাসবাদী এবং অন্যান্য ছদ্ম বিপ্লবী চিন্তাধারা ও মনোবৃত্তির প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও এই সব সংগ্রাম আধুনিক পুঁজিবাদের মর্মান্তিক পরিবেশের সঙ্গে আপসে যুবসমাজের অনিচ্ছার পরিচায়ক। এর ফলে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে এবং নবীন পুরুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতার জন্য সংগ্রামের সঠিক পথ ও অর্থের প্রভুত্ববিরোধী সংগ্রামের পথ উদ্‌ঘাটনে সমর্থ তার কমিউনিস্ট অগ্রবাহিনীর সঙ্গে যুবসমাজের ঘনিষ্ঠতার ভিত্তি গড়ে ওঠে।

ব্যাপক সামাজিক স্তরের একচেটিয়া অধিকারবিরোধী সংগ্রামের পথে একচেটিয়া ক্ষমতার সীমা অনবরত সংকীর্ণ হতে চলেছে এবং সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়াশীল অভ্যন্তরীণ ও আগ্রাসী বৈদেশিক নীতির বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল গণতান্ত্রিক শক্তি ও ধারাকে রাজনৈতিক জোটে ঐক্যবদ্ধ করার অনুকূল পূর্বশর্ত গড়ে তুলছে। কমিউনিস্ট পার্টি প্রগতিশীল শক্তিসমূহের এ ধরনের ঐক্য গঠনের এবং **একচেটিয়া অধিকারবিরোধী জোটে** তাদের সংহতিসাধনের সক্রিয় সমর্থকরূপে কাজ করে।

গণতান্ত্রিক আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে শ্রমিক শ্রেণী ফ্যাশিবাদের হুমকি প্রতিহত করতে পারে এবং এমন সব ব্যবস্থা কাজে পরিণত করতে পারে যা সাধারণ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সংস্কারসাধনের সীমা ছাড়িয়ে যায় ও

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে জয়লাভের উদ্দেশ্যে ভবিষ্যৎ সংগ্রামের পরিস্থিতি সহজসাধ্য করে তোলে।

মার্কসীয়-লেনিনীয় তত্ত্বের সৃজনশীল বিকাশ ঘটিয়ে, ঐতিহাসিক বিকাশের প্রতিটি পর্যায়ে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের রণনীতি ও কৌশল রচনা করে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলি সংশোধনবাদী ও গোঁড়া ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে, দক্ষিণপন্থী ও 'বামপন্থী' সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় সংগ্রাম পরিচালনা করে। দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ — কমিউনিস্ট আন্দোলনের সেই ধারা যা কোন কোন প্রশ্নে কার্যকারণসঙ্গত বিপ্লবী অবস্থানস্থল থেকে বিচ্যুত হয়, বুর্জোয়া মতাদর্শের সঙ্গে আপস করে বসে এবং বারবার সংস্কারবাদের দিকে, অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীর, ও শ্রমজীবী জনসাধারণের শ্রেণীশত্রুর সঙ্গে আপসপন্থার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। 'বামপন্থী' সুবিধাবাদের অভিব্যক্তি ঘটে অতি বিপ্লবীয়ানার এবং যে-কোন সৃজনী কর্মের প্রতি উপেক্ষা ও একমাত্র সশস্ত্র বলপ্রয়োগের নীতির উপর আস্থার মধ্যে। আপাত দৃষ্টিতে সুবিধাবাদের দুই ভিন্ন রূপ বিপরীতধর্মী বলে মনে হলেও আসলে মার্কসবাদের বিরোধিতার ব্যাপারে তারা অভিন্ন এবং একই পেটি বুর্জোয়া মনোভাব থেকে তাদের উদ্ভব।

ভ. ই. লেনিনের কথায়: 'প্রলেতারিয়েতের পাশাপাশি সর্বদা যা দেখতে পাওয়া যায় এবং যা সর্বদা কিছু না কিছু পরিমাণে প্রলেতারিয়েতের পরিবেশে অনুপ্রবিষ্ট — সেই পেটি বুর্জোয়া দোদুল্যমানতার রূপে ইতিহাসের প্রতিটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সন্ধিক্ষণ কিছু কিছু পরিবর্তনের সূচনা করে।

'পেটি বুর্জোয়া সংস্কারবাদ, অর্থাৎ গণতন্ত্র ও 'সোশ্যাল' ডেমোক্রাসির মিঠে বুলি ও দুর্বল ইচ্ছার অন্তরালে বুর্জোয়াদের তল্পিবাহকতা এবং পেটি বুর্জোয়া বিপ্লবীয়ানার কথায় বজ্রগর্ভ, গালভরা, আত্মম্ভরী, আর কাজে শূন্যগর্ভ বিচ্ছিন্নতা, বিক্ষিপ্ততা ও মস্তিষ্কহীনতা — এমনই হল এই দোদুল্যমানতার দুটি 'প্রবাহ'। পুঁজিবাদের গভীরতম মূল যতদিন পর্যন্ত উৎপাটিত না হচ্ছে, ততদিন এদের অস্তিত্ব অবধারিত।'

সুবিধাবাদের সব রকম রূপের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক সংগ্রাম — ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য।

যেমন বাইরের অবস্থার, তেমনি প্রতিটি দেশের নির্দিষ্ট পরিস্থিতির সর্বাঙ্গীণ বিচারের ভিত্তিতে কমিউনিস্ট পার্টিসমূহ নিজ নিজ কর্মসূচিতে সংগ্রামের আসন্ন ও অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী লক্ষ্য এবং তা অর্জনের সম্ভাব্য মেয়াদ নির্দেশ করে। স্বভাবতই, বিভিন্ন দেশের বিকাশের নির্দিষ্ট পরিস্থিতি এক রকম নয়, সেহেতু কমিউনিস্ট পার্টিগুলির কর্মসূচিও প্রতিটি বিন্দুতে মিলতে পারে না। তবে এমন বিষয়ও আছে যাকে পুঁজিবাদী দেশগুলির সকল কমিউনিস্ট পার্টিই নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য বলে মনে করে। তা হল **শ্রমিক শ্রেণীর কার্যকলাপের ঐক্যবিন্যাস।**

শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য —
তার বিজয়ের নিশ্চিতি

পুঁজিবাদী দেশের শ্রমিক শ্রেণী ও জনসাধারণের অন্যান্য স্তরের অংশবিশেষের উপর সমাজতন্ত্রী ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় নির্বাচকমণ্ডলী তাদের পক্ষে ভোট দেয়, পার্লামেণ্টগুলিতে তাদের শক্তিশালী প্রতিনিধিদল আছে এবং বেশ কিছু দেশে তারা সরকারও পরিচালনা করে।

সোশ্যাল ডেমোক্রাসির দক্ষিণপন্থী নেতারা অধিকাংশই মার্কসবাদের বিপরীতে নিজ নিজ সংস্কারবাদী তত্ত্বের উদ্ভাবক দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সুবিধাবাদী নেতাদের

উত্তরসূরী। সব তত্ত্বই অন্তত‌পক্ষে কিছু কিছু সংস্কার প্রবর্তনের কথা বিবেচনা করেছে এবং পুঁজিবাদের মূল ভিত্তি — ব্যক্তিগত মালিকানা ও ভাড়াটে শ্রমের শোষণের বিরুদ্ধে আক্রমণের স্থান সেখানে নেই।

বহু ইউরোপীয় দেশে দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রীরা শাসনক্ষমতায় আসার পর মনে হল বুঝি বা সমাজতন্ত্রে পুঁজিবাদের সংস্কারবাদী 'রূপান্তরসাধনে'র পরিকল্পনা রূপায়ণের সুযোগ তাদের হাতে এলো। কিন্তু তাদের কার্যকলাপ কেবল আরও একবার সংস্কারবাদের অসারতাই প্রমাণ করল। দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রীরা একটি দেশেও কোন রকম সমাজতন্ত্র গড়ে তোলে নি।

শ্রমিক আন্দোলনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা এবং সেই সঙ্গে কমিউনিস্টদের দিক থেকে সুবিধাবাদের চরম সমালোচনা — সংস্কারবাদী মতাদর্শের সংকট ঘনীভূত করছে। এর ফলে সোশ্যাল ডেমোক্রাসির শ্রেণীগুলির মধ্যে যে স্তরভেদপ্রক্রিয়া চলছে, নেতৃত্বপর্যায়ে তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। সোশ্যাল ডেমোক্রাসির অধিকাংশ নেতা আগের মতোই সংস্কারবাদের দেউলিয়া গোঁড়া বিশ্বাস জেদ করে আঁকড়ে ধরে আছে, বিশ্বস্তভাবে বৃহৎ পুঁজির স্বার্থ আগলে চলছে। কেউ কেউ আবার শান্তি ও প্রগতির সংগ্রামে শ্রমজীবী জনসাধারণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক দাবি বিবেচনা করার ঝোঁক দেখায়। সোশ্যাল ডেমোক্রাসির বামপন্থী শক্তির প্রচেষ্টা নূতন পরিপ্রেক্ষিত খুঁজে বার করা, — যাতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের সাধারণ ফ্রন্টে সমাজতন্ত্রী ও সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টিগুলি নিজেদের স্থান করে নিতে পারে। সোশ্যাল ডেমোক্রাসির পরিচালকদের মধ্যে যারা সবচেয়ে দূরদর্শী, তারা বুঝতে শুরু করেছে যে ঐ ধরনের

পরিপ্রেক্ষিত একমাত্র সম্ভব সর্বাপেক্ষা যুক্তিসঙ্গতভাবে যারা শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করছে, সেই কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতালাভের পথে।

শ্রমিক আন্দোলনের ঐক্যের সমর্থনে বর্তমানে অগ্রণী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও ভবিষ্যতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ার উদ্দেশ্যে কমিউনিস্টরা সমাজতন্ত্রী ও সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের সঙ্গে সহযোগিতার পক্ষে রায় দেয়। এ ধরনের সহযোগিতা সম্পাদনের জন্য কমিউনিস্টরা তাদের পক্ষ থেকে চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখে না। তবে এটা অনায়াসেই বোঝা যায় যে এ পথে সাফল্যজনক অগ্রগতি লাভ করতে গেলে সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীসহযোগিতার নীতি পরিত্যাগ করে শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত সংগ্রামে সুনিশ্চিত স্থান গ্রহণ করতে হবে। সোশ্যাল ডেমোক্রাসির দুমুখো নীতি, তার দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব ও অসংলগ্ন কার্যকলাপের কথা বিচার করলে শ্রমিক আন্দোলনে ঐক্যের পথ সহজ হবে বলে মনে হয় না। বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে হবে এবং বেশ কিছু ব্যাপারে মোহভঙ্গ ঘটবে। এই উদ্দেশ্যসাধনে কমিউনিস্টদের বিপুল প্রচেষ্টা নিয়োগ করতে হবে। তবে এমন কাজ অপরিহার্য। কোন রকম অতিশয়োক্তি না করে বলা যায় যে আজও পুঁজিবাদ বজায় থাকার বেশ বড় কারণ হল শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে মতভেদ। শ্রমিক আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান ও উত্তরোত্তর দৃঢ় ঐক্য সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগমন ত্বরান্বিত করছে, পুঁজিবাদের অবসান আসন্ন করে তুলছে।

১৮ ॥ জাতিসমূহের মুক্তি আন্দোলন

উপনিবেশবাদের পতন

পুঁজিবাদী নির্যাতনের ভিত্তিমূলে প্রচণ্ড আঘাত হানে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন।

উপনিবেশবাদ — মানবজাতির মূল কলঙ্ক, আর সে কলঙ্ক সম্পূর্ণরূপে অবস্থান করছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়, যেখানে মুষ্টিমেয় সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রশক্তি পৃথিবীর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীকে দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ করে রেখে দিয়েছে।

অক্টোবর বিপ্লব প্রাচ্যের জনগণের জাগরণ ঘটিয়েছে, তাদের মধ্যে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের শক্তি সঞ্চার করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফাশিস্ত জার্মানি ও সমরবাদী জাপানের পরাজয়ের ফলে উক্ত সংগ্রাম বিশেষ করে দৃঢ় চরিত্র পরিগ্রহ করেছে। দাসত্ববন্ধনকারীদের বিতাড়ন করে সমাজতন্ত্র গঠনে প্রবেশকারী চীনের জনগণ এবং কোরিয়া ও ভিয়েৎনামের জনগণ যে বিজয়ের সূচনা করল তা ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার উপর প্রচণ্ডতম আঘাতস্বরূপ। ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্মদেশ এবং আরও বহু দেশ স্বাধীনতা অর্জন করল। একের পর এক আফ্রিকার দেশ রাজনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জন করতে লাগল। ১৯৭৪ সনে শেষ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের পতন ঘটল পর্তুগালে।

অক্টোবর বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে ভাঙ্গন ধরিয়ে সকল জাতির সামনে মুক্তির পথ উন্মুক্ত করে দেওয়ার পর বিশ্বের মানচিত্রের কী রূপান্তর ঘটেছে সেটা দেখা যাক।

১৯১৯ সনে উপনিবেশ, আধা-উপনিবেশ ও অধিরাজ্যগুলির দখলে ছিল ৯ কোটি ৭৮ লক্ষ

বর্গকিলোমিটার, অথবা পৃথিবীর ৭২ শতাংশ ভূখণ্ড এবং তার জনসংখ্যা ছিল ১২৩ কোটি ৫০ লক্ষ, অথবা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৬৯·৪ শতাংশ। ১৯৭০ সনে তাদের দখলে — ৫৩ লক্ষ বর্গকিলোমিটার, অথবা পৃথিবীর ৩·৯ শতাংশ ভূখণ্ড এবং তার জনসংখ্যা — ৩ কোটি ৫০ লক্ষ, অথবা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ১ শতাংশ।

উপনিবেশবাদের পতন — তাৎপর্যের দিক থেকে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা উদ্ভবের পরবর্তী বৃহত্তম ঐতিহাসিক ঘটনা। পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট অত্যন্ত তীব্র করার পক্ষে আরও বহু উপাদানের সঙ্গে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

জাতীয় মুক্তি বিপ্লব

উপনিবেশসমূহের নির্যাতিত জনগণ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রাম পরিচালনা করেছে। তবে শক্তি ছিল উপনিবেশবাদীদের সহায় এবং তারা নির্মমভাবে রক্তের বন্যায় গণ-অভ্যুত্থান প্লাবিত করে দিয়েছে। বিজয় একমাত্র তখনই সম্ভব হল, যখন বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব হল এবং সাম্রাজ্যবাদীরা চিরকালের জন্য আন্তর্জাতিক কার্যকলাপে তাদের প্রভুত্বের আসন থেকে বিচ্যুত হল। তার অর্থ এই যে জাতীয় মুক্তি বিপ্লব আমাদের কালে এক অখণ্ড বিশ্ব বিপ্লবপ্রক্রিয়ার অঙ্গীভূত অংশে পরিণত হয়েছে, যেখানে নির্যাতিত জাতিসমূহের মুক্তি সংগ্রাম বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও পুঁজিবাদী দেশসমূহের শ্রমিক আন্দোলন — আধুনিক যুগের এই দুই মূল বিপ্লবী শক্তির কার্যকলাপের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীসম্পর্কে যুক্ত হয়ে পড়ে।

নূতন নূতন যে-সব পরিস্থিতিতে জাতীয় মুক্তি বিপ্লব প্রসারিত হয়, তা তার চরিত্র, চালিকাশক্তি ও পরিপ্রেক্ষিতের উপর প্রভাব বিস্তার করে। পূর্বতন উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলিতে স্বাভাবিকভাবেই সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পরিণত বৈষয়িক ও সামাজিক পূর্বশর্ত অনুপস্থিত। এই কারণে জাতীয় মুক্তি বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক হয় না। তবে তাকে বুর্জোয়া বিপ্লব হিশেবেও গণ্য করা যায় না। এ বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী বিপ্লব: এর প্রথম দাবি — স্বাধীনতা, দ্বিতীয় — কৃষি-সংস্কার। তার পরবর্তী বিকাশ নির্ভর করছে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে শ্রেণীশক্তিসমূহের অনুপাত ও সংগ্রামের উপর।

জাতীয় মুক্তি বিপ্লবে সচরাচর অংশগ্রহণ করে সামাজিক শক্তিসমূহের বিস্তৃত জোট: নবীন শ্রমিক শ্রেণী, কৃষিজীবী, শহরের পেটি বুর্জোয়া এবং জাতীয় বুর্জোয়াদের দেশপ্রেমী অংশ। এই জোটের রাজনৈতিক নেতৃত্ব কে দিচ্ছে সেটা বড় রকমের তাৎপর্যপূর্ণ।

যে-সব দেশে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামী বাহিনী গঠিত হয়েছে এবং জনগণের সংগ্রাম পরিচালনার উপযোগী কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠেছে, সেখানে জাতীয় মুক্তি বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত হতে পারে; আর যেখানে শ্রমিক শ্রেণী নেই অথবা তা রাজনীতিগতভাবে দুর্বল, সেখানে সমাজতন্ত্রের দৃষ্টান্তের প্রভাবে, স্থানীয় বুদ্ধিজীবী, কর্মচারী ও সেনাগোষ্ঠীসমূহের নিয়মতান্ত্রিক সংস্কারবাদী প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত বিপ্লবী গণতান্ত্রিক পার্টিসকল সাফল্যের সঙ্গে জাতীয় মুক্তি বিপ্লব পরিচালনা করতে পারে। এক্ষেত্রেও বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক প্রবণতা লাভ

করতে পারে, যদিও তার বিকাশ হয় অপেক্ষাকৃত জটিল পথে।

যে-সব দেশে নেতৃত্ব বুর্জোয়াদের হাতে, সেখানে জাতীয় মুক্তি এবং সামন্ততান্ত্রিক জের অতিক্রমের সমস্যাসমূহ অনির্দিষ্ট ও অসংলগ্নভাবে সমাধিত হয়। ঐ সব দেশে বুর্জোয়া কাঠামোর মধ্যে বিপ্লবকে সীমাবদ্ধ করে রাখার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

সংগ্রাম চলতে থাকে

ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার পতনের অর্থ উপনিবেশবাদের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি নয়। ব্যাপারটা এই যে সাম্রাজ্যবাদীরা উপনিবেশ হারানোকে শান্তভাবে মেনে নিতে পারে না, তারা মুক্তিপ্রাপ্ত দেশগুলির জনগণের উপর আগের মতো লুণ্ঠন চালিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে নূতন নূতন সূক্ষ্মতর পদ্ধতি কাজে লাগায়।

সেটা কীভাবে প্রকট হয়? প্রকট হয় সর্বোপরি নবীন রাষ্ট্রগুলির শাসনক্ষমতায় উপনিবেশবাদীদের আজ্ঞাবহ বিশ্বস্ত লোকদের বসানোর চেষ্টার মধ্যে। যেখানে তাদের পক্ষে এটা সম্ভব হয়েছে, সেখানে স্বাধীনতা ঘোষণার দ্বারা জনগণের অবস্থার বিশেষ কোন হেরফের হয় না।

আর যদি সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে পূর্বতন ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে রাজনৈতিক প্রভুত্বও বজায় রাখা সম্ভব না হয়, তবে সেখানে তারা নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থান বজায় রেখে, জাতিসমূহের উপর শোষণ চালিয়ে বিপুল মুনাফা ওঠাতে থাকে। স্বল্পোন্নত দেশগুলির উপর শোষণ থেকে

পশ্চিমী একচেটিয়া অধিপতিদের বার্ষিক মুনাফার পরিমাণ হাজার হাজার কোটি ডলার।

ঠিক এই কারণেই উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অবসান এখনও ঘটে নি। একমাত্র নিজস্ব শিল্প গড়ে তুলে, নিজেদের বিশেষজ্ঞদল তৈরি করে এবং পুঁজিবাদী একচেটিয়া কারবারগুলি হটিয়ে দিয়ে নবীন রাষ্ট্রগুলি অর্থনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে পারে এবং জাতীয় সম্পদের উপর লুণ্ঠনের অবসান ঘটাতে পারে। অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা অতিক্রম ও স্বাধীন জাতীয় অর্থনীতি গঠন — মুক্তিপ্রাপ্ত দেশগুলির মুখ্য সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নিজেদের স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে পূর্বতন ঔপনিবেশিক দেশগুলির জাতিসমূহ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বন্ধুত্বপূর্ণ সমর্থন লাভ করে থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভিলাইয়ের বৃহৎ লৌহ-ইস্পাত কারখানা গড়ে তুলতে ভারতকে সাহায্য করেছে, মিসর আরব প্রজাতন্ত্রে বিখ্যাত আসোয়ান বাঁধ নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তায় ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও আফগানিস্তানে, আফ্রিকার নবীন রাষ্ট্রসমূহে এবং আরও অনেক দেশে বহু কারখানা ও রাস্তাঘাট, হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট গড়ে উঠেছে। মস্কোর প্যাট্রিস লুমুম্বা মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের আরও বহু উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তরুণ ভারতীয় ও গিনিবাসী, আরবীয় ও সোমালীয় এবং বিশ্বের সকল প্রান্তের তরুণ-তরুণীরা শিক্ষা গ্রহণ করে। শিক্ষাশেষে বিশেষজ্ঞ হয়ে তারা অর্জিত জ্ঞান নিজ নিজ জাতির কাছে বহন করে নিয়ে যাবে এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাদের সাহায্য করবে।

মুক্তিপ্রাপ্ত দেশগুলিকে এখনও বহু বাধা অতিক্রম করতে হবে এবং জটিল সমস্যাসমূহ সমাধানের পথ খুঁজে বার করতে হবে।

স্বাধীনতা সংগ্রাম যতক্ষণ চলে, ততক্ষণ বিভিন্ন শ্রেণী ও সামাজিক গোষ্ঠী একতাবদ্ধ: তাদের সাধারণ শত্রু — সাম্রাজ্যবাদ। কিন্তু যে মুহূর্তে স্বাধীনতা অর্জিত হয় তখনই শ্রেণী-স্বার্থের বিরোধিতা প্রকাশ পায়। সাম্রাজ্যবাদ এবং অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ার শক্তির সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণী, কৃষিজীবী ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক স্তরের সংঘর্ষ তীব্র হয়ে ওঠে। জনগণের অর্জিত স্বাধীনতাকে বুর্জোয়ারা তাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার কাজে লাগানোর চেষ্টা করে। তারা জনগণের মূল্যে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তদের সঙ্গে রফা করার দিকে ঝোঁকে এবং শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর উপর শোষণের ভিত্তিতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কায়েমে প্রবৃত্ত হয়।

এদিকে, যে-সব দেশ পুঁজিবাদী পথ গ্রহণ করল, তাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে যে মুক্তিপ্রাপ্ত জাতিসমূহের সমস্যাসমাধানের সাধ্য পুঁজিবাদের নেই। পুঁজিবাদ তাদের উপর নূতন নূতন দুঃখ-দুর্দশা চাপিয়ে দেয়। ব্যাপক জনসাধারণের অসন্তোষের উত্তরে অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া কঠোর দমননীতি প্রয়োগ করে ও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার উপর আক্রমণ চালায়। প্রতিক্রিয়া গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে ও বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষের আগুন জ্বালায়, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জোটে ভাঙ্গন ধরায় এবং তার ফলে জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের ইতিমধ্যে অর্জিত সাফল্যসমূহ বিপদের মুখে পড়ে।

মক্তিপ্রাপ্ত দেশগুলির এমন পরিস্থিতি থেকে নিষ্ক্রমণের উপায় বা কী? ভ. ই. লেনিন তা নির্দেশ করে বলেছেন: '...যে-সব পশ্চাৎপদ জাতি এখন মুক্তি লাভ করছে এবং যাদের পরিবেশে এখন, যুদ্ধের পর, প্রগতির পথে আন্দোলন লক্ষ্য করা যাচ্ছে, — তাদের পক্ষে জাতীয় অর্থনীতি

বিকাশের পংজিবাদী পর্যায় যে অনিবার্য এমন কথা মেনে নেওয়া সঙ্গত হবে কি না। এই প্রশ্নে আমাদের জবাব হবে নেতিবাচক।'

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অভিজ্ঞতা পূর্বতন ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলির জনগণকে জাতীয় পুনরুজ্জীবন ও সমাজপ্রগতির সোজাসুজি ও বিস্তৃত পথ নির্দেশ করে। কিন্তু এ পথ আঁকড়ে ধরে দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে যেতে হলে নির্দিষ্ট পরিস্থিতি অপরিহার্য। যে-সব দেশ নিজেদের সামাজিক অর্থনৈতিক বিকাশের দিক থেকে অত্যন্ত পিছিয়ে আছে, সেখানে তা গড়ে তোলা বেশ কঠিন। মুক্তিপ্রাপ্ত জাতিগুলির সামনে বিপদ বড় কম নয়। নবীন রাষ্ট্রগুলি যাতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে না পারে, যাতে সেখানে পুরনো ব্যবস্থাদি বজায় থাকে তার জন্য সাম্রাজ্যবাদ ও অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া চেষ্টার ত্রুটি করে না। কিছু কিছু মুক্তিপ্রাপ্ত দেশ ইতিমধ্যেই প্রতিবিপ্লবী শক্তিসমূহের কার্যকলাপের ফলে ভাগ্যের ওলট-পালট সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। প্রতিক্রিয়াকে পঙ্গু করে দিতে এবং পশ্চাৎগতি রুখতে হলে যে-সব প্রগতিশীল ও দেশপ্রেমিক শক্তি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, সামন্ততন্ত্রবিরোধী, গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়ার জন্য সংগ্রামরত — তাদের ঐক্য দৃঢ় করা অত্যন্ত আবশ্যক।

সাম্প্রতিক কালে বহু দেশে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম বস্তুত শোষণসম্পর্কবিরোধী সংগ্রামে পরিণত হতে চলেছে। স্বাধীন বিকাশের পথ অবলম্বনকারী বেশ কিছু সংখ্যক দেশের শাসক পার্টি ও রাজনৈতিক কর্মীদের ঘোষণায় সমাজতন্ত্র গঠন তাদের রাজনীতির উদ্দেশ্য বলে প্রকাশ পেয়েছে। এসব দেশে স্বল্প অথবা বেশি

পরিমাণে সামাজিক পরিবর্তন রূপায়িত হচ্ছে: সে-সবের মধ্যে আছে সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া অধিকারভুক্ত উৎপাদনের উপায়ের জাতীয়করণ, অর্থনীতির রাষ্ট্রীয় শাখা গড়ে তোলা, কৃষি সংস্কার এবং কৃষি অর্থনীতির সমবায়ীকরণের অনুপ্রেরণা ইত্যাদি। সমাজবিকাশের যে কর্মসূচি অনুযায়ী এমন পরিবর্তন সংঘটিত হয়, তা পুরোপুরি ধারাবাহিক নয়, বহু ক্ষেত্রে সঠিক বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার সঙ্গে কল্পস্বর্গবাদী দৃষ্টিভঙ্গির জের, এমন কি কখন কখন ধর্মীয় ধারণার মিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়।

নিজ নিজ দেশের জনগণের ইতিহাসগত ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাঁরা নিজস্ব পথে সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণে অগ্রসর হয়েছেন, — এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত রাষ্ট্রসমূহের শাসকসম্প্রদায় এমন কথার উপরও জোর দেন যে বহু ব্যাপারে তাঁরা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির নিদর্শন অনুযায়ী পথ নির্ধারণ করছেন এবং বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা কাজে লাগাচ্ছেন।

এ থেকে সমাজতন্ত্রের দিকে মানবসমাজের অপ্রতিরোধ্য অগ্রগতি নূতন করে প্রমাণিত হয়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি নবীন রাষ্ট্রসমূহের উপর নিজেদের অভিজ্ঞতা চাপিয়ে দেয় না; তাদের সর্বতোভাবে সহায়তা করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের কাজে কোন রকম হস্তক্ষেপ করে না। জীবনের অভিজ্ঞতাই শেষ পর্যন্ত জনগণকে দেখিয়ে দেবে কোন তত্ত্ব সমাজতন্ত্রের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ও বিশ্বাসযোগ্য পথ; তাদের উত্তরোত্তর একমাত্র বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে — মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের কমিউনিস্ট মতবাদে সজ্জিত হতে উদ্বোধিত করবে।

১৯ ॥ শান্তি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান

আধুনিক যুগের মূল কথা — পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ — সমস্ত আন্তর্জাতিক বিকাশের চরিত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আমাদের কালে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পদ্ধতিটিই জটিল ও পরস্পরবিরোধী, রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে

সম্পর্কের নূতন নীতিতে উত্তরণকালীন ধর্ম তার সহজাত বিশেষত্ব।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের লেনিনীয় নীতি

সমাজতন্ত্র উদ্ভবের আগে পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়ে উঠত পুঁজিবাদী ব্যবস্থাসঞ্জাত নীতির ভিত্তিতে। সে সম্পর্কের প্রকৃতিতে ছিল অসাম্য, ঔপনিবেশিক দেশগুলির উপর সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শোষণ ও অত্যাচার, এক দেশকে অপর দেশের পদানত করে রাখা এবং হুকুমজারি ও বলপ্রয়োগের আধিপত্য।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় আন্তঃরাষ্ট্রীয় বৈরিতা প্রকাশের বর্বরতম রূপ — আগ্রাসী যুদ্ধ, — যা সাম্রাজ্যবাদের যুগে অদৃষ্টপূর্ব বিপুল আকার ধারণ করেছে এবং জনগণের ভয়ংকর বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ১ কোটি মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে —৫ কোটি।

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে যে পতাকা উড্ডীন হল তাতে কার্ল মার্কসেরই দূরদর্শী বাণী — 'শান্তি' যুক্ত হল। সকল জনগণের উদ্দেশে প্রচারিত সোভিয়েত শাসনক্ষমতার প্রথম ডিক্রি হল শান্তির ডিক্রি। সমাজতন্ত্রের প্রকৃতি থেকে আন্তর্জাতিকতাবাদ এবং অন্যান্য জাতি ও রাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছার ভিত্তিতে মূলগতভাবে নূতন এক বৈদেশিক নীতিও নির্গত হল। সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের সহযোগিতার কাঠামোর মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এক

নূতন আদর্শ দেখা দিল। সমাজতন্ত্রই ঔপনিবেশিক জোয়াল থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত দেশগুলির সাহায্যের আধার ও উৎস হয়ে দাঁড়াল।

আধুনিক যুগের উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব এই যে বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে একই সময় বিভিন্ন সমাজব্যবস্থাসম্পন্ন রাষ্ট্র অবস্থান করছে। পৃথিবীতে শক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক এমন, যে সাম্রাজ্যবাদ আন্তর্জাতিক জীবনে তার প্রাধান্য সৃষ্টিকারী প্রভাব হারিয়ে ফেলেছে। তার স্বাভাবিক বৈদেশিক নীতি এখন আর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের রীতি নির্ধারণ করে না। সেই সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক সহযোগিতার কাঠামোর মধ্যে বিন্যস্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের যে নূতন আদর্শ মুক্ত জাতিসমূহের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্পর্কের নমুনা উপস্থাপন করছে তা সর্বজনীন হতে পারে না, যতক্ষণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বজায় আছে।

এমন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সমাজব্যবস্থাসম্পন্ন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সম্পর্ক কী ধরনের হওয়া উচিত?

সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে সম্পর্কের ব্যাপারে একমাত্র বিচক্ষণ ও বাস্তব নীতি হল ভ. ই. লেনিন প্রবর্তিত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থাননীতির উদ্দেশ্য — আন্তর্জাতিক বিবাদ মীমাংসার উপায় হিশেবে যুদ্ধের আশ্রয় বর্জন, সার্বভৌমত্ব, সমতা এবং অপর রাষ্ট্রের কাজে হস্তক্ষেপ থেকে নিবৃত্ত থাকার নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থানির্বিশেষে সকল দেশের মধ্যে পারস্পরিক লাভজনক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের বিকাশ। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে

মতবিরোধ শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার পথে সমাধিত হতে পারে।

আমাদের কালে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান — বিশ্ব বিকাশের বাস্তব চাহিদা এবং আধুনিক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সামগ্রিক ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতার ভিত্তিস্বরূপ। দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায়: শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বিকল্প নেই।

সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়াশীল ও আগ্রাসী চক্রের দোষে বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির পর প্রায় পঁচিশ বছর ধরে দুই ভিন্ন ব্যবস্থাসম্পন্ন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সম্পর্কের রূপটি ছিল উত্তেজনামূলক ও বৈরভাবাপন্ন। এরই ভিত্তিতে তার নাম হল 'ঠান্ডা লড়াই'। প্রকৃতপ্রস্তাবে এটা ছিল সত্যিকারের 'উত্তপ্ত' লড়াইয়ের সীমানায় ভারসাম্য রক্ষা করা, যে লড়াই আধুনিক পরিস্থিতিতে সর্বাত্মক থার্মোনিউক্লিয়ার সংঘর্ষ ডেকে আনতে পারে। ফলত, প্রশ্নটা দাঁড়াল এরকম: হয় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, নতুবা অনিবার্যভাবে বিপর্যয়ের মুখে গড়িয়ে যাওয়া। তৃতীয় আর কোন পন্থা নেই।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ধারাবাহিকভাবে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি প্রচলনের অর্থ মোটেই মূল শ্রেণীগত অবস্থান থেকে সরে আসা নয়। এই নীতির অর্থ মতাদর্শগত সংগ্রামের, কমিউনিস্ট ও বুর্জোয়া মতাদর্শের মধ্যে সংগ্রামের পরিসমাপ্তি নয়। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ভাবধারা সমগ্র বিশ্বে প্রসারিত হয়েছে, কেননা তা শ্রমজীবী জনসাধারণের মূল স্বার্থের পরিপোষক: তাতে আছে জীবনের সত্য, আর সত্যকে এড়ানো যায় না। এটাও সকলের কাছে স্পষ্ট যে মতাদর্শগত সংগ্রাম মানেই সামরিক সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া নয়, সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সঙ্গে তাকে সম্পূর্ণ

মেলানো যায়। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান মোটেই নির্যাতিত জনগণ ও উপনিবেশবাদী এবং শোষিত ও শোষকের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর প্রসার লাভ করে না, এর অর্থ শ্রেণীবৈরিতা মিটমাট করা নয়। সকল রকম অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পবিত্র অধিকার প্রতিটি জাতির আছে।

সুতরাং, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি কোন ক্রমেই প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতিবিরুদ্ধ নয়, — বরং বিপরীত, তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্মিলিত হয়; কেননা আমাদের সময়কার প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দাবি হল শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখা, সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট গঠনকর্মের সমস্যা সমাধানের উপযোগী এবং পুঁজিবাদী দেশগুলিতে জরুরী স্বার্থ ও অধিকার রক্ষায় জনসাধারণের সংগ্রামের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি উক্ত লক্ষ্য অর্জনের পরিপোষক।

শান্তির সংগ্রাম
ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

শান্তি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান মানবজাতির বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বার্থের পরিপোষক হওয়া সত্ত্বেও তা আপনা-আপনিই আসে না এবং তার প্রতিষ্ঠা একমাত্র সম্ভব সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

১৯১৭ সনের অক্টোবরে নবীন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র যখন সকল জাতির উদ্দেশে শান্তির আহ্বান জানাল,

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগর্লি তার জবাবে হস্তক্ষেপ করে বসল। প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সোভিয়েত দেশের শ্রমিক-কৃষকদের অস্ত্র হাতে নিতে হল। সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্বের অধিকার স্বীকার করে নিতে বর্জোয়া রাষ্ট্রগর্লির বেশ কিছ্ন সময় লাগল। এবং এর পরেও তারা একাধিকবার জোর করে সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর তাদের নানা রকম দাবি-দাওয়া চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে গেছে, অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবী চক্রান্ত সংগঠন করেছে, জনগণের মর্ক্তি আন্দোলনকে পদদলিত করার উদ্দেশ্যে আগ্রাসী যর্দ্ধ পরিচালনা করেছে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে, যখন সমাজতন্ত্র শক্তিমান বিশ্বব্যবস্থারূপে বেড়ে উঠেছে, তখন বিশ্বে শক্তির আনর্পাতিক সম্পর্কে মূলগত পরিবর্তন দেখা যায়। সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি পরিবর্তিত না হলেও এবং তার অধিকারে বৈষয়িক সম্পদ ও সামরিক শক্তি বজায় থাকলেও প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী চক্রের অস্ত্রের জোরে জাতিসমূহের উপর নিজেদের ইচ্ছা চাপিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা নেহাৎই সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে।

আজ শান্তির পক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে সামিল হয়েছে অসমাজতান্ত্রিক দেশের একটা বড় গোষ্ঠী, যারা যর্দ্ধের ব্যাপারে আগ্রহী নয়, যাদের কাছে জাতীয় পর্নরর্জ্জীবনের সমস্যা সমাধানের জন্য শান্তির প্রয়োজন। সাম্রাজ্যবাদী যর্দ্ধের বিরর্দ্ধে ব্যাপক জনসাধারণের সংগ্রাম সংগঠনকারী আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণী শান্তি রক্ষা করে চলেছে। বর্জোয়া দেশের বাস্তববর্দ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিবিদসমেত

সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের অন্তর্গত জনসমাজের ব্যাপক স্তরও শান্তিরক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে থাকে।

'শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক শিবির, শান্তিকামী অসমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণী এবং শান্তির পক্ষ সমর্থনকারী সকল শক্তির সমবেত প্রয়াসে **বিশ্বযুদ্ধ রোধ করা সম্ভব।** সাম্রাজ্যবাদের উপর সমাজতন্ত্রের, যুদ্ধের উপর শান্তির ক্রমবর্ধমান শক্তিপ্রাধান্য থেকে এটাই দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবীতে সমাজতন্ত্রের পূর্ণ বিজয়ের আগেই, দুনিয়ায় অংশত পুঁজিবাদ থাকতে থাকতে সমাজজীবন থেকে বিশ্বযুদ্ধ অপসারণের বাস্তব সম্ভাবনার উদয় হয়েছে। সমগ্র বিশ্বে সমাজতন্ত্রের জয় যে-কোন ধরনের যুদ্ধ বাধার সামাজিক ও জাতীয় কারণসমূহের সম্পূর্ণ অবসান ঘটাবে। **যুদ্ধের বিলোপসাধন, পৃথিবীতে শাশ্বত শান্তির প্রতিষ্ঠা — কমিউনিজমের ঐতিহাসিক ব্রত।'**

সব দিক বিবেচনার ভিত্তিতে রচিত এই সিদ্ধান্তটি সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত। সোভিয়েত কমিউনিস্টদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে শান্তির শক্তি যুদ্ধের শক্তির উপর জয়লাভ করবে।

তবে, শান্তি দৃঢ়ীকরণের অনুকূল বিষয়গত শর্ত আপনা-আপনিই সব কিছুর সমাধান করে দেয় না। নূতন শক্তি সম্পর্কের সঠিক মূল্যায়ন এবং সক্রিয়ভাবে তার প্রয়োগও জানা চাই। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ এমন অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিয়েছে যা 'ঠাণ্ডা লড়াই' থেকে আন্তর্জাতিক উত্তেজনাপ্রশমনের দিকে গতিপরিবর্তনের বনিয়াদ রচনা করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ফ্রান্স ও ফেডারেল জার্মান প্রজাতন্ত্রের, বিশেষ করে পারমাণবিক যুদ্ধ নিবারণ সম্পর্কে মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি এবং পুঁজিবাদী দেশগুলির সঙ্গে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের চুক্তি সম্পাদিত হয়। ১৯৭৫ সনের গ্রীষ্মকালে হেলসিঙ্কিতে নিরাপত্তা ও সহযোগিতাবিষয়ক যে সারা ইউরোপ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তার চূড়ান্ত দলিল শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ‘সংহিতা’ আখ্যা লাভ করে।

অস্ত্রপ্রতিযোগিতা সীমিতকরণের দিকেও প্রথম পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। ১৯৬৩ সনে মাটির উপর, শূন্যে ও জলে পারমাণবিক বিস্ফোরণ পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণের এক আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়,১৯৬৯ সনে স্বাক্ষরিত হয় পারমাণবিক অস্ত্র সম্প্রসারণবিরোধী এক চুক্তি (পারমাণবিক শক্তির অধিকারী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে চীন ও ফ্রান্স এতে স্বাক্ষরদান করে নি)। যুদ্ধোপকরণ সীমাবদ্ধ করার ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলছে, মধ্য ইউরোপে সামরিক শক্তি ও সমরসজ্জা হ্রাসকরণের বিষয়টি নিয়েও আলোচনা চলছে।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের দৃঢ় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা এক বিরাট সাফল্য। এর সর্বোপরি প্রমাণ হল ভিয়েতনামী জনগণের পূর্ণ বিজয়, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অধিকারগত ব্যাপক আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এবং কিউবার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী অবরোধের পতন।

তবে দৃঢ় শান্তির পথে এখনও অনেক বাধা আছে। প্রতিক্রিয়াশীল ন্যাটোচক্র আন্তর্জাতিক উত্তেজনাপ্রশমন প্রক্রিয়া বিকাশে সর্বতোভাবে বিঘ্ন সৃষ্টির জন্য সচেষ্ট, অস্ত্র প্রতিযোগিতার জন্য উন্মুখ। দুনিয়ায় মৃত্যুবাহী অস্ত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। সামরিক সংঘর্ষের বিপজ্জনক জ্বালামুখগুলি (মুখ্যত মধ্য প্রাচ্যে) রয়ে গেছে।

ঠিক এই কারণেই শান্তির জন্য এবং বিচক্ষণতা ও ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পুনর্গঠনের জন্য সংগ্রামে শৈথিল্য প্রদর্শন অনুচিত। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেসে উত্থাপিত এবং ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিসমূহ, সকল প্রগতিশীল ও শান্তিকামী শক্তি কর্তৃক সমর্থিত শান্তি কর্মসূচি উত্তেজনাপ্রশমন প্রক্রিয়ার উৎসস্বরূপ ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৫তম কংগ্রেসে শান্তি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার জন্য, জাতিসমূহের মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য ভবিষ্যৎ সংগ্রামের যে কর্মসূচি ঘোষিত হয়েছে তা পূর্ববর্তী নীতির সরাসরি অনুসরণ ও বিকাশ।

সোভিয়েত বৈদেশিক নীতির শক্তি মানে এই যে তার অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষাক্ষমতার ভিত্তিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ঐক্যের পরিচয় দেয়, এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সে যে লক্ষ্য অনুসরণ করে তা সকল জাতির প্রয়োজনীয় স্বার্থের উপযোগী। তাদের জ্ঞানে শান্তি ধারণাটি সমাজতন্ত্র বোধের সঙ্গে ক্রমেই অভিন্ন হয়ে পড়ছে।

২

সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম

পঞ্চম অধ্যায়

সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

বাস্তব সমাজতন্ত্রের উদ্ভব

সমাজতন্ত্র হল এক ন্যায়সঙ্গত সমাজব্যবস্থার জন্য হাজার হাজার বছরের সন্ধানের ফল। নূতন সমাজ সম্পর্কে বিশিষ্ট চিন্তাবিদদের স্বপ্ন বহুদিন নিষ্ফল হয়ে পড়ে ছিল: নূতন ব্যবস্থা কায়েম করার মতো কোন বৈষয়িক পূর্বশর্ত ছিল না, ছিল না এমন কোন সামাজিক শক্তি যা আদর্শের জীবনায়ন ঘটাতে পারে।

আমাদের কালে কমিউনিস্টদের পরিচালনায় শ্রমিক শ্রেণী ও জনসাধারণের শ্রম ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন কোণের কোটি কোটি মানুষের চেতনায় 'সমাজতন্ত্র' শব্দটি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসম্পর্কিত জীবন্ত দৃষ্টান্তের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে।

অতীতের প্রগতিশীল চিন্তাবিদদের মতবাদ অনুযায়ী সমাজতন্ত্র হল সব রকম দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত এক নিখুঁত

সমাজব্যবস্থা। একথাটাও পরিষ্কার বোঝা যায়; কেননা ব্যক্তিগত মালিকানা ও মানুষের উপর মানুষের শোষণের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সমাজে যা কিছু অকুলান ছিল মানুষ উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নে তার সব কিছুই পূরণ করতে চেয়েছে।

বাস্তব সমাজতন্ত্র কদাচ আদর্শ পরিবেশে গড়ে ওঠে নি। ইতিপূর্বেই আমরা লক্ষ্য করেছি যে তার জন্ম হয় তীব্র শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্যে, — যে শ্রেণী-সংগ্রাম প্রায়শই অতি নির্মম আকার ধারণ করত। সমাজতন্ত্র অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর উন্মত্ত প্রতিরোধ ও প্রচণ্ড বাধাবিপত্তি অতিক্রম ক'রে, কুসংস্কার, জড়তা ও অজ্ঞতার বাধা চূর্ণ ক'রে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাও করেছে নেহাৎই সাধারণ মানুষ, তারা যে পরিবেশে শিক্ষা লাভ করেছে তার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে, নিজেদের দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটি নিয়ে।

সুতরাং, এটা স্পষ্ট যে সমাজতন্ত্র সাগরের ফেনপুঞ্জ থেকে সৌন্দর্যের পরমা দীপ্তিসহ সদ্যোজাতা পুরা কাহিনীর দেবী আফ্রোদিতের মতো রাতারাতি নিখুঁত রূপ নিয়ে আসে না। বাস্তব সমাজতন্ত্র সেই সব অসংখ্য বাধাবিপত্তির স্বাক্ষর বহন করে, যা তাকে অতিক্রম করতে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। পুরনো সমাজের 'জন্মদাগ' থেকে মুক্তি পেতে সমাজতন্ত্রের বেশ দীর্ঘ সময় লাগে; দীর্ঘ সময় ধরে নূতন সমাজব্যবস্থা বিকাশ লাভ করতে থাকে, নিখুঁত হয়ে উঠতে থাকে। সমাজতান্ত্রিক গঠনের শিক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষও বদলাতে থাকে। মানুষ অতীতের জের থেকে মুক্ত হয়, কমিউনিস্ট নীতিবোধে দীক্ষা লাভ করে, নিজের ভাগ্যের সচেতন ও প্রত্যয়সম্পন্ন স্রষ্টা হয়ে দাঁড়ায়।

বাস্তব সমাজতন্ত্রের উদ্ভব ১৯১৭ সনের অক্টোবরে। পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যে পর্বটির ব্যাপ্তি ১৯১৭ সনের অক্টোবর থেকে ৩০-এর দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত, তা ছিল সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পর্ব। এই পর্বের শেষ দিকে সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে অপরিবর্তনীয় রূপে সমাজতান্ত্রিক সম্পর্কের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা হল। অতঃপর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিকাশ লাভ করতে থাকে। তার অনন্ত সম্ভাবনা ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব ক্রমেই আরও স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

সমাজতন্ত্রের লক্ষণ

বিভিন্ন দেশে সমাজতন্ত্র বিকাশের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে আছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে উঠেছে। বহু ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশে উন্নত সমাজতন্ত্র সবে গঠিত হতে চলেছে। বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্তর্গত অন্যান্য দেশ আরও প্রারম্ভিক স্তরে আছে। এতদ্‌সত্ত্বেও সমাজব্যবস্থা হিশেবে সমাজতন্ত্রের কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ আছে।

‘সোস্যালিজম’ শব্দটির উদ্ভব লাতিন socialis শব্দ থেকে, যার অর্থ — ‘সামাজিক’, ‘বন্ধুত্বপূর্ণ’। **সমাজতন্ত্র** হল এমন এক ব্যবস্থা যার ভিত্তি — উৎপাদনের উপায়ের উপর সামাজিক মালিকানা এবং যার বিশেষত্ব নির্ভর করছে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলির উপর: শোষণমুক্ত মানুষের সহযোগিতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা, সমগ্র সমাজের স্বার্থে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের সুষম পরিকল্পনাগ্রহণ,

শ্রম অনুযায়ী সামাজিক উৎপন্ন দ্রব্যের বণ্টন, শ্রমিক শ্রেণী পরিচালিত সমাজে ক্রমবর্ধমান সামাজিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক ঐক্য, জনগণের শাসনের হাতিয়ারে রাষ্ট্রের রূপান্তর, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিকাশ এবং ব্যক্তিসত্তার পূর্ণতর ও সার্বিক বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ গঠন।

এই সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞার্থের তাৎপর্য অনুধাবন করতে গেলে সোভিয়েত ইউনিয়নে যে বাস্তব সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার মূল বৈশিষ্ট্য ও গঠনপ্রকৃতি বিচার করে দেখা দরকার।

২০ ॥ মালিকানা

সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক বনিয়াদ

সোভিয়েত ইউনিয়নে উৎপাদনের উপায় সমাজের অধিকারে। এ থেকেই সমাজতন্ত্রের উৎপাদন-সম্পর্ক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চরিত্র নির্ধারিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে যেমন উৎপাদনের উপায় থেকে বঞ্চিত কোন শ্রেণী নেই, তেমনি নেই মালিক-শ্রেণী। উৎপাদনের উপায়ের উপর মালিকানার ব্যাপারে কেউই বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অধিকারী নয়, অথবা বিপরীত দিক থেকে অন্যদের তুলনায় অসুবিধাজনক পরিস্থিতির মধ্যে থাকে না। এর ফলে উৎপাদনের উপায়ের পুঁজিতে এবং শ্রমশক্তির পণ্যে রূপান্তরের সম্ভাবনা তিরোহিত হয়েছে। **সামাজিক মালিকানা মানুষের উপর মানুষের শোষণ দূর করেছে।**

যেখানে শোষণ নেই, যেখানে একে অপরের শ্রমের ফল ভোগ করতে পারে না, সেখানে জীবনধারণের একমাত্র আইনসঙ্গত উপায় হয়ে দাঁড়ায় নিজের শ্রম। সামাজিক

মালিকানা পরজীবিতা ও পরাশ্রয়িতার বিরোধী, সেখানে সকলকে একই সমান নীতিতে শ্রম করতে হয়: 'যে কাজ করে না, সে খায় না'।

যেহেতু শ্রমের ফল সমাজের হেফাজতে আসে ও তারপর জনসাধারণের মধ্যে বণ্টিত হয়, সেহেতু শ্রমের পারিতোষিকের পরিমাণ সম্পূর্ণ নির্ভর করে সামাজিক সম্পদের মাত্রার উপর: সমাজ যত সমৃদ্ধ, তার অন্তর্ভুক্ত মানুষেরাও তত ভালোভাবে বাস করে। তারা সকলেই সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন বিকাশে আগ্রহী। সাধারণ অর্থনৈতিক আগ্রহ জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করে, একত্রিত করে। সমাজতন্ত্রে উৎপাদন-সম্পর্ক হল কর্মীদের উপর শোষণ থেকে মুক্ত সহযোগিতা ও পারস্পরিক সহায়তার সম্পর্ক।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশ পৃথক পৃথক গোষ্ঠীর অথবা ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন ও পরস্পরবিরোধী কার্যকলাপের দ্বারা নির্ধারিত হয় না, — তা নির্ধারিত হয় উৎপাদনের উপায়ের অধিকারী সমগ্র সমাজের মিলিত ইচ্ছার দ্বারা। সামাজিক মালিকানা উৎপাদনের নৈরাজ্য, সংকট ও বেকারত্ব দূর করে, সচেতন এবং লক্ষ্যনিষ্ঠ উপায়ে তার বিকাশপরিকল্পনার সম্ভাবনা (ও প্রয়োজনীয়তা) তুলে ধরে। অন্যভাবে বলতে গেলে সামাজিক সম্পত্তির প্রভুত্বের তাৎপর্য এই যে উৎপাদনের উপর পুঁজিবাদের অন্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত নিয়মের কর্তৃত্বের অবসান ঘটল, **সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক নিয়ম** তার কাজ শুরু করে দিল।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি বিশেষত্ব, যা সামাজিক মালিকানার দ্বারা নির্ধারিত।

ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই বোঝা গেছে যে মালিকানা হল এমন এক সামাজিক সম্পর্ক, যা বৈষয়িক সম্পদের উৎপাদন, বণ্টন ও ব্যবহারের পরিস্থিতি ব্যক্ত করে। দৈনন্দিন জীবনে মালিকানার সম্পর্ক দেখা দেয় **সম্পত্তির অধিকার** রূপে — আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এমন এক ব্যবস্থা রূপে, যে ব্যবস্থা অনুযায়ী পৃথক পৃথক ব্যক্তি, গোষ্ঠী অথবা রাষ্ট্র কোন সম্পত্তির ব্যবহার ও বন্দোবস্ত করে থাকে। সম্পত্তির অধিকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হল সম্পত্তির স্বত্ব। মালিক স্বত্ব ত্যাগ না করেও অন্য ব্যক্তিকে অথবা সংস্থাকে তার সম্পত্তি ব্যবহারের — এমন কি নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত বন্দোবস্তের অধিকার দিতে পারে। একমাত্র স্বত্ব ত্যাগ করলেই (নিজের সম্পত্তি বিক্রী করলে অথবা কাউকে দান সরলে) সে সম্পত্তির সমস্ত রকম অধিকার হারায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে সামাজিক মালিকানার অর্থ সর্বোপরি এই যে উৎপাদনের উপায় ও অন্যান্য মূল্যবান বৈষয়িক বস্তুর অধিকাংশ থাকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অধিকারে। জনগণের নির্দেশ অনুসারে ও তাদের পক্ষ থেকে রাষ্ট্র সম্পত্তির হাত-বদলের অধিকার পর্যন্ত (যেমন বিদেশী রাষ্ট্রগুলির কাছে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য পণ্যের বিক্রয়) মালিকের সমস্ত রকম অধিকার ভোগ করে।

সব সোভিয়েত মানুষ রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি সরাসরি ব্যবহার করে: শ্রমিক তার কাজের সময় যন্ত্রপাতি ও কল ইত্যাদির ব্যবহার করে, বিজ্ঞানীদের জন্য আছে সুসজ্জিত ইনস্টিটিউট ও ল্যাবরেটরি, শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য আছে বিদ্যালয়ের দালান, কর্মশালায় — যন্ত্রপাতি, পাঠকক্ষে — সরঞ্জাম ইত্যাদি।

রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির বন্দোবস্ত এখন আর লোকের হাতে নয়, — বৃহৎ অখণ্ড রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ — রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে।

শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহের পরিচালকেরা রাষ্ট্রের কাছ থেকে কোন মূল্যবান বৈষয়িক বস্তু বন্দোবস্তের পূর্ণ দায়িত্ব পায়, আর কর্মিদল পরিচালকের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের অধিকার রাখে।

রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি বন্দোবস্তের পূর্ণ দায়িত্ব ও অধিকার ব্যক্তিগতভাবে কাউকে দেওয়া হয় না, — দেওয়া হয় ম্যানেজার, অন্যান্য পরিচালকবর্গ ও কর্মিদলের হাতে। তাই, কর্মিদলই যে নিজ নিজ কারখানা অথবা প্রতিষ্ঠানের মালিক — সোভিয়েত জনগণের একথা বলার সম্পূর্ণ ভিত্তি আছে।

উৎপাদন কর্মিদলের কাজে ব্যবহারের জন্য আছে কোন নির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রকর্তৃক নির্ধারিত ও সমগ্র সমাজের স্বার্থের অনুকূল সম্পত্তি। যেমন, কারখানা তার নিজের লাভের জন্য উৎপাদনের অব্যবহৃত, অতিরিক্ত উপায় বিক্রী করতে পারে। কিন্তু সমাজের স্বার্থে অনেক সময় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থায় উদ্বৃত্তের পুনর্বণ্টন ক'রে তা সেই সব কলকারখানার জন্য সরবরাহ করা অপেক্ষাকৃত ভালো, যেগুলিতে তার প্রয়োজন আরও বেশি। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় উৎপাদন-শিল্পপ্রতিষ্ঠানের নিয়মে উদ্বৃত্ত বিক্রয়ের কথা একমাত্র তখনই বিবেচনা করা হয় যখন উচ্চ রাষ্ট্রীয় সংস্থা তার পুনর্বণ্টনে অস্বীকৃতি জানায়।

রাষ্ট্র কেবল যে তার সংস্থাসমূহের (কারখানা, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিদ্যালয়ের) মাধ্যমেই নাগরিকদের সমগ্র সমাজের অধিকারভুক্ত সম্পত্তি ব্যবহার করতে দিতে পারে তা নয়, — সরাসরিও পারে। শহরে ও শ্রমিক বসতিতে রাষ্ট্রের অধিকারভুক্ত বাসগৃহ সোভিয়েত জনগণকে ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়। তবে, সব ক্ষেত্রেই স্বয়ং রাষ্ট্র রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির মালিক ও তার সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপক থেকে যায়।

সমগ্র সোভিয়েত জনগণের স্বার্থ ও ইচ্ছাকে রূপ দিয়ে রাষ্ট্র রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহের সম্পত্তির সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে: এক সংস্থা থেকে অন্য সংস্থায় সম্পত্তির ব্যবহার হস্তান্তরের অধিকার দেয়, নূতন নূতন সংস্থা গড়ে তোলে অথবা পুরনো সংস্থাসমূহের বিলোপসাধন করে, পরিচালক নিয়োগ করে অথবা তাদের পদচ্যুত করতে পারে, যারা দুরভিসন্ধিবশত অথবা কাজের গাফিলতিতে সামাজিক সম্পদ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে তাদের শাস্তি প্রদান করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে উৎপাদনের উপায়ের প্রধান অংশের উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব। সেই সঙ্গে উৎপাদনের উপায় এবং অন্যান্য বৈষয়িক মূল্যবান বস্তুর কিছু অংশের উপর (অর্থাৎ, সেগুলির উপর মালিকানার অধিকারও) কর্তৃত্ব সমগ্র জনগণের হাতে না থেকে কৃষিজীবীদের শ্রম-সমবায়ের — যৌথখামার ও অন্যান্য সমবায়সংস্থার হাতে আছে।

সমাজতান্ত্রিক মালিকানার দুই রূপ

রাষ্ট্রীয় এবং সমবায়ী যৌথখামার-মালিকানা প্রকৃতিগতভাবে একই জাতের হলেও সামাজিক, সমাজতান্ত্রিক মালিকানার বিভিন্ন রূপ হিশেবে তাদের প্রকাশ। এই দুই রূপ সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের ভিত্তি।

আধুনিক সমাজের অর্থনীতিতে শিল্প যেহেতু চূড়ান্ত ভূমিকা গ্রহণ করে, সেহেতু শিল্পপ্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, পরিবহণব্যবস্থা এবং উৎপাদনের অন্যান্য মূল উপায় কার হাতে আছে তার উপর সমবায়ী মালিকানার সামাজিক অর্থনৈতিক তাৎপর্য একান্তরূপে নির্ভর করে। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে অধুনা সমবায়ের সংখ্যা কম নয়, কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানার প্রভুত্বের ফলে তা সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে

পারে না, যদিও এতে শ্রমজীবী, চাষী ও হস্তশিল্পীদের স্বাচ্ছন্দ্য আসে। এই ধরনের সমবায় প্রায়ই বৃহৎ পুঁজিপতি ও ভূস্বামীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে না উঠতে পেরে দেউলিয়া হয়ে যায়, নতুবা তার কোন কোন সদস্যের ঐশ্বর্যবৃদ্ধি হওয়ায় তারাই গোটা সমবায়সম্পত্তি আত্মসাৎ করার ফলে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে।

উৎপাদনের উপায়ের উপর সামাজিক মালিকানার কর্তৃত্বের পরিস্থিতিতে এবং যখন শাসনক্ষমতা শ্রমজীবীদের হাতে থাকে সেই অবস্থায় সমবায়ী মালিকানার দেউলিয়া হয়ে পড়ার এবং শ্রম-শোষণের কোন সম্ভাবনাই যে থাকে না কেবল তা নয়, — তা নূতন সামাজিক সম্পর্কের আধার হয়ে দাঁড়ায়। তার মর্ম সম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক।

সমাজতান্ত্রিক মালিকানার দুই রূপের মধ্যে প্রধান পার্থক্য — উৎপাদনের উপায়ের সামাজিকীকরণের অভ্যন্তরে নিহিত। রাষ্ট্রীয় মালিকানা সমগ্র দেশব্যাপী উৎপাদনের উপায় সামাজিকীকৃত করে তা সমগ্র জনগণের সম্পদে পরিণত করে। যৌথখামারী মালিকানা পৃথক পৃথক কৃষি প্রতিষ্ঠান জুড়ে উৎপাদনের উপায়কে সামাজিকীকৃত করে তাকে কোন কোন গোষ্ঠীর সম্পদে পরিণত করে। তাই, জমি ও তার অভ্যন্তরভাগ, জল, বন, কলকারখানা ও তাদের উৎপন্ন দ্রব্য, রাষ্ট্রকর্তৃক সংগঠিত বৃহৎ কৃষি প্রতিষ্ঠান (রাষ্ট্রীয় খামার) ও সেগুলির উৎপন্ন দ্রব্য, মেরামত ও টেকনিক্যাল কেন্দ্রসমূহ, ব্যাঙ্ক, পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, নাগরিক জীবনযাত্রানির্বাহ ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (হাসপাতাল, পলিক্লিনিক, বিশ্রামভবন, বিদ্যালয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্টেডিয়াম ইত্যাদি), নগর ও শিল্পকেন্দ্রগুলির অন্তর্গত বাসগৃহের মূল তহবিল — **রাষ্ট্রীয় (জাতীয়) সম্পত্তি বা মালিকানা** রূপে গণ্য। যৌথখামার ও সমবায়ের প্রাণী সম্পদ (গবাদি পশু ও পক্ষী), এবং উৎপাদনের হাতিয়ার (ট্র্যাক্টর, কম্বাইন

ইত্যাদি) সমেত তাদের সমষ্টিগত শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ ও উৎপাদনসম্পর্কিত সমষ্টিগত নির্মাণব্যবস্থা — **সমবায়ী যৌথখামার (গোষ্ঠীগত) সম্পত্তি** রূপে গণ্য। (যৌথখামারের ব্যবহৃত জমি, যা বিনামূল্যে চিরকাল তাদের কাজে লাগানোর জন্য সংস্থান করা হয়েছে।)

সমাজতান্ত্রিক মালিকানার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানা মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। এর কারণ এই নয় যে উৎপাদনের সমস্ত মূল উপাদান এর অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্রীয় মালিকানা জনগণের অর্থনীতির সকল অংশের মধ্যে অখণ্ড সংযোগ রচনা করে, একক পরিকল্পনা অনুযায়ী তার বিকাশের পথ প্রশস্ত করে, জনগণকে ব্যাপক জাতীয় স্বার্থ অনুসরণে প্রবৃত্ত করে এবং রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করতে শেখায়।

এর অর্থ মোটেই এমন নয় যে যাদের শ্রম যৌথখামারের মালিকানার সঙ্গে যুক্ত তাদের পরিস্থিতিটা খারাপ: জনগণের অংশ হিশেবে তারাও রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির অধিকারী। সম্পত্তির যৌথখামারী রূপ গ্রামে উৎপাদনী শক্তিবিকাশের আধুনিক স্তরের উপযোগী, তা উৎপাদনের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের ভিত্তি রচনা করে।

রাষ্ট্রীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও যৌথখামারের মধ্যে পার্থক্য সমাজতান্ত্রিক মালিকানার দুই রূপের সঙ্গে সংযুক্ত।

রাষ্ট্রীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কর্মীরা মজুরি পায় অর্থের মাধ্যমে। যৌথখামারীরা নিজেদের শ্রমের বদলে সমষ্টিগত সম্পত্তিতে তাদের অবদানের পরিমাণ অনুসারে এবং যৌথখামারের আয় অনুযায়ী অর্থ ও উৎপন্ন দ্রব্যের মাধ্যমে মজুরি পায়। যৌথখামারীদের উদ্বৃত্ত আয়ের উৎস হল তার গৃহসংলগ্ন জমির ব্যক্তিগত খামারে তাদের শ্রম।

বর্তমানে পার্টি ও সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী

যৌথখামারীদের শ্রমের জন্য মাসিক গ্যারাণ্টিযুক্ত মজুরির ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে। এই ব্যবস্থা কৃষিক্ষেত্রে মজুরির সঙ্গে শিল্পক্ষেত্রে প্রচলিত পারিশ্রমিকের নৈকট্য সূচনা করেছে।

যে সঙ্গতি থেকে যৌথখামারীদের পারিশ্রমিক দান করা হয় তার নাম **উপযোগ তহবিল**। যৌথখামারের আয়ের অপর অংশ যায় **মূল তহবিলে**।

উৎপাদনের মূল উপায়, কৃষিযন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম, যৌথখামারের বিদ্যুৎকেন্দ্রসমূহ, যানবাহনের উপকরণ, উৎপাদন ও সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্যে নির্মিত গৃহ ও ভবনাদি, শ্রমের জন্য ব্যবহৃত ও উৎপাদনশীল গবাদি পশু এবং যৌথখামারের উৎপাদন প্রসারের জন্য নির্ধারিত উপকরণ ও আর্থিক সঙ্গতি নিয়ে মূল তহবিল গঠিত। উক্ত তহবিল অবিভাজ্য, — তা যৌথখামারের সদস্যদের ব্যবহারে লাগানো যায় না।

মূল তহবিল যৌথখামারীদের শ্রমে, সমগ্র সোভিয়েত জনগণের সাহায্যে গড়ে ওঠে। তিরিশ বছর আগে যৌথখামারের সম্পত্তির মধ্যে ছিল কৃষি খামারের সামাজিকীকৃত উৎপাদনের উপায়: ঘোড়া, লাঙ্গল, মই ও অন্যান্য হাতিয়ার। যৌথখামারের আধুনিক মূল তহবিল প্রধানত হল ট্র্যাক্টর, কম্বাইন, ট্রাক এবং সমাজতান্ত্রিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতে শ্রমিক ও ইঞ্জিনিয়রদের শ্রমে তৈরী অন্যান্য যন্ত্রপাতি।

চলতি বছরের হিসাব থেকে বরাদ্দ করে রাখা আয় থেকে এবং উৎপাদনের উপায় ও সাংস্কৃতিক গঠনকর্ম প্রস্তুতে যৌথখামারীদের শ্রমের প্রত্যক্ষ প্রয়োগে মূল তহবিল প্রতি বছর বৃদ্ধি পেতে থাকে। যেমন, ১৯৬০ সনে মূল তহবিলের পরিমাণ ছিল ৩,১০০ কোটি রুবল, আর ১৯৭৫ সনে তা ৯,০০০ কোটির ঊর্ধ্বে দাঁড়ায়।

দু'ধরনের সমাজতান্ত্রিক উদ্যোগের মধ্যে মূলগত পার্থক্য তাদের পরিচালনার রূপে।

শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পরিচালক নিয়োগ করে রাষ্ট্র এবং প্রতিষ্ঠানের সমস্ত রকম কার্যকলাপের জন্য রাষ্ট্রের কাছে

তাঁকে দায়ী থাকতে হয়। যৌথখামারের সর্বোচ্চ পরিচালনসংস্থা হল যৌথখামারীদের সাধারণসভা; এই সভা পরিচালকমণ্ডলী ও সভাপতি নির্বাচন করে। যৌথখামারীরা প্রচলিত আইন ও যৌথখামারের বিধির ভিত্তিতে সংগঠন ও অর্থনীতিপরিচালনসংক্রান্ত প্রশ্নের সমাধান করে, যৌথখামারের স্বার্থ এবং সেই সঙ্গে রাষ্ট্রের স্বার্থের ভিত্তিতে পরিকল্পনা গ্রহণ করে, বিবরণী অনুমোদন করে, আয় বণ্টনের নিয়ম নির্ধারণ করে, ইত্যাদি।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র যৌথখামারগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। রাষ্ট্র তাদের কৃষিযন্ত্রপাতি, সার ও উৎকৃষ্ট বীজ দিয়ে সাহায্য করে, কৃষি অর্থনীতির পরিচালক কর্মিদল ও বিশেষজ্ঞদের তালিমের ব্যবস্থা করে, পশু-চিকিৎসার উপর নজর রাখে, উৎপাদনে অগ্রসর পদ্ধতির প্রসার ও প্রচলনে সহায়তা করে, যৌথখামারগুলিতে ঋণ সরবরাহ করে এবং যৌথখামারের কাছ থেকে তাদের উৎপন্ন দ্রব্য খরিদ করে।

নিজস্ব সম্পত্তি

সমাজতন্ত্রে সামাজিক মালিকানা ছাড়াও নিজস্ব সম্পত্তি থাকে। তা হল জনসাধারণের শ্রমজনিত আয় ও সঞ্চয়, তাদের অধিকারভুক্ত বাসগৃহ, গৃহস্থালী ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ব্যবহৃত জিনিসপত্র এবং ব্যক্তিগত ব্যবহারের বস্তু।

যৌথখামারের চত্বরে নিজস্ব সম্পত্তি — নিজস্ব সম্পত্তির এক বিশেষ ধরন; গৃহসংলগ্ন জমির ব্যক্তিগত খামার, উৎপাদনশীল গবাদি পশু, পক্ষী, খামারের ইমারৎ ইত্যাদি এর আওতায় পড়ে। সহায়ক অর্থনীতির প্রয়োজনীয়তা এই

কারণে যে যৌথখামারে উৎপাদনের স্তর এখন পর্যন্ত যৌথখামারীদের সমস্ত রকম ব্যক্তিগত চাহিদা মেটাতে পারে না।

পংজিবাদী ব্যক্তিগত মালিকানার সঙ্গে সমাজতন্ত্রে নিজস্ব সম্পত্তির কোন মিলই নেই। এই সম্পত্তি ব্যক্তিগত শ্রমের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে এবং তা শোষণের জন্য ব্যবহার করা যায় না।

নিজস্ব সম্পত্তির মধ্যে খুব কম বস্তুই স্বার্থপর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন, বাসস্থান ফাটকা দরে ভাড়া দিতে পারে, মোটরগাড়ির মালিক চুক্তিভিত্তিতে তা প্রাইভেট পরিবহণের কাজে লাগাতে পারে। এই ধরনের কার্যকলাপ সোভিয়েত সমাজে নীতিগতভাবে গর্হিত। রাষ্ট্র আইনসম্মত উপায়ে এই সব সহজ মুনাফাবাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, অর্থাৎ আইন অনুযায়ী তাদের দন্ড প্রদান করে থাকে। কালক্রমে নিজস্ব সম্পত্তির বেআইনী ব্যবহার অর্থনৈতিকভাবে উচ্ছেদ করা সম্ভব হবে: যেমন, রাষ্ট্রীয় গ্রীষ্মকালীন বাগান-বাড়িসমেত বাসস্থানের প্রাচুর্যের ফলে বাসস্থান ভাড়া নেওয়ার সমস্ত রকম চাহিদার অবসান ঘটবে।

সামাজিক সম্পদ বৃদ্ধির ফলে ক্রমেই বেশি পরিমাণে সামাজিক উৎপাদনক্ষেত্রে উৎপন্ন দ্রব্য জনসাধারণের ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণ করছে। এতে নিজস্ব সম্পত্তিরও বৃদ্ধি ঘটছে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র নিজস্ব সম্পত্তির বৃদ্ধি ও পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। শ্রমের পরিমাণ ও গুণ অনুসারে পারিশ্রমিক প্রদানের নীতিতে, জনসাধারণের ভোগ্যবস্তুর উপর দর নির্ধারণের নীতিতে এবং সামাজিক উপযোগ তহবিল বিকাশের ফলে উক্ত লক্ষ্যে পেঁছান সম্ভব। এই সব বিষয় সম্পর্কে পরে আলোচিত হবে।

সোভিয়েত আইন সামাজিক মালিকানার মতো নিজস্ব সম্পত্তিও রক্ষা করে। রাষ্ট্রের অথবা যৌথখামারের সম্পত্তি অপহরণের শাস্তি ৩ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সংশোধনী শ্রমমূলক দণ্ড; অপহরণের ঘটনা যদি কারও দ্বারা দ্বিতীয় বার ঘটে অথবা তা যদি কোন ষড়যন্ত্রকারী দলের উদ্যোগে সাধিত হয়, তবে কারাদণ্ডের মেয়াদ ৬ বছর পর্যন্ত। আর একাধিকবার অপরাধমূলক কার্যে লিপ্ত বলে প্রতিপন্ন কেউ যদি অপহরণ করে থাকে তা হলে শাস্তি —৫ থেকে ১৫ বছরের কারাদণ্ড। বিশেষ বড় ধরনের অপহরণের শাস্তি —মৃত্যুদণ্ড।

নাগরিকের সম্পত্তির উপর অবৈধ হস্তক্ষেপের জন্য কারাদণ্ডের মেয়াদ ২ থেকে ১০ (বিশেষ গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে) বছর; লুঠতরাজ, অর্থাৎ জীবননাশের আশংকাজনক অত্যাচারের ক্ষেত্রে মেয়াদ ১৫ বছর পর্যন্ত।

সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের লক্ষ্য

সমাজতন্ত্রে উৎপাদন জনগণের সমৃদ্ধির মান উন্নয়নের সহায়ক। এটা কেবল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মানবিকতার নিদর্শন নয়, — অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তাও বটে; কেন না জীবনযাত্রার মানের উপর এবং জনসাধারণের বৈষয়িক ও মানসিক প্রয়োজন কতটা পুরোপুরি মিটছে তার উপর সমাজের মুখ্য উৎপাদনী শক্তি—মানুষের বিকাশ অনেকখানি নির্ভর করছে। সেই সঙ্গে উন্নয়নশীল উৎপাদন যদি তার উৎপন্ন দ্রব্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদার সম্মুখীন না হয় তা হলে তার বিকাশের গতি মন্থর হয়ে যেতে বাধা। জনসাধারণের উপযোগের বৃদ্ধিই উৎপাদনকে অবিরাম সামনের দিকে ঠেলে, আর উৎপাদনের বৃদ্ধি মানুষের চাহিদা আরও পরিপূর্ণভাবে মেটানোর সুযোগ দেয়।

যেমন, সাংস্কৃতিক ব্যবহারিক পণ্যদ্রব্যের বিক্রয় দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকল। প্রতি বছর সোভিয়েত দেশের লোকেরা আরও বেশি পরিমাণ

ঘড়ি, কাপড়-কাচা মেশিন, রেফ্রিজারেটর, টেলিভিশন কিনতে লাগল। এটা ঠিক যে এই সব পণ্যের কতকগুলির চাহিদা এখনও যথেষ্ট পূরণ হয় না। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে এই পশ্চাৎপদতার অবসান ঘটবে। তা হলে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াবে? টেলিভিশন নির্মাণ কারখানার কর্মিদলের দৃষ্টান্ত থেকে এ প্রশ্নের উত্তর মিলবে। মূলত নিজেদের উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা মিটিয়ে তারা আরও উৎকৃষ্ট ধরনের দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য কাজ করছে। টেলিভিশনের উৎকর্ষ সাধিত হচ্ছে, অথচ তার দাম কমতে চলেছে।

সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের লক্ষ্য কীভাবে অর্জিত হতে পারে? এটা পরিষ্কার যে সাধারণভাবে উৎপাদনের প্রসার ঘটিয়ে এ লক্ষ্যে পেঁছান সম্ভব নয়: দ্রব্যের উৎকর্ষসাধন, নূতন নূতন ধরনের উৎপন্ন দ্রব্যের সৃষ্টি ও সেগুলির মূল্য হ্রাসের দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। একই কালে এসব করার একটিমাত্র উপায়ই আছে: তা হল **যন্ত্রবিজ্ঞানের উন্নতি।** যন্ত্রবিজ্ঞানের উন্নতিই সামাজিক শ্রমের উৎপাদনশীলতার অবিচল বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করে।

বিশিষ্ট যন্ত্রবিজ্ঞানের ভিত্তিতে উৎপাদনের বিকাশ — জনগণের নিরন্তর শ্রীবৃদ্ধিসাধনের মতোই প্রয়োজনীয়: একটি ছাড়া অপরটি সম্ভব নয়। **সমাজতন্ত্রের মূল অর্থনৈতিক নিয়ম হল** সমাজের সকল মানুষের ক্রমবর্ধমান বৈষয়িক ও মানসিক চাহিদা আরও পরিপূর্ণভাবে মেটানোর উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট যন্ত্রবিজ্ঞান ও সমষ্টিগত শ্রমের ভিত্তিতে উৎপাদনের নিরন্তর প্রসার ও উৎকর্ষসাধন।

মূল অর্থনৈতিক নিয়মের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সমাজতান্ত্রিক সমাজ উৎপাদনকর্মে এই নিয়মের প্রয়োগ ঘটিয়ে প্রতি বছর জাতীয় অর্থনীতিক্ষেত্রে উৎপন্ন বৈষয়িক সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

২১ ॥ পরিকল্পনাগঠন

পরিকল্পনার শক্তি

সোভিয়েত দেশে প্রতিটি উদ্যোগ উৎপাদনের উপায়ের উপর সামাজিক মালিকানার দ্বারা ঐক্যবদ্ধ এক অখণ্ড অর্থনীতির এক একটি দেহকোষ। এই সবগুলির মালিক এক — জনসাধারণ। আর যেখানে মালিক এক, সেখানে সাধারণ উদ্দেশ্য এবং কার্যকলাপের একক কর্মসূচি — পরিকল্পনা জন্ম নিয়ে থাকে।

পরিকল্পনা অর্থনীতির বিভিন্ন শাখা, উদ্যোগ ও সংস্থাসমূহের ক্ষেত্রে কার্যকলাপের মধ্যে সমন্বয় রচনা করে। ধরা যাক, নূতন রাসায়নিক সংযুক্ত উদ্যোগ নির্মিত হতে থাকল। যতক্ষণে নির্মাণকর্মীরা উদ্যোগের ভবনসমূহ গড়ে তুলছে, ততক্ষণে সমস্ত দেশজুড়ে রাসায়নিক যন্ত্রনির্মাণকারখানাগুলি প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম প্রস্তুত করছে; তৈলশোধন কারখানাগুলি নূতন উদ্যোগকে কাঁচা মাল দিয়ে সাহায্য করার ভার পায়, কীভাবে শিল্পোদ্যোগে সময়মতো কাঁচা মালের সরবরাহ এবং ক্রেতার কাছে সম্পূর্ণ উৎপন্ন দ্রব্যের দ্রুত প্রেরণ সম্ভব — রেলকর্মীরা তা স্থির করে; যারা ডিজাইনার, ইঞ্জিনিয়র ও কারিগর হতে চলেছে রাসায়নিক প্রয়োগবিদ্যাসংক্রান্ত ইনস্টিটিউটগুলি সে-সব শিক্ষার্থীর শেষতম পাঠক্রমে অতিরিক্ত বিশেষ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে; আর বিদ্যালয়ে ও কারিগরি বৃত্তিশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে ভবিষ্যৎ শ্রমিকেরা অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জন করে।

পরিকল্পনা হল রাষ্ট্রীয় দলিল, যা জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপকরণসমূহ বণ্টন করে, উৎপাদনের বৃদ্ধি এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন উপযোগী, সংস্কৃতির বিকাশসংক্রান্ত, অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যবিষয়ক এবং অন্যান্য নানা ব্যাপারে কর্তব্য নির্ধারণ করে।

জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের পরিকল্পনাগঠন পুঁজিবাদের উপর সমাজতন্ত্রে আর একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য শ্রেষ্ঠত্ব। হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে সমাজ এই প্রথম উৎপাদন-পরিস্থিতিকে নিজের অধিকারে আনে, সচেতনভাবে ও বিচার-বিবেচনা অনুযায়ী তা গঠন করে এবং তারই ফলে সামাজিক শ্রমের ব্যয় যথেষ্ট পরিমিত করতে পারে। সমাজ উৎপাদনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও নৈরাজ্যের ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে, অর্থনৈতিক সংকট থেকে চিরকালের জন্য মুক্ত।

জাতীয় অর্থনীতির সচেতন পরিচালনার অর্থ অবশ্য খেয়ালখুশিমাফিক পরিকল্পনাগঠন নয়। যেমন, এটা খুবই স্পষ্ট যে যথেষ্ট পরিমাণ কাঁচা মালের ভিত্তি না থাকলে নূতন নূতন কারখানা নির্মাণের পরিকল্পনাগঠন করা যায় না। জুতো উৎপাদন দশগুণ বৃদ্ধির পরিকল্পনাকে বার্ষিক কর্মসূচি হিশেবে গ্রহণ করা যায় না, কারণ এত কাঁচা মাল কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়, ইত্যাদি।

এই দৃষ্টান্ত এবং এমন হাজার হাজার দৃষ্টান্ত থেকে আমরা এক উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারি। পরিকল্পনাগঠন-নীতিতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির এক অন্যতম বিষয়গত নিয়মের প্রভাব পড়েছে; তা হল **জাতীয় অর্থনীতির সুষম ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশের নিয়ম**। পরিকল্পনাগঠনের সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে উক্ত নিয়ম অর্থনীতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয় সামঞ্জস্য (পারস্পরিক সম্পর্ক) রক্ষার দাবি জানায়।

সুষম ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশের নিয়ম প্রয়োগ করে রাষ্ট্র সচেতনভাবে জাতীয় অর্থনীতিগত সমানুপাত স্থাপন করে ও বজায় রাখে, কিন্তু এতে আংশিক অসামঞ্জস্যের সম্ভাবনা দূর হয় না। এ ধরনের অসামঞ্জস্যের মূল কারণ — ভুল অনুমানের ভিত্তিতে

পরিকল্পনাগঠন এবং সাংগঠনিক কাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি। পণ্যদ্রব্য-উৎপাদনের পরিকল্পনাকে সব সময় বৈষয়িক-টেকনিক্যাল সরবরাহ ও সমবায়ীকৃত যোগানব্যবস্থার দ্বারা সমন্বিত করা হয় না, এবং নির্মাণকর্মের পরিকল্পনাকেও আর্থিক বরাদ্দ, বৈষয়িক তহবিল, পরিকল্পনার মেয়াদ ও উপকরণের যোগানের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত করা হয় না, — যার ফলে উৎপাদনের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয়। বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা এ ধরনের ঘটনার সাক্ষাৎ প্রায়ই পেয়ে থাকি: হয়ত বা কারখানার ভবনগুলি নির্মিত হল, ত প্রয়োজনীয় উপকরণের অংশ সময়মতো ফরমাইশ দেওয়ার দিকে নজর রাখা হল না, অথবা কারখানার উৎপাদনক্ষমতা পরিকল্পনায় কম করে দেখান হয়েছে, অর্থাৎ বৃদ্ধির বাস্তব সম্ভাবনার কথা ভাবা হয় নি, ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবেও আংশিক অসামঞ্জস্য দেখা দিতে পারে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কোন কোন শস্যের ফলন অত্যন্ত কমে যেতে পারে, ফলে সেই ফসলের প্রক্রিয়াসংক্রান্ত শিল্পের ক্ষেত্রে কাঁচা মালের ঘাটতি দেখা দেয়।

এইভাবে, সমাজতন্ত্রে যে অসামঞ্জস্য দেখা দেয় তার উদ্ভব পুঁজিবাদের মতো অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে নয়; তা মানুষের ভুল-ভ্রান্তি, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদির ফল হতে পারে, এর চরিত্র সাময়িক ও আংশিক এবং তা উৎপাদনী শক্তির ভাঙ্গন, বেকারত্ব ও অর্থনৈতিক সংকট ডেকে আনে না।

আংশিক অসামঞ্জস্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের উপায় হল রাষ্ট্রীয় মজুত। সোভিয়েত সমাজ কাঁচা মাল, জ্বালানি, ভোগ্যবস্তু ও আর্থিক সঙ্গতির মজুত গড়ে তোলে এই উদ্দেশ্যে, যাতে উৎপাদনপ্রক্রিয়ার ব্যাঘাত ও ভাঙ্গন না ঘটে এবং প্রধানত যাতে মানুষকে অপ্রত্যাশিত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ায় কষ্টভোগ না করতে হয়।

জাতীয় অর্থনীতিসংক্রান্ত পরিকল্পনা কমিউনিস্ট পার্টির নীতির রূপদান করে এবং সেই নীতির জীবনায়নে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিশেবে কাজ করে।

পরিকল্পনার জন্ম

পরিকল্পনাকে জাতীয় অর্থনীতির সুষম ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশের বিষয়গত নিয়মের প্রতিফলনস্বরূপ হতে হবে। আর রাষ্ট্রযন্ত্রের কর্তব্য হল এই নিয়ম আয়ত্তে এনে তাকে কাজে লাগাতে শেখা এবং তার দাবি অনুযায়ী পরিকল্পনাগঠন।

পরিকল্পনাগঠন হতে পারে **চলতি**, আবার **দীর্ঘমেয়াদী**, অর্থাৎ সামনের কয়েক বছরের কথা বিবেচনা করেও হতে পারে।

দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার এক বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। বলতে গেলে এর মধ্যেই অর্থনৈতিক বিকাশের গতি লক্ষ্য করার মতো দূরদৃষ্টি ছাড়াও সামগ্রিকভাবে জাতীয় অর্থনীতিবিকাশের পথ নির্ধারণক্ষেত্রে সক্রিয় ব্যবস্থাগ্রহণে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ক্ষমতার বিশেষ পরিচয় মেলে।

দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার লক্ষণ কী? এতে উৎপাদন-বিকাশের গতি ও অনুপাত, শিল্পের শাখা, প্রজাতন্ত্র ও অর্থনৈতিক অঞ্চল অনুযায়ী পুঁজি-বিনিয়োগের পরিমাণ ও উদ্দেশ্য নিরূপিত হয়, নূতন নূতন শিল্পকেন্দ্র, বৃহৎ উদ্যোগ, যানবাহন চলাচলযোগ্য সড়ক নির্মাণ এবং বিভিন্ন শাখা ও উদ্যোগের প্রকৌশলগত পুনর্গঠন সম্পাদন ইত্যাদির কথা বিবেচনা করা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গঠিত হয় সাধারণত পাঁচ বছরের জন্য।

একথা ঠিক যে বৃহৎ অর্থনৈতিক এবং সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যাসমাধানের জন্য আরও অনেক দীর্ঘ মেয়াদের আবশ্যক। জাতীয় অর্থনীতির আয়তন যত বিশাল, তার অভ্যন্তরীণ পারস্পারিক সম্পর্ক

যত জটিল, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিকাশের গতি যত দ্রুত, তার বিজ্ঞানভিত্তিক পূর্বাভাস ১০, ১৫ এমন কি ২০ বছরের জন্য হওয়ার আবশ্যকতা তত বেশি। দেশে জনসংখ্যা কত দাঁড়াবে, ক্রেতাদের চাহিদা কতদূর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে, কোন বৃত্তির ক্ষেত্রে কত কর্মীর প্রয়োজন হতে পারে? — এমন আরও শত শত প্রশ্নের উত্তর শক্তি ও উপকরণের সঠিক বণ্টন সম্ভব করে তোলে। তথ্যসংগ্রহ ও তার তাৎপর্যনির্ধারণের আধুনিক পদ্ধতি এবং যান্ত্রিক গণনাকৌশল এই ধরনের পূর্বাভাস নির্ধারণ, অর্থাৎ তার ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাগঠন সম্ভব করে তুলেছে। তবে বলাই বাহুল্য যে তা পাঁচসালা পরিকল্পনার স্থান নেয় না। সোভিয়েত ইউনিয়নের অভিজ্ঞতা এবং অতঃপর অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতাও প্রমাণ করেছে যে পাঁচসালা মেয়াদ এমনই সুনির্বাচিত, যার ফলে পরিকল্পনাগঠনে নির্ভুলতা ও ভবিষ্যৎ পরিপ্রেক্ষিতের সমন্বয়সাধন এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার সঙ্গে বার্ষিক পরিকল্পনার মেলবন্ধন সম্ভব হয়।

পাঁচসালা পরিকল্পনাসমূহ কমিউনিস্ট পার্টিকর্তৃক অনুমোদিত নির্দেশের ভিত্তিতে গঠিত হয়। যেমন, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৫তম কংগ্রেস ১৯৭৬—১৯৮০ সনের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের প্রধান প্রধান দিক-নির্দেশ অনুমোদন করে।

পার্টির নির্দেশের ভিত্তিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনাসংস্থা থেকে শুরু ক'রে উদ্যোগসমূহের অন্তর্ভুক্ত পরিকল্পনাবিভাগ পর্যন্ত সমস্ত পরিকল্পনাসংস্থাই পৃথক পৃথক শাখায়, সংযুক্ত উদ্যোগে ও কলকারখানায় সামগ্রিকভাবে জাতীয় অর্থনীতিগত পরিকল্পনা উদ্ভাবন করে থাকে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় অর্থনীতির পরিকল্পনাগঠনের প্রক্রিয়ায় দুই বিপরীত ধারা দেখা যায়: নিম্ন থেকে ঊর্ধ্বে

এবং ঊর্ধ্ব থেকে নিম্নে। প্রতিটি উদ্যোগের কর্মিদল নিজ নিজ কলকারখানায় উৎপাদনপ্রসারের পরিকল্পনা উদ্ভাবন করে এবং তা মন্ত্রিপরিষদ ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাছে পেশ করে। অতঃপর রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনাসংস্থা পৃথক পৃথক মন্ত্রিপরিষদ ও বিভাগের পরিকল্পনাসমূহ একত্রিত করে এক সামগ্রিক জাতীয় অর্থনীতিগত পরিকল্পনা উদ্ভাবন করে।

দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাগুলি চলতি (বার্ষিক) পরিকল্পনাগঠন ও তা সম্পাদনের প্রণালীতে কাজে পরিণত হয়। চলতি পরিকল্পনার সাহায্যে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাসম্পাদনের গতি নিয়ন্ত্রিত হয় এবং তার অন্তর্ভুক্ত নির্দিষ্ট সমস্যাসকল সঠিকভাবে নির্ণীত হয়।

ব্যালেন্স, অর্থাৎ জমা-খরচের হিসাব তৈরী পরিকল্পনাসংক্রান্ত সমস্যার ভিত্তি রচনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। 'ব্যালেন্স' কথাটি 'ব্যালেন্স করা' অর্থাৎ ভারসাম্য রক্ষা করার প্রচলিত অর্থে সরাসরি নেওয়া যায়। বৈষয়িক, আর্থিক ও শ্রমশক্তিতে ব্যালেন্স বিভক্ত। বৈষয়িক ব্যালেন্স গুরুত্বপূর্ণ পৃথক পৃথক শিল্প ও কৃষি উৎপন্ন দ্রব্যের প্রাকৃতিক প্রকাশের মাধ্যমে (টন, ইউনিট, ইত্যাদি) গঠিত হয়ে থাকে। যেমন, কয়লার ব্যালেন্স, শস্যজাতীয় উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যালেন্স, বিদ্যুৎশক্তির ব্যালেন্স,মাংস ও মাংসজাত দ্রব্যের ব্যালেন্স, ইস্পাতের ব্যালেন্স, সুতিবস্ত্রের ব্যালেন্স ইত্যাদি। সমজাতীয় দ্রব্যের শ্রেণী নিয়েও ব্যালেন্স তৈরি হয়: জ্বালানির ব্যালেন্স, সরঞ্জামাদির ব্যালেন্স ইত্যাদি।

যে-কোন ব্যালেন্সের দুটি অংশ থাকে: জমা ও খরচ। প্রথম অংশে হিসাব করা হয় সমস্ত সম্পদের,

আর দ্বিতীয় অংশে — পরিকল্পনাকালীন সমস্ত খরচের।

বৈষয়িক ব্যালেন্সে কেবল এক ধরনের সামঞ্জস্য — পৃথক পৃথক পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহারের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রকাশ পায়। কিন্তু অর্থনীতির পরিপূর্ণ ভারসাম্য রক্ষা করতে গেলে সামঞ্জস্যের গোটা ধারা স্থাপন করা অবশ্যকর্তব্য। যেমন, জনসাধারণের আর্থিক আয়ের মধ্যে — মজুরি, যৌথখামারীদের প্রাপ্য পেন্সন, বৃত্তি ইত্যাদি ও জনসাধারণের ব্যয় নির্বাহ: দোকানপাটে পণ্যদ্রব্য কেনা, পরিবহণ, সংযোগ, আমোদ-প্রমোদকেন্দ্র, চিপ ক্যান্টিন ইত্যাদি বাবদ অর্থপ্রদানের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখতে হয়।

সমস্ত ব্যালেন্স সঙ্গতিসাধনের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের অধিবেশন পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ অনুমোদন করে। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শাসনসংস্থাকর্তৃক অনুমোদনের পর পরিকল্পনা **আইনের** বলে সকলের পক্ষে অবশ্যপূরণীয় বলে গ্রাহ্য হয়। কোন শাখায় পরিকল্পনা লঙ্ঘন করা হলে বা পরিকল্পনা অপূরণ থাকলে জাতীয় অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং উৎপাদনের অন্যান্য শাখা, যানবাহন, বাণিজ্য, অর্থব্যবস্থা ইত্যাদিতে তার প্রভাব পড়ে।

সোভিয়েত অর্থনীতির পরিকল্পিত বিকাশ তার বৃদ্ধিতে দ্রুত গতি সঞ্চার করে, দেশের সামাজিক সম্পদ বৃদ্ধিতে এবং জনসাধারণের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা করে।

২২ ॥ সমাজতন্ত্রে পণ্য-অর্থ সম্পর্ক

সমাজতন্ত্রে পণ্য-উৎপাদন বজায় থাকে কেন

একথা অবিদিত নেই যে পণ্য-উৎপাদনব্যবস্থা উদ্ভবের কারণ — সামাজিক শ্রমবিভাগ। পণ্য-উৎপাদনের এটা এমন এক সাধারণ বনিয়াদ, যা তার সারা অস্তিত্বকাল জুড়ে নিজের তাৎপর্য রক্ষা করে আসছে। সমাজতন্ত্রে শিল্প ও কৃষি অর্থনীতির মধ্যে, শিল্প ও কৃষির বিভিন্ন শাখার মধ্যে, বিভিন্ন ধরনের পণ্যদ্রব্য-উৎপাদনকারী ভিন্ন ভিন্ন উদ্যোগের মধ্যে এবং বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত কর্মীদের মধ্যে শ্রমবিভাগ প্রচলিত আছে।

শ্রমবিভাগ থেকে বিনিময় প্রথার উদ্ভব হলেও তাকে কি অবশ্যই ক্রয়-বিক্রয়ের রূপ নিতে হবে? পুঁজিবাদে দ্রব্য পণ্য হয়ে দাঁড়ায়, কেননা পণ্য-উৎপাদনকারীরা ব্যক্তিগত মালিক হিশেবে বাজারে দেখা দেয়। সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা না থাকায় পণ্য-উৎপাদনকারীরা সামাজিক মালিকানার প্রতিভূ হিশেবে কাজ করে।

এতদ্‌সত্ত্বেও পণ্য-উৎপাদন বজায় রাখার আবশ্যকতা কোথায়?

পণ্য-উৎপাদন বজায় থাকার কারণ এই যে উৎপাদনী শক্তি বিকাশের স্তর যথেষ্ট উচ্চে নয়। দ্রব্যের বিনিময়কে পণ্যের রূপ হারাতে হলে বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য গড়ে তুলতে হয় এবং বিনামূল্যে সকল মানুষের চাহিদা পূরণ করতে হয়। কমিউনিজমে এটাই হবে। সমাজতন্ত্রে সমাজ মানুষের শ্রমের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী

পণ্যদ্রব্য বণ্টন করতে বাধ্য। এখানে শ্রমের পরিমাণ ও উপযোগের পরিমাণ হিসাব করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। এ ধরনের হিসাবের উপায় হল অর্থ, যা দিয়ে প্রত্যেকে তার প্রয়োজনীয় পণ্য কিনতে পারে।

পণ্য-উৎপাদন বজায় থাকার আরও কারণ হল সমাজতান্ত্রিক মালিকানার দুই রূপের অবস্থান। রাষ্ট্র ও যৌথখামার — প্রধান দুই মালিকের মধ্যে বিনিময় সাধিত হয় পণ্যের রূপে: যৌথখামার তার উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রি করে রাষ্ট্রের কাছে এবং অংশত যৌথখামারের বাজারে, আর তার বদলে রাষ্ট্রের কাছ থেকে কেনে যন্ত্রপাতি, সার ও অন্যান্য পণ্য।

সমাজতন্ত্রে পণ্য-উৎপাদন মূলগতভাবে পুঁজিবাদী পণ্য-উৎপাদন থেকে ভিন্ন। এই উৎপাদন ব্যক্তিগত মালিকানাহীন, ছোট বড়, কোন রকম পুঁজিপতির সংস্রব এতে নেই, নেই মানুষের উপর মানুষের শোষণ।

পণ্যের উৎপাদন, সেগুলির বণ্টন ও বিনিময় আপনা-আপনি না হয়ে জাতীয় অখণ্ড অর্থনীতি-পরিকল্পনার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। পণ্য-উৎপাদনের ক্ষেত্রও সীমিত: জমি ও ভূগর্ভ, বন, কলকারখানা, রেলপথ এবং সামাজিক সম্পদের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান পণ্যে আবর্তনযোগ্য নয়, — এগুলি কেউ কিনতে পারে না, বিক্রিও করতে পারে না; শ্রমশক্তিও ঠিক তেমনি পণ্য নয়।

মূল্যের নিয়মের আচরণগত পরিবর্তনের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক পণ্য-উৎপাদন ও পুঁজিবাদী পণ্য-উৎপাদনের প্রত্যক্ষ প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়।

সমাজতন্ত্রে মূল্যের নিয়ম

যেখানে পণ্য-উৎপাদন আছে মূল্যের নিয়মও সেখানে প্রচলিত: সমাজের দিক থেকে আবশ্যকীয় শ্রমব্যয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন ও বিনিময় হয়ে থাকে। পণ্যের উপর দর নির্ধারণ করে দিয়ে রাষ্ট্র কোন নির্দিষ্ট উদ্যোগের স্বতন্ত্র ব্যয়ের কথা ভেবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। উৎপাদনী শক্তির বিকাশের বর্তমান পর্যায়ে, যন্ত্রবিজ্ঞানের বর্তমান স্তরে এবং শ্রমের দক্ষতা ও প্রয়োগের প্রচলিত মাঝারি ধাপে যে-সব ব্যয় অবশ্যপ্রয়োজনীয় রাষ্ট্র সেগুলির দ্বারা পরিচালিত হয়।

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে দর আপনা-আপনি বাজারে সৃষ্টি হয়, আর সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে নির্ধারিত হয় **পরিকল্পিত দর** (যৌথখামারের বাজারের দর বাদে*)। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের কথা বিবেচনা করে সর্বাগ্রে উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্যমানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

সাধারণত কোন পণ্যের দর যতদূর সম্ভব তার মূল্যের, অর্থাৎ উৎপাদনে যে পরিমাণ শ্রম ব্যয়িত হয়েছে, তার কাছাকাছি। দর যত সঠিকভাবে মূল্য প্রকাশ করে, কোন সরঞ্জাম, কাঁচা মাল বা উৎপাদনের প্রকৌশলগত প্রক্রিয়া কতটা লাভজনক তা নির্ধারণ করা তত সহজ হয়।

---

* যৌথখামারের বাজারের দর সরাসরিভাবে রাষ্ট্রের দ্বারা পরিকল্পিত নয়, — তা গড়ে ওঠে চাহিদা ও সরবরাহের প্রভাবে। সেই সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র যৌথখামারের বাজারের দরের উপর প্রভাব বিস্তার করে সর্বোপরি এই কারণে যে পণ্যের মূল অংশ কঠোর পরিকল্পিত দরে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যব্যবস্থায় বিক্রি হয়ে থাকে।

মূল্যের নিয়ম প্রয়োগের ফলে নূতন যন্ত্রপাতি প্রচলনে বৈষয়িক প্রেরণার সঞ্চার এবং উৎপাদনব্যবস্থার সংগঠন সম্ভব হয়। পরিণামে শ্রমের উৎপাদনশীলতার অবিচল বৃদ্ধি ও উৎপন্ন দ্রব্যের ইউনিটের মূল্যহ্রাস সুনিশ্চিত হয়।

সেই সঙ্গে সামাজিক উৎপাদনের স্বার্থে ও জনসাধারণের স্বার্থে যখন তা আবশ্যক হয়ে পড়ে, তখন রাষ্ট্র জেনেশুনেই মূল্যমান থেকে দরের বিচ্যুতি মেনে নেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এটা করা হয় সে ক্ষেত্রে, যখন অধিকতর অর্থনৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ অন্যান্য শিল্পশাখার বিকাশ ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে কোন কোন শিল্পশাখা থেকে উৎপন্ন আয়ের অংশ ব্যবহারের আবশ্যকতা দেখা দেয়। জনসাধারণের চাহিদা, অর্থাৎ উপযোগের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যেও এমন করা হয়। যেমন, দোকানে শিশুদের ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যের দর সচরাচর মূল্যের নীচে, কিন্তু তার বদলে কতকগুলি জিনিসের দর মূল্যের ঊর্ধ্বে (তামাক, ভোদ্‌কা ইত্যাদি)।

যা বলা হল তার মোটকথা এই দাঁড়াচ্ছে যে পুঁজিবাদে মূল্যের নিয়ম আপনা-আপনি কাজ করে, আর মূল্য থেকে দরের বিচ্যুতি হল পুঁজিবাদী অর্থনীতির নৈরাজ্যের ফল। এর ঠিক বিপরীত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে মূল্য থেকে দরের বিচ্যুতি সমাজের স্বার্থে রাষ্ট্রকর্তৃক সচেতনভাবে অনুমোদিত।

সমাজতন্ত্রে অর্থ

সমাজতান্ত্রিক পণ্য-উৎপাদনে অর্থও তেমনি তার স্বাভাবিক কর্তব্য পালন করে থাকে। বাকি সব পণ্যের মূল্য আর্থিক পণ্যের সমপর্যায়ভুক্ত করে নেওয়া হয়,

আর্থিক পণ্য **সেগুলির মূল্যপরিমাপ** নির্ণয় করে। সমাজতন্ত্রেও সোনা হল এই ধরনের আর্থিক পণ্য। সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রায় সোনার পরিমাণ আছে (১ রুবলের স্বর্ণ পরিমাণ ০·৯৮৭৪১২ গ্রাম)।

অর্থ হল বাণিজ্যের অবশ্যপ্রয়োজনীয় উপাদান, **বিনিময়ের মাধ্যম**, কেননা অর্থ ছাড়া কেনা-বেচা অসম্ভব।

অর্থের ব্যবহার চলে সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে। কলকারখানা, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহের পরস্পরের মধ্যে হিসাব মিটানো হয় চেক চুকানো ব্যবস্থার দ্বারা। ব্যাংক এক কারখানা বা প্রতিষ্ঠান থেকে অপর কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাউণ্টে মোট অর্থ হস্তান্তরিত করে। রাষ্ট্রীয় ব্যাংক যে নগদ অর্থ প্রদান করে থাকে তার প্রধান অংশ যায় মজুরি, পেন্সন, ভাতা ও বৃত্তি পরিশোধে এবং কৃষি দ্রব্য ক্রয়ের পেছনে। বাণিজ্যব্যবস্থা বিন্যাসের মধ্য দিয়ে নগদ অর্থ ব্যাঙ্কে প্রত্যাবর্তন করে।

শ্রমিক ও কর্মচারীদের মজুরি প্রদানের সময়, সমাজতান্ত্রিক উদ্যোগগুলি কর্তৃক ঋণ গ্রহণ এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাংককে ঋণ পরিশোধের সময়, কর ও বীমার প্রিমিয়াম দানের সময়, যৌথখামারীদের মধ্যে আর্থিক আয় বণ্টনের সময়, অর্থাৎ যখন ক্রয়-বিক্রয় ছাড়াই অর্থের হস্তান্তর ঘটতে থাকে তখন অর্থ হয় **মূলশোধের উপায়**।

অর্থ **সঞ্চয়ের উপায়**ও হতে পারে। কলকারখানা, রাষ্ট্রীয় খামার ও যৌথখামার তাদের আর্থিক আয় এবং সাময়িকভাবে অতিরিক্ত আর্থিক সঙ্গতি ব্যাঙ্কে জমা রাখে। এই সঞ্চয় ও বাঁচানো অর্থ রাষ্ট্র উৎপাদনের প্রসার, সংরক্ষিত ভাণ্ডার গঠন, অন্যান্য উদ্যোগ ও সংস্থাকে ঋণদানের জন্য ব্যবহার করে।

পংজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক সমাজে অর্থের সামাজিক ভূমিকা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পংজিবাদে অর্থ পংজিতে রূপান্তরিত হয়, শ্রমিক শোষণের হাতিয়ারে এবং অপরের শ্রম অধিকারের উপায়ে পরিণত হয়। সমাজতন্ত্রে অর্থ পংজিতে পরিণত হতে পারে না, তা দিয়ে কলকারখানা, শ্রমশক্তি, ভূমি, বিদ্যুৎকেন্দ্র — কিছুই কেনা যায় না। পংজিবাদী ব্যবস্থায় অর্থ হল বাজারের স্বতঃস্ফূর্ত নিয়ম নির্ধারণের হাতিয়ার। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র অর্থকে সচেতনভাবে পণ্যের উৎপাদন ও বণ্টনের সর্বগ্রাহ্য হিসাব-নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণের এবং শ্রমের পরিমাণ ও উপযোগের পরিমাণ নির্ধারণের উপায় হিশেবে গ্রহণ করে।

সমাজতন্ত্রে অর্থ হল শ্রম অনুযায়ী বণ্টনের প্রয়োজনীয় উপায়। অর্থ দিয়ে ব্যক্তিগত ব্যবহারের পণ্য ক্রয় করে জনসাধারণ সামাজিক উৎপন্ন দ্রব্যের এমন অংশ পায় যা তাদের ব্যয়িত শ্রমের পরিমাণ ও গুণের উপযোগী।

অর্থের সাহায্যে রাষ্ট্র উদ্যোগসমূহের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ফলাফল নির্ধারণ করতে পারে। তাদের আর্থিক ব্যয়ের মধ্যে কোন পণ্য-উৎপাদনের পক্ষে অবশ্যপ্রয়োজনীয় শ্রমের ব্যয়, কাঁচা মাল, উপাদান ও জ্বালানির ব্যয়, বিভিন্ন সরঞ্জামের ক্ষয়ক্ষতি, পরিচালনসংক্রান্ত ব্যয়, পণ্যের পরিবহণ এবং বাণিজ্যব্যবস্থার মাধ্যমে ক্রেতার কাছে তা সরবরাহের জন্য খরচ দেখতে পাওয়া যায়। সমাজতান্ত্রিক উদ্যোগসমূহের কাজের পেছনে রুবলের নিয়ন্ত্রণ অর্থনীতি পরিচালনার সবচেয়ে নমনশীল পদ্ধতি।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি বিশ্ব পংজিবাদী ব্যবস্থাধীন দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য করে থাকে। যেহেতু পণ্য ও সার্ভিসের দর প্রতিটি দেশে তার জাতীয় মুদ্রার ইউনিটে

প্রকাশ পায়, সেহেতু তাদের মধ্যে মুদ্রার গতিপথসম্পর্কিত সমস্যা,অর্থাৎ এক দেশের মুদ্রার এককের সঙ্গে অপর দেশের মুদ্রার এককের সম্পর্কসংক্রান্ত সমস্যা দেখা দিতে বাধ্য।

২৩ ॥ ব্যবস্থাপনা ও অর্থনীতির পরিচালনা

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পরিকল্পনামুখী চরিত্র তার স্থির ও দ্রুত বিকাশের অনুকূল সম্ভাবনা গড়ে তোলে। কিন্তু এই সব সম্ভাবনা আপনা-আপনি কাজে পরিণত হয় না, — ব্যবস্থাপনা ও অর্থনীতির পরিচালনা মাধ্যমে তা কাজে পরিণত হয়।

ব্যবস্থাপনার জন্য বহু বিচিত্র ধরনের প্রণালী, রূপ ও পদ্ধতির ব্যবহার করা দরকার। তা আয়ত্তে আনতে গেলে বিস্তৃত তাত্ত্বিক অধ্যয়ন ও প্রয়োজনীয় বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়। গোড়ায় থাকা দরকার এই নীতির মূল তাৎপর্য সম্পর্কে বোধ: ব্যয়সংকোচব্যবস্থা, স্বয়ম্ভর অর্থনীতি, উৎপাদনমূল্য এবং মুনাফা ও লাভজনকতাসংক্রান্ত ধারণা।

ব্যয়সংকোচব্যবস্থা

সামাজিক শ্রমের প্রতি সম্পর্কের ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতায় এবং রাষ্ট্রের অধিকারে যে-সব সম্পদ আছে তার সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ ব্যবহারে আগ্রহ সমাজতান্ত্রিক সমাজের রক্তের মধ্যে রয়েছে। যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের ক্ষয়ক্ষতি যত কম, কাঁচা মাল, জ্বালানি, বিদ্যুৎশক্তি এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপায়ের ব্যয় যত পরিমিত সেই পরিমাণ খরচেই আরও বেশি উৎপন্ন দ্রব্য তৈরি করা যেতে পারে।

উদাহরণ দেওয়া যাক। সেলাইয়ের কারখানায় সরকারীভাবে কাপড়ের নির্ধারিত পরিমাণ বর্জ্য ধার্য করাই আছে। মনে হতে পারে এখানে বুঝি একেবারে কিছুই করার নেই: এমনভাবে ত আর পোশাক সেলাই করা যায় না, যাতে ছাঁট না থাকে। কিন্তু উৎপাদনের অগ্রণী কর্মীরা অপরিহার্য বলে মনে হলেও কাপড়ের এমন অপব্যয়ের সঙ্গে আপস করতে পারে না। তারা এ ব্যাপারে অনেক খোঁজাখুঁজি ও অনুসন্ধান করে শেষ পর্যন্ত কাপড় ছাঁটার নূতন পদ্ধতি বার করে। এর ফলে একই পরিমাণ কাপড় থেকে ১০টির জায়গায় ১১টি পোশাক সেলাই করা সম্ভব হয়। যুক্তি-সিদ্ধ প্রস্তাব বহু হাজার মিটার বস্ত্র বাঁচাতে সাহায্য করে।

কেবল কাঁচা মাল ও উপাদানের পরিমিত ব্যয়ের দ্বারাই নয়, — শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির দ্বারাও ব্যয়সঙ্কোচ সম্ভব।

সোভিয়েত জনগণ ভরা সিন্দুকের উপর বসে কৃপণ নাইটের* মতো মনে মনে নিজের ঐশ্বর্যের তারিফ করার জন্য ব্যয়সঙ্কোচের চেষ্টা করে না। গভীর আগ্রহের সঙ্গে আর্থিক উপকরণ, কাঁচা মাল অথবা জ্বালানি ব্যয় করে তারা শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ — সামাজিক শ্রমের ব্যয়সঙ্কোচ করে। আর তা তারা করে থাকে সমগ্র জনগণের সচ্ছলতাবৃদ্ধির জন্য। সাশ্রয়কৃত অর্থ আরও বেশি পরিমাণে বাসস্থান, বিদ্যালয়ভবন ও বিশ্রামকেন্দ্র নির্মাণে সমাজকে সাহায্য করে, অর্থাৎ যথাস্থানে ব্যয়ে কোন রকম কার্পণ্য না করে আরও প্রভূত পরিমাণে সোভিয়েত জনগণের চাহিদা পূরণ করে।

খুঁটিনাটি ও চুলচেরা হিসাবের সঙ্গে যে ব্যয়সঙ্কোচব্যবস্থার কোন মিলই নেই, কেবল তা নয়, — এ ব্যবস্থা প্রকৃতপ্রস্তাবে সরাসরি তার বিপরীত। সমস্ত রকম অগ্রগতি এবং যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রগতির জন্য আর্থিক

* পুশকিনের ঐ নামের নাটকের চরিত্র। — অনুঃ

সঙ্গতির দরকার; সোভিয়েত রাষ্ট্র এ ব্যাপারে কোন রকম কার্পণ্য না দেখিয়ে অর্থ মঞ্জুর করে। এতেই সামাজিক শ্রমের ব্যয়ে পরম দূরদর্শিতার পরিচয় প্রকাশ পায়। যে-কোন ব্যয়ের যাতে ভিত্তি থাকে, যাতে সমাজের এই প্রত্যয় হয় যে উপকরণ মিছামিছি খরচ না হয়ে অর্থনীতির ভবিষ্যৎ বিকাশে সাহায্য করছে — সেটা অবশ্যই দেখা দরকার।

পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি শ্রমের যতদূর সম্ভব পরিমিত ব্যয় সম্ভব করে তোলে। কিন্তু এর অর্থ কি এই যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সব রকম ক্ষতির সম্পূর্ণ অবসান ঘটেছে? দুঃখের বিষয়, অবস্থাটা মোটেই সে রকম নয়। বহু উদ্যোগ ও নির্মাণক্ষেত্রে, যৌথখামার ও রাষ্ট্রীয় খামারে এখনও আর্থিক সঙ্গতির অতিব্যয় দেখা যায়: কাঁচা মাল, বিবিধ উপকরণ ও জ্বালানি বেহিসাবীভাবে খরচ করা হয়, যন্ত্রপাতি যথাযথ কাজে লাগানোর প্রতি নজর রাখা হয় না, নূতন যন্ত্রপাতির দুর্বল প্রয়োগ এবং কোন রকম বিচার-বিবেচনা না করে শ্রমিকদের কাজ সংগঠন ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়। এসব ক্ষতির কারণ হল ব্যবস্থাপনার অভাব, জাড্য ও রক্ষণশীলতা। এতে রাষ্ট্রের বিরাট খরচ ও লোকসান হয়।

সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তির প্রতি যত্ন, শ্রমের উৎপাদনশীলতার দৃঢ় উন্নতি ও যন্ত্রপাতির উৎকর্ষ, শ্রমব্যয়ের নিয়মিত হ্রাস, কাঁচা মাল, জ্বালানি, বিবিধ উপকরণ ও বিদ্যুৎশক্তির পরিমিত ব্যয়, উৎপাদনে বর্জ্যের ও বরবাদী দ্রব্যের পরিমাণ হ্রাস — এই হল এমন কতকগুলো নীতি যা ছাড়া ব্যয়সঙ্কোচব্যবস্থা মেনে চলা সম্ভব নয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে ব্যয়সঙ্কোচব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার এমন এক পদ্ধতি যার কাজ হল উৎপাদনের

উপায় ও শ্রমের স্বল্পতম ব্যয়ে অধিকতর পরিমাণ উৎকৃষ্ট দ্রব্যের উৎপাদন। উক্ত লক্ষ্যে পেঁছানোর অন্যতম উপায় — **স্বয়ম্ভর অর্থনীতি।**

স্বয়ম্ভর অর্থনীতি

স্বয়ম্ভর অর্থনীতিসম্পন্ন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ রাষ্ট্রের কাছ থেকে ইমারত, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, কাঁচা মাল ও জ্বালানির সংগ্রহ এবং আর্থিক উপকরণ পেয়ে থাকে। উৎপাদনের উপায় অক্ষুণ্ণ রাখা ও তার সঠিক ব্যবহারের জন্য তাকে দায়ী থাকতে হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজের ভার পেয়ে এই উদ্যোগ স্বাধীনভাবে তার উৎপাদনসংক্রান্ত কার্যকলাপ সংগঠন করে।

স্বয়ম্ভর অর্থনীতিসম্পন্ন উদ্যোগ অন্যান্য উদ্যোগের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে চলে। যেমন, সুতো তৈরির কারখানাকে তুলোর জন্য রাষ্ট্রীয় খামারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করতে হয়, কারখানা তুলো চালানের জন্য রেল ভাড়া দেয়, নিজেদের তৈরী পণ্যদ্রব্য সুতীবস্ত্র উৎপাদনের কারখানায় বিক্রি করে, সুতীবস্ত্র উৎপাদনের কারখানা আবার তৈরী বস্ত্র বাণিজ্য সংস্থাগুলির কাছে বিক্রি করে ইত্যাদি। এর জন্য উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কলকব্জা, জ্বালানি ও কাঁচা মাল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তিতে সরবরাহের শর্ত, পরিমাণ, শ্রেণী, দ্রব্যের উৎকর্ষ, সরবরাহের সময়, দর, পরিশোধের সময় ও রীতি এবং এই সমস্ত শর্ত লংঘনের পরিণাম নির্দেশ করা হয়।

স্বয়ম্ভর অর্থনীতিসম্পন্ন উদ্যোগ স্বয়ং-পরিশোধের নীতিতে কাজ করে: এই উদ্যোগগুলিকে কাঁচা মাল, জ্বালানি ও বিভিন্ন উপকরণের পেছনে এবং শ্রমিক ও

কর্মচারীদের মজুরি পরিশোধবাবদ সব ব্যয় পণ্যবিক্রয়লব্ধ আর্থিক সঙ্গতি থেকে পুষিয়ে নিতে হয়, উৎপাদনের উপায় ব্যবহারের দরুন বাজেটে অর্থপ্রদান করতে (মূল তহবিল ব্যবহারের জন্য পরিশোধ ও খাজনা) এবং সামাজিক বীমাবাবদ বরাদ্দ ঠিক করতে হয়, আর তা ছাড়া লাভও আনতে হয়।

উদ্যোগ যত বেশি দ্রব্য উৎপাদন করবে, উৎপাদনের পেছনে যত কম ব্যয় করবে, তত বেশি পরিমাণে সঙ্গতি নিজের অধিকারে পেতে — অর্থাৎ, পরিকল্পিত ও পরিকল্পনাবহির্ভূত সঞ্চয় থেকে তথাকথিত উদ্যোগের তহবিলে বরাদ্দ করে রাখতে পারবে। উদ্যোগের তহবিল থেকে নূতন যন্ত্রপাতির প্রচলন, উৎপাদনের সম্প্রসারণ, ঘর-বাড়ি নির্মাণ ও মেরামত, ক্রেইশ, কিণ্ডারগার্টেন, পাইওনিয়র ক্যাম্প ইত্যাদি শিশু প্রতিষ্ঠানের ভরণপোষণ, বিশ্রামভবন, স্বাস্থ্যাবাস, ক্যাণ্টিন ও ক্লাবের উপকরণ সরবরাহ, বিশ্রামভবন ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে যাবার বিশেষ ব্যবস্থা এবং কর্মীদের বোনাস প্রদান ইত্যাদির জন্য ব্যয় করা হয়। বোঝাই যাচ্ছে যে সামগ্রিকভাবে স্বয়ম্ভর উদ্যোগের মতো তার সব কর্মীরাও শ্রমের সময়ের যথাযথ ব্যবহারে, বৈষয়িক ও আর্থিক সম্পদের পরিমিত ব্যয়ে এবং উৎপন্ন দ্রব্যের উৎকর্ষসাধনে আগ্রহী।

১৯৭০ সনে শিল্পোদ্যোগগুলি বিকাশ তহবিলে ৩৬০ কোটি রুবল, সামাজিক সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা ও বাসনির্মাণ তহবিলে ১৪০ কোটি রুবল এবং বৈষয়িক প্রেরণাদায়ক তহবিলে ৪০০ কোটি রুবল বরাদ্দ করেছে। বিগত অষ্টম পাঁচসালা পরিকল্পনায় শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক ও কর্মচারীদের গড় মজুরির যে বৃদ্ধি ঘটেছে তার এক-চতুর্থাংশের বেশি এসেছে এই সব তহবিলের সঙ্গতি থেকে।

উৎপাদনমূল্য

সমাজতান্ত্রিক উদ্যোগসমূহের নিজস্ব এক ধরনের হিসাব আছে যার দ্বারা অর্থনীতি কতখানি সঠিক চলছে তা নির্ণয় করা সম্ভব। এটা হল দ্রব্যের উৎপাদনমূল্য, যা কোন পণ্যদ্রব্য উৎপাদনে উদ্যোগের খরচের পরিমাণ নির্দেশ করে।

উৎপাদনমূল্য হিসাব করার সময় কাঁচা মাল ও সহায়ক উপাদান (মেশিনে লেপনের তেল, রং ইত্যাদি), জ্বালানি ও বিদ্যুৎশক্তি ব্যয়, দালান, মেশিন, সরঞ্জাম ইত্যাদি উৎপাদনের উপায়ের ক্ষয়ক্ষতি দরুন পরিশোধ, মজুরি, সামাজিক বীমাবাবদ বরাদ্দ এবং পরিচালনযন্ত্রের জন্য ব্যয়ের কথা গণনা করতে হয়। মোট অর্থের ব্যয় হিসাব করার পর তাকে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ দিয়ে ভাগ করা হলে উৎপাদিত বস্তুর ইউনিটের উৎপাদনমূল্যের সূচক পাওয়া যায়। তাই, **উৎপাদনমূল্য — দ্রব্যের উৎপাদন ও বিক্রয়ের উদ্যোগের আর্থিক রূপে প্রকাশিত ব্যয়।**

একই ধরনের দ্রব্য উৎপাদনকারী বিভিন্ন উদ্যোগে উৎপাদনমূল্য বিভিন্ন রকমের হতে পারে। কোন উদ্যোগের উৎপাদনমূল্য যদি অত্যন্ত বেশি হয়ে পড়ে এবং হিসাবে মন্দ অবস্থার লক্ষণ ধরা পড়ে, তা হলে উদ্যোগের পরিচালক ও কর্মিদলকে রোগের কারণ খুঁজে বার করে তা নিরাময়ের ব্যবস্থা করতে হবে। কোন ক্ষেত্রে তার কারণ হতে পারে কাঁচা মালের অপব্যয়, কোন ক্ষেত্রে — যন্ত্রপাতির অনুৎপাদনশীল ব্যবহার, আবার কোন ক্ষেত্রে — পরিচালনখাতে ব্যয়ের স্ফীতি। সঠিক রোগনির্ণয় করতে পারলে রোগীর চিকিৎসা সহজসাধ্য হয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে: দ্রব্যের উৎপাদনমূল্য কখন উপরে, কখনই বা তা নীচে এবং কিসের উপরই বা উৎপাদনমূল্যহ্রাস নির্ভর করে?

অগ্রণী উদ্যোগগুলিতে দ্রব্যের উৎপাদনমূল্য অবশ্যই পশ্চাৎপদ উদ্যোগের তুলনায় অনেক নীচে। এর কারণ কী? কারণ এই যে এসব উদ্যোগে নূতন নূতন অগ্রণী যন্ত্রপাতির আশ্রয় নেওয়া হয় এবং তার ফলে শ্রমের উৎপাদনশীলতা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে, উপকরণসমূহের ব্যয় পরিমিত হয় এবং উপকরণের আধুনিকতম রূপ (যেমন, ধাতুর বদলে প্লাস্টিক) কাজে লাগানো হয়, তৈরী জিনিসের গঠন ক্রমাগত উৎকর্ষ লাভ করতে থাকে। এসবই উৎপাদনমূল্যের নিম্নগামিতা সম্ভব করে তোলে। আর যদি অপটু হাতে অর্থনীতি পরিচালিত হয়, শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি না পায়, কাঁচা মাল ও অন্যান্য উপকরণের অতিরিক্ত ব্যয় হয় তবে সে উদ্যোগে দ্রব্যের উৎপাদনমূল্য বেশি হবে।

পুঁজিবাদী দুনিয়ায় কারবারি আনাড়ির মতো কারবার পরিচালনা করে দেউলিয়া হয়ে পড়ে এবং কখনো কখনো গুলি মেরে আত্মহত্যা করা ছাড়া তার আর কোন উপায় থাকে না। সোভিয়েত ইউনিয়নে দেউলিয়া হয়ে পড়ার কোন উপায় নেই, কেননা সমস্ত উদ্যোগর মালিক এক — জনগণ। তবে, এর অর্থ মোটেই এমন নয় যে জনগণ, পার্টি ও রাষ্ট্রীয় পক্ষের সামাজিক স্বার্থের লঙ্ঘন সহ্য করা সম্ভব। পার্টি ও রাষ্ট্রীয় সংগঠনসমূহ, জনগণের পরিদর্শনসংস্থা, প্রেস এবং সোভিয়েত জনসমাজ উদ্যোগসমূহের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের সাহায্য করে, দোষ-ত্রুটি নির্দেশ করে এবং কোন ব্যাপারে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হলে সতর্ক করে দেয়। উৎপাদনব্যবস্থা সুবিন্যস্ত করার ক্ষেত্রে

পরিচালকদের অক্ষমতা প্রকাশ পেলে তাদের অন্য কোন কাজে বদলি করা হয়; আর তারা যদি অপরাধমূলক অসতর্কতা, অব্যবস্থাপনার পরিচয় দেয় অথবা এমন কি রাষ্ট্রকে প্রতারণা করে থাকে তা হলে আইনের সমস্ত রকম কঠোরতার প্রয়োগে তাদের শাস্তি দেওয়া হয়।

মুনাফা ও লাভজনকতা

উৎপাদনমূল্যের সূচক উদ্যোগসমূহের কর্মপরিস্থিতি উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। কিন্তু এতে সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির দৃষ্টিতে উদ্যোগের কার্যকলাপের মূল্যনির্ধারণ সম্ভব নয়। এই ভূমিকা সবচেয়ে ভালোভাবে পালন করে অন্যান্য সূচক, এবং বিশেষ করে **মুনাফা ও লাভজনকতা।**

মুনাফা হল উদ্যোগকর্মীদের তৈরী উদ্বৃত্ত উৎপন্ন দ্রব্যের সেই অংশ যা উৎপাদিত বস্তু বিক্রয়ের পরও উদ্যোগের অধিকারে থেকে যায়।

মুনাফার আয়তন নির্ধারিত হয় দ্রব্যের পাইকারি দর ও তার উৎপাদনমূল্যের পার্থক্যের দ্বারা। কোন উদ্যোগ যদি ২২ লক্ষ রুবল মূল্যের পণ্য বিক্রয় করে এবং তার উৎপাদন ও বিক্রয়বাবদ ২০ লক্ষ রুবল খরচ করে তার মুনাফার পরিমাণ হবে ২ লক্ষ রুবল। সুতরাং, মুনাফার আয়তন সর্বোপরি নির্ভর করছে উৎপাদন ও বিক্রয়বাবদ ব্যয়ের উপর, অর্থাৎ উৎপাদনমূল্যের উপর। মুনাফার আয়তনের উপর তৈরী জিনিসের পরিমাণ (এক জোড়া জুতোর দামে যদি এক রুবল পরিমাণ মুনাফা অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে দশ জোড়ায় তার পরিমাণ হবে ১০ রুবল), তাদের গুণ (অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট পণ্যদ্রব্যের দর তুলনামূলকভাবে উপরে বাঁধা হয়ে থাকে) এবং উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয় থেকে আদায় (কারখানার গুদামে জুতো যতক্ষণ পর্যন্ত পড়ে রয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার মূল্যে অন্তর্ভুক্ত মুনাফা বাস্তব পরিমাণ নয়। এই

মুনাফা বাস্তব হবে একমাত্র ক্রেতার কাছ থেকে উদ্যোগের হাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আসার পর) প্রভাব বিস্তার করে।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উদ্যোগের মুনাফা কোন রকম বিনা শ্রমলব্ধ আয় হতে পারে না। সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের লক্ষ্য মুনাফার পশ্চাদ্ধাবন নয়, — সমাজের ক্রমবর্ধমান চাহিদা আরও পরিপূর্ণভাবে মেটানোই তার লক্ষ্য।

উৎপাদনমূল্যের সূচকের তুলনায় মুনাফা উল্লেখযোগ্য প্রাধান্যের অধিকারী।

উৎপাদনমূল্য হ্রাসের জন্য চেষ্টা সময় সময় উৎপন্ন দ্রব্যের উৎকর্ষবৃদ্ধির সমস্যার বিরুদ্ধে যায়। কোন কোন সময় নির্মাণ-শিল্পোদ্যোগের অতিরিক্ত ব্যয় দ্রব্য-উপযোগকরণের ক্ষেত্রে অতি লাভজনক হয় (যেমন, বিমান ইঞ্জিনের উৎকর্ষসাধনের ফলে জাতীয় অর্থনীতি কোটি কোটি রুবল লাভ করে)। তবে, এই অতিরিক্ত ব্যয় উৎপাদনমূল্যের বৃদ্ধি ঘটায়।

উদ্যোগের কাজকে কেবল উৎপাদনমূল্য দিয়ে বিচার করলে মনে হবে বুঝি বা তার কাজের অবনতি ঘটছে (যেহেতু দ্রব্যের উৎপাদনমূল্য বেড়ে গেল)। আর যদি উদ্যোগের কার্যকলাপকে মুনাফা অনুযায়ী বিচার করা যায় তা হলে সিদ্ধান্তটি হবে সঠিক: উদ্যোগের কাজের উন্নতি ঘটছে (উৎকৃষ্ট দ্রব্য উঁচু দরে বিক্রি হওয়াতে তার মুনাফা বৃদ্ধি পাবে)। সুতরাং, মুনাফা যেমন উৎপাদনকারীর, তেমনি দ্রব্যের ক্রেতার সুবিধার্থে অধিকতর উৎকর্ষ অর্জন সম্ভব করে।

অবশ্যই, মুনাফা অনুযায়ী সমস্যার নির্ধারণের ফলে উৎপাদনমূল্য হ্রাসের তাৎপর্যহানি ঘটছে না। তবে, মুনাফার

মোট পরিমাণও উদ্যোগের কাজের ফলাফলের একেবারে পূর্ণাঙ্গ চরিত্র তুলে ধরতে পারে না। উদ্যোগের কাজের উৎকর্ষ বিচার করতে গেলে লাভজনকতার সূচকেরও ব্যবহার করতে হয়, কারণ এতে মূল তহবিল ও চলতি উপকরণের মূল্যের সঙ্গে প্রাপ্ত মুনাফার সম্পর্ক প্রকাশ পায়।

উৎপাদন তহবিলের প্রতিটি রুবল থেকে উদ্যোগের যত বেশি মুনাফা ঘটবে তার লাভজনকতাও তত ঊর্ধ্বে। এইভাবে, লাভজনকতার সূচকের গণনা কোন উদ্যোগকে যন্ত্রপাতি, কাঁচা মাল এবং উৎপাদনের অন্যান্য তহবিল সর্বাপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত উপায়ে ব্যবহারের প্রেরণা দেয়।

মুনাফা কেবল স্বয়ম্ভর অর্থনীতিসম্পন্ন উদ্যোগ ও সংযুক্ত উদ্যোগেরই নয়, — রাষ্ট্রীয় বাজেটেরও আয়ের মূল উৎস। অবশ্য কোন উপায়ে এবং কী পরিস্থিতিতে তা বৃদ্ধি পায় সমাজতান্ত্রিক সমাজ সে ব্যাপারে উদাসীন থাকতে পারে না। উৎপাদনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি, দ্রব্যের উৎপাদনমূল্য হ্রাস এবং শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি — এই হল মুনাফা বিস্তারের উপায়। অমূলকভাবে দর বাড়িয়ে অথবা পণ্যের নির্দিষ্ট শ্রেণীবিন্যাস ও মান লঙ্ঘন করে তা লাভের যে-কোন রকম চেষ্টা চলতে পারে না।

উৎপাদনমূল্য, মুনাফা, লাভজনকতা ও অন্যান্য অর্থনৈতিক সূচক ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারলে মূল লক্ষ্যে পেঁৗছানো, অর্থাৎ সামাজিক উৎপাদনের কার্যকারিতাবৃদ্ধি সম্ভব।

অর্থনীতির পরিচালনা

সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন পরিচালনার ব্যবস্থা হল পৃথক পৃথক উদ্যোগ ও অর্থনৈতিক সংযুক্ত উদ্যোগগুলির বিস্তৃত

স্বয়ংসম্পূর্ণতার সঙ্গে কেন্দ্রীকৃত পরিচালনার মেলবন্ধন। জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের বিভিন্ন স্তরে পরিচালনার নির্দিষ্ট রূপ সোভিয়েত দেশে বার বার পরিবর্তিত হয়েছে।

বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়নে যে পরিচালনব্যবস্থা প্রচলিত আছে তা পূর্বের সমস্ত কল্যাণকর অভিজ্ঞতার সমাহার এবং পূর্বতন অন্যান্য রূপের ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত। এতে আঞ্চলিক উৎপাদন পরিচালনার সঙ্গে, অঙ্গপ্রজাতন্ত্রসমূহ ও স্থানীয় সংস্থাগুলির উদ্যমের বিকাশের সঙ্গে আধুনিক বৃহৎ উৎপাদনের পক্ষে প্রয়োজনীয় শাখাভিত্তিক পরিচালনব্যবস্থার নীতি সংযুক্ত হয়। এখন দেশের অর্থনৈতিক শাখাগুলি পরিচালনা করে তিন ধরনের মন্ত্রিপরিষদ — সারা ইউনিয়ন, অঙ্গপ্রজাতান্ত্রিক এবং প্রজাতান্ত্রিক মন্ত্রিপরিষদ, — যার অধীনে আবার স্থানীয় শিল্পোদ্যোগগুলিও আছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেস জাতীয় অর্থনীতি পরিচালনব্যবস্থার আরও উৎকর্ষসাধনের দায়িত্ব সামনে রেখেছে: 'প্রজাতন্ত্রসমূহের অভ্যন্তরে এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল ও এলাকাসমূহের মধ্যে অবস্থিত যুক্তিসঙ্গত অর্থনৈতিক সংযোগব্যবস্থার সঙ্গে শিল্পক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও টেকনিক্যাল কর্মপন্থার ঐক্য নির্ধারণকারী শাখাভিত্তিক পরিচালননীতির আরও সঙ্গতিসাধন প্রয়োজন।... সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা মূলগতভাবে যেমন যুক্তিসঙ্গত উৎপাদন-সম্পর্ক লঙ্ঘনকারী বিভাগীকরণ নীতির সঙ্গে খাপ খায় না, তেমনি অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ঐক্য শিথিলকারী স্থানীয়করণের সঙ্গেও খাপ খায় না।'

২৪ ॥ শ্রম ও বণ্টনব্যবস্থা

শ্রমের পরিস্থিতি

সমৃদ্ধির উৎস, — যা মানুষকে সৃজনের আনন্দ এনে দিতে পারে, — হাজার হাজার বছর ধরে শোষণের ব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় সেই শ্রম হয়ে দাঁড়িয়েছে মানুষের ভারী বোঝা। প্রচুর ফসল ফলিয়েও যাদের অনটনের মধ্যে দিন কাটাতে হত, যারা উৎকৃষ্ট বস্ত্র তৈরি করা সত্ত্বেও জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করতে বাধ্য হত, অপূর্ব প্রাসাদ গড়ে তোলা সত্ত্বেও যাদের দিন যাপন করতে হয় কুঁড়ে-ঘরে, — তাদের পক্ষে শ্রম এ ছাড়া আর কী হতে পারে?

সমাজতন্ত্রে শ্রমজীবীরা হল দেশের সকল সমৃদ্ধির সম্পূর্ণ অধিকারী। আর তারা কাজ করে মুষ্টিমেয় পরজীবীদের ঐশ্বর্যবৃদ্ধির জন্য নয়, — কাজ করে নিজেদের জন্য, নিজেদের সমাজের জন্য। বাধ্যতামূলক শ্রমকে স্বাধীন শ্রমে রূপান্তর — সমাজতন্ত্রের মহত্তম কীর্তি।

এই রূপান্তরের সঙ্গে শ্রমপরিস্থিতির মূলগত পরিবর্তন যুক্ত আছে।

সমাজতন্ত্রে শ্রমব্যবস্থার অন্যতম উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এই যে সমাজতান্ত্রিক সমাজে **পূর্ণ কর্মের সংস্থান** আছে। ১৯৩০ সনে সোভিয়েত ইউনিয়নের শেষ শ্রমবিনিময় দপ্তরের দুয়ারে কুলুপ আঁটা হওয়ার পর থেকে সোভিয়েত দেশের তরুণসম্প্রদায় বেকারত্বের কথা কেবল পুঁজিবাদী দেশের পুস্তকাদি ও সংবাদপত্রের খবর থেকে জানতে পারে। সোভিয়েত জনগণ তাদের নিজেদের অভিরুচি অনুযায়ী বৃত্তি নির্বাচনা করতে এবং তদনুযায়ী বৃত্তি শিক্ষা লাভ করতে পারে।

বুর্জোয়া মতাদর্শবাদীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে উৎপাদনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পক্ষে বেকারত্ব এড়ানো সম্ভব হবে না। আজ দেখা যাচ্ছে যে এই হিসাবটা একেবারেই ঠুনকো। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে উৎপাদন প্রচণ্ড গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যন্ত্রীকরণ এবং স্বয়ংক্রিয়ব্যবস্থার প্রচলন অবিচলিতভাবে বেড়ে চলেছে, অথচ সকলের জন্য কাজও আছে। জাতীয় অর্থনীতিতে নিযুক্ত শ্রমিক ও কর্মচারীর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে; সংখ্যা ১০ কোটি অতিক্রম করে গেছে।

উৎপাদনী শক্তি বিকাশের পরিমাণ অনুযায়ী **শ্রমের সময় হ্রাস** হতে থাকে। কর্মীর বিশ্রাম, শিক্ষা ও ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি মনোযোগের জন্য আরও বেশি সময় থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়নে অতিরিক্ত সময় খাটুনি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ১৯৬৭ সন থেকে দুদিন অবকাশসমেত পাঁচ দিনের কর্মসপ্তাহ প্রচলিত হয়েছে।

অবসরসময় বৃদ্ধির ফলে তা ঠিকমতো ব্যবহারের প্রশ্নও দেখা দেয়। এটা ঠিক যে আলস্যে কালযাপনে কি ব্যক্তি, কি সমাজ — কারোই সমৃদ্ধি হয় না। মাতলামি ও জুয়াখেলা প্রত্যক্ষ ক্ষতি সাধন করে। অবসরসময়ের বিচক্ষণ ও হিতকর ব্যবহারের জন্য সমস্ত সামাজিক সংস্থার সংস্কৃতি-শিক্ষামূলক কাজের তৎপরতাবৃদ্ধির প্রয়োজন।

সমাজতন্ত্রে **শ্রমসংরক্ষণের** প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। সবারই জানা আছে যে আধুনিক উৎপাদনের বহু শাখায় কাজের সময় জখমের সম্ভাবনা, এমন কি প্রাণহানির আশঙ্কা পর্যন্ত থাকে। শ্রমসংরক্ষণের ব্যাপারে সর্বদাই উৎকর্ষ সাধন চলছে, দুর্ঘটনা যতদূর কমানো যায় সমাজতান্ত্রিক সমাজ তার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

সর্বশেষে, সমাজতন্ত্র সকলের জন্য **শ্রম অনুযায়ী বৈষয়িক সম্পদ লাভের সম অধিকার** প্রতিষ্ঠা করে।

প্রত্যেককে শ্রম অনুযায়ী

উৎপাদনী শক্তি বিকাশের যে স্তর অর্জিত হয়েছে তা সামাজিক তহবিলে মানুষের ব্যক্তিগত অবদান নির্বিশেষে বিনামূল্যে সকলের চাহিদা মেটাতে বণ্টনের কমিউনিস্ট নীতি প্রচলনের পক্ষে এখনও যথেষ্ট নয়। এখন সমাজতন্ত্রে কিসের ভিত্তিতেই বা বৈষয়িক সম্পদের বণ্টন চলতে পারে?

ধরা যাক আমরা খেয়ালখুশিমতো এ সমস্যার সমাধান করতে পারি। আমরা সকলকে একই রকম পারিতোষিক দিতে শুরু করলাম: সে প্রথম শ্রেণীর টার্নারই হোক আর ষষ্ঠ শ্রেণীরই হোক, উচ্চ শিক্ষাসম্পন্ন যোগ্য বিশেষজ্ঞই হোক আর কারখানার সামান্য শিক্ষার্থীই হোক।

বণ্টনের এ ধরনের পদ্ধতির নাম **সমমাত্রিক বণ্টন** এবং তা সমাজতন্ত্র সম্পর্কে পেটি বুর্জোয়া আদর্শের উপস্থাপনা করে। মজুরির সমমাত্রীকরণের পরিণাম কী হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। সবাই একই পারিশ্রমিক পেলে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও নিজের শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ব্যাপারে লোকের আগ্রহ চলে যেত। সে পারিশ্রমিকও মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই যৎসামান্য হত এবং তা বাড়তির দিকে না গিয়ে বরঞ্চ কমতির দিকেই যেত, কেননা মানুষের কাজের মান যত নিকৃষ্ট হবে, সমাজ ততই দরিদ্র হবে।

সুতরাং, মজুরির সমমাত্রীকরণ সমতার সূচনা না করে সমতার শোচনীয় প্যারডি সৃষ্টি করত: সকলেই ‘সমান’, কেননা কেউ কারও চেয়ে বেশি পায় না, — এই বোধ নিঃস্বদের কতটুকুই বা আনন্দ দিতে পারে? এতে সামাজিক সম্পদ খেয়ে নিঃশেষ করে ফেলা হত। এই কারণে মার্কসীয়-লেনিনীয় তত্ত্ব মজুরির সমমাত্রীকরণকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে। সমাজ তার খেয়ালখুশিমতো বণ্টনের যে-কোন রূপ

বেছে নিতে পারে না। উৎপাদনের বিকাশের স্তর ও চরিত্র তা নির্ধারণ করে।

সমাজতন্ত্রে বণ্টনকে সামাজিক সম্পদের অবিচল বৃদ্ধির সহায়ক ও সেই সঙ্গে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান ক্রমাগত উন্নয়নের অনুকূল হতে হবে: একমাত্র এই পরিস্থিতিতেই প্রাচুর্য গড়ে তোলা ও চাহিদা অনুযায়ী বণ্টনের দিকে পরিবর্তন সম্ভব। সমাজতন্ত্রের নীতি — **প্রত্যেককে শ্রম অনুযায়ী,** অর্থাৎ শ্রমের পরিমাণ ও উৎকর্ষ অনুযায়ী পারিশ্রমিক প্রদান — এই দাবির সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গত।

ঐ একই নীতির অপর একটি রূপ (নেতিবাচক প্রকাশ) হল: **যে কাজ করে না, সে খায় না** — এই দাবি। শিশু, শিক্ষার্থী এবং যারা ঘরে বসে উঠতি পুরুষের শিক্ষার মতো সমাজের পক্ষে হিতকর ও প্রয়োজনীয় কর্মে নিযুক্ত, বৃদ্ধ অথবা অসুস্থ — তাদের কারো ক্ষেত্রে অবশ্যই কথাটা প্রযোজ্য নয়। সমাজতন্ত্রের এই দাবি শ্রমবিমুখ মানুষদের বিরুদ্ধে, অতীতের সবচেয়ে ন্যক্কারজনক জের — পরজীবীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত।

শ্রম অনুযায়ী বণ্টনের নীতি, যেখানে শাসনক্ষমতার অধিকারীরা উৎপাদিত বস্তুসম্পদের অধিকাংশ নিজেরা হস্তগত করে, সেই শোষণভিত্তিক সমাজের প্রচণ্ডতম অন্যায়ের অবসান ঘটায়। আগেই বলা হয়েছে যে সমাজতন্ত্রে শ্রম, কেবল শ্রমই জীবনধারণের একমাত্র আইনসঙ্গত উপায় এবং শ্রমই মানুষের সামাজিক পরিস্থিতি নির্ধারণ করে।

ই. ইল্‌ফ ও ইয়ে. পেত্রোভ রচিত ব্যঙ্গ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র অস্তাপ বেন্‌দের-এর দুর্দশা দেখে কার না হাসি পায়! ব্ল্যাকমেল করে কোটিপতি হওয়ার পর এই প্রতারকটি ভাবল যে সম্পদের ফলে আশে-

পাশের লোকজন তাকে একজন বিশিষ্ট লোক বলে খাতির ও তোষামোদ করতে থাকবে। কিন্তু দেখা গেল যে সোভিয়েত দেশে মানুষের কাছে সোনার আর কদর নেই। হতভাগ্য কোটিপতি সবার হাসির পাত্র হল এবং কোথাও তার ঠাঁই হল না।

কাহিনীটি কেবল হাসির নয়, শিক্ষামূলকও বটে। সমাজতন্ত্রে অর্থ, — তার পরিমাণ যতই হোক না কেন, — শাসনক্ষমতা ও ভক্তি অর্জনের উপায় হিশেবে আর টিকতে পারল না। অর্থ তার তাৎপর্য হারিয়ে ক্রমে 'ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকার', 'লাভজনক বিবাহবন্ধন'জাতীয় অতীত ধারণার মতো অবলুপ্ত হতে চলল। সমাজতান্ত্রিক সমাজে না কেনা যায় শ্রমিক শোষণের উদ্দেশ্যে কারখানা, না প্রতিনিধির প্রমাণপত্র, না মন্ত্রীর আসন। সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিগত ক্ষমতা, সমাজের স্বার্থে নিযুক্ত শ্রম মানুষের মূল্যায়নের মানদণ্ড।

শ্রম অনুযায়ী পারিশ্রমিক প্রদান সমাজতন্ত্রের আরও একটি যে অর্থসংক্রান্ত নীতি কাজে পরিণত করে তা হল **নিজের শ্রমের ফলাফলের প্রতি মানুষের বৈষয়িক আগ্রহ।** মানুষ যত পরিশ্রম করে, সমাজকে যত বেশি দেয় তার পারিতোষিকের পরিমাণও তত বেশি। এর ফলে মানুষ তার পূর্ণ শক্তিতে কাজ করার ও যোগ্যতাবৃদ্ধির প্রেরণা লাভ করে।

সামাজিক তহবিলের মাধ্যমে বণ্টন

সামাজিক তহবিল থেকেও সমাজতান্ত্রিক সমাজের সৃষ্ট সম্পদের বণ্টন হয়। সোভিয়েত শাসনক্ষমতার একেবারে গোড়ার দিকে, যখন প্রথম প্রথম আবাসিক বিদ্যালয়, ক্রেইশ ও অনুরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল, তখন লেনিন সেগুলিকে কমিউনিজমের অঙ্কুর আখ্যা দেন এবং এই অঙ্কুরগুলিকে সযত্নে রক্ষা করার ও মজবুত করার নির্দেশ

দিয়ে যান। আজ সোভিয়েত ইউনিয়নে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। জনশিক্ষা ও চিকিৎসাব্যবস্থা, স্বাস্থ্যনিবাস ও পাইওনিয়র ক্যাম্পের ভরণপোষণ, বার্ধক্যজনিত ও শ্রমক্ষমতার অভাবজনিত পেন্সনের বন্দোবস্ত — এ সবের জন্যই রাষ্ট্র সামাজিক তহবিল থেকে অর্থ সরবরাহ করে।

সামাজিক তহবিল থেকে যে বণ্টন সম্পন্ন হয় তা মূলত কোন ব্যক্তির শ্রমের পরিমাণ ও উৎকর্ষের উপর নির্ভর করে না। এতে তুলনামূলকভাবে দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমে নিযুক্ত মানুষের মধ্যে, বহুসন্তানসম্পন্ন এবং নিঃসন্তান পরিবারে জীবনযাত্রার মানে যে পার্থক্য দেখা যায় তা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে সামাজিক তহবিল বণ্টনের সময় শ্রমের প্রচলিত বণ্টনের ফলাফল হিসাব করা হয়। তাই, পেন্সনের পরিমাণ নির্ভর করে মজুরির উপর, স্বাস্থ্যনিবাসে যাবার বিশেষ ব্যবস্থা প্রধানত ভালো কর্মীর ভাগ্যে ঘটে।

সামাজিক তহবিল ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রতি বছরই জনশিক্ষা ও চিকিৎসাব্যবস্থার জন্য আরও বেশি অর্থ পৃথক করে রাখা হচ্ছে, সন্তানসম্পন্ন পরিবারগুলির পেছনে বৈষয়িক সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হচ্ছে, কর্মরতা মায়েদের জন্য সুবিধার সম্প্রসারণ চলছে। শিশুপ্রতিষ্ঠানগুলির জাল ছড়িয়ে পড়ছে, পেন্সন ও ভাতার পরিমাণ বাড়ছে।

নবম পাঁচসালায় (১৯৭১—১৯৭৫ সনে) সামাজিক উপযোগ তহবিল থেকে জনসাধারণের প্রাপ্য আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রায় দেড়গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সোভিয়েত জনসাধারণের বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্যের ক্ষেত্রে এর মূল্য নিরূপিত হতে পারে নিম্নলিখিত তথ্য থেকে:

১৯৭৫ সনে শ্রমিক ও কর্মচারীদের গড় মাসিক আয় পৌঁছেছে ১৪৬ রুবলে, আর সামাজিক তহবিল থেকে আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাযোগে — মাসিক ১৯৮ রুবলে।

শ্রমের মূল বিধিনিয়ম

নূতন কর্মী ও পরিচালনবিভাগের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অথবা শ্রমচুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তিতে দুই পক্ষের বাধ্যবাধকতার শর্ত থাকে। শ্রমজীবী তার বৃত্তি (যেমন, ফিটার মিস্ত্রী, বিদ্যুৎমিস্ত্রী) ও যোগ্যতা (যেমন, চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম) অথবা তার পদ অনুযায়ী (যেমন, অর্থনীতিবিশেষজ্ঞ-ইঞ্জিনিয়র) কাজ পূরণ করতে, উদ্যোগে প্রচলিত শ্রমের বিধিনিয়ম মেনে চলতে বাধ্য থাকে। পরিচালনবিভাগ শ্রমের স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যসমেত পরিবেশ সংরক্ষণে এবং সম্পাদিত কার্যের জন্য উপযুক্ত বৈষয়িক পারিতোষিক প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকে। শ্রমদিনের পরিধি ও ছুটির স্থিতিকাল আইন অনুযায়ী নির্ধারিত হয় বলে তা আর চুক্তিতে নির্দেশ করা হয় না। অপরিহার্য কোন কোন ক্ষেত্রে অতিরিক্ত শর্ত নির্দিষ্ট হতে পারে (যেমন, সান্ধ্যস্কুলে পাঠগ্রহণের কারণে কেবল দিনের শীফ্‌টে কাজের সুযোগ অথবা প্রাথমিক পরীক্ষাপর্বের মেয়াদ)।

সোভিয়েত আইন শ্রমিক ও কর্মচারীদের বে-আইনীভাবে বরখাস্ত থেকে ভালোভাবে রক্ষা করে। পরিচালনবিভাগ আইনে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট মাত্র কিছুসংখ্যক ঘটনার ক্ষেত্রে এবং অবশ্যই ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির অনুমোদনক্রমে

কর্মীকে বরখাস্ত করতে পারে। কর্মী স্বেচ্ছায় কর্ম পরিত্যাগ করলে তাকে পরিচালনবিভাগের কাছে দু' সপ্তাহের নোটিশ দিতে হবে। কারিগরি বৃত্তিশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যালয়, বিশেষ মাধ্যমিক শিক্ষা অথবা উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শেষ করার পর শিল্পপ্রতিষ্ঠানে শ্রম-আইন অনুযায়ী নির্ধারিত মেয়াদের আগে (উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শেষ করার পর — তিন বছর) কোন তরুণ শ্রমিক ও বিশেষজ্ঞের কর্ম পরিত্যাগের অধিকার নেই।

উদ্যোগের পরিচালনবিভাগের সঙ্গে কর্মিদলের পারস্পরিক সম্পর্কও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়ন কমিটি শ্রমিক, টেকনিক্যাল-ইঞ্জিনিয়রিং কর্মী ও কর্মচারীদের পক্ষ নিয়ে দাঁড়ায়। ট্রেড ইউনিয়ন কমিটি ও পরিচালনবিভাগের মধ্যে প্রতি বছর দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অথবা **যৌথ চুক্তি** সম্পাদিত হয়।

যৌথ চুক্তিতে উৎপাদনসংক্রান্ত পরিকল্পনা পূরণ, উৎপাদন-সংগঠনে উন্নতিবিধান, নূতন যন্ত্রপাতির প্রচলন এবং শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, উৎপন্ন দ্রব্যের উৎকর্ষসাধন ও উৎপাদনমূল্যহ্রাসের ব্যাপারে পরিচালনবিভাগ এবং শ্রমিক ও কর্মচারীমণ্ডলীর পারস্পরিক বাধ্যবাধকতা নির্দেশ করা থাকে। চুক্তিতে শ্রমসংরক্ষণ এবং সমগোত্রীয় উদ্যোগগুলির নূতন প্রথা প্রবর্তকদের অভিজ্ঞতার প্রচলন নিয়ে বোঝাপড়ার কথা আছে। চুক্তিতে সামাজিক-সাংস্কৃতিক (স্বাস্থ্যনিবাস ও বিশ্রামকেন্দ্রগুলিতে যাবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, চিকিৎসার জন্য পথ্য, শিশুদের মধ্যে স্বাস্থ্যমূলক ও পাঠ্যসূচি বহির্ভূত কর্মপরিচালনা ইত্যাদি) ব্যবস্থাবাবদ ব্যয়ের পরিমাণ নির্দেশ করা হয়।

পরিচালনবিভাগের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কোন শ্রমিক ও কর্মচারীর অথবা তাদের দলের মতানৈক্য দেখা দিতে পারে। কর্মী ও পরিচালনবিভাগের মধ্যে বিরোধসংক্রান্ত বিচার-বিবেচনার ব্যাপারে প্রথম অবশ্যপ্রয়োজনীয় সংস্থা হল **শ্রমবিরোধসংক্রান্ত কমিশন।** পরিচালনবিভাগ ও ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির সমান সংখ্যক স্থায়ী সদস্য নিয়ে এই কমিশন সংগঠিত। আবেদনের পাঁচ দিনের মধ্যে কমিশনকে শ্রমবিরোধ মীমাংসার জন্য বসতে হবে। শ্রমবিরোধ মীমাংসিত বলে বিবেচিত হবে তখনই, যখন পক্ষ পারস্পরিক বোঝাপড়ায় আসবে। কর্মী শ্রমবিরোধ কমিশনের সিদ্ধান্তে একমত না হলে **স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির** কাছে আবেদন করতে পারে। এটা হল শ্রমবিরোধসংক্রান্ত দ্বিতীয় সংস্থা। স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়ন কমিটি সাত দিনের মধ্যে শ্রমবিরোধসংক্রান্ত আবেদন ও অভিযোগ বিবেচনার জন্য বসে। স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির সিদ্ধান্তে একমত না হলে কর্মী তার কাজের এলাকাবর্তী **গণ-আদালতে** আবেদন করতে পারে। ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির সম্মতিক্রমে কাউকে বরখাস্ত করা নিয়ে বিরোধ উঠলে কমিশন তার বিচার করে না (এক্ষেত্রে কর্মী সরাসরি আদালতে আবেদন জানাতে পারে); কমিশন কোন উদ্যোগের পরিচালক ও সহ পরিচালক, কর্মশালার প্রধান ও কারিগরের বরখাস্ত অথবা বদলিসংক্রান্ত প্রশ্নেরও বিচার করে না।

পরিচালনবিভাগের সঙ্গে কর্মিবৃন্দের আরও এক ধরনের যে বিরোধ কদাচিৎ দেখা যায়, তা উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে অথবা যৌথ চুক্তি ধরনের অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বনের সময় ঘটতে পারে। পরিচালনবিভাগ ও ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে সম্মতি অনুযায়ী এই সব বিতর্কের মীমাংসা হয়। যদি তারা একমতে না আসতে পারে তবে ট্রেড ইউনিয়ন ও প্রতিষ্ঠানের উচ্চ সংস্থা বিরোধের মীমাংসা করে।

শ্রমরক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। উৎপাদনব্যবস্থার প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ, ভারী ও শ্রমসাধ্য কাজের যন্ত্রীকরণ, সম্ভাব্য দুর্ঘটনা ও বৃত্তিজনিত অসুস্থতার কারণ অপসারণের ফলে উদ্যোগসমূহে শ্রমের নিরাপদ ও সুস্থ পরিস্থিতি গড়ে

উঠেছে। প্রাণীদেহের উপর রাসায়নিক পদার্থ, অস্বাভাবিক তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার ক্ষতিকর প্রভাব নিবারণ ও উপশমের জন্য কারখানার খরচে শ্রমিককে বিনামূল্যে বিশেষ ধরনের পোশাক ও প্রতিষেধক (চশমা, রেস্পিরেটর ও মুখোশ) সরবরাহ করা হয়। কোন কোন উৎপাদনে, যেমন রাসায়নিক উৎপাদনে, শ্রমিক বিনামূল্যে প্রতিষেধক খাদ্য পায়। শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিকেরা সংক্ষিপ্ত শ্রমদিন ও অতিরিক্ত ছুটি পেয়ে থাকে।

পরিচালনবিভাগের দায়িত্ব হল শ্রমিককে কারখানার সাধারণ আচরণবিধি এবং কাজের সময় যে-সব যন্ত্রপাতি প্রযুক্ত হয় তার ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া। নিরাপত্তা কৌশলসংক্রান্ত বিধি প্রতিটি শ্রমিককেই জানতে হয়, তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে আবার বিশেষ পরীক্ষাও দিতে হয়।

যেমন রাষ্ট্রীয় সংস্থা (মন্ত্রিপরিষদ, বিভাগ ও অভিশংসক), তেমনি ট্রেড ইউনিয়নও শ্রমরক্ষাসংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা সম্পাদন করে থাকে। উদ্যোগসমূহে শ্রমরক্ষা কমিশন স্থাপিত হয় এবং নিরাপত্তা কৌশল ও উৎপাদনক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি পালনের ব্যবস্থা দেখা-শোনার জন্য সামাজিক পরিদর্শক নির্বাচন করা হয়। নিরাপত্তাব্যবস্থা লঙ্ঘিত হলে যে-কোন উৎপাদনক্ষেত্রে কাজ বন্ধ করে দেওয়া যায়। শ্রমরক্ষা আইন লঙ্ঘনের জন্য অপরাধী ব্যক্তিদের কঠোর দণ্ড প্রদান করা হয়।

কৃষির জন্য নিরাপত্তা কৌশল ও উৎপাদনক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি পালনের যে-সব নিয়ম আছে সেগুলি যৌথখামারের ক্ষেত্রেও অবশ্যপ্রযোজ্য। যৌথখামারগুলিতে বহু ধরনের প্রকৌশল ও যন্ত্রপাতির বিরাট সমাবেশ ঘটে, বিদ্যুৎ ও রসায়নের বিস্তৃত প্রয়োগ দেখা যায়। পশু

পরিচর্যার ব্যাপারে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিধি পালন করা দরকার।

সকল শ্রমজীবীর ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য সাধারণ অধিকারবিধি ছাড়াও শ্রম-আইন **নারী ও কিশোরদের** শ্রমরক্ষার ব্যাপারে অতিরিক্ত বিধি-নিয়ম ধার্য করে।

অনেকগুলি রাসায়নিক, ছাপাখানা ও চর্মশিল্পের উৎপাদনে এবং ধাতুর বিগলন ও তরল ধাতুর পাত্রান্তরণের মতো শ্রমসাধ্য ও স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কাজে নারী শ্রমের ব্যবহার নিষিদ্ধ। ভূগর্ভের অভ্যন্তরস্থ কোন কাজে যথারীতি নারীকে গ্রহণ করা হয় না। রাত্রিকালীন ও অতিরিক্ত সময় খাটুনিজনক কোন কাজে এবং যে-সব কাজে প্রায়ই বাইরে যেতে হয় সে ধরনের কাজে নারী শ্রমের ব্যবহার সীমাবদ্ধ। মাতৃত্ব ও শৈশব বিশেষভাবে সুরক্ষিত। অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় ও প্রসবকালে নারী ১১২ দিনের অথবা এক-তৃতীয়াংশ বর্ষের ছুটি পায়। গর্ভবতী নারী ও এক বছর বয়স পর্যন্ত শিশুসমেত অনূঢ়াকে বরখাস্ত করা যায় না।

১৬ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগে কোন ছেলেমেয়েকে কাজে নেওয়া হয় না, — বিশেষ ক্ষেত্রে ১৫ বছর বয়স্ককে নেওয়া হয়। এর জন্য প্রাথমিক ডাক্তারী পরীক্ষা অবশ্যই দরকার। ১৬ থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত কিশোরদের শ্রমদিন সংক্ষিপ্ত; তবে বয়স্ক শ্রমিক ও কর্মচারী পূর্ণ শ্রমদিনের জন্য যে পরিমাণ পারিশ্রমিক পায়, তাদের পারিশ্রমিকও তার সমান। ১৮ বছরের নীচে ছেলেমেয়েদের কোন কোন কাজে নিয়োগ ও শিক্ষাগ্রহণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। রাত্রিকালীন কাজে, অতিরিক্ত সময় খাটুনিজনক ও স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক কাজে কিশোরদের নেওয়া হয় না। ১৮ বছরের নীচে শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য এক

ক্যালেণ্ডার মাসব্যাপী এবং যথারীতি গ্রীষ্মকালীন ছুটির ব্যবস্থা আছে।

তরুণসম্প্রদায় যাতে সহজে এবং শিগ্‌গির কাজ পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়। কারখানাগুলিতে মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে পাশ করা ছাত্রদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকে। যে-সব তরুণ শ্রমিক ও কর্মচারী কাজের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ে, কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অথবা উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করে তাদের জন্য সুবিধা আছে: তাদের শ্রমদিন অথবা শ্রমসপ্তাহ সংক্ষিপ্ত করা হয়, শিক্ষামূলক ছুটি মঞ্জুর করা হয় এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি কোন জায়গায় পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় শতকরা ৫০ ভাগ গাড়িভাড়া দেওয়া হয়।

শ্রমের জন্য পারিশ্রমিক

আগেই বলা হয়েছে যে সমাজতন্ত্রে ব্যয়িত শ্রমের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী বণ্টনের নীতি প্রচলিত আছে। এই নীতি বাস্তবে কীভাবে প্রযুক্ত হয় দেখা যাক।

শ্রমিক যে শ্রম ব্যয় করে **শ্রমের মাত্রাদর্শ** স্থাপনের সাহায্যে তা নিরূপিত হয়। কাজের মাত্রাদর্শের মতো সময়ের মাত্রাদর্শও আছে। কোন বস্তু বা বস্তুর খুঁটিনাটি অংশ প্রস্তুত করতে শ্রমিকের কত ঘণ্টা, মিনিট অথবা এমন কি সেকেণ্ড ব্যয় হয়, **সময়ের মাত্রাদর্শ** তা নির্ধারণ করে। **কাজের মাত্রাদর্শ** শ্রমিক শিফটে, ঘণ্টায়, মিনিটে অথবা সেকেণ্ডে কতটা বস্তু বা বস্তুর খুঁটিনাটি অংশ তৈরি করে তা নির্ধারণ করে। অর্থাৎ, সমস্যা হিশেবে শ্রমিকের কাছে আদর্শগুলির নিজ নিজ ধরন আছে।

মজুরি হিসাব নিকাশের পক্ষে কেবল ব্যয়িত শ্রমের পরিমাণ জানাটাই যথেষ্ট নয়। তার গুণের আরও সঠিক মূল্যায়ন গুরুত্বপূর্ণ। এটা সম্ভব করে **শুল্কনীতি।** শুল্কনীতি যেমন কর্মীর যোগ্যতা, নৈপুণ্য ও জ্ঞানের এবং কাজের চরিত্র, জটিলতা ও বিপজ্জনকতা (শ্রম-পরিস্থিতি) অনুসারে শ্রমিকের মজুরির প্রভেদ করে, তেমনি জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পশাখার তাৎপর্য অনুযায়ীও তা করে। দক্ষতাপ্রাপ্ত ও অদক্ষ শ্রমিকের শ্রমের, ভারী ও হাল্কা শ্রমের মধ্যে প্রভেদ এবং কাজের জটিলতা ও দায়িত্বের কথা বিবেচনা করা হয়। প্রতিটি শ্রমিককে তার বৃত্তি ও যোগ্যতা অনুসারে **শুল্কসংক্রান্ত শ্রেণীতে** ফেলা হয়। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে সাধারণ কাজে নিযুক্ত শ্রমিকেরা। পরবর্তী শ্রেণীগুলি শ্রমিকের যোগ্যতার পরিচায়ক।

বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পারিশ্রমিক প্রদানের সম্পর্কে **শুল্ক বিন্যাস** নির্ধারিত হয়। যে শ্রমিক যত উচ্চ বর্গের, তার মজুরিও তত বেশি। দক্ষ শ্রম সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ফলদায়ক, যেহেতু তা সময়ের ইউনিটে অধিকতর পরিমাণে এবং উৎকৃষ্টতর ধরনের দ্রব্য উৎপন্ন করে। কর্মীর যোগ্যতা (তার শ্রেণী) বিশেষ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত এবং পরিচালনবিভাগ ও ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে স্বীকৃত হয়। ঘণ্টায় বা দিনে শ্রমিকের পারিশ্রমিকের পরিমাণ শুল্কের হার নির্ধারণ করে। শিল্পে প্রতিটি শাখার জন্য একই রকম শুল্ক বিন্যাস ও শুল্ক হারের প্রথা প্রচলিত আছে।

জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন শাখা অনুযায়ী তৈরী **শুল্ক ও যোগ্যতাসংক্রান্ত নির্দেশ-পুস্তকগুলিতে** প্রতিটি বৃত্তির জন্য কাজের

বিশদ চরিত্রবৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়েছে। নির্দেশ-পুস্তকসমূহে শুল্কশ্রেণী নির্ধারণের সেই সব বিজ্ঞানভিত্তিক লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে, যার ভিত্তিতে কর্মসমাধার দরুন মূল্য দিতে হয়। প্রতিটি শ্রেণীর শ্রমিকের ঠিক কী জিনিস জানা এবং করতে জানা উচিত, নির্দেশ-পুস্তকে তা বলা থাকে।

যেখানে শ্রমের পরিমাণ নির্ধারণ এবং প্রতিটি শ্রমিকের শ্রমের ব্যয় হিসাব করা সম্ভব সেখানে মজুরির **ফুরনব্যবস্থা** গৃহীত হয়। সময়ানুপাতিক পারিশ্রমিক নীতির ক্ষেত্রে, যেমন স্বয়ংক্রিয় ও কনভেয়রব্যবস্থাসম্পন্ন এবং অন্যান্য আধুনিক উৎপাদনে শ্রমিক প্রকৃতপক্ষে নির্ধারিত সময়ব্যাপী কাজের জন্য মজুরি পেয়ে থাকে। সকল মুখ্য পদাধিকারী এবং ইঞ্জিনিয়রিং-টেকনিক্যাল শিল্পের কর্মী ও কর্মচারীরাও **সময়ানুপাতিক পারিশ্রমিক** পান।

পারিশ্রমিকের প্রচলিত ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়। এইভাবে, অর্থনৈতিক সংস্কার সারা বছরের কাজের ফলাফলের ভিত্তিতে বোনাস প্রদান (তথাকথিত ত্রয়োদশ বেতন) সমেত শ্রমজীবীদের পুরস্কৃত করার বিভিন্ন প্রণালী বাস্তবে পরিণত করেছে। মজুরিব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন করে রাষ্ট্র উচ্চ উৎপাদনশীল শ্রমে প্রেরণাসঞ্চারে এবং যৌথ ও সামাজিক স্বার্থের সঙ্গে প্রতিটি কর্মীর স্বার্থের সংযোগসাধনে সচেষ্ট হয়।

শ্রমের ভাবাদর্শগত প্রেরণা

বণ্টনের সমাজতান্ত্রিক নীতি মানুষকে তার ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করার প্রেরণা যোগায়, **শ্রমের** নীতিগত, — আরও ঠিক করে বলতে গেলে, — **ভাবাদর্শগত প্রেরণার** বিকাশে সহায়তা করে।

অক্টোবর বিপ্লবে জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গেই এই প্রেরণার আবির্ভাব। শোষণ থেকে শ্রমের মুক্তির ফলে কত দ্রুত নূতন সমাজ গঠন করা এবং সকলের জন্য সুন্দর জীবন গড়ে তোলা যায়, তার জন্য বিপুল উৎসাহের সঞ্চার হল। কেবল বৈষয়িক আগ্রহ দিয়েই কি বিদ্যুৎকেন্দ্র, ধাতুকারখানা, বন্দর (দ্নেপ্রগেস্, মাগ্নিৎকা, কম্সমোল্স্ক) নির্মাণকারীদের কীর্তি ব্যাখ্যা করা যায়? মহান ভাবাদর্শের বশবর্তী হয়ে মানুষ দুঃখ-দুর্দশার মুখোমুখি হয়েছে; ব্যক্তিগত লাভের আশা নয়, — উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতি বিশ্বাস এবং নিজের কাজের দ্বারা সেই ভবিষ্যৎকে আসন্ন করে তোলার প্রয়াসই তাকে পরিচালনা করেছে। অনাবাদী জমিতে ফসল ফলানোর কাজে, সাইবেরিয়া ও দূর প্রাচ্যে নূতন নূতন শিল্পের কেন্দ্র গড়ে তোলার কাজে যে লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণী অংশগ্রহণ করেছে তাদেরও সেই একই প্রেরণা।

উচ্চ বিবেকবুদ্ধি, কমিউনিস্ট প্রত্যয়, সমাজ ও সমষ্টির প্রতি কর্তব্যবোধ — এই হল সমাজতন্ত্রে শ্রমের ভাবাদর্শগত প্রেরণা।

শ্রমের প্রতি বৈষয়িক ও ভাবাদর্শগত প্রেরণার সম্মিলন সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের অন্যতম প্রবল চালিকাশক্তির মধ্যে — **সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতায়** উজ্জ্বল অভিব্যক্তি লাভ করেছে।

সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা

সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা — স্বাধীন সৃজনশীল শ্রমের উৎপন্ন দ্রব্য ও উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় নূতন সমাজতান্ত্রিক সম্পর্কের প্রকাশ এবং বিপ্লবের দ্বারা সূচিত শ্রমের

ভাবাদর্শগত প্রেরণার অভিব্যক্তি। সংক্ষেপে বলতে গেলে এর মধ্যে উৎপাদনবিকাশে এবং সামাজিক সম্পদবৃদ্ধিতে শ্রমজীবী মানুষের প্রযত্ন রূপায়িত হয়েছে। শ্রমজীবীরা পরিকল্পনার সার্থক পরিপূরণ ও অতিপূরণ, উৎপন্ন দ্রব্যের উৎকর্ষসাধন ও তার উৎপাদনমূল্যহ্রাসের উদ্দেশ্যে, কাঁচা মাল, সহায়ক উপাদান, জ্বালানি ও বিদ্যুৎশক্তির যথাযথ ও পরিমিত ব্যবহারের জন্য, শ্রম শৃঙ্খলাবৃদ্ধি ও শ্রম সংগঠনব্যবস্থার উৎকর্ষসাধনের উদ্দেশ্যে, বিজ্ঞানে ও প্রকৌশলগত সাফল্যের দ্রুত প্রয়োগ এবং যোগ্যতাবৃদ্ধি ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রেখে প্রতিযোগিতায় নামে।

মহান অক্টোবর বিপ্লবের অব্যবহিত পর থেকেই সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার সূত্রপাত। জনসাধারণের এই সর্বজনীন আন্দোলনের অভিজ্ঞতার সাধারণীকরণ প্রসঙ্গে ১৯১৭ সনের শেষ ভাগে লেনিন 'কী ভাবে প্রতিযোগিতা সংগঠিত করতে হয়?' শিরোনামায় এক প্রবন্ধ লেখেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন: 'সমাজতন্ত্র প্রতিযোগিতা নির্বাপিত করেই না, — বরং তার উল্টো, — সমাজতন্ত্রই প্রথম প্রকৃতপক্ষে **বিস্তৃতভাবে**, প্রকৃতপক্ষে **বহুল আয়তন জুড়ে** তার প্রয়োগ সম্ভব করে তোলে এবং প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ শ্রমজীবীকে এমন এক কর্মক্ষেত্রের প্রতি আকর্ষণ করে, যেখানে তারা আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায়, জনগণের অফুরান, সংগুপ্ত নির্ঝরিণী রূপে যে-দক্ষতা ও প্রতিভার অস্তিত্ব, পুঁজিতন্ত্র হাজারে হাজারে, লাখে লাখে যা গুঁড়িয়ে দিয়েছে, পিষ্ট করেছে, রুদ্ধ করেছে, — নিজেদের সেই দক্ষতা প্রস্ফুটিত করতে পারে, প্রতিভার উদ্বোধন ঘটাতে পারে।' ইতিহাস লেনিনের এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করেছে।

সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার প্রাথমিক রূপগুলির অন্যতম হল গৃহযুদ্ধ পর্বের কমিউনিস্ট সুব্বোৎনিক (বিনা মজুরিতে অতিরিক্ত শ্রমদিন)।

১৯১৯ সনের বসন্তকালে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে মস্ক্‌ভা-সর্তিরোভচ্‌নায়া ডিপোর শ্রমিকেরা নিজেদের উদ্যমে অতিরিক্ত সময়ে বিনা পারিশ্রমিকে স্টীম ইঞ্জিন মেরামতের সিদ্ধান্ত নিল। এই পুরনো স্টীম ইঞ্জিনটি আজ নূতন, কমিউনিস্ট শ্রম-সম্পর্ক উদ্ভবের মূর্তিমান সাক্ষ্য হয়ে মিউজিয়ামে আছে।

সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন ও কৃষি যৌথীকরণের পর্বে 'উদার্‌নিক'দের (অগ্রণী শ্রমিকদের) এবং পরে স্তাখানভ বাহিনীর আন্দোলন বিস্তার লাভ করল। পিতৃভূমির মহাযুদ্ধের সময় শিল্পোদ্যোগগুলিতে রণাঙ্গনের সমস্যার প্রাক্‌মেয়াদী পরিপূরণের উদ্দেশ্যে অগ্রণী কর্মিবাহিনী সংগঠিত হয়েছিল। যুদ্ধোত্তর কালে প্রবর্তক, উৎকর্ষসাধনকারী ও উদ্ভাবকদের বিস্তৃত আন্দোলনের সূত্রপাত হল। ৬০-এর দশকে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা এক নূতন উন্নততর পর্যায়ে পৌঁছুল: কমিউনিস্ট শ্রম-সম্পর্কের জন্য আন্দোলন জন্ম নিল।

আধুনিক কালে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা আক্ষরিকভাবে জাতীয় অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। ৭ কোটি ৪০ লক্ষেরও উপরে শ্রমিক, কর্মচারী ও যৌথখামারী এতে অংশগ্রহণ করে।

সমাজতন্ত্রে প্রতিযোগিতার ভূমিকাটাই বা কী?

সর্বোপরি এই প্রতিযোগিতা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির দ্রুত বিকাশ ঘটানোর এবং তাতে যে প্রচুর সম্ভাবনা নিহিত আছে তা কাজে লাগানোর উপায় হিশেবে গৃহীত হয়। উৎকর্ষসাধনকারী ও উদ্ভাবকদের আন্দোলনের অর্থনৈতিক ফলাফল দিয়ে এই উপায়ের কার্যকারিতা বিচার করা যায়। একমাত্র ১৯৭১ সনেই তাদের উত্থাপিত প্রস্তাব প্রচলনের ফলে জাতীয় অর্থনীতি তিনশ' কোটি রুবল অর্জন করেছে।

সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার মূলনীতি — অগ্রণীদের দিক থেকে পশ্চাৎপদদের সাহায্যদান, পশ্চাৎপদদের উন্নত করার প্রয়াস, উৎপাদনের সামগ্রিক উন্নতিবিধান। প্রতিযোগিতা অগ্রণী অভিজ্ঞতার প্রসার নিশ্চিত করে। যেখানে পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থায় যে-কোন রকম উৎকর্ষসাধনকে প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছ থেকে চোখের মণির মতো সযত্নে রক্ষা করে চলতে হয়, সেখানে সমাজতন্ত্রে প্রতিযোগিতাই উৎপাদনের নূতন প্রবর্তকদের পরীক্ষার দ্রুত ও বিস্তৃত প্রচলন সম্ভব করে, ব্যাপক প্রচারের সঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক।

পুঁজিবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতা, — যার মূলমন্ত্র এক পক্ষের পরাভব ও মরণ এবং অপর পক্ষের বিজয় ও প্রভুত্ব, — তা থেকে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার মূলগত প্রভেদ আছে। সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা তার সামগ্রিক মর্মগত অর্থে প্রতিদ্বন্দ্বিতার হিংস্র নীতির বিরোধী। এর অর্থ কিন্তু 'প্রতিযোগিতা' বলতে যা বোঝায় তার কোন রকম পুরুষত্বহানি ঘটছে না: ভালো ফলাফল অর্জনকারীরা বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র। এবং আরও বেশি সম্মান ও শ্রদ্ধার অধিকারী তারা, যারা নিজেদের সাফল্য দিয়ে বন্ধুদের সাফল্য অর্জনে সাহায্য করে। তাই, প্রতিযোগিতার ফলে সকলেই লাভবান।

সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার আরও একটি উল্লেখযোগ্য দিকের প্রতি — মানুষের উপর তার শিক্ষামূলক প্রভাবের প্রতি লক্ষ্য না করে পারা যায় না। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে উদ্যম, কর্মতৎপরতা, দৃঢ়তা ও লক্ষ্যনিষ্ঠার মতো সোভিয়েত সমাজের মেহনতী মানুষের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলী গড়ে ওঠে। কারখানা, যৌথখামার ও প্রতিষ্ঠানের

সম্মানে বন্ধুদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে মানুষ নিজেকে যৌথ শ্রমের সরিক বলে ভাবতে শেখে। তার মধ্যে সাধারণের কাজের প্রতি দায়িত্ববোধ এবং শৃঙ্খলা ও সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে চেতনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে জ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ, নিজের বৃত্তিকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তে আনার প্রয়াস এবং নিজের কাজে বিশারদ হওয়ার চেষ্টা জন্মায় ও তা বৃদ্ধি পায়। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ মানুষকে নূতন সমাজ গঠনের সৃজনশীল কর্মের সক্রিয় ও সচেতন অংশীদার করে তোলে।

২৫ ॥ পুনরুৎপাদন

বিকাশের গতি

দিনের পর দিন, বছরের পর বছর মানুষকে খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, জুতো, ঘর-বাড়ি তৈরি করে যেতে হয়। উৎপাদনের উপায়েরও নবীকরণ তাই দরকার হয়ে পড়ে — কাঁচা মাল ও জ্বালানির অনুসন্ধান করতে হয়, ব্যবহারে ক্ষয়প্রাপ্ত মেশিন ও যন্ত্রব্যবস্থার বদল করতে হয়। অর্থাৎ, সমাজ টিকে থাকার অবশ্যপ্রয়োজনীয় শর্ত হল উৎপাদনপ্রক্রিয়ার অবিরাম নবীকরণ, অর্থাৎ **পুনরুৎপাদন।**

যদি সামাজিক উৎপাদন পরিমাণে না বাড়ে, বছরের পর বছর একই আয়তনের পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে, তা হলে তাকে বলতে হয় **সাধারণ পুনরুৎপাদন**; এক্ষেত্রে কেবল আগের পরিমাণে ব্যয়িত বৈষয়িক সম্পদের পূরণ ঘটে। আর উৎপাদনের আয়তন যদি বৃদ্ধি পায়, তা হলে তা হবে **সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদন।** এক্ষেত্রে সমাজ যে কেবল ব্যয়িত

বৈষয়িক সম্পদ পুষিয়েই দেয় তা নয়, — অতিরিক্তভাবে উৎপাদনের উপায় এবং ভোগ্যবস্তুও উৎপন্ন করে।

শুধু বৈষয়িক সম্পদই নয়, — উৎপাদন-সম্পর্কও পুনরুৎপাদিত হয়। যেমন, পুঁজিবাদী উৎপাদনের বৈশিষ্ট্য হল এক দিকে পুঁজিপতির এবং অপর দিকে ভাড়াটে শ্রমিকের আকার। পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদনপ্রক্রিয়া শ্রমিকের উপর শোষণের পরিস্থিতির জন্ম দেয় এবং তাকে দৃঢ় করে, শ্রমিককে অনবরত তার শ্রমশক্তি বিক্রয় করতে বাধ্য করে এবং পুঁজিপতিকে সমৃদ্ধ করে।

সমাজতান্ত্রিক পুনরুৎপাদন সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবেই বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা ও পারস্পরিক সহায়তার সম্পর্ক উত্তরোত্তর নূতন করে গড়তে থাকে। এক্ষেত্রে এইসব সম্পর্কের নিছক পুনরাবৃত্তি ঘটে না, — তাদের উৎকর্ষ সাধিত হয়; কেননা সমাজতন্ত্র ধীরে ধীরে কমিউনিজমে বিকশিত হতে থাকে।

সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক নিয়মাবলী সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদনের দ্রুত গতি অর্জনে সহায়তা করে।

বিশ্বের উৎপাদনক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের আপেক্ষিক গুরুত্ব ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বের শিল্পদ্রব্যের এক-পঞ্চমাংশ উৎপন্ন করে, যেখানে তার জনসংখ্যা বিশ্বের জনসংখ্যার শতকরা ৭·১ ভাগ। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও শক্তিমান পুঁজিবাদী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে শিল্প উৎপাদনের স্তরগত ব্যবধান ক্রমেই সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে।

সমাজতান্ত্রিক পুনরুৎপাদন কোন নিয়মের অধীন এবং পুনরায় গড়ে উঠতে থাকা বৈষয়িক সম্পদের বণ্টন কীভাবে হয়ে থাকে তা দেখা যাক।

কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (যেমন, এক বছরের মধ্যে) সমাজে যে বৈষয়িক সম্পদ উৎপন্ন হয়, তার গোটা পরিমাণ নিয়ে **মোট (অথবা সমগ্র) সামাজিক উৎপন্ন দ্রব্য।**

নিজের প্রাকৃতিক রূপ অনুযায়ী মোট উৎপন্ন দ্রব্য উৎপাদনের উপায় ও ভোগ্যবস্তুতে বিভক্ত। সেই অনুসারে সামাজিক উৎপাদনের দুটি বৃহৎ উপবিভাগ আছে: **প্রথম উপবিভাগ** (অথবা 'ক' শ্রেণী) — **উৎপাদনের উপায়ের উৎপাদন ও দ্বিতীয় উপবিভাগ** (অথবা 'খ' শ্রেণী) — **ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন।**

প্রথম উপবিভাগের অন্তর্গত উৎপন্ন দ্রব্যের এমন একটা প্রাকৃতিক রূপ আছে, যার ফলে তা ব্যক্তিগত ব্যবহারের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। সে নিজেই 'উৎপাদনের উপায়ের বর্গ', অর্থাৎ শ্রমের সামগ্রী এবং হাতিয়ার হিশেবে আবার উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় প্রবেশের জন্য কয়লা, সিমেণ্ট, ইস্পাত, মেশিন, ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিন এবং বিভিন্ন ধরনের যে-সব কাঁচা মাল নির্ধারিত, — সে সবই তার অন্তর্ভুক্ত।

খাদ্যদ্রব্য, জুতো, পোশাক-পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র, বাসনপত্র ইত্যাদি — দ্বিতীয় উপবিভাগের অন্তর্গত দ্রব্য। এগুলি একমাত্র ভোগ্যবস্তু হিশেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সমস্ত উদ্যোগের কাঁচা মাল, জ্বালানি ও সরঞ্জামের প্রয়োজন যাতে মিটতে পারে, যাতে জনসাধারণ দোকানে প্রয়োজনীয় ভোগ্যবস্তু কিনতে পারে এবং এসবের ফলে পুনরুৎপাদন আরও চলতে থাকে — তার জন্য কী ধরনের পরিস্থিতির প্রয়োজন?

সর্বোপরি, এটা প্রত্যক্ষ যে প্রথম উপবিভাগে এমন পরিমাণে দ্রব্য তৈরি হওয়া দরকার, যাতে প্রথমত, উৎপাদনের উপায়ের ব্যবহার (যন্ত্রপাতি ও দালানের ব্যবহারজনিত ক্ষয়ক্ষতি, কাঁচা মাল ও জ্বালানির খরচ ইত্যাদি) পুষিয়ে

নেওয়া যায়, দ্বিতীয়ত, সামাজিক উৎপাদনের ভবিষ্যৎ প্রসার সুনিশ্চিত করা যায়।

আর দ্বিতীয় উপবিভাগে এমন পরিমাণ ভোগ্যবস্তু তৈরি হওয়া দরকার, যাতে সমস্ত মানুষের চাহিদা আরও পরিপূর্ণভাবে মিটতে পারে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় উপবিভাগের অন্তর্গত শিল্পশাখাসমূহের উৎপাদন প্রসারসংক্রান্ত ও যন্ত্রবিজ্ঞান বিকাশের গতি সর্বোপরি প্রথম উপবিভাগ থেকে প্রাপ্ত উৎপাদনের উপায়ের পরিমাণ ও গুণের দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে **ভোগ্যবস্তুর উৎপাদনের তুলনায় উৎপাদনের উপায়ের উৎপাদন-বিকাশকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হয়।**

উৎপাদনের উপায়ের উৎপাদনবৃদ্ধিকে অগ্রাধিকারদানের নিয়মের তাৎপর্য এই যে পরিকল্পনা যথাযথ গঠন করা গেলে উৎপাদনের অন্য সব শাখায় সামাজিক শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির অনুকূল এবং টেকনিক্যাল উন্নতির গতিবৃদ্ধিকারী শিল্পশাখাসমূহ মুখ্যত বিকাশ লাভ করে।

তবে উৎপাদনের উপায় উৎপাদনের উদ্দেশ্য আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ নয়। উৎপাদনের উপায় শেষ অবধি ভোগ্যবস্তুর উৎপাদনবৃদ্ধি ও জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য আবশ্যক হয়। তাই, ভারী শিল্পবিকাশের পাশাপাশি আমরা ভোগ্যবস্তুর উৎপাদনবিকাশে গতি সঞ্চার করতে পারি এবং করতে থাকবও।

যুদ্ধ পূর্ববর্তী পাঁচসালাপর্বে (১৯২৯—১৯৪০) প্রথম উপবিভাগের অন্তর্গত শিল্পে উৎপন্ন দ্রব্যের গরপড়তা বার্ষিক বৃদ্ধির গতি ভোগ্যবস্তু উৎপাদনের ১·৭ গুণ উপরে ছিল। এর অর্থ এই যে উৎপাদনের উপায়ের উৎপাদন ভোগ্যবস্তু উৎপাদনের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। যুদ্ধোত্তর বছরগুলিতে উভয়ের গতি অনেকটা

কাছাকাছি চলে আসে। ১৯৬০—১৯৬৫ সনে 'ক' শ্রেণীভুক্ত উৎপাদন ৫৮ শতাংশ এবং 'খ' শ্রেণীভুক্ত উৎপাদন ৩৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

অষ্টম পাঁচসালায় উৎপাদনের উপায়ের উৎপাদন ৫১ শতাংশ এবং জনগণের ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন ৪৯ শতাংশ বর্ধিত হয়। সঞ্চিত উৎপাদনক্ষমতা নবম পাঁচসালায়ও হাল্কা শিল্পের দ্রুত বিকাশ সম্ভব করছে ('ক' শ্রেণীভুক্ত উৎপন্ন দ্রব্যের ৪৬·৩ শতাংশ এবং 'খ' শ্রেণীভুক্তের ৪৮·৬ শতাংশ বৃদ্ধি আগে থাকতে অনুমান করা হচ্ছে)। এতে উৎপাদনের উপায় উৎপাদনের দ্রুত গতির সাধারণ পথরেখা বাতিল হয়ে যাচ্ছে না। এটা ঠিক যে বর্তমান পর্যায়ে বাস্তব সামর্থ্যের কথা বিবেচনা করে পার্টি জনগণের সমৃদ্ধির আকস্মিক উন্নয়নের সমস্যা সামনে রেখেছে। এই অতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান এর সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের ভবিষ্যৎ বিকাশেরও বনিয়াদ গড়ে তোলে।

মোট সামাজিক উৎপন্ন দ্রব্যকে তার মূল্যের দৃষ্টিতে বিচার করতে গেলে তা হবে বৈষয়িক উৎপাদনের সমস্ত ক্ষেত্রে উৎপন্ন মূল্যের যোগফলের সমান। মোট সামাজিক উৎপন্ন দ্রব্য দুটো অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ, উৎপাদনের যে-সব উপায় ব্যয়িত হয় তা পূরণ করে। আসলে এটা হল সেই **পুরনো মূল্য,** যা উৎপাদনের উপায়ের ব্যবহারজনিত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনুযায়ী প্রস্তুত দ্রব্যের উপর গিয়ে পড়ে। দ্বিতীয় অংশটি ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য এবং উৎপাদনের সম্প্রসারণ, অনুৎপাদনকারী ক্ষেত্রের ভরণপোষণ, মজুত গড়ে তোলা ইত্যাদির জন্যও নির্দিষ্ট থাকে। **পুনরায় গড়ে তোলা মূল্যের সমস্তটা নিয়ে হয় জাতীয় আয়।**

অষ্টম পাঁচসালার শেষে (১৯৭০ সনে) জাতীয় আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ২৯ হাজার কোটি রুবল। নবম পাঁচসালার তিন বছরের মধ্যে (১৯৭৩ সনে) তা ৪,৪০০ কোটি রুবল বৃদ্ধি পায়। একমাত্র এই বৃদ্ধিই ১৯৪০ সনের পুরো জাতীয় আয়ের পরিমাণকে ছাড়িয়ে যায়।

জাতীয় আয় ও রাষ্ট্রীয় বাজেট

বৈষয়িকভাবে উৎপাদনের উপায় ও ভোগ্যবস্তু: অর্থাৎ কাঁচা মাল, উপাদান, মেশিন, যন্ত্রপাতি, শস্য, চিনি, পোশাক-পরিচ্ছদ, জুতো, বইপত্র ইত্যাদি নিয়ে জাতীয় আয় গঠিত। এছাড়া, জাতীয় আয় অর্থের মাধ্যমে হিসাব করা হয়। নবস পাঁচসালায় তা দাঁড়ায় ১ লক্ষ ৫১ হাজার ৩ শ' কোটি রুবলে।

সমগ্র জাতীয় আয় **উপযোগ তহবিল** এবং **সঞ্চয় তহবিলে** বিভক্ত।

উপযোগ তহবিল ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রয়োজন মেটানোয় যায়। তা আবার বৈষয়িক উৎপাদনে নিযুক্ত কর্মীদের পারিশ্রমিক তহবিল এবং বিজ্ঞান, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জনস্বাস্থ্যের কাজে নিযুক্ত কর্মীদের পারিশ্রমিক, সামাজিক ভরণপোষণ, রাষ্ট্রযন্ত্র ও সেনাবাহিনীর ব্যয় বাবদ সামাজিক উপযোগ তহবিলে বিভক্ত। সমগ্র জাতীয় আয়ের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ নিয়ে উপযোগ তহবিল।

সঞ্চয় তহবিল তিন ভাগে বিভক্ত: প্রথম অংশ যায় উৎপাদন-সম্প্রসারণে, দ্বিতীয় অংশ — সাংস্কৃতিক ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রাসম্পর্কিত বনিয়াদি নির্মাণকর্মে (বিদ্যালয়, হাসপাতাল, কিণ্ডারগার্টেন, ক্রেইশ, বাসগৃহ ইত্যাদি), আর তৃতীয় অংশ জমা তহবিল অথবা বীমা তহবিল গঠন করে। সঞ্চয় তহবিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ: এই তহবিল ব্যতিরেকে সম্প্রসারিত উৎপাদন সম্ভব নয়।

সঙ্গতির যে অংশ সমাজতান্ত্রিক উদ্যোগসমূহের সরাসরি হেফাজতে থাকে, তা বাদে বাকি সব তহবিলই কেন্দ্রীভূত ও একত্রিত হয়। এটা সম্ভব হয় **রাষ্ট্রীয় বাজেটের** সাহায্যে।

বাজেটের আয়-ব্যয় পরিকল্পনা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূল আর্থিক পরিকল্পনা হিশেবে গণ্য। সঙ্গতি কোথা থেকে আসে এবং কোন উদ্দেশ্যে পরিচালিত — এতে তা দেখানো হয়। বাজেট এক বছরের জন্য তৈরি হয় এবং সরকার কর্তৃক উত্থাপিত হওয়ার পর সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের অধিবেশনে তা বিবেচিত ও অনুমোদিত হয়।

রাষ্ট্রীয় বাজেটে সমাজতান্ত্রিক উদ্যোগগুলি থেকে আর্থিক উপকরণ আসে নীট আয়ের অংশ হিশেবে এবং যৌথখামার থেকে তা আসে আয়কর রূপে। জনসাধারণের কাছ থেকে সংগৃহীত আয়করের রাষ্ট্রীয় বাজেটে বিশেষ বড় স্থান নেই।

এখন, বাজেটের আর্থিক উপকরণ কোন দিকে পরিচালিত হয় দেখা যাক।

১৯৭৫ সনের ডিসেম্বরে সর্বোচ্চ সোভিয়েতের অধিবেশন ১৯৭৬ সনের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের যে বাজেট অনুমোদন করে তাতে আয়ের পরিমাণ ২২,৩৭০ কোটি রুবল, ব্যয় ২২,৩৫০ কোটি রুবল। জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের কাজে লাগানো হয়েছে ১১,৭৪০ কোটি রুবল, বিজ্ঞান, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, শরীরচর্চার বিকাশে, পেন্সন, ভাতা, বৃত্তি অর্থাৎ সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে — ৮,৫০০ কোটি রুবল। বাজেটের অর্থের যে অংশ দেশের প্রতিরক্ষাব্যবস্থার জন্য ব্যয়িত হয় তার পরিমাণ ১,৭৪০ কোটি রুবল, আর রাষ্ট্রযন্ত্র চালানোর দরুন খরচ —২০০ কোটি রুবল। শ্রমিক ও কর্মচারীদের মজুরির আরও বৃদ্ধি, সামাজিক বীমাব্যবস্থার উন্নয়ন এবং জনগণের জীবনযাত্রার

মানোন্নয়নকল্পে গৃহীত অন্যান্য ব্যবস্থা বাবদ নির্দিষ্ট হয়েছে ৪৭০ কোটি রুবল।

২৬ ॥ বর্তমান পর্যায়ে পার্টি ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্মপন্থা

অর্থনৈতিক কর্মপন্থার বিষয়বস্তু

সামাজিক বিকাশের প্রতিটি পর্যায়ে জনগণের চাহিদা ও দেশের সুযোগের কথা বিবেচনা করে কমিউনিস্ট পার্টি অর্থনৈতিক কর্মপন্থা প্রস্তুত করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেস উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজের পরিস্থিতিতে এ ধরনের কর্মপন্থার মূলগত প্রশ্নের উপর নীতি নির্দেশ করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৫তম কংগ্রেসে ১৯৭৬-১৯৮০ সনের পাঁচসালার উপযোগী করে এবং আরও দীর্ঘকালের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ সব নীতি সুনির্দিষ্ট করা হয়।

পার্টির অর্থনৈতিক কর্মকৌশলের মধ্যে আছে কর্তব্যসমূহের নির্ধারণ, সেগুলি এবং প্রধান প্রধান যে সব সমস্যার প্রতি সর্বাগ্রে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হওয়া উচিত, তা সমাধানের পথ নির্ধারণ।

জনগণের জীবনের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক মানের অব্যাহত উন্নয়ন — সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বুনিয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপন্থার উদ্দেশ্য। উক্ত লক্ষ্য অর্জনের মূল পথ — সামাজিক উৎপাদনের বিকাশ, তার ফলপ্রসূতার উন্নয়ন, বৈজ্ঞানিক-টেকনিক্যাল প্রগতির দ্রুত বৃদ্ধি, শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং জাতীয়

অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে কাজের মানের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন।

লক্ষ্য এবং তা অর্জনের যে সব উপায় নির্ধারিত হয় সেগুলি নির্দিষ্ট রূপ লাভ করে কোন না কোন পর্বের গুরুত্ব অনুযায়ী পার্টির অর্থনৈতিক কর্মপন্থায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন যে জনগণের স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধিতে সচেষ্ট একথা বলাই ত আর যথেষ্ট নয়। কোন সময়ের মধ্যে এবং ঠিক কী করা যেতে পারে ও করা উচিত — সেটাও দেখানো দরকার। এইভাবে সামগ্রিক হিসাবে ১৯৭৬—১৯৯০ সনের জন্য দেশের অর্থনীতি বিকাশের যে ভবিষ্যৎচিত্র অংকিত হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে ঐ ১৫ বছরের মধ্যে দেশ বিগত ১৫ বছরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বেশি বৈষয়িক ও আর্থিক সম্পদের অধিকারী হবে। এর ফলে সোভিয়েত জনসাধারণের স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাবে, তাদের শ্রম ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পরিস্থিতি উন্নত হবে, স্বাস্থ্যরক্ষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির — তথা যা কিছু নূতন মানুষ গঠনের এবং জীবনের সমাজতান্ত্রিক রূপের পরিপূর্ণতা সাধনের সহায়ক — সে সবের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হবে।

এটা সম্পূর্ণ বোধগম্য যে ১৫ বছরের জন্য নির্দিষ্ট কোন খসড়ায় খুঁটিনাটি বিষয় থাকতে পারে না এবং চলতি পরিকল্পনাগুলির মতো নির্দেশমূলক চরিত্রও তার থাকতে পারে না। দেশের সামনে যে সব কর্তব্য দেখা দেয় সেগুলির চরিত্র ও আকার যাতে সময় থাকতে নির্ধারণ করা যায়, কী কী সমস্যা উপস্থিত হতে পারে তা আগে থেকে দেখতে পাওয়া এবং সেগুলি সমাধানের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারা — এখানে সেটাই লক্ষ্য।

দেশের জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের পাঁচসালা পরিকল্পনাগুলিতে পার্টির অর্থনৈতিক কর্মপন্থা আরও বিশদরূপে প্রস্তুত করা হয়, জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন শাখা ভিত্তিতে বিশেষ বিশেষ কর্তব্য নির্ধারিত হয়, স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি ও সংস্কৃতির মান উন্নয়নের কর্মসূচি চিহ্নিত হয়।

ফলপ্রসূতা ও মানোন্নয়নের গতিপথ

দশম পাঁচসালায় সোভিয়েত অর্থনীতির পরিমাণগত বৃদ্ধি চলতে থাকবে এবং তা চলবে বিশাল আয়তন জুড়ে। সেই সঙ্গে তার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে এটা হবে **ফলপ্রসূতা ও উচ্চ মানের পরিকল্পনা।**

অর্থনৈতিক বিকাশের এই সব উপাদানকে অগ্রগণ্য স্থান দেওয়ার কতকগুলি কারণ আছে।

প্রথমত, শ্রম সম্পদের অবস্থাগত পরিবর্তন ঘটেছে। শ্রম জীবনে নবীন পুরুষের যোগদান ছাড়াও আগে যে সব নারী কাজ করত না, তাদের সামাজিক উৎপাদনে জড়িয়ে ফেলে এবং গ্রামীণ জনসংখ্যার একাংশকে শহরে স্থানান্তরিত করে অতীতে উৎপাদনের সম্প্রসারণ সম্ভব হত। বর্তমানে উক্ত সম্ভাবনাসমূহ মূলত নিঃশেষে কাজে লাগানো হয়ে গেছে। শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নতির প্রায় একমাত্র উপায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দশম পাঁচসালায় তা শিল্পজাত উৎপন্ন দ্রব্যের প্রায় ৯০ শতাংশ বৃদ্ধি এবং কৃষি অর্থনীতি ও নির্মাণক্ষেত্রে উৎপন্ন দ্রব্যের সার্মাগ্রক বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করবে। শিল্পে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রতিটি শতাংশ যে কী বিরাট তাৎপর্য বহন করে তা বোঝা যায় এই তথ্য থেকে যে এধরনের প্রতিটি শতাংশ

প্রায় ৫০০ কোটি র‌ুবল পরিমাণ উৎপন্ন দ্রব্যের বৃদ্ধি ঘটায়।

দ্বিতীয়ত, আরও বেশি তাপশক্তি ও কাঁচা মাল দেশের দরকার, অথচ এগ‌ুলির উৎপাদন ক্রমেই ব্যয়বহ‌ুল হয়ে দাঁড়াচ্ছে (যেমন, তৈল ও গ্যাসের জন্য আরও দ‌ূরে — প‌ূর্বাঞ্চলে যেতে হচ্ছে, অনধ‌্যুষিত এলাকা আয়ত্তে আনতে হচ্ছে)। এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারের উপায় কী? যে সব সম্পদ আমাদের আছে সেগ‌ুলির অধিকতর য‌ুক্তিসঙ্গত ব্যবহার, ব্যয়সঙ্কোচ এবং যেখানে সম্ভব সেখানে ধাতুর জায়গায় প্লাস্টিকের ব্যবহার, বিশেষত ম‌ূল্যবান ধাতুর জায়গায় অপেক্ষাকৃত স‌ুলভ, অথচ কোন অংশ কম ফলপ্রস‌ূ নয় এমন ধাতু কাজে লাগানো।

তৃতীয়ত, নগর ও শিল্পাঞ্চল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবহণ যোগাযোগ ও বৈষয়িক সরবরাহ ব্যবস্থা বিকাশের পেছনে ক্রমেই অধিক পরিমাণ সঙ্গতি ব্যয় করতে হয়। একমাত্র উৎপাদনের ফলপ্রস‌ূতা বৃদ্ধির পথেই এই সব সঙ্গতি পাওয়া সম্ভব।

ফলপ্রস‌ূতার সঙ্গে উৎপন্ন দ্রব্যের মানোন্নয়ন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। জিনিস মজব‌ুত হলে তা টিকবেও বেশি দিন। যেমন, মোটরগাড়ির ইঞ্জিনের কার্যকাল বাড়ানোর অর্থ হল মেরামত ছাড়া কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বেশ কিছ‌ু আর্থিক আশ্রয়। গাড়িই হোক, অন্যান্য যন্ত্রপাতিই হোক, কিংবা সাধারণ ভোগ্যপণ্য অথবা খাদ্যদ্রব্যই হোক — সর্বত্র এবং সর্বক্ষেত্রে উচ্চ মান শ্রম ও বৈষয়িক সম্পদের আশ্রয় ঘটায়, সমাজের চাহিদা আরও পরিপ‌ূর্ণভাবে মেটাতে পারে।

ফলপ্রস‌ূতা ও মানোন্নয়নের গতিপথের অর্থ হল জাতীয় অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে ন‌্যূনতম ব্যয়ে সর্বোচ্চ ফলাফল

অর্জন এবং কাজের সময়, যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা, কাঁচা মাল ও অন্যান্য উপাদানের যতদূর সম্ভব সদ্ব্যবহার। সোভিয়েত জাতীয় অর্থনীতি বর্তমানে যে আকার ধারণ করেছে, তাতে এক রুবল থেকে তহবিলে এক কোপেক আগমের অর্থ হল বছরে প্রায় ৩০০ কোটি রুবল পরিমাণ উৎপন্ন দ্রব্য বৃদ্ধি।

পরিকল্পনা গঠন ও পরিচালনের সমগ্র কৌশল, বৈষয়িক ও নৈতিক অনুপ্রেরণার সমস্ত পদ্ধতি উৎপাদনের ফলপ্রসূতা ও মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে পরিচালিত। ঐ একই উদ্দেশ্যে সামাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার বিকাশ।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি পরিচালনার অন্যতম মূল ব্যবস্থারূপে রাষ্ট্রীয় বাজেটের অর্থানুকূল্য বহির্ভূত স্বয়ম্ভর অর্থনীতির পরিচয় পাওয়া গেল। পার্টির অর্থনৈতিক কর্মপন্থা বর্তমান পর্যায়ে উক্ত ব্যবস্থার আরও বিকাশের কথা বিবেচনা করছে: এর উপায় হল কলকারখানার স্বয়ম্ভরতার প্রসার এবং অধিকতর পরিমাণে, পরন্তু অবশ্যই উন্নত মানের দ্রব্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কর্মিদলের বৈষয়িক আগ্রহ বৃদ্ধি।

সামাজিক উৎপাদনের ফলপ্রসূতা নির্ভর করে যেমন অর্থনীতির দক্ষ ব্যবস্থাপনার উপর তেমনি ভালো প্রশাসন দপ্তরের উপরও বটে। সোভিয়েত ইউনিয়নে তা গড়ে ওঠে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণের লেনিনীয় নীতির ভিত্তিতে — যার মূল উদ্দেশ্য হল স্থানীয় কর্মোদ্যোগের বিকাশের সঙ্গে পরিকল্পিত কেন্দ্রীকৃত পরিচালনার সংযোগসাধন। অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে যে আধুনিক পরিস্থিতিতে সর্বাধিক ফলপ্রসূ — শিল্পপরিচালনার তিন শাখাযুক্ত ব্যবস্থা (কারখানা — কারখানাসমবায় — মন্ত্রণালয়)। কৃষি

অর্থনীতিতে বিকশিত হচ্ছে আন্তঃযৌথখামার ব্যবস্থা, যৌথখামার-রাষ্ট্রীয় খামার সম্মেলন এবং রাষ্ট্রীয় ও সমবায়ী প্রতিষ্ঠানসম্মেলন, সেই সঙ্গে — কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন, প্রসেসিং ও বিক্রয়সংক্রান্ত কৃষি শিল্পসমাহার।

পরিচালনার সাংগঠনিক কাঠামো ও পদ্ধতি গড়ে তোলার পথ হবে পরিচালন ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ একত্রীভবন, সম্মিলিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকলাপের উৎকর্ষসাধন এবং গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে পরিচালনবিভাগের অধস্তন শাখাসমূহ ও উৎপাদন কর্মিদলের উদ্যোগের বিকাশসাধন।

দশম পাঁচসালার মূল কর্তব্যসমূহ

পাঁচসালা পর্বে এমন এক পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে যার ফলে মেহনতীদের স্বাচ্ছন্দ্যের স্থায়ী বৃদ্ধি ঘটবে। উপযোগ ও সঞ্চয়ের কাজে ব্যবহারযোগ্য জাতীয় আয় সামগ্রিকভাবে ২৪-২৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে, আর তার অন্তর্ভুক্ত উপযোগ তহবিল ১৯৭৫ সনের তুলনায় বৃদ্ধি পাবে ২৭-২৯ শতাংশ, অর্থাৎ ৭,১০০-৭,৮০০ কোটি রুবল। জনসাধারণের মাথাপিছু প্রকৃত আয় ২০-২২ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। ৫৪ কোটি ৫০ লক্ষ —৫৫ কোটি বর্গমিটার পরিমাণ নূতন বাসগৃহ নির্মিত হবে। পৌরব্যবস্থা, নগর ও পল্লী অঞ্চলের সমৃদ্ধিখাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সঙ্গতি নির্দিষ্ট হচ্ছে।

পাঁচসালা পর্বের প্রতি বছরে সোভিয়েত জনসাধারণের খাদ্যদ্রব্য ও সাধারণ ভোগ্যপণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। দশম পাঁচসালায় হালকা শিল্প ও খাদ্যশিল্প এবং দৈনন্দিন সেবাব্যবস্থার ক্ষেত্র বিকাশের খাতে নির্দিষ্ট হচ্ছে

৩,১০০ কোটি রুবলের ঊর্ধ্বে, অর্থাৎ বিগত পাঁচসালার চেয়ে ৬০০ কোটি রুবল বেশি। ১৯৮০ সন নাগাদ সোভিয়েত দেশে ১,২৫০-১,৩১০ কোটি মিটার কাপড় এবং ১৮০-১৯০ কোটি বোনা জিনিস তৈরি হবে।

১৯৭৬—১৯৮০ সনে ভারী শিল্পের স্থায়ী বিকাশ সুনিশ্চিত হবে; এখানে বিকাশে অগ্রগামী শিল্পশাখাগুলির, সর্বোপরি মেশিন ও যন্ত্রপাতি নির্মাণ এবং ইলেক্ট্রনিক্স শিল্পের বিশেষ ভূমিকা নির্দিষ্ট হয়েছে — ঐ সব শিল্পশাখাকে জাতীয় অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি দ্রুতকরণের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। যন্ত্রনির্মাণ শিল্পের মোট উৎপাদনবৃদ্ধি নির্দিষ্ট হয়েছে দেড় গুণেরও বেশি। বহুমুখী ও পরিচালনমূলক কম্পিউটার যন্ত্রসমাহার এবং স্বয়ংক্রিয় পরিচালনব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ ও রেজিস্ট্রেশনের যন্ত্রপাতি ও উপকরণের উৎপাদন বিকশিত হচ্ছে। মাইক্রোইলেক্ট্রনিক্স ও সূক্ষ্ম রশ্মিবিকিরণ পদ্ধতি নির্ভর নূতন নূতন যন্ত্রপাতি ও রেডিও ইলেক্ট্রনিক সাজসরঞ্জাম নির্মাণ সম্পর্কে গবেষণা চলছে।

দেশের জ্বালানি ও তাপশক্তি শিল্পসমাহারে গভীর রূপান্তর সাধিত হতে চলেছে। ১৯৮০ সন নাগাদ বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন ১৩৪,০০০-১৩৮,০০০ কোটি কিলোওয়াট-ঘণ্টার পৌঁছুবে। পরমাণুশক্তিবিজ্ঞান বিকশিত হবে। দ্রুত গতিসম্পন্ন নিউট্রনের সাহায্যে রিঅ্যাক্টরের নির্মাণকর্ম ও আয়ত্তে আনা শিগগিরই সম্ভব হবে।

লোহ ও ইস্পাত নির্মাণ এবং যন্ত্রনির্মাণশিল্পের প্রধান প্রধান শাখার মতো জ্বালানি ও তাপশক্তি শিল্পসমাহারের বিকাশও সাধিত হয় দুই-তিনটি পাঁচসালার হিসাবমতো

শিল্পসমাহারসংশ্লিষ্ট বৃহৎ কর্মসূচির ভিত্তিতে। দেশের এবং বিশ্বের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাসংক্রান্ত অগ্রগতির কথা বিবেচনা করে রচিত এই সব কর্মসূচিতে উৎপাদনী শক্তিসমূহের আরও উপযুক্ত বিন্যাসের দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। দেশের পূর্বাঞ্চলগুলির প্রাকৃতিক সম্পদ উদ্ধারকার্য ত্বরান্বিত করার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। এইভাবে পশ্চিম সাইবেরীয় শিল্পসমাহার ভবিষ্যতে প্রায় অর্ধেক তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রাসায়নিক রবার ও প্লাস্টিক সরবরাহ করবে। বিশ্বের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎকেন্দ্র — সাইয়ানি-শুশেন জলবিদ্যুৎকেন্দ্রের শক্তিচালিত সাইয়ানি শিল্পসমাহার লৌহ ও ইস্পাতনির্মাণ এবং যন্ত্রনির্মাণশাখায় অনেকগুলি বিশেষীকৃত শিল্পকেন্দ্র নিয়ে গঠিত হবে। বৈকাল-আমুর রেলসড়ক নির্মাণের সঙ্গে দেশের পূর্বাঞ্চলে অনেকগুলি বৃহৎ শিল্পকেন্দ্র গঠন সংশ্লিষ্ট।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৫তম কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে কৃষি অর্থনীতির ভবিষ্যৎ বিকাশ সম্পর্কে ব্যবস্থাসমূহ বিবেচিত হয়েছে। পার্টি দুই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত লক্ষ্য উত্থাপন করেছে। **প্রথম** — দেশের খাদ্যদ্রব্য ও কৃষি সংক্রান্ত কাঁচা মালের নির্ভরযোগ্য সরবরাহ এবং সেই উদ্দেশ্যে সর্বদা যথেষ্ট পরিমাণে মজুত অব্যাহত রাখা। **দ্বিতীয়** — শহর ও গ্রামের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রার মান কাছাকাছি করার পথে আরও অগ্রগতি। এই সব উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কৃষি অর্থনীতির পরিপূর্ণ ক্ষমতার মাত্রা অনবরত বৃদ্ধি করতে হয়, তাকে তাপশক্তির সাহায্যে আরও সজ্জিত করে তোলা দরকার। **দশম** পাঁচসালায় কৃষি অর্থনীতিতে লাগানো হচ্ছে ১৭,২০০ কোটি রুবল

মূলধন — গত পাঁচসালার তুলনায় ৪,১০০ কোটি রুবল বেশি। যৌথখামার ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলি ৪৬ কোটি ৭০ লক্ষ টন সার পাবে। উচ্চ উৎপাদনক্ষমতাসম্পন্ন আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে।

১৯৭৬—১৯৮০ সনের জন্য মূলধন বিনিয়োগের মোট পরিমাণ ২৪-২৬ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। উক্ত অর্থ ব্যয়িত হবে সর্বোপরি বৈজ্ঞানিক-টেকনিক্যাল বিকাশে গতিসঞ্চারকারী শিল্পক্ষেন্দ্র নির্মাণে এবং চালু শিল্পসমূহের প্রযুক্তিগত পুনঃসজ্জীকরণ ও পুনর্গঠনের কাজে। সোভিয়েত ইউনিয়ন বর্তমান যে কোন দেশের চেয়ে বেশি নির্মাণ কাজে নেমেছে। এককালে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল দ্নিপার নদীতে বিদ্যুৎকেন্দ্র, মাগনিতগোর্স্কের লৌহ কারখানার মতো নির্মাণকর্ম, ভলগগ্রাদ ও খারকভের ট্র্যাক্টর কারখানার উৎপাদনকর্ম। এখন দেশে আরও বহু ক্ষমতাসম্পন্ন এবং প্রযুক্তিগতভাবে উৎকর্ষ কারখানা প্রতি বছর চালু হচ্ছে। দশম পাঁচসালা পর্বেও দেশের অর্থনৈতিক মানচিত্রে নূতন নূতন শিল্পকেন্দ্র দেখা দেবে।

পাঁচসালাপর্বে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক-টেকনিক্যাল সহযোগিতা আরও বিকশিত হবে, উন্নত পুঁজিবাদী দেশ এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রসারিত হবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৫তম কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত জীবনায়নের ফলে সোভিয়েত দেশের অর্থনৈতিক ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং জনগণের স্বাচ্ছন্দ্যের নূতন প্রস্ফুরণ সুনিশ্চিত হবে।

নবম পাঁচসালা পরিকল্পনার তাৎপর্য

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেসে ১৯৭১—১৯৭৫ সনের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের পাঁচসালা পরিকল্পনাসংক্রান্ত যে নির্দেশসমূহ গৃহীত হয় তাতে পার্টির অর্থনৈতিক কর্মপন্থা রূপ লাভ করেছে।

নবম পাঁচসালা পরিকল্পনার মূল সমস্যা — সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন বিকাশের দ্রুত গতি, তার কার্যকারিতা ও বৈজ্ঞানিক-টেকনিক্যাল প্রগতির বৃদ্ধি এবং শ্রমের উৎপাদনশীলতার দ্রুত বিকাশের ভিত্তিতে জনগণের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রার উল্লেখযোগ্য মানোন্নয়ন সুনিশ্চিত করা।

অষ্টম পাঁচসালায় যেখানে গড়পড়তা বার্ষিক জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিল ২৩,৩০০ কোটি রুবল, সেখানে, নবম পাঁচসালায় তা পেঁছুবে ৩২,৫০০ কোটি রুবলে, আর ১৯৭১—১৯৭৫ সনে মোট দাঁড়াবে ১ লক্ষ ৬২ হাজার ৫ শ' কোটি রুবলে।

যেখানে গত পাঁচ বছরে জনসাধারণের প্রকৃত আয়ের মোট পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫,৪০০ কোটি রুবলে, সেখানে নূতন পাঁচসালায় তা ৭,২০০ কোটি রুবলে বৃদ্ধি পাবে। মাথাপিছু হিসাবে প্রকৃত আয় আনুমানিক ৩০ শতাংশ বর্ধিত হবে। সামাজিক উপযোগ তহবিল বৃদ্ধি এবং মজুরি ও বেতন বৃদ্ধির সাহায্যে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে বর্তমান পাঁচসালায় ২,২০০ কোটি রুবল পৃথক করে রাখা হচ্ছে, যেখানে অষ্টম পাঁচসালায় তা ছিল ১,০০০ কোটি রুবল।

বাসগৃহনির্মাণ আরও বিস্তৃত হবে। পাঁচ বছরে মোট ৩৮ কোটি বর্গমিটার পরিমাণ বাসগৃহনির্মাণের কথা। এর ফলে প্রায় ৬ কোটি লোকের বাসব্যবস্থার উন্নতি হবে। পৌরব্যবস্থা এবং শহর ও পল্লীর স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের উদ্দেশ্যেও যথেষ্ট পরিমাণ সঙ্গতির ব্যবস্থা হয়েছে।

জনসাধারণের ভোগ্যবস্তু সরবরাহের সত্যিকারের উন্নতিবিধান নবম পাঁচসালা পরিকল্পনার একটি কাজ। সুতীবস্ত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, জুতো ও বোনা জিনিস ইত্যাদির প্রভূত বৃদ্ধি পাবে। টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর, রেডিও-সেট, কাপড়-কাচা মেশিন ইত্যাদি দীর্ঘকালীন ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যের চাহিদা সম্পূর্ণ মেটানোর বাস্তব সম্ভাবনা আছে। হাল্‌কা শিল্প বিকাশের জন্য যে সঙ্গতি পৃথক করে রাখা হয়েছে তা গত পাঁচসালায় নির্ধারিত পরিমাণের প্রায় দ্বিগুণ।

কংগ্রেস সেই সঙ্গে ভারী শিল্পের ভবিষ্যৎ বিকাশের বিরাট তাৎপর্যের উপর জোর দিয়েছে। ভারী শিল্প কৃষি অর্থনীতি ও ভোগ্যবস্তু উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিল্পশাখাসমেত সমগ্র অর্থনীতির টেকনিক্যাল অগ্রগতি এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষাক্ষমতার দৃঢ় বনিয়াদ সুনিশ্চিত করে।

বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হবে। পরমাণু-বিদ্যুৎশক্তিকেন্দ্র নির্মাণের বিস্তৃত পরিকল্পনা রূপায়িত হবে; সর্বাগ্রে তা হবে দেশের ইউরোপীয় অংশে, — যেখানে জ্বালানি সম্পদ সীমিত। ১০—১২ বছরের মধ্যে ৩ কোটি কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন পরমাণু-বিদ্যুৎশক্তিকেন্দ্র চালু করার কথা আছে। নবম পাঁচসালায় বিদ্যুৎশক্তিবিজ্ঞান বিকাশের ফলে টেকনিক্যাল অগ্রগতির ভবিষ্যৎ দ্রুত

শক্তিসঞ্চারের পথে অন্যান্য আমূল পরিবর্তনও ঘটবে। ৪০ লক্ষ কিলোওয়াট পর্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন বৃহৎ বৃহৎ বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি হবে, — যেখানে কেবল ৩ লক্ষ কিলোওয়াটের নয়, — এমন কি ৫, ৮ ও ১২ লক্ষ কিলোওয়াটের একক শক্তি-ব্লক স্থাপনের পরিকল্পনা আছে।

আকস্মিক দুর্ঘটনার আশঙ্কায় পারস্পরিক গ্যারান্টি এবং নানা মরসুমে ও সারা দিন যাবৎ কাজের চাপের অনিয়মিত অবস্থা দূর করার উদ্দেশ্যে বৃহৎ বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি এক বিশেষ ধরনের 'চক্রে' ঐক্যবদ্ধ হয়। ঐক্যবদ্ধ কেন্দ্রগুলি এক 'সমবেত ভাণ্ডার' — সমবেত বিদ্যুৎব্যবস্থা গড়ে তোলে, যেখান থেকে বিদ্যুৎশক্তির বহু গ্রাহক রসদ পেয়ে থাকে। এইভাবে, বিদ্যুৎশক্তিব্যবস্থা গঠিত হয়।

অষ্টম পাঁচসালায় দেশের ইউরোপীয় অংশের ঐক্যবদ্ধ বিদ্যুৎশক্তিব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। এখন প্রবর্তিত হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নের একক বিদ্যুৎশক্তিব্যবস্থা, — যার ফলে সাইবেরিয়া ও কাজাখস্তান থেকে ইউরোপীয় অঞ্চলে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ সম্ভব হবে। প্রায় সব যৌথখামার ও রাষ্ট্রীয় খামার রাষ্ট্রীয় বিদ্যুৎশক্তিব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হবে।

যন্ত্রনির্মাণ — জাতীয় অর্থনীতির প্রযুক্তিগত পুনঃসজ্জীকরণের বৈষয়িক বনিয়াদ। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সমস্ত শিল্পশাখায় সরবরাহ করা তার প্রধান কাজ। নূতন যন্ত্রপাতির উৎপাদনশীলতা যাতে আরও বেশি হয় এবং তাদের ক্ষমতার ইউনিটের মূল্য যাতে হ্রাস পায়, সেদিকে দৃষ্টি রাখা অবশ্যপ্রয়োজনীয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেস যন্ত্রনির্মাণকারীদের উপর পরিশ্রমসাধ্য হস্তচালিত কাজের যন্ত্রীকরণের উদ্দেশ্যে, সর্বপ্রথম জাতীয় অর্থনীতির সকল

শাখায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদনসমূহের সংযুক্ত যন্ত্রীকরণের জন্য বিশেষ করে কৃষি অর্থনীতিতে, — যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা আরও পূর্ণাঙ্গ সরবরাহ করার দায়িত্ব দিয়েছে। স্বয়ংক্রিয়করণের সরঞ্জাম ও উপকরণের উৎপাদন দ্বিগুণ বাড়ছে, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিনির্মাণ উল্লেখযোগ্য বিকাশ লাভ করছে। কম্পিউটারের উৎপাদন ২·৬ গুণ বৃদ্ধি পাবে।

দেশী গাড়িনির্মাণশিল্পে বিরাট উন্নতি ঘটবে। ২২টি নূতন মডেলের লরি নির্মাণের এবং তাদের বহনক্ষমতাবৃদ্ধির চেষ্টা চলছে। পাঁচসালার অন্যতম বৃহৎ নিমার্ণকর্ম হল কামা লরি কারখানা, — সেখানে বছরে ১ লক্ষ ৫০ হাজার লরি নির্মিত হবে।

১৯৭২ সনে ভলগা গাড়িনির্মাণ কারখানার নির্মাণকর্ম সমাপ্ত হয়; বর্তমানে কারখানাটি কাজ শুরু করে দিয়েছে। এর পরিকল্পিত ক্ষমতা — বছরে ৬ লক্ষ ৬০ হাজার মোটরগাড়ি। মস্কোর 'লেনিনীয় কমসমোল' কারখানার পুনর্নির্মাণকর্ম শেষ হলে 'মস্ক্‌ভিচ' গাড়ির উৎপাদন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাবে। এর উৎপাদন ২ লক্ষে পৌঁছুবে। নবনির্মিত ইজেভ্‌স্ক কারখানার কনভেয়র থেকে ইতিমধ্যেই হাজার হাজার নূতন মোটরগাড়ি বেরিয়ে এসেছে; পরিকল্পনামতো উক্ত কারখানার পূর্ণ ক্ষমতা — বছরে ২ লক্ষ ২০ হাজার গাড়ি। এ সবের ফলে ১৯৭৫ সনে ১২ লক্ষ ৬০ হাজার পর্যন্ত মোটরগাড়ি উৎপাদন সম্ভব হবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে কৃষি অর্থনীতির বিকাশ নিরূপণের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শর্তস্বরূপ গ্রামে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সারের সরবরাহ, বনিয়াদী নির্মাণের সম্প্রসারণ, জমির উৎকর্ষসাধন, কর্মিদলের তালিম এবং উৎপাদনব্যবস্থার উন্নতিবিধানের কথা বিবেচনা করা হয়েছে।

পাঁচসালার বছরে রাষ্ট্রীয় এবং যৌথখামার থেকে কৃষি অর্থনীতিতে প্রায় ১২,৯০০ কোটি রুবল বিনিয়োগ করা হবে; বিগত দুটি পাঁচসালা পরিকল্পনায় একত্রে এই খাতে যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছে, উক্ত পরিমাণ তার সমান।

কৃষি অর্থনীতিতে পাঁচ বছরের মধ্যে বিদ্যুৎশক্তির ক্ষমতা দেড়গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, কৃষিক্ষেত্রে ১৭ লক্ষ ট্র্যাক্টর ও ১১ লক্ষ লরি সরবরাহ করা হয়েছে। যৌথখামার ও রাষ্ট্রীয় খামারসমূহে উচ্চ উৎপাদনশীল শস্যসংগ্রহকারী কম্বাইন ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি কাজ করছে। পশুপালনক্ষেত্রে শ্রমসাধ্য প্রক্রিয়ার যন্ত্রীকরণ এবং শ্রম সহজসাধ্য করার উদ্দেশ্যে যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের সরবরাহ প্রচুর বৃদ্ধি করা হচ্ছে। কৃষিতে বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহার দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাবে: উক্ত ব্যবহার ৭,৫০০ কোটি কিলোওয়াট-ঘণ্টায় পৌঁছুবে।

১৯৭৫ সনে কৃষি অর্থনীতিতে ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টন খনিজ সার ও ফসফেট সরবরাহ করা হবে (১৯৭০ সনে ছিল ৪ কোটি ৬০ লক্ষ টন)। ভূমি-উন্নয়ন এবং জলসেচযোগ্য জমিতে পণ্যশস্যের গ্যারাণ্টিযুক্ত উৎপাদনের বনিয়াদ গড়ে তোলার বিস্তৃত কর্মসূচি রূপায়ণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হবে। জলসেচব্যবস্থা দ্রুত নির্মাণ করা হবে এবং তার ফলে ভলগার তীরবর্তী অঞ্চল, উত্তর ককেশাস ও ইউক্রেনের দক্ষিণে ১৫ লক্ষ হেক্টর এবং মধ্য এশিয়ায় ৬ লক্ষ ৫০ হাজার হেক্টর সেচযোগ্য জমি কাজে লাগানো সম্ভব হবে। অতিরিক্ত আর্দ্র অঞ্চলে ৫০ লক্ষ হেক্টর জমি হাসিলের কাজ নির্দেশ করা হয়েছে। ৪ কোটি ১০ লক্ষ হেক্টর বিশিষ্ট চারণভূমি জলসিক্ত করার কথা আছে।

গ্রামের মেহনতী মানুষের দায়িত্ব — বছরে গড়পড়তা

১৯ কোটি ৫০ লক্ষ টন পর্যন্ত শস্যের উৎপাদন, আর অবশ্যপালনীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী তার খরিদ ৮ কোটি ৫০ লক্ষ টন পর্যন্ত হতে হবে। পাঁচসালার সময়ের মধ্যে মাংসের গড়পড়তা বার্ষিক উৎপাদন ১ কোটি ৪০ লক্ষ টন, দুধের —৯ কোটি ২০ লক্ষ টন আর ডিমের — সংখ্যায় ৪,৬০০ কোটি ছাড়িয়ে যাওয়ার কথা। অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির কথা ভাবা হয়েছে।

নূতন পাঁচসালা পরিকল্পনার প্রধান সমস্যা মূলধন বিনিয়োগের নীতিও নির্ধারণ করে। জাতীয় অর্থনীতির পৃথক পৃথক শাখায় তার বণ্টনের অনুপাতে মৌলিক পরিবর্তনের কথা ভাবা হয়েছে।

১৯৭১—১৯৭৫ সনে মূলধন বিনিয়োগের মোট পরিমাণ — ৫০,০০০ কোটি রুবল, — যা পূর্ববর্তী পাঁচসালার চেয়ে প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ বেশি। ২৪তম কংগ্রেসে ল. ই. ব্রেজনেভ বলেন: 'আমরা বর্তমানে বৈষয়িক উৎপাদনের ক্ষেত্রে যা গড়ছি তা পৃথিবীর অন্য যে-কোন দেশের চেয়ে বেশি। দ্নেপ্রগেস, মাগ্নিৎকা এবং ভলগোগ্রাদ ও খারকভ ট্র্যাক্টরনির্মাণ কারখানা গঠন আমাদের দেশের ইতিহাসে যে কী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তা প্রাচীন পুরুষের স্মরণে আছে। এখন প্রতি বছর আরও বহুক্ষমতাসম্পন্ন প্রযুক্তিগতভাবে অনেক উৎকৃষ্ট কেন্দ্র ও উদ্যোগ চালু হচ্ছে। গত কয়েক বছরে যে-সব উদ্যোগ গড়ে উঠেছে সেগুলির মধ্যে আছে ক্রাস্নয়ার্স্কে নির্মিত পৃথিবীর বৃহত্তম জলবিদ্যুৎকেন্দ্র, কনাকোভো, বুরশতিন্ ও ক্রিভয় রোগের অনবদ্য তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র; বিশাল ধাতু-শিল্পোদ্যোগ — পশ্চিম সাইবেরীয় কারখানা ও কারাগান্দার সংযুক্ত উদ্যোগ; তিউমেন অঞ্চল এবং পশ্চিম কাজাখস্তানে অবস্থিত তৈল-

নিষ্কাশন সমাহার, ভলগা মোটরগাড়ি ও পাভ্‌লদার ট্র্যাক্টর কারখানা, বিশাল ক্ষমতাসম্পন্ন রাসায়নিক সংযুক্ত উদ্যোগ ও কারখানা; ব্রাৎস্ক ও সিক্‌তিভ্‌কার কাষ্ঠশিল্পসমাহার। চের্নোগোর্স্কে মিহি পশমী কাপড়ের ও কুর্স্কে বোনা জিনিসের সংযুক্ত উদ্যোগ এবং হাল্‌কা ও খাদ্যশিল্পের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নির্মিত হয়েছে।'

কৃষি অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় মূলধন বিনিয়োগ ৭০ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে, ট্র্যাক্টর এবং কৃষি যন্ত্রপাতিনির্মাণে — প্রায় দ্বিগুণ, খনিজ সার এবং উদ্ভিদরক্ষার উপকরণের উৎপাদনবিকাশে — ৬০ শতাংশ, হাল্‌কা শিল্পে —৯০ শতাংশ, খাদ্য এবং মাংস-দুগ্ধ শিল্পে —৬০ শতাংশ। কৃষি অর্থনীতির বিকাশ এবং খাদ্যদ্রব্য ও সাধারণ ভোগ্যবস্তুর বৃদ্ধিতে সবসমেত সমগ্র রাষ্ট্রীয় মূলধন বিনিয়োগের প্রায় ৩০ শতাংশ নির্ধারিত হয়েছে।

সামাজিক উৎপাদনের কার্যকারিতাবৃদ্ধির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত — উৎপাদনী শক্তির যথাযথ বিনিয়োগ, — যাতে সকল অঙ্গপ্রজাতন্ত্রের শিল্পের ভবিষ্যৎ বিকাশ এবং পরিণামে লেনিনীয় জাতীয় নীতির বাস্তবায়ন ক্রমাগত সুনিশ্চিত হয়।

নূতন পাঁচসালার সামনে আছে ইউরোপীয় উত্তরাঞ্চল, সাইবেরিয়া, দূর প্রাচ্য, কাজাখস্তান ও মধ্য এশিয়ার সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক সম্পদের দ্রুত উদ্ধারসংক্রান্ত বিশাল পরিমাণ কাজ সম্পাদন। পশ্চিম সাইবেরিয়ার তেল-গ্যাস শিল্পাঞ্চল, পূর্ব সাইবেরিয়ার ব্রাৎস্ক-ইলিম ও সাইয়ানি, তাজিকিস্তানের নুরেক এবং অন্যান্য শিল্পাঞ্চল ও শিল্পকেন্দ্রের মতো সামাজিক তাৎপর্যপূর্ণ বেশ কিছু নূতন নূতন শিল্পাঞ্চল ও শিল্পকেন্দ্র গঠিত হতে থাকবে। পূর্বাঞ্চলগুলিতে নূতন নূতন উদ্যোগের নির্মাণকর্ম — মূলত লৌহেতর ধাতু ও

রাসায়নিক শিল্প কেন্দ্রীভূত হচ্ছে; লোহ ও লোহজাত ধাতু-শিল্প এবং কাষ্ঠ-প্রক্রিয়াকরণ বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করবে।

অর্থনৈতিক কর্মপন্থার আরও একটি মূল প্রশ্ন — আমাদের সামনে যে সমস্যা রয়েছে তা সমাধানের উপযোগী সুযোগ-সম্ভাবনা কাজে লাগানো।

সমস্যার ধারাবাহিকতার দিক থেকে যেমন, দীর্ঘমেয়াদী ভবিষ্যতের দিক থেকেও তেমনি, শ্রমের উৎপাদনশীলতাবৃদ্ধির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হিশেবে বৈজ্ঞানিক-টেকনিক্যাল প্রগতির দ্রুততাসাধন প্রথম স্থান পায়। নবম পাঁচসালায় জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি এবং শিল্পজাত উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণবৃদ্ধি প্রধানত শ্রমের উৎপাদনশীলতাবৃদ্ধির দ্বারা অর্জিত হবে।

সকল জাতের উৎপন্ন দ্রব্যের টেকনিক্যাল স্তর, ব্যয়সংকোচ এবং উৎকর্ষের মাত্রাবৃদ্ধি — কম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নয়। ঐতিহাসিকভাবে, আমরা যে পরিস্থিতির মধ্যে ছিলাম তার কারণে ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছে যে পরিমাণগত বিচারটা — অর্থাৎ, অত টন ইস্পাত, অতটা পরিমাণ তেল, অত পরিমাণ শস্য বা অত সংখ্যক ট্র্যাক্টর — এই নিরিখই অগ্রাধিকার পেয়ে এসেছে। অবশ্য, আজও কোন দ্রব্য কতটা উৎপন্ন হল আমাদের কাছে তার গুরুত্ব রয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্যের উৎকর্ষবৃদ্ধি এবং তার উৎপাদনে ব্যয়সংকোচের প্রতি আরও বেশি দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে।

আরও ব্যাপক জনসাধারণকে উৎপাদন পরিচালনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা — অন্যতম কেন্দ্রীয় সমস্যা। ভ. ই. লেনিন যেমন নির্দেশ করেছেন, — প্রতিটি সচেতন শ্রমিক যাতে নিজেকে কেবল তার কারখানার কর্তা বলেই নয়, — দেশের

প্রতিনিধি বলেও অনুভব করতে পারে — তা দেখা দরকার।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক এবং বৈজ্ঞানিক-টেকনিক্যাল সহযোগিতার নিয়মিত বিকাশের প্রতি কংগ্রেস বিশেষ নজর দিয়েছে। ঐ সব দেশে তৈল, প্রাকৃতিক গ্যাস, বিদ্যুৎশক্তি ও আকরিক লোহসমেত সোভিয়েত যন্ত্রপাতিনির্মাণ ও রাসায়নিক শিল্পজাত বহু দ্রব্য, কাঁচা মাল ও জ্বালানির সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি থেকে রাসায়নিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি, রেলপথ ও জলপথের উপকরণ এবং জনসাধারণের শিল্পজাত ভোগ্যবস্তু আমদানি করবে।

এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈদেশিক অর্থনীতিগত সম্পর্কের ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণেরও পরিকল্পনা আছে। এদের সঙ্গে সমতা ও পারস্পরিক স্বার্থের প্রতি শ্রদ্ধার নীতিতে গড়ে ওঠা সহযোগিতার সম্পর্ক আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী শোষণব্যবস্থার বিপরীত। সেই সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক দেশ ও উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যসম্প্রসারণের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন জাতীয় অর্থনীতির চাহিদা আরও ভালোভাবে মেটানোর সুযোগ পাবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবে পরিণত হওয়ার অর্থ হবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিবিকাশের পথে, সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিজমের বৈষয়িক-টেকনিক্যাল ভিত্তি গড়ে তোলার পথে এক নূতন বৃহৎ পদক্ষেপ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা

২৭ ॥ শ্রমজীবীদের সমাজ

সমাজতন্ত্র হল শ্রমজীবীদের সমাজ। এখানে শোষিত ও শোষক নেই, চিরদিনের মতো সামাজিক ও জাতীয় নির্যাতনের অবসান ঘটেছে। শ্রমিক শ্রেণী, কৃষিজীবী ও বুদ্ধিজীবীসম্প্রদায় তাদের মূলগত সমস্বার্থে ঐক্যবদ্ধ। বিভিন্ন জাতি ও জনসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত শ্রমজীবীদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা, সংহতি ও পারস্পরিক সহায়তা গড়ে উঠেছে। এক নূতন ঐতিহাসিক জনসমাজের — সোভিয়েত জনগণের উদয় হয়েছে।

সোভিয়েত সমাজের শ্রেণীগত কাঠামো

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী — **শ্রমিক শ্রেণী**। দেশের শ্রমজীবী জনসাধারণের অর্ধেকেরও বেশি — শ্রমিক শ্রেণী। শ্রমিক শ্রেণী প্রধানত সমাজতান্ত্রিক

শিল্পে, অর্থাৎ জাতীয় অর্থনীতির প্রধান প্রধান শাখায় নিযুক্ত। তার শ্রমে উৎপাদনের উপায় ও শিল্পজাত ভোগ্যবস্তু তৈরি হয়। রাষ্ট্রীয় খামার, পরিবহণ এবং অর্থনীতির অন্যান্য শাখায়ও শ্রমিক শ্রেণী নিযুক্ত।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পৃথিবীর বিশিষ্ট শিল্পপ্রধান দেশে রূপান্তর, আধুনিক শিল্পশাখার প্রতিষ্ঠা গঠনগতভাবে শ্রমিক শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ১৯১৭ সনের অক্টোবরের আগে পর্যন্ত যেখানে শ্রমিকেরা তাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুসারে হাল্‌কা শিল্পে এবং খাদ্য প্রস্তুত শিল্পে প্রথম স্থান অধিকার করেছে, সেখানে বর্তমানে তারা যন্ত্রনির্মাণ ও ধাতু-প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে, লৌহ ধাতুশিল্প ও ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতিনির্মাণে, রাসায়নিক ও তৈল শিল্পে এবং আধুনিক উৎপাদনের অন্যান্য মুখ্য শাখায় প্রাধান্য বিস্তার করছে। শ্রমিক শ্রেণী সমাজতান্ত্রিক সমাজের চূড়ান্ত উৎপাদনী শক্তি।

শিল্প যৌথখামারগুলিকে মুখ্য কৃষি যন্ত্রপাতি ও খনিজ সার সরবরাহ করে। উদ্যোগসমূহে শ্রমিকেরা কৃষি উৎপন্ন দ্রব্য প্রক্রিয়াজাত করে। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ আকাদমিশিয়ন স. গ. স্ত্রুমিলিনের হিসাব অনুযায়ী উৎপাদিত শস্যের প্রতিটি টনে শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ শ্রমিকের শ্রম রয়েছে।

যন্ত্রবিজ্ঞানক্ষেত্রে প্রগতি শ্রমিকদের উৎপাদন-নৈপুণ্যের উন্নয়ন ঘটিয়েছে, বহু নূতন নূতন বৃত্তি দেখা দিয়েছে। শ্রমিক শ্রেণীর সাংস্কৃতিক ও সাধারণ শিক্ষার স্তর উন্নত হয়েছে। বিপ্লবের আগে পর্যন্ত কলকারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি ছিল নিরক্ষর। বর্তমানে শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের দুই-তৃতীয়াংশের পূর্ণ অথবা অপূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষা আছে। অনেকে কাজ করতে করতে

সাধ্য বিদ্যালয়ে, কারিগরি বিদ্যালয়ে এবং উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষা লাভ করে থাকে। বিশিষ্ট উৎপাদন শাখাসমূহে নিযুক্ত উচ্চ যোগ্যতা অর্জনকারী শ্রমিকদের কাজকর্মে (অ্যাডজাস্টার ও ফিটার মিস্ত্রী, মেরামতকারী, অপারেটর) শারীরিক শ্রমের উপর বুদ্ধিমার্গীয় শ্রম প্রাধান্য বিস্তার করতে চলেছে। তাদের শ্রম ক্রমেই সৃজনশীল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কী শিক্ষায়, কী শ্রমের বৈশিষ্ট্যে — অগ্রগামী শ্রমিক এবং উৎপাদনের নব-উদ্ভাবকেরা ইঞ্জিনিয়ারিং-টেকনিক্যাল কর্মীদের কাছাকাছি চলে আসছে।

'শ্রমের অর্থ — সাহস' নামে বইতে কিরভ কারখানার টার্নার ল. ক. লালোতিন লিখছেন: 'নব-উদ্ভাবক শ্রমিক হল রাষ্ট্র সম্পর্কে ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মানুষ। তার মধ্যে একজন দক্ষ কারিগরের অসামান্য গুণাবলী ও উৎকৃষ্ট ইঞ্জিনিয়রের সুদৃঢ় জ্ঞানের সম্মিলন দেখতে পাওয়া যায়। তার প্রবণতা — উৎপাদনসংক্রান্ত প্রযুক্তিবিদ্যার স্থায়ী উন্নতিবিধান, নূতনত্ব ও অগ্রগামিতার জন্য সংগ্রাম।'

উৎপাদনের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান, সমৃদ্ধ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এবং উচ্চ চেতনা ও সংঘবদ্ধতার বলে শ্রমিক শ্রেণী সমাজে মুখ্য ভূমিকার অধিকারী। শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি — কমিউনিস্ট পার্টি সামাজিক বিকাশ সংগঠন ও পরিচালনা করে।

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সমাজের অপর মূল শ্রেণী — **কৃষক শ্রেণী**, যার বিশাল সমষ্টি ৩০-এর দশকে সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পথে প্রবেশ করে (বল্টিক অঞ্চল, পশ্চিম ইউক্রেন, পশ্চিম বেলোরুশিয়া ও মোল্‌দাভিয়া সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে যৌথীকরণ সম্পন্ন হয় যুদ্ধপরবর্তীকালে)।

যৌথীকরণকালে কৃষক শ্রেণীর সাহায্যের জন্য শ্রমিক শ্রেণী তার হাজার হাজার উৎকৃষ্ট প্রতিনিধি প্রেরণ করে। তারা প্রথম সমবায় সমিতি গঠনের কাজে, যৌথখামারের উৎপাদন সুবিন্যস্ত করতে এবং গ্রামের সাংস্কৃতিক ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পরিবর্তনে সাহায্য করে। সে সময়কার বীরত্বপূর্ণ উৎসাহের পরিচয় আজ পর্যন্ত বয়ে নিয়ে এসেছে ম. আ. শোলখভের বিখ্যাত উপন্যাস 'অনাবাদী জমি হাসিল', — যেখানে যৌথীকরণ পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত পুতিলভ কারখানার কমিউনিস্ট সেমিওন দাভিদভের কার্যকলাপের বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। অতঃপর কৃষি উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য সংগ্রামের প্রতিটি চূড়ান্ত পর্বে কৃষক শ্রেণীর সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছে শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধিরা। ১৯৫৫ সনের বসন্তকালে পার্টির আহ্বানে প্রায় ২৫ হাজার শ্রমিক ও কর্মচারী যৌথখামারের পরিচালনামূলক কাজে চলে আসে।

শ্রমের পরিস্থিতি এবং সাংস্কৃতিক অবস্থার দিক থেকে যৌথখামারের অন্তর্ভুক্ত কৃষক শ্রেণী ক্রমেই শ্রমিক শ্রেণীর আরও কাছাকাছি এগিয়ে আসতে থাকে। যৌথখামারীরা যৌথ শ্রম এবং যান্ত্রিক কৌশলের ভিত্তিতে পরিচালিত বৃহৎ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিক্ষেত্রে কাজ করে। কৃষি উৎপাদনে বিজ্ঞান ও যন্ত্রপাতির ব্যাপক প্রচলনের ফলে সম্পূর্ণ নূতন নূতন বৃত্তির আবির্ভাব হল। বর্তমানে যৌথখামারগুলিতে ট্র্যাক্টরচালক, কম্বাইনচালক, গাড়িচালক ইত্যাদি ধরনের মেশিন অপারেটরের সংখ্যা — প্রায় ৪০ লক্ষ। কর্মে নিযুক্ত গ্রামীণ জনসাধারণের অর্ধেকেরও বেশি মাধ্যমিক অথবা উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করেছে।

গ্রামাঞ্চলে নূতন এবং আরও জটিল যন্ত্রপাতির প্রয়োগের ফলে, স্কুল, ক্লাব, সিনেমা হল, চিকিৎসা ও খেলাধূলার ব্যবস্থাসমেত ব্যাপক নির্মাণকর্ম এবং টেলিভিশন ও সংবাদের অন্যান্য মাধ্যমের বিস্তৃত সম্প্রসারণের কল্যাণে সোভিয়েত

গ্রামীণ জীবনের পরিবর্তন ঘটল, আধুনিক বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির মূল্যবান বস্তু গ্রামের জনসাধারণের হাতে এলো।

শিল্পের বিকাশ, শহরের বৃদ্ধি এবং যন্ত্রীকৃত শ্রমে কৃষি শ্রমের ক্রমিক রূপান্তরের ফলে দেশের জনসাধারণের মধ্যে কৃষক শ্রেণীর আপেক্ষিক গুরুত্ব হ্রাস পায়। কিন্তু আমরা দেখেছি যে এটা এমন এক প্রক্রিয়া, যা পুঁজিবাদে কৃষক শ্রেণীর উচ্ছেদ ও তার প্রভেদ নির্ধারণের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

সোভিয়েত সমাজের দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সম্প্রদায় — **বুদ্ধিজীবীসম্প্রদায়।**

সামগ্রিকভাবে ধরতে গেলে এরা — বৈষয়িক উৎপাদন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও সংস্কৃতি, জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সংস্থাসমূহে নিযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ।

১৯২৬ সনে যেখানে মুখ্যত বুদ্ধিমার্গীয় শ্রমে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা ছিল ২৯ লক্ষ আর ১৯৩৭ সনে ছিল প্রায় ১ কোটি, এখন সেখানে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩·৪ কোটি। বিশেষত উৎপাদন-প্রকৌশল ও বিজ্ঞানসংশ্লিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের আপেক্ষিক গুরুত্ব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৈজ্ঞানিক-টেকনিক্যাল বিপ্লবের গভীরতাসাধন এবং মানসিক জীবনযাত্রাসংক্রান্ত উৎপাদন-সম্প্রসারণ অনুযায়ী বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যা ভবিষ্যতেও বাড়তে থাকবে। এটা অর্থনীতি ও সংস্কৃতি বিকাশের দাবি এবং সোভিয়েত জনগণের শিক্ষাগত আগ্রহের উপযুক্ত।

পুঁজিবাদী দুনিয়ায় বুদ্ধিজীবী তার জ্ঞান ও প্রতিভা পুঁজির মালিকদের কাছে বিকিয়ে দিতে বাধ্য; সমাজতান্ত্রিক বনিয়াদে সমাজ নবায়নের সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মানুষের পাশাপাশি এমন সব বিশেষজ্ঞও

দেখতে পাওয়া যায়, যারা পংজিবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করে এবং নিজেদের 'পবিত্র বিদগ্ধজন' বলে বিবেচনা করে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সকল শ্রেণী এবং সামাজিক সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত বুদ্ধিজীবী শ্রমিক ও কৃষকদের হাতে হাত মিলিয়ে নূতন দুনিয়া গড়ে তোলে, জনগণের সেবাকে তার শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলে মনে করে।

নূতন সামাজিক সম্পর্ক

সোভিয়েত সমাজে সামাজিক সম্পর্কের চিত্রটি কী?

মানুষের ক্রিয়াকর্মের চরম ক্ষেত্র — **বৈষয়িক উৎপাদনের** কথা ধরা যাক। উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে সামাজিক মালিকানা এক শ্রেণীর উপর অপর শ্রেণীর প্রভুত্বের অবসান ঘটিয়েছে। শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবীসম্প্রদায় সমাজতান্ত্রিক সমাজের জন্য, নিজেদের জন্য মেহনতের সমান সুযোগ পায়, জাতীয় অর্থনীতি ও সংস্কৃতির স্ফুরণে তাদের সমান আগ্রহ। মানুষের বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও অবস্থা তার শ্রেণীগত অন্তর্ভুক্তির উপর নির্ভর করে না, — নির্ভর করে ব্যক্তিগত শ্রম, ক্ষমতা ও জ্ঞানের উপর।

শ্রমিক শ্রেণীতে অথবা যৌথখামারী কৃষক শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্তির সঙ্গে **রাজনীতিক্ষেত্রে** বিশেষ সুযোগ-সুবিধার কোন সম্পর্ক নেই: সোভিয়েত রাষ্ট্রের সব নাগরিক শ্রেণী-সম্প্রদায় নির্বিশেষে রাষ্ট্রপরিচালনায় একই রকম ক্ষমতার অধিকারী। সোভিয়েত সমাজে শ্রেণীসমূহের মধ্যে কোন কঠোর সীমারেখা নির্দেশ করা নেই: শ্রমিক ইচ্ছে করলে কৃষক হতে পারে, কৃষক শ্রমিক হতে পারে। শ্রমিক ও কৃষক পরিবারের ছেলেমেয়েরা উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন করে

বুদ্ধিমার্গীয় শ্রমের কর্মীতে পরিণত হতে পারে। শ্রেণীসমূহের মধ্যবর্তী সীমারেখার এই সচলতা তাদের ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতার সাক্ষ্য দেয়।

শ্রমিক শ্রেণীতে, কৃষক ও বুদ্ধিজীবীসম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্তির সঙ্গে সংস্কৃতিক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধার কোন সম্পর্ক নেই। সমাজতন্ত্র শিক্ষাকে সকল নাগরিকের অধিকারে পরিণত করেছে, জনগণের প্রতিভাবিকাশের অনুকূল অবস্থা গড়ে তুলেছে। এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে জনসাধারণের সকল স্তরের মানসিক সংস্কৃতির পর্যায় এক রকম হতে পারে না, বিশেষত একথা মনে রাখা দরকার যে জনসাধারণের নির্দিষ্ট অংশের পক্ষে সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানসংশ্লিষ্ট কর্ম বৃত্তি হয়ে দাঁড়ায়। তবে যে-কোন শ্রমেই নিযুক্ত থাকুক না কেন, প্রতিটি মানুষ যে জ্ঞান অর্জন করতে পারে, বিজ্ঞান ও শিল্পের সঙ্গে সংযোগ সাধন করতে পারে, সত্যিকারের অর্থে মার্জিত ও বুদ্ধিদীপ্ত হতে পারে এবং প্রতিভার অধিকারী হলে বিশিষ্ট অভিনেতা, শিল্পী অথবা বিজ্ঞানী হতে পারে — এ ধরনের বিশেষজ্ঞতা সে ঘটনা রহিত করে না।

হাজার হাজার বছর ধরে আপসহীন শ্রেণীবিরোধ মানবজাতিকে ছিন্নভিন্ন করেছে, পুঁজিবাদী সমাজে আজও তীব্রতম শ্রেণী-সংগ্রাম চলছে। এরই বিপরীতে, সমাজতন্ত্রে **সমগ্র জাতির সামাজিক-রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত ঐক্য** কায়েম করা হয়। এর ভিত্তি এখানেই যে সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক সমাজের সকল মেহনতী মানুষ সমান অধিকারী এবং মূলগত স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ; রাজনৈতিক দিক থেকে সকল শ্রমজীবী এক লক্ষ্যে — কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে কমিউনিজম গঠনের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ;

ভাবাদর্শগতভাবে শ্রমিক শ্রেণী, যৌথখামারী কৃষক ও বুদ্ধিজীবী জনসম্প্রদায় একই মতাদর্শে, — মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তাধারায় ঐক্যবদ্ধ।

সামাজিক-রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত ঐক্যের অর্থ সমাজের সকল স্তরের নিছক অভিন্নতা নয়।

প্রতিটি স্তরের মূলগত সমস্বার্থের ক্ষেত্রে নিজ নিজ বিশিষ্ট চাহিদা ও প্রয়োজন থাকতে পারে। যেমন, সমগ্র সোভিয়েত জনগণ জাতীয় অর্থনীতির ভবিষ্যৎ উন্নয়নে, দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তিবৃদ্ধিতে, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এবং সংস্কৃতির স্ফুরণে সমান আগ্রহী। কিন্তু এ ছাড়াও নিজ নিজ বিশিষ্ট প্রয়োজন আছে, —যেমন আছে কৃষি মেশিন অপারেটরের, বিদ্যালয়ের শিক্ষকের, যারা সাইবেরিয়ার ভয়ংকর পরিস্থিতিতে কাজ করে তাদের, এবং দেশের দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীদেরও।

এ থেকে শাসনবিভাগ ও পরিচালনদপ্তরের সামনে কখনো কখনো জটিল সমস্যার উদয় হয়: কোন ধরনের সামাজিক চাহিদা সবচেয়ে আগে পূরণ করা উচিত, কোন দিকে সর্বাগ্রে সঙ্গতি প্রেরণ করা কর্তব্য। অন্যভাবে বলতে গেলে বিভিন্ন সামাজিক স্তরের বিশেষ স্বার্থের সর্বদা সমন্বয়সাধন ও তাদের ন্যায়সঙ্গত চাহিদা মেটানো দরকার। এই সমস্যার সমাধান করে সমগ্র জনসাধারণের আগ্রহ পূরণকারী কমিউনিস্ট পার্টির নীতি।

সমগ্র জাতির সামাজিক-রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত ঐক্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজতন্ত্রের জয় সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্যান্য পরিবর্তনেরও সূচনা করেছে। সমাজতন্ত্র চিরদিনের জন্য শোষণভিত্তিক ব্যবস্থার বিকৃত পরিণতির —

বুদ্ধিমার্গীয় ও দৈহিক শ্রমের এবং শহর ও গ্রামের **বিরোধের** অবসান ঘটিয়েছে। যে সামাজিক পরিস্থিতিতে বুদ্ধিমার্গীয় শ্রমের কাজ ধনিক শ্রেণীকে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা করে দিত, আর শহর গ্রামকে শোষণ করতে পারত — তা বিলুপ্ত হল।

তা বলে, সমাজতন্ত্রে সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে — এমন কথা ভাবা ঠিক হবে না। শ্রেণীহীন কমিউনিস্ট সমাজ গঠন করার পথে এখনও **শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষকসম্প্রদায়ের মধ্যে, শহর ও গ্রামের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য** ইত্যাদি ধরনের যে-সব বাধা রয়ে গেছে তা অতিক্রম করা দরকার। সপ্তম অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা হবে।

২৮ ॥ স্বাধীন জাতিগুলির সংঘ

জাতীয় প্রশ্নের সমাধান

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রথম বিজয় সম্পন্ন হল পৃথিবীর সবচেয়ে বহুজাতিক দেশে, — যেখানে ১০০টিরও বেশি জাতি ও জাতিসত্তা আছে। জারের রাশিয়ায় অনুন্নত জাতিগুলির রাজনৈতিক অধিকারহীনতা থেকে শুরু করে তাদের উপর ঔপনিবেশিক শোষণ পর্যন্ত সমস্ত রকমের জাতীয় অত্যাচারের অস্তিত্ব ছিল। শাসক শ্রেণী দিনের পর দিন বৃহৎ শক্তিসুলভ জাতিদম্ভ এবং স্থানীয় জাতীয়তাবাদ প্রচার করে এসেছে, বিভিন্ন জাতির লোকের মধ্যে বিভেদ ও অবিশ্বাস ছড়িয়েছে, যাতে জনসাধারণের ঐক্যের পথে অন্তরায় সৃষ্টি হয় তার জন্য একের বিরুদ্ধে

অপরকে লেলিয়ে দিয়েছে। জাতীয় ভিত্তিতে বেধে ওঠা রক্তাক্ত সংঘাত, ব্যাপক লুঠতরাজ ও হত্যাকাণ্ড ছিল সাধারণ ঘটনামাত্র।

শাসনক্ষমতায় এসে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি ক্রমশ জাতীয় প্রশ্নের সমাধান সম্পর্কে তার কর্মসূচির রূপায়ণ ঘটাতে লাগল। এই কর্মসূচির সারকথা — জাতিসমূহের সমান অধিকারের প্রতিষ্ঠা, সকল আকারের ও ধরনের জাতীয় অত্যাচারের অবসান; প্রতিটি জাতিকে স্বাধীনভাবে নিজের ভাগ্য নির্ধারণের (আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার) এবং সমান অধিকারসম্পন্ন জাতীয় প্রজাতন্ত্রগুলির স্বেচ্ছায় ফেডারেশনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রশ্ন সমাধান; জাতিসমূহের মধ্যে সত্যিকারের সমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রতিটি জাতির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের উপযুক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি।

১৯২২ সনের ৩০শে ডিসেম্বর সোভিয়েতসমূহের প্রথম কংগ্রেসে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়ন গঠনসম্পর্কিত ঘোষণা ও চুক্তি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হল।

সোভিয়েত ফেডারেশন প্রতিটি জাতীয় রাষ্ট্রসংগঠনের অধিকারের সঙ্গে সমগ্র ইউনিয়নের স্বার্থের, সমগ্র জাতির স্বার্থের সুসমঞ্জস সম্মিলন ঘটাল।

রাষ্ট্রশক্তির কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি দেশের সমগ্র অঞ্চলের অর্থনীতি ও সংস্কৃতির বিকাশ পরিচালনা করে। সোভিয়েত ইউনিয়নে একই নাগরিকত্ব, একই বাজেট, একই মুদ্রাব্যবস্থা এবং একই সামরিক শক্তি।

সেই সঙ্গে প্রতিটি **অঙ্গপ্রজাতন্ত্রের** নিজের নিজের সংবিধান আছে এবং তারা অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সরাসরি

সম্পর্ক রাখতে পারে, কূটনৈতিক প্রতিনিধি বিনিময় করতে পারে। অঙ্গপ্রজাতন্ত্র জাতীয় অর্থনীতির বিকাশসংক্রান্ত নিজস্ব পরিকল্পনা ও বাজেট তৈরি করে, প্রজাতন্ত্রের অধীনস্থ শিল্পোদ্যোগ, বাসসংস্থান এবং গ্রাম ও পৌরব্যবস্থা পরিচালনা করে, জনস্বাস্থ্য, সামাজিক ভরণপোষণ, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ শিক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থা করে।

অঙ্গপ্রজাতন্ত্রসমূহের সীমানার অভ্যন্তরে বহু জাতির বাস। যদি কোন জাতি অথবা জাতিসত্তা মোটামুটি নিবিড় গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বাস করে, তবে তার রাষ্ট্রীয় গঠন **স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ বা জাতীয় জেলার** রূপ লাভ করে। নিজ নিজ সীমানার অভ্যন্তরে স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র জাতীয় অর্থনীতি এবং সংস্কৃতিও পরিচালনা করে, তাদের নিজেদের শাসনসংস্থা ও সংবিধান আছে।

সোভিয়েত ফেডারেশন সমাজতান্ত্রিক জাতি ও জাতিসত্তার ভ্রাতৃসুলভ সহযোগিতা মূর্ত করে তোলে। সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নে সম্মিলনের ভিত্তিতে সোভিয়েত সমাজের অপূর্ব গতিশক্তি — **সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের মৈত্রীবন্ধন** সঞ্চারিত হয়েছে। জাতিসমূহের মৈত্রীবন্ধন — সমাজতন্ত্রের শক্তি ও অপরাজেয়তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উৎস।

১৯৭২ সনের ডিসেম্বরে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়ন গঠনের ৫০ বছর পূর্ণ হল। প্রত্যক্ষ ঘটনাবলী এবং অর্ধশতাব্দীর অভিজ্ঞতায় সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি অনুসৃত জাতিসংক্রান্ত লেনিনীয় নীতির ন্যায়পরতা ও বাস্তবতা প্রমাণিত হয়েছে।

এই অভিজ্ঞতা পুঁজিবাদের উপর সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সাক্ষ্য।

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নের ৫০ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এক বিবৃতিতে ল. ই. ব্রেজনেভ বলেন: 'বিগত অর্ধশতাব্দীর বীরত্বপূর্ণ কর্মসম্পাদনের ফলাফল বিচার করলে, অতীতের কাছ থেকে জাতীয় প্রশ্ন যে রূপে আমরা পেয়েছি তার যে সম্পূর্ণ, চূড়ান্ত এবং অপরিবর্তনীয় সমাধান ঘটেছে — এমন কথা বলার যথেষ্ট ভিত্তি পাওয়া যায়। এটা এমন এক সাফল্য, যা সোভিয়েত ইউনিয়নের নূতন সমাজ গঠনে শিল্পায়ন, যৌথীকরণ ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মতো সাফল্যের সঙ্গে একাসনে স্থান পাবার অধিকারী।

'সোভিয়েত ইউনিয়নে জাতীয় অন্তর্ভুক্তি নির্বিশেষে, শ্রেণীগত স্বার্থ ও লক্ষ্যের ঐক্যে সম্মিলিত জনগণের মহান ভ্রাতৃত্বের জন্ম হয়েছে, তা দৃঢ়সংসক্ত হয়েছে এবং ইতিহাসের দিক থেকে এমন এক অভূতপূর্ব সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, যাকে আমরা সঙ্গত কারণেই লেনিনীয় গণমৈত্রী আখ্যা দিয়ে থাকি। বন্ধুগণ, এই মৈত্রী আমাদের এক অমূল্য সম্পদ, সমাজতন্ত্রের বিজয় অভিযানে প্রতিটি সোভিয়েত মানুষের হৃদয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান বস্তু। আর, আমরা সোভিয়েত মানুষেরা, এই মৈত্রীকে সর্বদা চোখের মণির মতো রক্ষা করব!'

জাতীয় প্রশ্ন সমাধানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে জটিল সমস্যা ছিল জাতিসমূহের মধ্যে প্রকৃত সমতা প্রতিষ্ঠায় সাফল্যলাভ, কেননা দেশের জাতিসকল সমাজবিকাশের বিভিন্ন স্তরে অবস্থান করছিল। উন্নত জাতিগুলির পাশাপাশি অনুন্নত জাতিসত্তা এবং ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীও ছিল। মধ্য এশিয়ার

অধিকাংশ অঞ্চলে সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক প্রভুত্ব ছিল। প্রত্যন্ত উত্তরাঞ্চলে, সাইবেরিয়া ও দূর প্রাচ্যের বহু অঞ্চলে পিতৃতান্ত্রিক গোষ্ঠীপ্রথার অস্তিত্ব ছিল। অনুন্নত জাতিগুলিকে অগ্রণীদের পর্যায়ে উন্নয়নের জন্য তাদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের গতি ত্বরান্বিত করা আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। পার্টি সে পথই গ্রহণ করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্বকালের মধ্যে শিল্পজাত উৎপন্ন দ্রব্যের সাধারণ পরিমাণ যেখানে ৩২০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, সেখানে কাজাখস্তানে তা বেড়েছে ৬০০ গুণ, তাজিক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে — ৫০০ গুণেরও বেশি, কির্গিজিয়ায় — ৪০০ গুণেরও বেশি, উজবেক প্রজাতন্ত্রে — প্রায় ২৪০ গুণ, তুর্কমেন প্রজাতন্ত্রে —১৩০ গুণেরও উপরে।

সমাজতন্ত্র পূর্বতন অনুন্নত জাতিসমূহের পুনরুজ্জীবনে সহায়তা করেছে। সোভিয়েত আমলে ৪০টিরও বেশি জাতিসত্তা নিজেদের লিপি ও সাহিত্য গড়ে তুলেছে। বিদ্যালয়গুলিতে দেশের বিভিন্ন জাতি ও জাতিসত্তার ৬৫টি ভাষায় শিক্ষাদান করা হয়ে থাকে। অঙ্গপ্রজাতন্ত্রগুলির নিজেদের বিজ্ঞান আকাদমি, অসংখ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইনস্টিটিউট, থিয়েটার ও ফিল্ম-স্টুডিও আছে। জাতীয় অঞ্চলগুলিতে উৎপাদন ও সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ কর্মিদল গড়ে উঠেছে।

সকল জাতির, — এবং সর্বাগ্রে সমগ্র রুশ জনগণের পারস্পরিক ভ্রাতৃপ্রতিম সহায়তার উপর নির্ভর করে পূর্বতন অনুন্নত বহু জাতি তিন-চার দশকের মধ্যে মধ্যযুগ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ বাস্তবে পরিণত করল, পীড়াদায়ক পুঁজিবাদী বিকাশের হাত থেকে নিস্তার পেল, এবং কেউ কেউ আক্ষরিক অর্থে দৈহিক বিলুপ্তি থেকে উদ্ধার লাভ করল।

এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার নবীন স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের প্রগতিশীল শক্তি ক্রমবর্ধমান আগ্রহের সঙ্গে সোভিয়েত অভিজ্ঞতা লক্ষ্য করে যাচ্ছে। ঐ সব দেশের বহু সমাজকর্মী ঘোষণা করেছেন যে সমাজতন্ত্র যে জাতীয় নির্যাতনের অবসান ঘটিয়ে পূর্বতন পশ্চাৎপদ জনগণকে অগ্রণী সভ্যতার স্তর পর্যন্ত উত্তোলন করেছে একমাত্র সেই কারণেই সমাজতন্ত্রের ন্যায়পরতা ও মানবিকতার সমুখে মানবজাতির শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করা উচিত। সোভিয়েত উজবেকিস্তান সম্পর্কে ধারণাপ্রসঙ্গে ভারতীয় লেখক পণ্ডিত সুন্দরলাল বলেন: 'সোভিয়েত ব্যবস্থার ফলে উজবেকিস্তান যদি অত্যুন্নত দেশ হয়ে দাঁড়ায়, — আর সত্যিই তাই হয়েছেও! — তা হলে সোভিয়েত ব্যবস্থাকে দুনিয়ার সেরা সমাজব্যবস্থা বলতেই হয়।'

জাতীয় সম্পর্ক বিকাশের দুই প্রবণতা

সমাজতন্ত্রে একই কালে দুটি প্রবণতা — জাতিসমূহের বিকাশ ও তাদের ঘনিষ্ঠতা — কাজ করে। উভয় প্রবণতাই প্রগতিশীল এবং একে অপরের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা।

প্রকৃতপক্ষে জনগণের মৈত্রী ও তাদের পারস্পরিক সহায়তার কল্যাণেই রুশ সাম্রাজ্যের চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলের পূর্বতন পশ্চাৎপদ জাতিগুলি দেশের কেন্দ্রীয় অঞ্চলসমূহের বিকাশের সমপর্যায়ে উন্নীত হতে পেরেছে। আজ সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত জাতীয় প্রজাতন্ত্র অত্যুন্নত শিল্প ও যন্ত্রীকৃত কৃষির এবং জাতীয় অর্থনীতি ও সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে উচ্চ বিশিষ্টতা অর্জনকারী বিশেষজ্ঞের অধিকারী।

সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত জাতীয় প্রজাতন্ত্রগুলি নিজেরাই যদিও অন্যান্য জনগণ ও রাষ্ট্রকে সাহায্য করে, তথাপি সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির

কর্মসূচিতে বিশেষভাবে বলা আছে যে পার্টি 'আগের মতোই সমগ্র জাতি ও জাতিসত্তার স্বার্থের কথা পূর্ণ বিবেচনা করে এবং দেশের যে-সব অঞ্চলের আরও দ্রুত বিকাশের প্রয়োজন সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখে তাদের যথার্থ সমতারক্ষার নীতি অনুসরণ করে যাবে'।

অন্য দিক থেকে, জাতিসমূহের বিকাশই আরও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার দাবি সূচনা করে। এইভাবে, অঙ্গপ্রজাতন্ত্রসমূহে শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন এবং জাতীয় অর্থনীতি বিশেষীকরণে উন্নতি তাদের মধ্যে যৌথকর্ম সম্প্রসারণের অবশ্য অনুষঙ্গী। বর্তমানে একটি বৃহৎ নির্মাণকর্মও বহু সংখ্যক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের কলকারখানার অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে সম্পন্ন হয় না, আর অনাবাদী জমির উদ্ধারসাধন, দেশের পূর্ব অঞ্চলে নূতন শিল্প কেন্দ্র গড়ে তোলার মতো বিশাল ব্যবস্থাসমূহ একমাত্র সমগ্র সোভিয়েত জনগণের মিলিত প্রয়াসেই বাস্তব রূপ লাভ করতে পেরেছে।

তিন-চার দশক আগে পর্যন্ত দেশের সমগ্র বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপ মস্কো, লেনিনগ্রাদ, কিয়েভ ও অন্যান্য কয়েকটি বৃহৎ কেন্দ্রের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে ছিল। এখন, যখন সব জাতীয় প্রজাতন্ত্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণার বনিয়াদ গড়ে উঠেছে এবং প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিকরা বেড়ে উঠেছেন, তখন তাঁদের সহযোগিতা ব্যতিরেকে বিজ্ঞানের বিকাশ নিরর্থক।

পুলকভো মানমন্দিরের জ্যোতির্বিদরা তাঁদের বিউরাকান অঞ্চলের সহকর্মীদের সঙ্গে 'যৌথকর্মে' লিপ্ত। রাজধানীর গণিতবিদরা ত্বিলিসিতে তাঁদের 'সংগ্রামের' সাথীদের সঙ্গে অনবরত যোগসূত্র রাখেন। দেশের সমগ্র প্রান্ত থেকে ধাতু-বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষার জন্য কিয়েভে যান।... সোভিয়েত বিজ্ঞানের একক ফ্রন্ট শক্তিশালী হতে চলেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের যে-কোন জাতির সংস্কৃতিসেবী রচিত বই পড়ে, চলচ্চিত্র দেখে, সঙ্গীত শুনে আমরা নিজেদের মানসজগৎ সমৃদ্ধ করি, জীবনের নব নব দিগন্ত সম্পর্কে আমাদের চেতনা হয় এবং আমরা নিজেদের জন্য নন্দনতাত্ত্বিক আনন্দের নূতন উৎস উদ্‌ঘাটন করি। আর তা ভ্রাতৃপ্রতিম জনগণের জাতীয় সংস্কৃতিকে আরও গভীরভাবে জানার প্রেরণা দেয় এবং তাকে আরও ভালোভাবে বুঝতে ও তার অধিকতর মূল্য দিতে শেখায়।

এইভাবে, প্রতিটি জাতির ভবিষ্যৎ বিকাশ সমগ্র সমাজের পক্ষে অত্যন্ত লাভজনক, জাতিতে জাতিতে অর্থনৈতিক সংযোগ গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করে, গভীর পারস্পরিক শ্রদ্ধার জন্ম দেয় এবং জাতিসমূহের মধ্যে মৈত্রী দৃঢ় করে। **ঘনিষ্ঠতার মধ্য দিয়ে অর্জিত জাতিসমূহের স্ফুরণ এবং স্ফুরণের মধ্য দিয়ে অর্জিত জাতিসমূহের ঘনিষ্ঠতা — এই হল সোভিয়েত ইউনিয়নে জাতীয় সম্পর্কবিকাশের দ্বান্দ্বিকতা।**

এখানে অবশ্য একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির কথা এড়িয়ে গেলে চলবে না। আমরা যখন জাতির স্ফুরণের কথা বলি, তখন তার অর্থ হল জাতীয় সংস্কৃতির উৎকৃষ্ট এবং প্রগতিশীল দিক এবং সুস্থ জাতীয় রীতিনীতি ও ঐতিহ্য, — যা সকল জাতির সংস্কৃতির যথার্থ সমৃদ্ধি সাধন করে। তবে প্রতিটি জাতিরই প্রাচীন আচার-ব্যবহারের জের থেকে যায়, ক্ষতিকর ঐতিহ্যের প্রকাশ দেখা যায়।

বিশেষ করে বর্তমান ও ক্ষতিকর হল জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির জের। জাতিত্বের বড়াই এবং অপর জাতির জনসাধারণের প্রতি অবজ্ঞার চেয়ে জঘন্য এবং সমাজ-মানসবিরোধী আর কিছুই নেই। জাতি ও বর্ণের ভিত্তিতে

মানুষের অধিকার লঙ্ঘন ও বৈষম্যমূলক আচরণের যে-কোন রকম প্রকাশ সোভিয়েত আইনে কঠোর দণ্ড পেয়ে থাকে। পার্টি সোভিয়েত জনসাধারণকে আন্তর্জাতিকতাবাদ, সম অধিকার এবং জাতিসমূহের মৈত্রীর মূলনীতিতে শিক্ষা দেয়। আন্তর্জাতিকতাবাদী না হয়ে জীর্ণ জাতীয়তাবাদিতার জের টেনে চলে কারও পক্ষে কমিউনিজমের সচেতন গঠনকারী হওয়া সম্ভব নয়।

সোভিয়েত জনগণ

জাতিসমূহের ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতা এবং তাদের পারস্পরিক সমৃদ্ধিসাধনের ফলে **জনসাধারণের অন্তঃপ্রকৃতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য বিকশিত হয়ে চলেছে;** এসব বৈশিষ্ট্যের জন্ম দিয়েছে নূতন সমাজব্যবস্থা এবং তাতে মূর্ত হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতিসমূহের উৎকৃষ্ট ঐতিহ্য। এই বৈশিষ্ট্যগুলি **মানুষের এক নূতন ঐতিহাসিক সম্প্রদায়ের — সোভিয়েত জনগণের বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক।**

সোভিয়েত দেশ ভ্রমণের সুযোগ যাঁদের হয়েছে তাঁরা মধ্য এশিয়ায়, বল্টিক অঞ্চলে, ককেশাসের প্রত্যন্ত প্রদেশে অথবা মোল্‌দাভিয়ায় — যেখানেই যান না কেন, সর্বত্রই চোখে পড়বে সোভিয়েত জীবনের বিশেষ লক্ষণ। মানুষের বাহ্য প্রকৃতিতে, তাদের পোষাক-পরিচ্ছদে, ভাষায় এমন কি ভঙ্গিতেও বেশ কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যেতে পারে। কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের সকলের স্বভাবসিদ্ধ এমন সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়, যা দিয়ে প্রায় অভ্রান্ত রূপে সোভিয়েত মানুষের পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব। এমনটা না হয়ে উপায় নেই: কেননা দৃষ্টিভঙ্গির ঐক্য, সমাজজীবনের একই রকম পরিস্থিতি মানুষের সমগ্র অন্তঃপ্রকৃতিতে প্রতিফলন না ঘটিয়ে পারে না।

জাতীয় চরিত্র অত্যন্ত স্থির, জাতির জীবনের সর্বাঙ্গীণ প্রভাবে তা গড়ে ওঠে। প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে প্রতিটি জাতির অন্তর্গত মানুষের অথবা সমজাতীয় জনসম্প্রদায়ের প্রকৃতিগত প্রভেদবশত চরিত্রের বৈষম্য নির্ধারণ করা যায়। কিন্তু এতে **সোভিয়েত মানুষের** নূতন সাধারণ বৈশিষ্ট্য বিকাশের পথে বিন্দুমাত্র প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। এখানে আছে কর্মব্যস্ততা ও বিস্তার, মহাপ্রাণতা ও ঔদার্য, অকপটতা ও নীতিনিষ্ঠা এবং আরও অনেক গুণ, — যেগুলির প্রসার ঘটেছে নূতন কমিউনিস্ট নৈতিকতা প্রতিষ্ঠার ফলে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে সকল জাতির পক্ষে সাধারণ এমন এক সংস্কৃতির সফল বিকাশ ঘটেছে, যা কমিউনিজমের সর্বমানবগ্রাহ্য সংস্কৃতির প্রতিরূপ হিশেবে কাজ করছে। এইভাবে, সোভিয়েত লেখক, সুরকার বা শিল্পীর সৃজনকর্মে যে শৈলী ও রূপের বিশাল বৈচিত্র্য প্রকাশ পায় সেখানে যে প্রণালীটি তাঁদের শিল্পকর্মের উপকরণ, তা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার প্রণালী। ল. ই. ব্রেজনেভ মন্তব্য করেছেন: '...আমাদের সংস্কৃতি সমাজতান্ত্রিক — তার মর্মবস্তুতে, বিকাশের মূল গতিপ্রকৃতিতে, বৈচিত্র্যপূর্ণ — তার জাতীয় রূপে এবং আন্তর্জাতিক — তার অন্তরে ও চরিত্ররূপে। এইভাবে, এ সংস্কৃতি সমগ্র জনগণের গড়ে তোলা মহার্ঘ অন্তরলোকের সুষম সংমিশ্রণ হয়ে দাঁড়ায়।'

এ ব্যাপারে আধুনিক স্থাপত্যও বৈশিষ্ট্যসূচক নিদর্শন স্থাপন করেছে। প্রতিটি জাতির স্থপতি স্বভাবতই নিজেদের রচনায় জাতীয় স্থাপত্যের বাস্তব অভিজ্ঞতায় লব্ধ উৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রয়োগ ঘটান। সেই সঙ্গে তাঁরা আমাদের যুগের সৌন্দর্যবোধ অনুযায়ী গৃহাদি নির্মাণের চেষ্টা করেন; তাঁরা অতি সরল ও প্রকাশমূলক রূপ অনুসন্ধান করেন, অট্টালিকার ব্যয় ও সুযোগ-সুবিধার কথা

বিবেচনা করেন। এই সব চাহিদা থেকেই তাঁদের কাছে কংক্রিট, প্ল্যাস্টিক ও কাচের মতো নূতন নূতন উপকরণ হাজির হয়। ফলে নূতন এক স্থাপত্যশৈলীর জন্ম হয়, — যাতে উৎকৃষ্ট জাতীয় ঐতিহ্যের স্বীকরণ ঘটে। ব্যাপারটা বিভিন্ন শৈলী ও ভঙ্গি থেকে সংগৃহীত সারবস্তুর সংযোগসাধন নয় (তার মধ্যে কোন রুচির পরিচয় নেই), — এ হল সর্বমানবগ্রাহ্য এবং জাতীয় স্থাপত্যশৈলীর সমন্বয়।

সুদৃঢ় আন্তর্জাতিক দিক থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে **জাতীয় ভাষাসমূহের বিকাশের মতো** জাতীয় সম্পর্কযুক্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করা হয়।

প্রতিটি জাতি নিজ নিজ ভাষা বিকাশের, তাকে জাতীয় সংস্কৃতির শক্তিমান হাতিয়ার রূপে সমৃদ্ধ করে তোলার সমস্ত রকম সুযোগ পেয়ে থাকে। সেই সঙ্গে ভ্রাতৃপ্রতিম জনগণের পরিবারে জাতিসমূহের পরস্পরের মধ্যে সংযোগরক্ষার উপায়ের জন্য বিশেষ চাহিদা থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়নে সেই উপায় হল রুশ ভাষা। এটা কেউ কোন ডিক্রি জারী করে প্রতিষ্ঠা করে নি। সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতিসকল পরস্পরের মধ্যে সংযোগরক্ষার উপায় হিশেবে স্বেচ্ছায় রুশ ভাষা গ্রহণ করেছে। আর এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিকও বটে, কারণ রুশ ভাষা — সোভিয়েত ইউনিয়নে বসবাসকারী বৃহত্তম জাতির ভাষা (দেশের সমগ্র জনসংখ্যার অর্ধেক — রুশী)। রুশ ভাষা যেমন তার নিজস্ব সাহিত্যে, তেমনি অনুবাদসাহিত্যে সমৃদ্ধতম। সোভিয়েত জনগণ যে-কোন জাতির অন্তর্ভুক্তই হোক না কেন, তারা রুশ ভাষাকে ভালোবাসে এই কারণে যে এ ভাষা লেনিন ও চের্নিশেভ্স্কির, তলস্তয় ও চেখভের, পুশকিন ও গোগলের, গোর্কি ও মায়াকোভ্স্কির ভাষা।

এটা স্পষ্ট যে ভবিষ্যতেও সোভিয়েত জনগণ আগ্রহের সঙ্গে রুশ ভাষা অধ্যয়ন করবে, জাতিসমূহের মধ্যে সংযোগসাধনের উদ্দেশ্যে তার ব্যাপক ব্যবহার করবে। তবে এই প্রগতিশীল প্রবণতা কোন ক্রমেই অন্যান্য জাতীয় ভাষার ভবিষ্যৎ বিকাশ ও সমৃদ্ধিকে রুদ্ধ করে না। মাতৃভাষার সঙ্গে সঙ্গে রুশ ভাষা পাঠের গুরুত্ব প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচিতে সমস্ত রকম জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে 'যে-কোন ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন রকম বিশেষ সুবিধা, সীমাবদ্ধতা বা বাধ্যবাধকতা' আরোপ করা চলবে না।

বিশ্বব্যাপী কমিউনিজমের বিজয়ের পর জাতীয় পার্থক্য ধীরে ধীরে মুছে যাবে, একই সর্বজনীন ভাষা ও একই সর্বজনীন সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা হবে, — যে সংস্কৃতির মধ্যে জাতীয় সংস্কৃতির সমস্ত সম্পদ আত্মীকৃত হবে। তবে, এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত দীর্ঘ, এবং এখন মোটামুটিভাবেও তার সময় নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

২৯ ॥ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র

প্রতিটি সোভিয়েত মানুষের গর্ব এই যে সে বিশ্বের প্রথম **শ্রমজীবী মানুষের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের** প্রবল শক্তির একটি কণিকা, তার পূর্ণ অধিকারভোগী নাগরিক।

রাষ্ট্রের কর্তব্য ও কার্যপ্রণালী

সোভিয়েত রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের মূল গতিপ্রকৃতি এবং তার কার্যপ্রণালীই বা কী? নূতন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আবির্ভাব মুহূর্ত থেকেই তার সামনে যে সমস্যা দেখা

দিল তা হল শ্রমিক শ্রেণীর শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠা এবং শোষণকারীদের প্রতিরোধ দমন। তবে, শোষক শ্রেণীর উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের দমনেরও আর কোন প্রশ্ন রইল না।

অন্য যে-কোন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মতো সোভিয়েত রাষ্ট্রেরও প্রধান কার্যপ্রণালী নির্ধারণ করছে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম গঠনের সৃজনশীল উদ্দেশ্যসমূহ।

সর্বাগ্রে — **অর্থনৈতিক-সংগঠনমূলক কার্যপ্রণালী।** সোভিয়েত রাষ্ট্র — উৎপাদনের মূল উপায়ের যৌথ মালিক। সোভিয়েত রাষ্ট্র জাতীয় অর্থনীতির সকল শাখার নিয়মিত বিকাশ সুবিন্যস্ত করে, জনসাধারণের শ্রম সঙ্ঘবদ্ধ করে এবং তাদের সচ্ছলতাবৃদ্ধির জন্য যত্ন নেয়। সমাজে যতক্ষণ পর্যন্ত শ্রম অনুযায়ী বণ্টনের নীতি প্রচলিত আছে, ততক্ষণ রাষ্ট্র শ্রমের পরিমাণ ও উপযোগের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে, সমগ্র সামাজিক সম্পদের যথাযথ হিসাব রাখে এবং তস্কর ও লুঠেরাদের হাত থেকে সামাজিক সম্পত্তি রক্ষা করে।

অর্থনৈতিক-সংগঠনমূলক কার্যপ্রণালীর সঙ্গে **সাংস্কৃতিক-শিক্ষামূলক কার্যপ্রণালীর** যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সোভিয়েত রাষ্ট্র গণশিক্ষা পরিচালনা করে, বৈজ্ঞানিক সংস্থাসমূহের ক্রিয়াকলাপ সংগঠন করে এবং থিয়েটার, মিউজিয়ম, ফিল্ম-স্টুডিও, প্রকাশালয় ইত্যাদি তার পরিচালনায় থাকে। জনগণের মনের চাহিদা মেটানোর আয়োজন করে রাষ্ট্র সেই সঙ্গে শ্রমজীবীদের কমিউনিস্ট শিক্ষায় শিক্ষিত করার বিশাল কর্ম চালিয়ে যায়।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজ — **সামাজিক শৃঙ্খলা এবং নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা।**

অভ্যন্তরীণ কার্যপ্রণালীর পাশাপাশি সোভিয়েত রাষ্ট্রের পর পর অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য বাহ্যিক ক্রিয়াও আছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিস্ট গঠনকর্মে সর্বাধিক অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি গড়ে ওঠার সমস্যা এবং বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের প্রতি আমাদের আন্তর্জাতিক দায়িত্ব সেগুলি নির্ধারণ করে।

যতক্ষণ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে সামরিক আক্রমণের আশঙ্কা আছে, ততক্ষণ **দেশের প্রতিরক্ষা** এবং **সমাজতান্ত্রিক সহযোগিতার অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির যৌথ প্রতিরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ** সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রধান কাজ। গুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপের মধ্যে আছে **বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাসম্পন্ন অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভ্রাতৃপ্রতিম সহযোগিতা স্থাপন, জনগণের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সমর্থন এবং সকল দেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের বিকাশ। সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এবং বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থাসম্পন্ন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি কায়েম করার উদ্দেশ্যে** সোভিয়েত রাষ্ট্র সক্রিয় সংগ্রাম পরিচালনা করছে।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কার্যকলাপ লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এ রাষ্ট্র এমন এক রাজনৈতিক সংস্থা যা জনগণের পক্ষ নিয়ে, জনগণের স্বার্থে এবং তাদের সরাসরি অংশগ্রহণে কাজ করে। তার অর্থ এই যে সোভিয়েত রাষ্ট্র — সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রী রাষ্ট্র।

সমাজতন্ত্র 'গণতন্ত্র' ধারণায় তার সত্যিকারের অর্থ ফিরিয়ে আনে, রাষ্ট্রকে যথার্থ জনগণের শাসনের হাতিয়ার করে তোলে। এর অর্থ অবশ্যই এমন নয় যে সমাজতান্ত্রিক

গণতন্ত্র প্রস্তুত এবং **সম্পন্ন** র‍ূপেই জন্ম নেয়। **সমাজের** বিকাশ এবং **সমৃদ্ধি**, জনগণের শিক্ষাপ্রবণতা, রাজনীতি চর্চা, তৎপরতা ও উদ্যোগের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনগণের শাসনপদ্ধতি বিকশিত হতে থাকে, তার উৎকর্ষ সাধিত হতে থাকে।

সোভিয়েত রাষ্ট্রের বনিয়াদ, **সমাজতান্ত্রিক** গণতান্ত্রিকতার সবচেয়ে গ‍ুর‍ুত্বপ‍ূর্ণ ভিত্তি — 'সোভিয়েতসম‍ূহ' — **শ্রমজীবী** জনগণের **শাসনসংস্থাসম‍ূহ**।

মেহনতী জনগণের প্রতিনিধি-সোভিয়েতসম‍ূহ

সোভিয়েত ইউনিয়নে **সমস্ত** শাসনক্ষমতার অধিকারী মেহনতী জনসাধারণ: তাদের প্রতিনিধিসভা — **মেহনতী জনগণের প্রতিনিধি-সোভিয়েতসম‍ূহ**। এগ‍ুলি প্রতিটি শহরে, শ্রমিক বসতিতে, গ্রামে, ক্ষ‍ুদ্র ও বৃহৎ জনবসতি অঞ্চলে, প্রতিটি প্রদেশে, জেলায় ও প্রজাতন্ত্রে আছে। সোভিয়েতগ‍ুলি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক বনিয়াদ; অন্য সব রাষ্ট্রসংস্থা সোভিয়েতগ‍ুলি থেকে উদ্ভূত, সোভিয়েতগ‍ুলি তাদের ক্ষমতা দেয় এবং নিয়ন্ত্রণ করে।

সোভিয়েতগ‍ুলিতে জনগণের স্বার্থের প‍ূর্ণ প্রতিনিধিত্ব স‍ুনিশ্চিত করে গণতান্ত্রিক **নির্বাচনপদ্ধতি**।

নির্বাচনপদ্ধতিতে গণতান্ত্রিকতার চাক্ষ‍ুষ নিদর্শন — **নির্বাচনের সর্বজনীন চরিত্র**। নারী-প‍ুর‍ুষ নির্বিশেষে ১৮ বছর বয়ঃপ্রাপ্ত যে-কোন নাগরিক তার সামাজিক উদ্ভব, জাতীয় অন্তর্ভুক্তি, শিক্ষা, ধর্মবিশ্বাস, বাসস্থান, বৈষয়িক অবস্থা এবং বিগত কার্যকলাপ নির্বিশেষে নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার রাখে। ব্যতিক্রম — মস্তিষ্ক-বিকৃতি।

১৮ বছর বয়ঃপ্রাপ্তদের স্থানীয় মেহনতী জনগণের প্রতিনিধি-সোভিয়েতে নির্বাচিত হওয়ার অধিকার আছে, ২১ বছর বয়ঃপ্রাপ্তদের — অঙ্গপ্রজাতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েতে এবং ২৩ বছর বয়ঃপ্রাপ্তদের সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতে নির্বাচিত হওয়ার অধিকার আছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের লোকেরা অল্প বয়স থেকেই রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে **নির্বাচনের অধিকার — সমান ও সরাসরি।** প্রতিটি নাগরিক একই ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। প্রত্যেকে মাত্র একটি ভোট দিতে পারে। কী স্থানীয় সোভিয়েতে, কী সর্বোচ্চ সোভিয়েতে — সর্বত্রই প্রতিনিধিনির্বাচন সরাসরি ও প্রত্যক্ষ।

কেউই ভোটদাতার স্বাধীন ইচ্ছাকে প্রভাবিত করতে পারে না: সোভিয়েত ইউনিয়নে নির্বাচন হয় **গোপন ব্যালটপদ্ধতিতে।**

নির্বাচনে ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায়সংস্থা, কমসমোল এবং সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য মেহনতী সমিতির সঙ্গে যুক্ত পার্টিবহির্ভূত ব্যক্তিদের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি ঘনিষ্ঠ ঐক্যবন্ধনে কাজ করে। জনগণ প্রার্থী দাঁড় করায়। ব্যাপক জনসমাজ নির্বাচনী প্রচারকার্যও নিয়ন্ত্রণ করে; এই সব প্রচারসংস্থায় ভারপ্রাপ্ত এজেণ্ট, নির্বাচন কমিশনের সদস্য ও প্রচারকসমেত ২ কোটি ৫০ লক্ষেরও অধিক ব্যক্তি অংশগ্রহণ করে।

সোভিয়েতের প্রতিনিধিরা পেশাদার রাজনীতিক নন, — এ'দের অধিকাংশই কলকারখানায়, যৌথখামারে, বিভিন্ন ইনস্টিটিউট ও বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে কাজ করেন। তাঁদের

নিয়মিতভাবে সোভিয়েতের কাছে এবং সরাসরি জনসাধারণের কাছে কার্যবিবরণী পেশ করতে হয়। প্রতিনিধিদের উপর ভোটদাতাদের নিয়ন্ত্রণ অটুট এবং কাজে গাফিলতি অথবা অসঙ্গত আচরণের ক্ষেত্রে সোভিয়েতের সভ্যমণ্ডলী থেকে তাঁদের অপসারণ করা যায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় শাসনসংস্থা — **সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত**। উক্ত সোভিয়েত গোপন ব্যালটপদ্ধতিতে, সাধারণ, সমান ও সরাসরি নির্বাচনের ভিত্তিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকবৃন্দকর্তৃক চার বছরের জন্য নির্বাচিত হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত শাসন বিষয়ে জনগণের সমস্ত রকম ক্ষমতার পূর্ণ অধিকার পায় এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিষয়ক নীতিসংক্রান্ত সর্বসাধারণ ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বিবেচনা ও সমাধান করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত জাতীয় অর্থনীতির পরিকল্পনা ও বাজেট অনুমোদন করে; সকল নাগরিক ও সংস্থাসমূহের পক্ষে বাধ্যতামূলক কেন্দ্রীয় আইন প্রচলন করে; সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান প্রবর্তন করে এবং প্রয়োজন অনুসারে তার পরিবর্তন সাধন করে, সংবিধান অনুসরণের দিকে লক্ষ্য রাখে; সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকার গঠন করে ও তার গঠনপ্রণালী পরিবর্তন করে; সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত নির্বাচন করে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের

সাধারণ অভিশংসক নিয়োগ করে; আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্ব করে এবং আন্তঃপার্লামেন্ট সংযোগ স্থাপন করে, বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিসকল অনুমোদন করে এবং রাষ্ট্রসংস্থা ও ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কার্যকলাপের উপর সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণ সম্পন্ন করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের প্রতিনিধিরা — শ্রমিক শ্রেণী, যৌথখামারের কৃষক ও মেহনতী বুদ্ধিজীবীসম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। তাঁদের অর্ধেকেরও বেশি সরাসরি উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক ও যৌথখামারী। সর্বোচ্চ সোভিয়েতের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধি — নারী। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত তার গঠনের দিক থেকে যে-কোন বুর্জোয়া পার্লামেণ্টের তুলনায় নবীন।

জারের রাশিয়ার চতুর্থ রাষ্ট্রীয় দুমার (১৯১২ সনের নির্বাচনে) গঠনব্যবস্থার সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের প্রতিনিধি গঠনব্যবস্থার তুলনা করা যাক। দুমাতে ৪৪২ জন প্রতিনিধির মধ্যে ৩৫৪ জনই ছিল ভূস্বামী, শহুরে বুর্জোয়া, ব্যবসায়ী ও কুলাক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। আধুনিক বুর্জোয়া পার্লামেণ্টগুলো ঠিক তেমনিভাবেই প্রধানত শিল্পপতি, ব্যাঙ্কার, বৃহৎ আমলাসম্প্রদায় এবং একচেটিয়া সংস্থাসমূহের প্রশাসক ও আইনজীবীদের নিয়ে গঠিত। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে একজনও শ্রমিক বা ক্ষুদ্র কৃষিখামারজীবী নেই, জার্মান ফেডেরাল প্রজাতন্ত্রের পার্লামেণ্টে — একজনও শ্রমিক প্রতিনিধি নেই। পুঁজিবাদী দেশগুলির পার্লামেণ্টে নারীপ্রতিনিধিত্বও নগণ্য।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের দুটি কক্ষ: জাতিনির্বিশেষে সমস্ত নাগরিকের সাধারণ স্বার্থের প্রতিনিধিত্বমূলক ইউনিয়ন কক্ষ এবং সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নে ঐক্যবদ্ধ অসংখ্য

জাতি ও জাতিসত্তার বিশেষ বিশেষ চাহিদা ও স্বার্থের পরিপোষক জাতিসমূহের কক্ষ। এই কারণে কক্ষসমূহের গঠননীতি বিভিন্ন ধরনের। 'ইউনিয়ন কক্ষে' প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় নির্দিষ্ট জনসংখ্যার ভিত্তিতে (প্রতি ৩ লক্ষে এক জন)। জাতিসমূহের কক্ষে নির্বাচনের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা হিসাব করা হয় না: প্রতিটি অঙ্গপ্রজাতন্ত্র নির্বাচন করে ৩২ জন প্রতিনিধি, স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র —১১ জন, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল —৫ জন এবং জাতীয় এলাকা — ১ জন। উভয় কক্ষে প্রতিনিধিসংখ্যা প্রায় সমান সমান: 'ইউনিয়ন কক্ষে' — ৭৬৭ জন এবং জাতিসমূহের কক্ষে — ৭৫০ জন।

উভয় কক্ষের অধিকার সমান। আইন প্রণয়নের ব্যাপারে উভয়েরই অধিকার সমান। উভয় কক্ষ কর্তৃক গৃহীত হলে আইন অনুমোদিত বলে গ্রাহ্য হয়। প্রতিটি কক্ষ রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গঠনকর্মসংক্রান্ত মূল বিষয়ের পরিচালনা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের ক্রিয়াকলাপের পৃথক পৃথক সমস্যার উপরে স্থায়ী কমিশন গঠন করে। কমিশনগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতে বিবেচনার জন্য প্রশ্নাদি প্রস্তুত করে, তার গৃহীত আইন ও নির্দেশসকল পালনের ব্যাপারে লক্ষ্য রাখে।

অনুরূপভাবে, যুবসমাজসংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিশনগুলি সর্বোচ্চ সোভিয়েতের বিবেচনাধীন তরুণ-তরুণীদের শিক্ষাদীক্ষা, বৃত্তিশিক্ষা, শ্রম, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও অবসরযাপনসংক্রান্ত প্রশ্নসমূহের সর্বাঙ্গীণ প্রাথমিক প্রস্তুতি নিয়ে থাকে। উক্ত কমিশনগুলি উঠতি পুরুষের শিক্ষায় নিযুক্ত কমসমোল, যুবসমাজ এবং পার্টি ও সোভিয়েত সংস্থা ও সংগঠনসমূহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত নিয়মিতভাবে বৈঠকে মিলিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধান করে। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শাসনসংক্রান্ত স্থায়ী চলতি কাজের জন্য উভয় কক্ষ প্রতিবার প্রথম অধিবেশনের যুক্ত বৈঠকে **সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী** নির্বাচন করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী সভাপতি, অঙ্গপ্রজাতন্ত্রসমূহের সংখ্যা অনুযায়ী সহ সভাপতি এবং সভাপতিমণ্ডলীর সম্পাদক ও সদস্য নিয়ে গঠিত। সর্বোচ্চ সোভিয়েতের অংশ হিশেবে এবং অধিবেশনসমূহের অন্তর্বর্তীকালে সর্বোচ্চ সোভিয়েতের কিছু কিছু কর্তব্য সম্পাদন ক'রে সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী সোভিয়েত রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শাসনসংস্থারও কাজ করে। সভাপতিমণ্ডলীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশসমূহ সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সাধারণ অধিবেশনের অনুমোদনসাপেক্ষ।

সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ

সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকার — **সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ** সর্বোচ্চ সোভিয়েতের ইউনিয়ন কক্ষ এবং জাতিসমূহের কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে গঠিত হয়। রাষ্ট্রের সামগ্রিক স্বার্থসংক্রান্ত সকল প্রশ্নের সমাধানে অঙ্গপ্রজাতন্ত্রসমূহের প্রতিনিধিত্ব যাতে থাকে সে জন্য অঙ্গপ্রজাতন্ত্রগুলির মন্ত্রিপরিষদের সভাপতিরা এর অন্তর্ভুক্ত। মন্ত্রিপরিষদ সর্বোচ্চ সোভিয়েতের কাছে দায়ী থাকে, আর

অধিবেশনের অন্তর্বর্তীকালে — সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর কাছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ — সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় শাসনক্ষমতার সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহী ও ব্যবস্থাপক সংস্থা।

মন্ত্রিপরিষদ অর্থনীতি ও সংস্কৃতির বিকাশ পরিচালনা করে, রাষ্ট্রীয় বাজেটের রূপায়ণ সংগঠন করে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত গৃহীত আইন-কানুনের বাস্তবে প্রয়োগ ঘটায়, সামাজিক শৃঙ্খলা সুনিশ্চিত করে এবং রাষ্ট্রের স্বার্থ ও নাগরিকের অধিকার রক্ষা করে। বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্কের সাধারণ পরিচালনা উক্ত পরিষদের হাতে। মন্ত্রিপরিষদ দেশের সামরিক শক্তি গঠন করে এবং তা পরিচালনা করে। মন্ত্রিপরিষদ অনুশাসন এবং নির্দেশরূপে তার সিদ্ধান্তসমূহ বিধিবদ্ধ করে। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উপর সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের যুক্ত অনুশাসন সমস্ত রাষ্ট্রীয় ও পার্টির সংস্থার পক্ষে অবশ্যপ্রয়োজনীয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ জাতীয় অর্থনীতি ও সংস্কৃতির পৃথক পৃথক শাখার উপর কর্তৃত্বকারী মন্ত্রণালয়, ভারপ্রাপ্ত দফতর ও সংস্থার কাজ সংঘবদ্ধ করে ও তার পথ নির্দেশ করে।

প্রজাতন্ত্রসমূহের এবং বিভিন্ন স্থানীয় শাসন ও পরিচালনসংস্থা

অঙ্গপ্রজাতন্ত্রে সর্বোচ্চ শাসনসংস্থা — তার সর্বোচ্চ সোভিয়েত। এই সংস্থা প্রজাতন্ত্রের সীমানার মধ্যে প্রযুক্ত আইনের প্রবর্তন করে, প্রজাতন্ত্রের বাজেট ইত্যাদি অনুমোদন করে। গঠনের দিক থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের থেকে অঙ্গপ্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের পার্থক্য এই যে তা এক কক্ষবিশিষ্ট। অঙ্গপ্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েত নিজ নিজ সভাপতিমণ্ডলী নির্বাচন করে, যার অধিকারের সীমা প্রজাতন্ত্রের সংবিধানে নির্দিষ্ট আছে। অঙ্গপ্রজাতন্ত্রগুলিতে সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহী ও ব্যবস্থাপক সংস্থা — অঙ্গপ্রজাতন্ত্রের মন্ত্রিপরিষদ।

স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় শাসনক্ষমতার সর্বোচ্চ সংস্থা — স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েত; উক্ত শাসনসংস্থা সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী নির্বাচন করে, মন্ত্রিপরিষদ গঠন করে এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালত নির্বাচন করে।

রাষ্ট্রীয় শাসনক্ষমতার সংস্থাসমূহের মধ্যে স্থানীয় সোভিয়েত গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। প্রাদেশিক, জেলা, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল, এলাকা, মহকুমা, শহর, গ্রাম ও মহল্লা মেহনতী জনগণের প্রতিনিধি-সোভিয়েতগুলি দু'বছরের জন্য নির্বাচিত হয়ে থাকে। মেহনতী জনগণের প্রতিনিধি-সোভিয়েতগুলি সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নির্মাণকর্ম — তাদের পরিচালনাধীন শিল্পপ্রতিষ্ঠান, দপ্তর ও সংস্থাসমূহ পরিচালনা করে, স্থানীয় বাজেট ধার্য করে, তাদের অধীনস্থ বিভিন্ন শাসনসংস্থার কার্যকলাপ পরিচালনা

করে, সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষায়, আইনের যথাযথ অনুসরণে এবং নাগরিক অধিকার রক্ষায় সহায়তা করে। স্থানীয় সোভিয়েতগুলির গুরুত্বপূর্ণ কাজ — জনসাধারণের পরিবেশন ব্যবস্থার উন্নতির তত্ত্বাবধান।

কার্যনির্বাহী ও ব্যবস্থাপক সংস্থা — কার্যনির্বাহী কমিটি স্থানীয় সোভিয়েত নির্বাচন করে। অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ব্যাপারে দৈনন্দিন পরিচালনাকার্যের জন্য সোভিয়েতগুলি সচরাচর অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নির্মাণকর্মের বিভিন্ন শাখাসাংক্রান্ত পরিকল্পনা কমিশন ও বিভাগ গঠন করে। মেহনতী জনগণের প্রতিনিধি-সোভিয়েতগুলির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে ব্যাপক জনসাধারণ স্থায়ী ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়ে থাকে।

সোভিয়েতসমূহের কার্যকলাপের সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষসাধন ও সর্বাধিক গণতন্ত্রীকরণে পার্টি সচেষ্ট। অর্থনৈতিক, আর্থিক, ভূমিসংক্রান্ত ও অন্যান্য প্রশ্নের সমাধানে এবং স্থানীয় শিল্পোদ্যোগ ও জনসাধারণের দৈনন্দিন ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক কৃত্যকের পরিচালনাব্যাপারে সোভিয়েতগুলিকে বিস্তৃত স্বাধীনতা দেওয়া হয়। স্থায়ী কমিশনসমূহের ক্রিয়াকলাপে তৎপরতা সঞ্চারিত হয় এবং ভোটদাতাদের সামনে প্রতিনিধিদের নিয়মিত বিবরণী রাখার বন্দোবস্ত করা হয়। ১৯৭২ সনে প্রতিনিধিদের পদমর্যাদাসংক্রান্ত যে নূতন আইন গৃহীত হয়েছে তাতে গণপ্রতিনিধি হিশেবে তাঁদের ভূমিকা উন্নীত হয়েছে, তাঁদের ক্ষমতা বিস্তৃত হয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে তাঁদের আরও সক্রিয় করে তুলতে সাহায্য করেছে।

বিচারালয় ও অভিশংসক দফতর

সোভিয়েত আইন যথাযথ অনুসরণের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং সামাজিক শৃঙ্খলা, নাগরিক অধিকার ও স্বার্থরক্ষা রাষ্ট্রের সকল সংস্থার কর্তব্য। তবে এমন কিছু সংস্থা আছে

যেগুলি বিশেষভাবে এই সব সমস্যা নিয়ে ব্যাপৃত থাকে। **বিচারালয় ও অভিশংসক দফতর** — এই ধরনের সংস্থা।

সোভিয়েত বিচারালয় গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে স্থাপিত। বিচারব্যবস্থার প্রধান সংযোগ — **আঞ্চলিক (নাগরিক) জনবিচারালয়।** প্রতিটি অঞ্চলে ও শহরে তা আছে। জন আদালতের বিচারকেরা পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন সাধারণ, সমান ও সরাসরি ভোটাধিকারের ভিত্তিতে, গোপন ব্যালটে। বিচারকেরা ভোটদাতাদের অধীন এবং তাদের অপসারণ করা যায়। বৃত্তিগত বিচারকদের সঙ্গে বিচারালয়ের কাজে সামাজিক ভিত্তিতে জননির্ধারকরা অংশগ্রহণ করে থাকেন। তাঁরা সাধারণ জনসভায় প্রকাশ্য ভোটে দু'বছরের মেয়াদে নির্বাচিত হন। সমস্ত দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমা বিচারকমণ্ডলী সম্মিলিতভাবে নিষ্পন্ন করেন।

সোভিয়েতগুলির অনুরূপ এলাকা বিচারালয়, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের বিচারালয়, প্রাদেশিক ও জেলার বিচারালয় এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র ও অঙ্গপ্রজাতন্ত্রের বিচারালয় পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়। দেশের সর্বোচ্চ বিচারসংস্থা — সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ বিচারালয় সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতকর্তৃক পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়।

বিচারকেরা স্বাধীন, — তাঁরা একমাত্র আইনের অধীন। মামলার কার্যপরিচালনা বিভিন্ন অঙ্গপ্রজাতন্ত্র এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের ভাষায় হয়ে থাকে। মামলায় অংশগ্রহণকারীরা মাতৃভাষায় বক্তব্য রাখতে পারে। আইনে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া প্রকাশ্য বিচারের ব্যবস্থা বিচারের সর্বসমক্ষ চিত্র ও

নিরপেক্ষতার প্রমাণ দেয়। অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার আছে।

বিচারালয়েরই অনুরূপ সমস্যা, অন্য পদ্ধতিতে সমাধান করে আইন-কানুন যথাযথ অনুসরণের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য নিযুক্ত বিশেষ সংস্থা — অভিশংসক দফতর। অভিশংসক দফতর ফৌজদারী মোকদ্দমা উত্থাপন ও তদন্ত করে, অপরাধী ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে তথ্য প্রমাণাদি সংগ্রহ করে এবং তদন্তকারী সংস্থাসমূহের কার্যকলাপের আইনানুগতার প্রতি লক্ষ্য রাখে। বিচারালয় অভিশংসক দফতর প্রেরিত মোকদ্দমার বিচার করে এবং বিচারালয়ে অভিশংসক রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অভিযোক্তা হিশেবে কাজ করেন।

স্থানীয় পার্থক্য নির্বিশেষে এবং আঞ্চলিক কোন রকম প্রভাবের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব না দেখিয়ে অভিশংসক দফতর আইনের সমগ্র দেশব্যাপী যথার্থ এক অর্থ নির্ণয়ের দিকে লক্ষ্য রাখে।

সাধারণ রাষ্ট্রীয় পর্যবেক্ষণ থেকে অভিশংসকের পর্যবেক্ষণের প্রভেদ আছে। রাষ্ট্রসংস্থাসমূহ পর্যবেক্ষণ এবং বিভাগীয় অনুসন্ধান কালে নিয়ন্ত্রণযোগ্য সংগঠনগুলির চালু ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপে হস্তক্ষেপের অধিকার রাখে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ও প্রশাসনসংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

আইনলঙ্ঘনের ক্ষেত্রে অভিশংসক দফতর প্রচলিত বিধিবলে স্থানীয় সোভিয়েতের অথবা বিভাগসমূহের কার্যনির্বাহী ও প্রশাসনসংস্থাগুলির কার্যবিধির বিরুদ্ধে আপীলের অধিকার রাখে এবং সেই অধিকার প্রয়োগে বাধ্য; অভিশংসক দফতর বাস্তব পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে সরকারী ব্যক্তি ও নাগরিকদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী, শাস্তিমূলক অথবা প্রশাসনসংক্রান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে।

অভিশংসক দফতর সোভিয়েত নাগরিকের ব্যক্তিত্বের অলঙ্ঘনীয়তা রক্ষা করে। বিচারালয়ের নির্দেশ অথবা অভিশংসক দফতরের অনুমোদন ছাড়া সোভিয়েত সমাজে একজন মানুষকেও গ্রেফতার করা যায় না।

সোভিয়েত অভিশংসকসংস্থাগুলি হল শাসনের স্থানীয় সংস্থা ও পরিচালনা থেকে স্বতন্ত্র এক অখণ্ড দৃঢ় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা। অভিশংসক দফতরের পরিচালক সোভিয়েত ইউনিয়নের মুখ্য অভিশংসক সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত কর্তৃক সাত বছরের জন্য নির্বাচিত হন। সোভিয়েত ইউনিয়নের মুখ্য অভিশংসক প্রজাতন্ত্রসমূহের, প্রদেশ ও জেলাসমূহের অভিশংসক নিয়োগ করেন। এলাকা, মহকুমা ও নগরসমূহের অভিশংসক নিয়োগ করেন অঙ্গপ্রজাতন্ত্রসমূহের অভিশংসকগণ এবং উক্ত নিয়োগ সোভিয়েত ইউনিয়নের মুখ্য অভিশংসকের অনুমোদনসাপেক্ষ। নিম্নপদস্থ অভিশংসক দফতর উচ্চপদস্থের অধীন।

৩০ ॥ সোভিয়েত অধিকারবিধি

সমাজতান্ত্রিক বৈধতা

সোভিয়েত আইন সমগ্র জনগণের ইচ্ছার অভিব্যক্তি। তা সামাজিক সম্পর্কসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সংরক্ষণ করে, নাগরিক ও সরকারী ব্যক্তিদের অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করে এবং জনসাধারণের সামাজিক ও নিজস্ব সম্পত্তি রক্ষা করে।

সমস্ত আইনের প্রণালী হিশেবে আছে **সমাজতান্ত্রিক অধিকার,** যার আবার কতকগুলি শাখা আছে।

দৈনন্দিন জীবনে **নাগরিক অধিকারের** এক বিশাল ভূমিকা আছে।

সমাজতান্ত্রিক শিল্পোদ্যোগ ও সংগঠনগুলির মধ্যে সম্পর্ক নিয়মনের ক্ষেত্রে নাগরিক অধিকারের এক বিশেষ তাৎপর্য আছে। আইন উদ্যোগসমূহের অর্থনৈতিক অধিকারসমূহ নির্দেশ করে এবং সরবরাহ, প্রস্তুত পণ্যদ্রব্যের বিক্রয়, পরিবহণ ইত্যাদির জন্য ব্যবস্থা নির্ধারণ করে।

নাগরিক অধিকার সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পকর্মের রচয়িতাদের, উৎকর্ষসাধনকারী ও উদ্ভাবকদের অধিকার রক্ষা করে। নাগরিক অধিকারবিধির এই অংশের নামকরণ হয়েছে **রচয়িতা ও উদ্ভাবকদের অধিকার**। আবিষ্কারক স্রষ্টা হিশেবে তাঁর স্বীকৃতি ও অগ্রাধিকারের, অর্থাৎ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে তাঁর অগ্রগণ্যতার দাবি জানাতে পারেন। আবিষ্কারের উপর অধিকারের স্বীকৃতিস্বরূপ যে অভিজ্ঞানপত্র দেওয়া হয় তদনুযায়ী তাঁকে উপযুক্ত পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। এসবই উদ্ভাবন ও উৎকর্ষসাধনজাতীয় আবিষ্কারসংক্রান্ত বিশেষ আইনের দ্বারা নির্ধারিত।

পারিবারিক-দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্র নিয়মন করে **পারিবারিক অধিকার**। আইন অনুযায়ী বিবাহের অবশ্য রেজেস্ট্রিকরণের উদ্দেশ্য হল পরিবারের সঙ্গে গভীর সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা। যাতে পারিবারিক জীবনের একেবারে গোড়া থেকে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক পারস্পরিক ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা এবং সাধারণ নৈতিক আদর্শের দৃঢ় ভিত্তিতে গড়ে উঠতে পারে সে ব্যাপারে সমাজের আগ্রহ জন্মগত। আইন বিবাহিত দম্পতির পদবী নির্বাচনে, বৃত্তি, কাজ ও বাসস্থান নির্বাচনে সমান অধিকার, পারস্পরিক বৈষয়িক সহায়তা এবং একত্রে বসবাসের দরুন সাধারণ সম্পত্তির উপর সমান

স্বত্বের কথা বিবেচনা করে। মাতা-পিতা হওয়ার পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক দায়িত্ব — সন্তানের লালন-পালন ও শিক্ষা। মাতা ও শিশুর স্বার্থ রাষ্ট্র সংরক্ষণ করে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মাতা-পিতার দায়িত্ব পালনে শৈথিল্যের দন্ড আছে। বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানরাও অক্ষম মাতা-পিতার যত্ন নিতে এবং তাদের বৈষয়িক সাহায্য দিতে বাধ্য।

এখনও বাস্তবে সমাজতান্ত্রিক আইনব্যবস্থা লঙ্ঘনের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়। এগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামের উদ্দেশ্যে আইন অবশ্যপালনীয় আচরণবিধি প্রবর্তন করে, কোন কোন কাজ অপরাধমূলক তা নির্ধারণ করে এবং সেই অনুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থা প্রচলন করে। এই আইনের নাম **ফৌজদারী দণ্ডবিধি**। সোভিয়েত আইন ১৬ বছর বয়স থেকে যে-কোন অপরাধমূলক কাজের জন্য ফৌজদারী দণ্ডবিধি প্রয়োগ করে, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে — ১৪ বছর বয়স থেকে। চৌর্য, চাকুরিক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অপব্যবহার এবং পদাধিকারের সুযোগে বে-আইনী কাজ (যেমন, উৎকোচগ্রহণ), শারীরিক অঙ্গহানি ঘটানো, গুণ্ডামি, কুৎসা রটনা ও শিকার সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘনের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা আছে। গুলির আঘাতে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত কঠিনতম শাস্তিব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয় দেশদ্রোহী, গুপ্তচর ও অন্তর্ঘাতকদের ক্ষেত্রে এবং সামাজিক সম্পত্তির প্রতারণাকারী, জাল মুদ্রার কারবারী, বিদেশী মুদ্রার চোরাকারবারী, হত্যাকারী ও বলপ্রয়োগকারীর ক্ষেত্রে।

আইনের মূল উদ্দেশ্য — দৃঢ় ও ন্যায়সঙ্গত সামাজিক শৃঙ্খলার প্রবর্তন, জনসাধারণকে শিক্ষাদান এবং এমন এক সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলা যা সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বরদাস্ত করতে পারে না। সোভিয়েত আইনব্যবস্থার

উৎকর্ষসাধনে কমিউনিস্ট পার্টি দৃঢ় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি লক্ষ লক্ষ নাগরিকের অংশগ্রহণে বিস্তৃত আলাপ-আলোচনার পর সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত এবং অঙ্গপ্রজাতন্ত্রসমূহের সর্বোচ্চ সোভিয়েতসমূহ জনস্বাস্থ্যসংরক্ষণ, পারিবারিক সম্পর্কের দৃঢ়তাসাধন, শ্রম-সম্পর্কের ভবিষ্যৎ উৎকর্ষসাধন, প্রাকৃতিক পরিবেশসংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমিত ব্যবহার সম্পর্কে নূতন আইন গ্রহণ করেছে।

আইন নাগরিকদের রাষ্ট্র ও সমাজের স্বার্থ উপলব্ধি করতে শেখায় এবং সচেতনভাবে অধিকার পালনের দাবি জানায়, অর্থাৎ **অধিকারসম্পর্কিত জ্ঞান** শিক্ষা দেয়। আইনের আবেদন নিছক সমগ্র জনগণের উদ্দেশ্যে নয় — প্রতিটি ব্যক্তির উদ্দেশ্যে। প্রতিটি ব্যক্তিকে আইন অনুযায়ী কাজ করতে হবে, আইনের দাবির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হবে এবং কঠোরভাবে তা অনুসরণ করতে হবে। ঠিক এই কারণেই যাতে আইন-কানুন কঠোরতমভাবে অনুসৃত হয় তার জন্য কমসমোল যথাসাধ্য কাজ করে, তরুণ-তরুণীদের সামনে অধিকারসংক্রান্ত শিক্ষা খুলে ধরে। কমিউনিস্ট জীবনযাত্রার জন্য, নবজীবনের জন্য সংগ্রামে আইনের শক্তিরও যেমন ব্যবহার করতে হবে, তেমনি ব্যবহার করতে হবে সামাজিক মতামতের শক্তি এবং যৌথক্রিয়াবাদের প্রভাব।

সমাজতান্ত্রিক অধিকারবোধ নীতিবোধের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। পার্টি ও রাষ্ট্র নির্ধারিত নীতির অনুসরণ করায় সমাজতান্ত্রিক অধিকারবোধ একই সঙ্গে মানুষের আচরণের সঙ্গত অথবা অসঙ্গত, ন্যায়পরায়ণ অথবা ন্যায়বিরুদ্ধ রূপের নৈতিক মূল্যনির্ধারণও করতে পারে। অন্য দিকে সমাজতান্ত্রিক আইনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও সমাজতান্ত্রিক অধিকারবিধি রক্ষার সংগ্রামের মধ্যে ব্যাপক জনসাধারণকে টেনে

আনার ফলে অধিকার ও নীতিবোধের ঘনিষ্ঠ বন্ধন ঘটে। বিধিগত নিয়মনের নৈতিক ভিত্তি ক্রমে বৃহত্তর তাৎপর্য অর্জন করে এবং বিধিনিষেধলঙ্ঘনকে দুর্নীতিমূলক আচরণ হিশেবে মনে করা হয়।

সমগ্র সমাজতান্ত্রিক অধিকারবিধির উদ্দেশ্য ব্যক্তিত্বের স্বাধীন বিকাশের শর্ত গড়ে তোলা। এর সবচেয়ে সরাসরি প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় সোভিয়েত নাগরিকের অধিকার ও দায়িত্বের মধ্যে।

অধিকার ও দায়িত্বের সম্পর্ক

সোভিয়েত দেশের অধিকাংশ মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে সোভিয়েত শাসনক্ষমতার কালে। যে বিস্তৃত সামাজিক অধিকারের মধ্যে মানুষের সমগ্র জীবনব্যাপী তার প্রতি সমাজের তত্ত্বাবধানের পরিচয় পাওয়া যায়, সোভিয়েত জনগণ তা ভোগ করতে অভ্যস্ত।

খুদে সোভিয়েত নাগরিক সাত বছরে পড়লে বিদ্যালয়ের উন্মুক্ত দ্বার তাকে সাদর আহ্বান জানায়, আর সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পর লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণী মাধ্যমিক বিশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে তাদের শিক্ষা চালিয়ে যায়। সোভিয়েত নাগরিকদের **শিক্ষার অধিকার** আছে।

দেশের সমস্ত শিশু আজ শিক্ষা লাভ করছে, যেখানে বিপ্লবের আগে পর্যন্ত প্রায় চার-পঞ্চাংশ শিশুরই বিদ্যালয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ ছিল না। সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার দিকে উত্তরণ বাস্তবে পরিণত হচ্ছে। উচ্চ ও মাধ্যমিক বিশেষ শিক্ষার জন্য বিস্তৃত সুবিধার আয়োজন করা হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০ লক্ষের

কাছাকাছি চলে এসেছে। রাষ্ট্র শিক্ষার সমগ্র ব্যয়ভার বহন করে, শিক্ষার্থীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বৃত্তি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে, আর আবাসিক বিদ্যালয়গুলিতে ছেলেমেয়েরা কেবল রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে শিক্ষাই পায় না, — রাষ্ট্র তাদের ভরণপোষণও করে।

জ্ঞান অর্জন করে এবং বৃত্তি নির্বাচনান্তে প্রতিটি সোভিয়েত নাগরিক নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে শক্তি ও ক্ষমতার পরিচয় দানের সুযোগ পায়। ব্যক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অধিকার — **শ্রমের অধিকারের** গ্যারাণ্টি হল সংকট ও বেকারসমস্যাহীন সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। সোভিয়েত জনগণকে যে-কোন কাজ অথবা বৃত্তি নির্বাচনের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ সৃজনী কর্মের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, — যদি না তা সমাজের স্বার্থবিরোধী হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্রমজীবীরা সবেতন ছুটি ভোগ করে। স্বাস্থ্যনিবাস, বিশ্রামকেন্দ্র, অসংখ্য পর্যটনকেন্দ্র, স্টেডিয়াম ও ক্রীড়াক্ষেত্র, পার্ক ও ক্লাব তাদের হেফাজতে রয়েছে। অসুস্থ হয়ে পড়লে কর্মীরা সামাজিক বীমা তহবিল থেকে বৈষয়িক সাহায্য (মজুরির ১০০ শতাংশ পর্যন্ত) পায়, আর চিকিৎসাসংক্রান্ত যাবতীয় সাহায্য সে পায় বিনাব্যয়ে। সোভিয়েত ইউনিয়নে **বিশ্রাম ও চিকিৎসার সুযোগলাভের অধিকার** আছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিটি পরিবার ও প্রতিটি নাগরিকের যেমন সামাজিক তহবিলের হিসাব থেকে, তেমনি সমবায়ব্যবস্থায় অথবা ব্যক্তিগত নির্মাণ-ব্যয়ে আরামপ্রদ বাসগৃহ পাওয়ার অধিকার আছে।

যারাই ভালোভাবে কাজ করার পর বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হয়েছে, তারা পেন্সন পায়। সোভিয়েত ইউনিয়নে বার্ধক্যে

এবং অসুস্থ অবস্থায় **বৈষয়িক সাহায্যলাভের অধিকার** আছে। দেশের সচ্ছলতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পেন্সনের পরিমাণ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে।

সোভিয়েত গণতন্ত্র রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক-রাজনৈতিক ও অন্তর্জীবনের সর্বক্ষেত্রে **নারী ও পুরুষের সমান অধিকার** দিয়ে থাকে। সোভিয়েত নারীরা কমিউনিস্ট সমাজের সক্রিয় গঠনকারী। তাঁদের মধ্যে অনেকে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পদে অধিষ্ঠিতা, শিল্পোদ্যোগ, যৌথখামার ও রাষ্ট্রীয় খামারের কর্ণধার, বিজ্ঞানপ্রতিষ্ঠান ও বিদ্যালয়ের পরিচালিকা।

রাষ্ট্র ও সামাজিক সংগঠনসমূহ সোভিয়েত নাগরিকের সামাজিক অধিকার রক্ষা করে। জাতীয় অথবা বর্ণগত অন্তর্ভুক্তির অজুহাতে উক্ত অধিকার সংকোচনের প্রয়াস ফৌজদারি অপরাধ বলে গণ্য এবং আইন অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য। আইন ব্যক্তির অলঙ্ঘনীয়তার দিকে দৃষ্টি রাখে।

সামাজিক অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত জনগণ যে-সব বিস্তৃত **রাজনৈতিক অধিকার অথবা স্বাধীনতা** ভোগ করে, সেগুলি হল **বাক্‌স্বাধীনতা, প্রকাশের স্বাধীনতা, সংঘ, সভা-সমিতি ও শোভাযাত্রা সংগঠনের স্বাধীনতা**। রাজনৈতিক স্বাধীনতা কেবল যে আইনেই স্বীকৃত তা নয়, — বৈষয়িক উপকরণও তার জন্য জোগানো হয়: জনসাধারণ ও তাদের সংগঠনের সেবায় ছাপাখানা আছে, আছে যথেষ্ট পরিমাণে কাগজ, প্রকাশালয় ও সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় দফতর, রেডিও, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন। এক কথায় সমাজতন্ত্রের সমস্ত রকম সমাজপ্রণালীতে স্বাধীনতার গ্যারাণ্টি আছে। স্বাধীনভাবে নিজের মতামত প্রকাশের অধিকার প্রয়োগ

ক'রে সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকেরা ব্যাপকভাবে এবং কর্তৃত্বসহ গুরুত্বপূর্ণ পার্টি ও সরকারী বিল এবং অনুশাসনের বিচার করে এবং এমন সব মূল্যবান প্রস্তাব উত্থাপন করে, — যার বাস্তবায়নে নূতন জীবনের বিকাশ ও গঠন ত্বরান্বিত হয়।

রাজনৈতিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে কি কোন রকম সীমাবদ্ধতা আছে? আছে, — এবং তা অবশ্যম্ভাবী। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সোভিয়েত প্রেস কখনই তার পৃষ্ঠায় যুদ্ধ, বলপ্রয়োগ ও নৈতিক স্বেচ্ছাচারিতা প্রচারের স্থান দেয় না। সোভিয়েত ইউনিয়নে জাতীয় বৈরিতা ও মানববিদ্বেষের প্রচার নিষিদ্ধ। আর এটাই স্বাভাবিক: যা কিছু জনগণের পক্ষে ক্ষতিকর, সমাজতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকর — সে সবই নিষিদ্ধ।

অধিকারে সমতার অর্থ দায়িত্বেও সমতা। সমাজ এবং রাষ্ট্র তাদের নাগরিকদের কী ধরনের দায়িত্ব অর্পণ করে?

সর্বপ্রথম কর্তব্য — **পরিশ্রম করার কর্তব্য,** — বিশেষত সৎ ও বিবেকবান হয়ে, যেহেতু শ্রম যে-কোন সমাজ মজবুত করে, তাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।

সমাজ প্রতিটি নাগরিকের উপর সমৃদ্ধির বনিয়াদ — **সমাজতান্ত্রিক মালিকানা সংরক্ষণ ও প্রতিষ্ঠার** দায়িত্ব অর্পণ করে। এরই সঙ্গে কম দিয়ে বেশি আদায় করা যাদের উদ্দেশ্য সমাজ তাদের বিরুদ্ধে, এবং পরজীবিতা, চৌর্য, গুণ্ডামি ইত্যাদি তার সহ্যের বাইরে।

সোভিয়েত নাগরিক **রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন ও সামাজিক শৃঙ্খলার কঠোর অনুসরণে বাধ্য** এবং তাকে সমাজতান্ত্রিক সমাজবিধির দাবি অনুযায়ী আচরণ করতে হয়।

মাতৃভূমি রক্ষা সোভিয়েত জনসাধারণের পবিত্র দায়িত্ব। ১৮ বছর বয়ঃপ্রাপ্ত প্রতিটি সোভিয়েত তরুণ সোভিয়েত সেনাবাহিনীতে কাজ করতে বাধ্য।

ডাক্তারী অথবা অন্য কোন বিশেষ ধরনের শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরাও ১৯ বছর বয়ঃপ্রাপ্ত হলে স্বেচ্ছায় সামরিক কর্তব্য পালন করতে পারে।

১৯৬৭ সনের অক্টোবরে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত কর্তৃক সর্বজনীন সামরিক দায়িত্বসংক্রান্ত যে আইন গৃহীত হয় তাতে তরুণসম্প্রদায়ের জন্য প্রাথমিক সামরিক তালিমের ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হয়েছে। নির্দিষ্ট বয়ঃসীমার আগে এবং নির্দিষ্ট বয়ঃপ্রাপ্ত সকল তরুণকে নাগরিক প্রতিরক্ষাব্যবস্থাসমেত প্রয়োজনীয় প্রাথমিক সামরিক জ্ঞান অর্জন করতেই হবে। এরই সঙ্গে স্থলবাহিনী, বিমান ও নৌবাহিনীর সহায়ক স্বেচ্ছাসেবী সমিতির শিক্ষাসংস্থাগুলিতে এবং কারিগরি বৃত্তিশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ১৭ বছর বয়ঃপ্রাপ্ত তরুণসম্প্রদায়ের মধ্য থেকে স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনীর জন্য বিশেষজ্ঞের দল তৈরি করা হচ্ছে।

নাগরিকের অধিকার তার দায়িত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। দায়িত্ব ছাড়া অধিকার নেই, এবং অধিকার ছাড়া দায়িত্বও নেই। এগুলির বিষয়বস্তুও অনবরত সমৃদ্ধ হতে থাকে: শ্রমের চরিত্র পাল্টায়, শ্রমসপ্তাহের দৈর্ঘ্য হ্রাস পায়, বিশ্রামকেন্দ্র ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, পেন্সনের পরিমাণ বাড়ে ইত্যাদি। আর তা সম্ভব হয় একমাত্র এই কারণে যে মানুষের শ্রম আরও উৎপাদনশীল হতে থাকে এবং মানুষ তার শ্রমসংক্রান্ত কর্তব্যের ব্যাপারে আরও দায়িত্বজ্ঞান ও বিবেকের পরিচয় দেয়।

এ ছাড়াও কথা আছে। অধিকার ও দায়িত্বের সামঞ্জস্যপূর্ণ ঐক্য কেবল এই কারণেই নয় যে দায়িত্ব ছাড়া অধিকার

নেই, — পরন্তু কারণ এই যে এ ছাড়াও অধিকার নিজেই দায়িত্ব এবং দায়িত্বই অধিকার। সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্রম — অধিকার ও দায়িত্ব দুইই। শিক্ষাও তাই: সোভিয়েত ইউনিয়নে সর্বজনীন **আবশ্যিক** অষ্টম শ্রেণী শিক্ষা প্রচলিত। আর নেহাৎ কাপুরুষ ও দলত্যাগী ছাড়া কেই বা মাতৃভূমিরক্ষার দায়িত্বকে বোঝা বলে মনে করবে? সেনাবাহিনীর কাজকে সোভিয়েত জনসাধারণ অস্ত্রহাতে নাগরিকের পিতৃভূমিরক্ষার পবিত্র অধিকার বলে গণ্য করে। তরুণ যোদ্ধারা সোভিয়েত ইউনিয়নের গৌরবময় সশস্ত্র বাহিনীতে কাজ করার জন্য গর্বিত, তারা সোভিয়েত জনগণের শান্তিপূর্ণ সৃজনশীল শ্রমের রক্ষণাবেক্ষণে সদাজাগ্রত।

ঠিক এই কারণেই সোভিয়েত দেশের মানুষ অধিকারের সঙ্গে দায়িত্বের প্রতিতুলনা করে না, চাপিয়ে দেওয়া কাজ হিশেবে দায়িত্ব পালন করে না, — করে গভীর আন্তরিক প্রত্যয়ের বলে। অধিকার ও দায়িত্বের ঐক্য যেমন ব্যক্তির, তার প্রতিভা ও ক্ষমতা বিকাশের, তেমনি সোভিয়েত দেশের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে যৌথ, সামাজিক বনিয়াদ প্রতিষ্ঠার সর্বাপেক্ষা অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে তোলে।

৩১ ॥ শ্রমজীবীদের সামাজিক সংগঠনসমূহ

সোভিয়েত সমাজের রাজনীতিব্যবস্থায় শ্রমজীবীদের সামাজিক সংগঠনগুলি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। এই সংগঠনগুলি রাষ্ট্রশক্তির সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা ক'রে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে কাজ করে, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের (শ্রমিক ও কর্মচারী, যুব ও

নারীসম্প্রদায়, শিল্পজীবী ইত্যাদি) বহুবিধ আগ্রহ পরিতৃপ্ত করে, শিক্ষাসংক্রান্ত কর্তব্য সম্পাদন করে এবং সোভিয়েত জনসাধারণের সমষ্টিগত কৌশল ও সাংগঠনিক ক্ষমতার গঠন ও অভিব্যক্তির কাজ করে।

সামাজিক সংগঠনগুলি শ্রমজীবীদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সমবায় হিশেবে কাজ করে, তাদের নিজস্ব নিয়ম-কানুন আছে। ট্রেড ইউনিয়ন, কমসমোল, সমবায় সমিতি এবং বৈজ্ঞানিক, কারিগরি, ক্রীড়া ও সংস্কৃতিবিষয়ক সঙ্ঘগুলি হল বৃহত্তম সামাজিক সংগঠন। বস্তুত দেশের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক অধিবাসী এগুলির অন্তর্ভুক্ত।

ট্রেড ইউনিয়ন

শ্রমিক ও কর্মচারীদের সমগ্র মেহনতী জীবন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের সঙ্গে জড়িত। প্রতিটি কলকারখানায়, নির্মাণক্ষেত্রে, রাষ্ট্রীয় খামারে, দপ্তরে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন আছে। ১০ কোটি ৭০ লক্ষেরও বেশি মানুষ ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র শ্রমিক শ্রেণী ও জাতীয় অর্থনীতি ক্ষেত্রে নিযুক্ত সকল মানুষকে নিয়ে অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী এবং, কৃষিশ্রমের সঙ্গে যুক্ত অসংখ্য কর্মিদল উক্ত সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত।

নামকরণ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে ট্রেড ইউনিয়ন বৃত্তিগত লক্ষণ অনুযায়ী শ্রমজীবীদের একত্রবদ্ধ করে। পুঁজিবাদী পরিস্থিতিতে বিভিন্ন স্তরের শ্রমিক ও কর্মচারীদের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে না নেমে উপায় থাকে না। সোভিয়েত সমাজে এ ধরনের সংঘর্ষের স্থান নেই, কেননা সমাজতান্ত্রিক

রাষ্ট্র — মেহনতী জনগণের রাষ্ট্র। বিভিন্ন স্তরের শ্রমিক ও কর্মচারীদের চাহিদা মেটানোর চেষ্টায় ট্রেড ইউনিয়নগুলি রাষ্ট্রসংস্থাসমূহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা রক্ষা করে চলে; যে-সব সমস্যার উদয় হয়, তার সবগুলি এমনভাবে সমাধান করা হয় যাতে সমাজের অন্যান্য স্তরের মানুষের সঙ্গে কোন বিশেষ শ্রেণীভুক্ত শ্রমজীবীর বৃত্তিগত স্বার্থের সংঘর্ষ না বাধে। এক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রে যে-কোন বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত মানুষের মূল আগ্রহ — সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের বিকাশ দ্রুততর করা এবং সোভিয়েত সমাজের সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতি যাতে উন্নত হয় তার অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে তোলা।

ভ. ই. লেনিন ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে জনসাধারণের উৎপাদন পরিচালনাসংক্রান্ত শিক্ষা, তালিম ও প্রবণতার সংগঠনক্ষেত্র এবং অর্থনীতি পরিচালনা ও কমিউনিজমের পাঠশালার সন্ধান পেয়েছেন।

রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনাগঠন থেকে শুরু করে প্রতিটি উদ্যোগের কার্যপরিচালনা পর্যন্ত — জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের অতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাসমূহের সমাধানে ট্রেড ইউনিয়ন অংশগ্রহণ করে থাকে। কলকারখানার অন্তর্ভুক্ত ও স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়ন কমিটিগুলি প্রশাসনবিভাগের সঙ্গে যৌথ চুক্তি সম্পাদন করে। উৎপাদন পরিকল্পনা গঠনে অংশগ্রহণের (ট্রেড ইউনিয়ন সদস্যদের সভায় পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা এবং তার পরিবর্তন সাধনে দাবি জানানোর), অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে কারখানার পরিচালকের বিবরণ শোনার এবং দরকার হলে ঊর্ধ্বতন অর্থনৈতিক সংস্থার সামনে অমনোযোগী পরিচালকের বদলী অথবা তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবিসংক্রান্ত প্রশ্ন উত্থাপনের অধিকার তার আছে।

জনসাধারণের আইনসঙ্গত স্বার্থ রক্ষা করা — ট্রেড ইউনিয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য।

ট্রেড ইউনিয়নগুলি যেমন কোন কারখানার অভ্যন্তরে, তেমনি তার বাইরে অন্যান্য উদ্যোগের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার দিকে শ্রমিক ও কর্মচারীদের আকর্ষণ করে। তারা কমিউনিস্ট শ্রম-সম্পর্কের জন্য আন্দোলন সংগঠন করে। ট্রেড ইউনিয়নগুলি বিস্তৃত উদ্ভাবনকর্ম পরিচালনা করে। তাদের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে শ্রমের অগ্রণী পদ্ধতির প্রসার এবং কর্মীদের মধ্যে সৃজনমূলক পারস্পরিক সহায়তার উপযুক্ত বিন্যাসসাধন গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। ট্রেড ইউনিয়ন কমিটিসমূহ শ্রমিক, ইঞ্জিনিয়র ও কর্মচারীদের যোগ্যতাবৃদ্ধির জন্য সংগ্রাম পরিচালনা করে। উৎপাদনপরিচালনায় জনসাধারণকে টেনে এনে ট্রেড ইউনিয়ন পরিচালনবিভাগের সঙ্গে একত্রে উৎপাদনসম্পর্কিত আলোচনা-সভা সংগঠন করে।

জনসাধারণের সাংস্কৃতিক ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রাসংক্রান্ত চাহিদা মেটানো ও তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নের ভার ট্রেড ইউনিয়নের উপর ন্যস্ত। উদ্যোগের পরিচালনবিভাগের সঙ্গে কলকারখানার অন্তর্ভুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন কমিটি একযোগে বাসস্থান বণ্টনের ব্যবস্থা করে। তারা স্বাস্থ্যনিবাস, বিশ্রামকেন্দ্র, পর্যটনকেন্দ্র ইত্যাদির বন্দোবস্ত করে। ক্রেইশ ও কিণ্ডারগার্টেনে শিশুদের সংস্থান এবং বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য গ্রীষ্মকালীন বিশ্রামের আয়োজন তাদের পরিচালনাধীন। ট্রেড ইউনিয়ন রাষ্ট্রীয় ও সমবায় বাণিজ্য, চিপ ক্যাণ্টিন-ব্যবস্থা ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রাসংক্রান্ত কৃত্যক নিয়মনের অধিকারী।

ট্রেড ইউনিয়ন — উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক শক্তি। সংস্কৃতিভবন, ক্লাব, গ্রন্থাগার — তার পরিচালনাধীন।

ট্রেড ইউনিয়ন যে কেন কেবল জনসাধারণের বৃহত্তম সাধারণ সংগঠন না হয়ে দেশের সমগ্র সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে এত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে — এসব থেকেই তা বেশ বোঝা যায়।

যুবসম্প্রদায়ের সঙ্ঘ

সোভিয়েত ইউনিয়নের তরুণসম্প্রদায় তাদের জীবনের সেরা সময়ের দশ বছরেরও বেশি লেনিনীয় কমসমোলের আওতায় কাটায়। দেশের জীবনে কমসমোলের তাৎপর্য এই যে তা যুবসংগঠনমাত্র নয়, — **যুবসম্প্রদায়ের কমিউনিস্ট সঙ্ঘ,** এই সংগঠন পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক রক্ষা করে চলে, পার্টির নেতৃত্বে কাজ করে এবং উঠতি পুরুষের কমিউনিস্ট ভাবধারাসম্পন্ন শিক্ষার ব্যাপারে ও নূতন সমাজ গঠনে পার্টির সহযোদ্ধা হিশেবে কাজ করে। আর কোন সংগঠন কমসমোলের মতো পার্টিকে এত সদস্য দেয় না; কমসমোল হল সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির অফুরান ভান্ডার। নিখিল সোভিয়েত লেনিনীয় কমিউনিস্ট যুবসঙ্ঘে শিক্ষাপ্রাপ্ত লক্ষ লক্ষ সেরা সদস্য কমিউনিস্ট পার্টিতে গৃহীত হয়। এখানেই সোভিয়েত সমাজের বংশপরম্পরাগত উত্তরাধিকার ও পার্টির রাজনীতিতে যুবসম্প্রদায়ের সমর্থন স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে।

কমিউনিস্ট পার্টি এবং তার নেতা ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের উদ্যোগে ও প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে কমিউনিস্ট যুবসঙ্ঘের উৎপত্তি। ১৯১৮ সনের ২৯শে অক্টোবরে মস্কোর

খারিতোনিয়েভ্স্কি লেনের ৪ নং বাড়িতে অনুষ্ঠিত যুবসঙ্ঘের প্রথম নিখিল রাশিয়া কংগ্রেসে কমসমোল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কংগ্রেসকর্তৃক গৃহীত কর্মসূচির বনিয়াদি সংবিধিতে লিখিত হয়েছিল: 'সঙ্ঘ রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ; সঙ্ঘের উদ্দেশ্য — কমিউনিস্ট ভাবধারার বিস্তার এবং শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর যুবসম্প্রদায়কে সোভিয়েত রাশিয়ার সক্রিয় নির্মাণকর্মের সঙ্গে জড়িত করা।' ভ. ই. লেনিন কংগ্রেসের সম্মানিত সভাপতি নির্বাচিত হন। কংগ্রেসের শেষে তিনি প্রতিনিধিদলকে অভ্যর্থনা জানান এবং স্থানীয় পরিস্থিতি ও যুবসঙ্ঘের কর্তব্য সম্পর্কে তাদের সঙ্গে বহুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করেন।

১৯২৪ সনে কমসমোলের ষষ্ঠ কংগ্রেস যুবসংঘকে **লেনিনীয়** যুবসংঘ নামকরণের প্রস্তাব গ্রহণ করে।

সমাজতন্ত্রের ইতিহাসে কমসমোল উজ্জ্বল ও অবিস্মরণীয় অধ্যায় সংযোজন করল।

গৃহযুদ্ধের কাল — কমসমোলের জন্মকাল। রাশিয়ার কমিউনিস্ট যুবসঙ্ঘের প্রথম কংগ্রেস আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে: 'দক্ষিণাঞ্চলে যে বিশ্ব প্রতিবিপ্লব আসন্ন হয়ে উঠেছে তা আমাদের কাছে উপযুক্ত প্রতিঘাত পাবে। আমাদের সমগ্র বিপ্লবী উৎসাহ, যৌবনের সমস্ত শক্তি আমরা তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে সমর্পণ করব।... এক পাও পিছু হটা নয়!.. সোভিয়েত ক্ষমতা দীর্ঘজীবী হোক!' কমসমোল সংগঠনগুলি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে পূর্ণশক্তিসমেত রণাঙ্গনে যোগ দেয়। ১৯১৯ সনের মে মাসে পূর্ব রণাঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ায় কমসমোল প্রথম সমগ্র রাশিয়াব্যাপী সদস্য সমাবেশে ঘোষণা ক'রে তিন সহস্রাধিক কমসমোল

সদস্যকে রণাঙ্গনে পাঠায়। ১৯২০ সনে প্রায় ৭০ হাজার কমসমোল সদস্য, অর্থাৎ প্রতি ছয় জনের একজন কমসমোল সদস্য লাল ফৌজে ছিল। নিকোলাই অস্ত্রোভ্‌স্কির 'ইস্পাত' উপন্যাস আমাদের কাছে সে সময়কার বীরত্বের পরিচয় বহন করছে।

গৃহযুদ্ধের সময় হাজার হাজার কমসমোল সদস্যের যুদ্ধে কৃতিত্বের নিদর্শন হিশেবে লেনিনীয় কমসমোলকে 'লাল পতাকা' অর্ডারে ভূষিত করা হয়। মাতৃভূমি প্রদত্ত সম্মানপদক গ্রহণ করে নিখিল সোভিয়েত লেনিনীয় কমিউনিস্ট যুবসঙ্ঘের অষ্টম কংগ্রেস সমগ্র কমসমোল ও যুবসম্প্রদায়ের তরফ থেকে ঘোষণা করে: 'আমাদের জ্ঞান, আমাদের শক্তি ও আমাদের জীবন শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর শাসনক্ষমতার অধিকারভুক্ত। গৃহযুদ্ধের অগ্নিময় দিনগুলিতে আমরা সে সবের জন্য মায়া করি নি, নূতন পরীক্ষা ও বিজয়ের দিনে আমরা আক্ষেপের দীর্ঘশ্বাস মোচন না করে তা অর্পণ করব।'

শান্তিপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক গঠনের পর্ব এলো। কমসমোল সদস্যরা যাতে দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনে এবং আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞানের ভিত্তিতে কৃষি ও শিল্পের পুনর্গঠনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ১৯২০ সনেই কমসমোলের তৃতীয় কংগ্রেসে ভ. ই. লেনিন কমসমোল সদস্যদের কমিউনিজম অধ্যয়নের কর্তব্য নির্দেশ করেন। তিনি কমসমোলকে এমন এক বিশিষ্ট স্বেচ্ছাসেবী দল হওয়ার আহ্বান জানান, যে দল সব রকম কাজে তার উদ্যোগ ও নিষ্ঠার পরিচয় দেবে।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত শিল্প ও পরিবহণব্যবস্থা পুনর্গঠনে কমসমোল পার্টিকে সাহায্য

করে। কমসমোল সদস্যরা কারখানা ও বিদ্যুৎকেন্দ্রসমূহের ব্লক নির্মাণ করে, তাইগায় এবং উত্তপ্ত বালুকাভূমিতে রেললাইন পাতে, নূতন নূতন শহর গড়ে তোলে। দ্নেপ্রগেস, মাগ্নিৎকা, কুজবাস, কমসমোল্স্ক-অন-আমুর, দনেৎস্ক, মস্কো মেট্রো নির্মাণ — এই হল কমসমোলের শিল্প পথ পরিক্রমার নেহাৎ কয়েকটি দৃষ্টান্তমাত্র।

১৯৩১ সনের জানুয়ারিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা সাফল্যজনক রূপায়ণের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রম নিয়োগ ও সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার জন্য সরকার লেনিনীয় কমসমোলকে 'শ্রমের লাল পতাকা' অর্ডারে ভূষিত করে।

পার্টির আহবানে কমসমোল সদস্যবৃন্দ ও যুবসম্প্রদায় কৃষি যৌথীকরণের জন্য নিঃস্বার্থ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। কমসমোল ফসলের জন্য ব্যাপক অভিযান চালায়, ট্র্যাক্টরচালক, কম্বাইনচালক, কারিগর, ড্রাইভার এবং কৃষিক্ষেত্রের অন্যান্য যন্ত্রচালক গড়ে তুলতে সাহায্য করে। কমসমোল গ্রামে কৃষক পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্য বিদ্যালয়, পাঠাগার ও গ্রন্থাগার নির্মাণ করে, কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যা প্রচার করে এবং কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করে। না কুলাকদের গুলি, না প্রতিবিপ্লবী বাস্মাচ্ দস্যুদলের নির্মম অত্যাচার — কোন কিছুই তরুণ উৎসাহীদের ক্ষান্ত করতে পারে নি।

কমসমোল সদস্যবৃন্দ ও যুবসম্প্রদায় বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ে প্রচুর জ্ঞান আহরণ করে। সমাজতান্ত্রিক গঠনকর্মের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা — নিজস্ব গণবুদ্ধিজীবীসম্প্রদায় গড়ে তোলার সমস্যা সমাধানে কমসমোল পার্টিকে সাহায্য করে। বহু বিশ্ববিখ্যাত বড় বড় সোভিয়েত বিজ্ঞানী

কমসমোলের পথ ধরে বিজ্ঞানের জগতে প্রবেশ করেছেন। কমসমোল নিজেদের মধ্য থেকে প্রতিভাবান পার্টি কর্মী ও বিভিন্ন পরিষদকর্মী, অর্থনৈতিক ও সামরিক কর্মী বার করেছে।

পিতৃভূমির মহাযুদ্ধের কাল। লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণী স্বেচ্ছাসেবী-রূপে রণাঙ্গনে যোগ দিল। তরুণ যোদ্ধারা আবেদন জানায়: 'কমসমোল সদস্য হয়ে যুদ্ধে যেতে চাই'। 'সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর' খেতাবপ্রাপ্ত ১১ হাজার যোদ্ধার মধ্যে ৭ হাজার — কমসমোল সদস্য এবং কমসমোলে শিক্ষাপ্রাপ্ত। দু'-দুবার 'সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর' খেতাবপ্রাপ্তদের মধ্যে ৬০ জন কমসমোলে শিক্ষাপ্রাপ্ত। তিনবার 'সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর' খেতাবের অধিকারী ইভান কজেদুব ও আলেক্সান্দর পক্রিশ্‌কিন কমসমোলে শিক্ষা লাভ করেছেন।

কমিউনিস্টদের সঙ্গে একযোগে কমসমোল সদস্যরা সাময়িকভাবে ফাশিস্ত সেনাবাহিনী অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে প্রথম গেরিলাবাহিনী সংগঠন করে। গেরিলাবাহিনীর শতকরা ৬০ ভাগ কমসমোল সদস্য ও তরুণদের নিয়ে গঠিত হয়। শত্রু অধিকৃত অঞ্চলসমূহে গোপন কমসমোল সংগঠন — কমসমোলের মহকুমা কমিটি, নগর কমিটি ও জেলা কমিটির অস্তিত্ব ছিল, কমসমোল সংবাদপত্রও প্রকাশিত হত।

কমসমোলের দুঃসাহসিক ও নির্ভীক ছেলেমেয়েদের নাম সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ভিক্তর তালালিখিন ও ইউরি স্মির্‌নোভ, আলেক্সান্দর মাত্রোসভ ও গফুর মামেদভ, লিজা চাইকিনা ও মারিয়া মেল্‌নিকাইতে, নিকোলাই গাস্‌তেল্‌লো ও ফেওদোসি স্মলিয়াচ্‌কভ, মান্‌শুক মামেতভা ও জয়া

কস্‌মদেমিয়ান্‌স্কায়া এবং ‘তরুণ গার্ড’ ও ‘গেরিলা স্ফুলিঙ্গ’ বাহিনীর বীরদের কীর্তি কিংবদন্তী হয়ে জনগণের মাঝে বেঁচে রয়েছে।

‘নিজেদের কাজ এবং সেই সঙ্গে রণাঙ্গনে যোগদানকারী কমরেডদের কাজ পূরণ’ — এই ছিল শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে কর্মরত কমসমোল সদস্যদের মূলমন্ত্র। লক্ষ লক্ষ উঠতি ছেলেমেয়ে স্কুলের বেঞ্চ ছেড়ে সোজা কারখানার কর্মশালায় চলে আসে, যন্ত্রকৌশল আয়ত্ত করে। কমসমোল যে-সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করে, সেগুলি শিল্প ও পরিবহণসংস্থার জন্য ২০ লক্ষাধিক তরুণ শ্রমিককে তালিম দেয়। কমসমোল সারা ইউনিয়ন রবিবাসরীয় শ্রমদিন পরিচালনা করে এবং অর্জিত অর্থ প্রতিরক্ষা তহবিল ও অনাথ শিশু সাহায্য তহবিলে প্রদান করে।

পিতৃভূমির মহাযুদ্ধকালে সোভিয়েত মাতৃভূমির সেবায় বিশিষ্ট কৃতিত্বের জন্য এবং সোভিয়েত যুবসম্প্রদায়কে স্বদেশের প্রতি নিঃস্বার্থ আনুগত্যের মন্ত্রে দীক্ষাদানের মহান কর্ম সম্পাদনের স্বীকৃতি হিশেবে ১৯৪৫ সনের জুন মাসে লেনিনীয় কমসমোলকে ‘লেনিন অর্ডারে’ ভূষিত করা হয়। বিশিষ্ট কৃতিত্বের অধিকারী কমসমোল সংগঠনসমূহ ও কমসমোল সংবাদপত্রগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্ডারে ভূষিত হয়।

যুদ্ধোত্তর পর্বে শান্তিপূর্ণ শ্রম ও গঠনের কালে কমসমোলকে আবার সামনের সারিতে দেখা যায়। শ্রমের ক্ষেত্রে যুবসম্প্রদায়ের কীর্তি — বিদ্যুৎকেন্দ্র, রেলসড়ক ও নূতন নূতন শহরের নির্মাণকারী এবং অনাবাদী জমিতে আবাদকারী ও মহাকাশচর্চার পুরোগামীদের কৃতিত্ব — সোভিয়েত মাতৃভূমির ইতিহাসে নূতন অধ্যায় সংযোজন

করেছে। শ্রমের ক্ষেত্রে সাফল্য ও যুবসম্প্রদায়কে শিক্ষাদানের জন্য লেনিনীয় কমসমোলকে সাম্প্রতিক কালে দু'বার 'লেনিন অর্ডারে' এবং কমসমোলের অর্ধশত বার্ষিকী উপলক্ষে 'অক্টোবর বিপ্লব অর্ডারে' ভূষিত করা হয়েছে।

কমসমোলের নেতৃত্বে সোভিয়েত যুবসম্প্রদায় আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক যুব আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে, শান্তির জন্য সংগ্রাম করে। নিখিল সোভিয়েত লেনিনীয় কমিউনিস্ট যুবসংঘ অন্যান্য দেশের গণতান্ত্রিক যুব ও ছাত্র সংগঠনসমূহের সঙ্গে একত্রে সকল দেশের প্রগতিশীল যুব ও ছাত্রসংগঠন — বিশ্ব গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন এবং আন্তর্জাতিক ছাত্রসংঘ প্রতিষ্ঠা করেছে।

এখন ৩ কোটি ৫০ লক্ষেরও বেশি তরুণ-তরুণী কমসমোলের সদস্যভুক্ত। নিখিল সোভিয়েত লেনিনীয় কমিউনিস্ট যুবসংঘ ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন কিশোর পাইওনিয়র বাহিনীর কমিউনিস্ট সংগঠনসমূহের সরাসরি পরিচালনা করে। পার্টি কমসমোলের হাতে উঠতি পুরুষের শিক্ষার গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি ৩০ বছরের অন্তর্বর্তী তরুণসম্প্রদায়। তারা প্রধান প্রধান নির্মাণক্ষেত্রে, বিদ্যুৎকেন্দ্র ও কলকারখানায়, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইনস্টিটিউট ও ল্যাবরেটরিতে এবং যৌথখামার ও রাষ্ট্রীয় খামারে কাজ করে। আজ অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নির্মাণকর্মের এমন কোন ক্ষেত্রের কথা ধারণায়ই আনা যায় না, যেখানে তরুণসম্প্রদায় ও কমসমোল সদস্যদের উদ্যোগ, সৃজনী শক্তি ও সাহসিকতা নিয়োজিত না হয়েছে। কমসমোল ক্ষিপ্র বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবী নির্মাণকর্ম, ছাত্রসম্প্রদায়ের নির্মাণবাহিনী, যুবসম্প্রদায়ের উৎপাদন

ব্রিগেড, গ্রীষ্মকালীন শ্রম ও বিশ্রাম শিবির — এসবই হাজার হাজার তরুণ-তরুণীর জীবনের পাঠশালা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গৃহনির্মাণ এবং সাংস্কৃতিক ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহসংক্রান্ত নির্মাণকর্ম, হাল্কা শিল্প ও খাদ্য শিল্প এবং সরবরাহক্ষেত্রের ক্রমাগত বিকাশে সক্রিয় অংশগ্রহণকে কমসমোল সদস্যরা নিজস্ব জন্মগত কাজ বলে মনে করে।

কমসমোল দশম পাঁচসালার ক্ষিপ্র কর্মিবাহিনীরূপে নিজেকে ঘোষণা করেছে। জাতীয় অর্থনীতির শতাধিক অতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র ১৯৭৬ জনের জন্য কমসমোল বাহিনীর সারা ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবী নির্মাণকর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পশ্চিম সাইবেরিয়ার তৈল ও গ্যাস আকরিকের এবং কুর্স্কের অনিয়মিত চৌম্বকশক্তির এলাকাভুক্ত অনবদ্য সম্পদের ভবিষ্যৎ উদ্ধারকর্ম, বৈকাল-আমুর রেলসড়ক, কামা লরি কারখানা, উস্ত-ইলিম্স্ক কাষ্ঠশিল্পসমাহার, অস্কোল্-এর বিদ্যুৎশক্তি চালিত ধাতুশিল্পোদ্যোগ এবং ভলগোদন ভারী যন্ত্রপাতি নির্মাণ কারখানার গঠনকর্ম উক্ত কার্যকলাপের অন্তর্গত। এই সব জরুরী নির্মাণক্ষেত্রে ১ লক্ষ ১০ হাজার তরুণ উৎসাহীকে পাঠানো হবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৫তম কংগ্রেস উপলক্ষে 'পাঁচসালায় ফলপ্রসূতা ও মান — যুবসম্প্রদায়ের উৎসাহ ও সৃজনশক্তি দান' — এই মূলমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ কমসমোল সদস্যবৃন্দ ও যুবসম্প্রদায়ের ব্যাপক দেশপ্রেমী আন্দোলন সূচিত হয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেসে গৃহীত কর্মসূচির সম্পাদন এবং নবম পাঁচসালা পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়ণের সংগ্রামে কমসমোল ও যুবসম্প্রদায় তাদের জ্ঞান, শ্রম ও প্রতিভা দান করে চলেছে। যুবসম্প্রদায় ও কমসমোল সদস্যরা শ্রম ও শিক্ষাক্ষেত্রে নূতন নূতন সাফল্য নিয়ে ১৯৭৪ সনে এপ্রিলে অনুষ্ঠিত নিখিল

সোভিয়েত লেনিনীয় কমিউনিস্ট যুবসঙ্ঘের ১৭শ কংগ্রেসে মিলিত হয়।

সমবায় সংগঠন

উপরে **অর্থনৈতিক** সংগঠন হিশেবে যৌথখামারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু যৌথখামার আবার সেই সঙ্গে কৃষক শ্রেণীর **সামাজিক** সংগঠনও বটে।

যৌথখামার হল এক ধরনের সমবায়, অর্থাৎ যৌথ উৎপাদন ও সামাজিক স্বশাসনের ভিত্তিতে কৃষকদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বন্ধুত্বপূর্ণ সংযুক্ত উদ্যোগ। যৌথখামারীরা নিজেরাই সাধারণ সভায় পরিচালকমণ্ডলী, সভাপতি ও কণ্ট্রোল কমিশনের নির্বাচন, সমবায়ের সদস্যপদ প্রদান ও কোন সদস্যের বহিষ্করণ, উপকরণ কাজে লাগানোর ব্যবস্থা, উৎপাদনের পরিমাণ ও দর নির্ধারণ, সামাজিক অর্থনীতিতে শ্রমের বাধ্যতামূলক ন্যূনতম ব্যবহারের মতো অত্যন্ত জরুরী সমস্যার সমাধান করে এবং বাড়ির সংলগ্ন ব্যক্তিগত খামারের আয়তন নির্ধারণ ইত্যাদি করে। বৃহৎ যৌথখামারগুলিতে বহু সমস্যা বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী ও ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রতিনিধিসভায় ও কর্মিবাহিনীর সভায় সমাধান করা হয়। সাধারণ সভার স্থায়ী কমিশনসমূহ কাজ করে। এর ফলে যৌথখামারের জীবনযাত্রাসংক্রান্ত সমস্যার বিচারে সকল যৌথখামারী অংশগ্রহণ করতে পারে।

উৎপাদন-পরিকল্পনা ও সংগঠনের ব্যাপারে যৌথখামারগুলির ব্যাপক উদ্যোগ-গ্রহণের সুযোগ আছে। গ্রামাঞ্চল ও বিভিন্ন পল্লীর নির্মাণ ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য ব্যবস্থা এবং শিশুদের ক্রেইশ ও কিণ্ডারগার্টেন, বিদ্যালয়,

হাসপাতাল, ক্লাব ও গ্রন্থাগার গড়ে তোলার সমস্যা তারা স্বাধীনভাবে সমাধান করে।

যৌথখামারে গণতান্ত্রিক পরিবেশ আরও বিকাশের উদ্দেশ্যে সারা দেশীয় যৌথখামারের সম্মিলিত পরিষদ এবং বিভিন্ন মহকুমা, জেলা, প্রদেশ ও প্রজাতন্ত্র ভিত্তিতে যৌথখামারের পরিষদসমূহ গড়ে উঠেছে। সোভিয়েত কৃষক সমাজের এই নির্বাচিত সংস্থাগুলি গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সমন্বয়সাধনে সাহায্য করে, যৌথখামারের নির্মাণকর্মসংক্রান্ত অভিজ্ঞতার সাধারণীকরণ করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে **ক্রেতা সমবায় সমিতি** আছে; উক্ত সমিতি গ্রামাঞ্চলে বাণিজ্যব্যবস্থার উৎকর্ষসাধন করে, কৃষিক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে, অধিবাসীদের স্বাচ্ছন্দ্যের তত্ত্বাবধান করে। **বাসগৃহ-নির্মাণ সমবায় সমিতি** বাসব্যবস্থার উৎকর্ষসাধনে অধিবাসীদের সহায়তা করে থাকে।

বিভিন্ন সমিতি

সোভিয়েত ইউনিয়নে আরও বহু সামাজিক সংগঠন আছে যেগুলি বৃত্তি অথবা বিশেষ বিশেষ আগ্রহ অনুযায়ী (যেমন, পশুশিকারী সমিতি, মৎস্যশিকারী সমিতি ইত্যাদি) জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করে। তাদের মধ্যে কোন কোনটি আবার জনসাধারণের বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ সংগঠন করে। সারা ইউনিয়ন ‘জ্নানিয়ে’ (জ্ঞান) সমিতি, শিক্ষাকর্মী, চিকিৎসা ও অন্যান্য বিজ্ঞানশাস্ত্রসংশ্লিষ্ট কর্মীদের সমিতি, অসংখ্য বৈজ্ঞানিক-টেকনিক্যাল সমিতি,

উৎকর্ষসাধনকারী ও উদ্ভাবকদের সমিতি, লেখক, সাংবাদিক, সুরকার, শিল্পী, চলচ্চিত্রশিল্পকর্মী, স্থপতি এবং সৃজনকর্মরত অন্যান্য বুদ্ধিজীবীসম্প্রদায়ের সঙ্ঘ — এ ধরনের সংগঠন।

অন্যান্য সমিতি শারীরচর্চা সংগঠন করে, প্রতিরক্ষাসংক্রান্ত জ্ঞান ইত্যাদি প্রচার করে। খেলাধূলাসংক্রান্ত সমিতি ও সংগঠন এবং স্থলবাহিনী, বিমান ও নৌবাহিনীর সহযোগী স্বেচ্ছামূলক সমিতি — এ ধরনের সংগঠন।

রেড ক্রস ও রেড ক্রেসেন্ট সমিতি, প্রকৃতি ও বৃক্ষসজ্জা সংরক্ষণ সমিতি এবং ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক নিদর্শন সংরক্ষণ সমিতি উল্লেখযোগ্য মানবিক ভূমিকা গ্রহণ করে।

স্বেচ্ছামূলক সমিতিসমূহের সম্পূর্ণ দলটি সোভিয়েত জনগণকে শান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সংগঠিত করে, অন্যান্য দেশের জনগণের সঙ্গে মৈত্রী গড়ে তোলে। এগুলি হল সোভিয়েত মৈত্রী সমিতিসমূহ, সোভিয়েত শান্তি কমিটি, সোভিয়েত নারী কমিটি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের যুবসংগঠনসমূহের কমিটি।

এর সবগুলি এবং অন্যান্য অসংখ্য স্বেচ্ছামূলক সঙ্ঘ সামাজিক শৌখিন সমিতি হিশেবে কাজ করে। কোটি কোটি জনসাধারণ তাদের প্রভাবাধীন।

নিজ নিজ সমস্ত বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও সামাজিক সংঠনগুলির শেষ লক্ষ্য মাত্র একটিই — জনগণের উদ্যোগ ও সক্রিয়তার বিকাশসাধন, কমিউনিজম গঠনের কর্তব্য-সম্পাদনে পার্টি ও সরকারের প্রতি সহায়তা।

সকল সামাজিক সংগঠন ও সঙ্ঘের কার্যকলাপ সংগঠন ও মজবুত করে কমিউনিস্ট পার্টি। পার্টি সামাজিক সংগঠনের উপর হুকুম জারি করে না, — পার্টি প্রধানত

সংগঠনগুলিতে কর্মরত কমিউনিস্টদের মাধ্যমে সংগঠনের কর্মপন্থা পরিচালনা করে এবং তারা যাতে আরও পরিপূর্ণভাবে ও সাফল্যজনক উপায়ে সমিতির পরিচালনায় জনসাধারণের ব্যাপকতর অংশগ্রহণের ব্যাপারে সহায়তা করতে পারে তার প্রতি যত্ন নিয়ে থাকে। গণসংগঠন ও সমিতিগুলি তাদের কার্যকলাপের দ্বারা ধারাবাহিকভাবে সমাজতান্ত্রিক সমাজের সবচেয়ে প্রভাবশালী সামাজিক-রাজনৈতিক সংগঠন ও তার স্বীকৃত পরিচালক পার্টির নীতিকে জীবনে রূপদানের চেষ্টা করে।

৩২ ॥ সমাজতন্ত্র বিকাশের পথনির্দেশ

পূর্ণ ও চূড়ান্ত বিজয়

সোভিয়েত সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাসংক্রান্ত জ্ঞান বিকাশের সামগ্রিক মূল্যায়নের তাৎপর্য এবং কমিউনিজমের দিকে ক্রমিক অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিত বুঝতে সাহায্য করে। সামাজিক বিকাশের ফলাফলের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্লেষণ ভিত্তিতে কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসসমূহ এই ধরনের মূল্য নির্ধারণ করেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বকালেই সোভিয়েত ইউনিয়নে **সমাজতন্ত্রের পূর্ণ বিজয়** সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসা হয়েছিল। তার ভিত্তি ছিল এই যে: ১) উৎপাদনের সমস্ত মুখ্য উপায় ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে সামাজিক মালিকানায় চলে গেছে, জাতীয় অর্থনীতির সকল শাখায় সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের সূচনা হয়েছে; ২) পুঁজিবাদী নৈরাজ্য ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবর্তে অর্থনীতির সুষম বিকাশ দেখা দিল, 'যে কাজ করে না, সে খায় না', 'প্রত্যেকের কাছ থেকে

তার সামর্থ্য অনুযায়ী গ্রহণ, প্রত্যেককে তার পরিশ্রমের প্রতিদান' — এই নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; ৩) শোষক শ্রেণীর বিলোপ ঘটেছে, সমাজে আছে কেবল মেহনতী শ্রেণী ও স্তরের মানুষ; ৪) জাতীয় নির্যাতন ও বৈরিতার অবসান ঘটেছে, সকল জাতির সম অধিকার ও ভ্রাতৃত্বমূলক ইউনিয়নে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে; ৫) সোভিয়েত শাসনক্ষমতা ও তার রাষ্ট্রীয় রূপ হিশেবে প্রলেতারীয় একনায়কত্ব কায়েম হয়েছে, বুর্জোয়া আইনের স্থান নিয়েছে সমাজতান্ত্রিক আইন; ৬) জনগণ সচেতনভাবে সমাজতান্ত্রিক দেশপ্রেম ও প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের ভাবধারার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করল, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সমাজে কর্তৃত্বমূলক মতাদর্শ হয়ে দাঁড়াল।

এই সব পরিবর্তনের অর্থ মোটামুটি হিসাব করে দেখলে বলা যেতে পারে যে লেনিন অতি স্পষ্ট ভাষায় সূত্রাকারে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণপর্বের যে মুখ্য প্রশ্নটি ('কে — কার উপর') রেখেছিলেন তার সমাধান সমাজতন্ত্রের পক্ষে গেছে। এখন থেকে আর সামাজিক গঠনপদ্ধতির পৃথক পৃথক উপাদান, বিভাগ ও অংশ নয়, — সমগ্র সমাজ — তার অর্থনৈতিক বনিয়াদ, রাজনৈতিক উপরিকাঠামো, সমাজে প্রভুত্ব বিস্তারকারী মতাদর্শ — আমূল পুনর্গঠিত হয়েছে, সমাজতান্ত্রিক চরিত্র অর্জন করেছে।

যুদ্ধ পরবর্তীকালে সমাজতন্ত্রের পূর্ণ বিজয়ের সিদ্ধান্তের সঙ্গে যুক্ত হল তার **চূড়ান্ত বিজয়ের** সিদ্ধান্ত। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র গঠন পুঁজিবাদী বেষ্টনের মধ্যে ঘটেছে — একথাটা স্মরণে রাখলে উক্ত সিদ্ধান্তের তাৎপর্য স্পষ্ট হবে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিজে যতই মজবুত হোক না কেন সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের আশঙ্কা বরাবরই রয়ে

গিয়েছিল এবং তার সাফল্যের অর্থ হত সোভিয়েত ইউনিয়নে পংজিবাদের অনিবার্য পুনরুত্থান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটল। ফ্যাসিবাদের পরাভব, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের অসামান্য মর্যাদাবৃদ্ধি, ইউরোপ ও এশিয়ার কতিপয় দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়, কমিউনিস্ট ও সর্বজনীন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রসার, জাতিসমূহের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের জোয়ার — এসবই বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে নূতন শক্তি সম্পর্কের সূচনা করল। বর্তমানে, যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের 'পুঁজিবাদী বেষ্টন' ধারণা অতীতের ইতিহাসে পর্যবসিত হয়েছে, যখন আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহের উপর বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অধিকতর প্রভাব বিস্তার করছে এবং, যখন সোভিয়েত জনগণ তার শ্রমে শক্তিশালী অর্থনীতি ও অভেদ্য প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, তখন সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয়ের কথা ভাবার সব রকম ভিত্তি আছে বলা চলে। এমন কি সমাজতন্ত্রের শত্রুরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে কী সোভিয়েত রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির দৃষ্টিকোণ থেকে, কী তার আন্তর্জাতিক অবস্থানের দৃষ্টিকোণ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা পাকাপোক্ত।

উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ

সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের পূর্ণ ও চূড়ান্ত বিজয় সম্পর্কে সিদ্ধান্তের অর্থ মোটেই এমন নয় যে নূতন সমাজকে পরিবর্তনের আওতার বাইরে ও পরিপূর্ণতাসাধনের অতীত বলে মনে করতে হবে। বরং তার বিপরীত, — আমূল

বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটার ঠিক পর পর, — সামাজিক জীবনের সমস্ত বনিয়াদী সংস্থা পুঁজিবাদী চরিত্র হারিয়ে সমাজতান্ত্রিক চরিত্র অর্জনের পরই অর্থনীতির বিকাশে গতি সঞ্চার, জনগণের অবস্থার উন্নতি, সংস্কৃতির সমৃদ্ধি এবং সমাজবিকাশের বহুবিধ ও জটিলতর সমস্যাসমাধানের সম্ভাবনা প্রশস্ত হতে পারে। ভ. ই. লেনিনের কথায়: 'সমাজতন্ত্র যেন মৃত, আবদ্ধ ও চিরদিনের জন্য বেঁধে দেওয়া কোন একটা কিছু, — এই প্রচলিত বুর্জোয়া ধারণাটি যে কী ডাহা মিথ্যে তা ভেবে দেখা' দরকার, 'কেননা প্রকৃতপক্ষে একমাত্র সমাজতন্ত্র থেকেই অধিকাংশ দেশবাসীর, এবং পরে সমগ্র দেশবাসীর অংশগ্রহণে যে দ্রুত, অকৃত্রিম ও বাস্তবিক অগ্রগতির সূত্রপাত হয়, তা সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের সর্বক্ষেত্রে ঘটে থাকে'।

এটা সম্পূর্ণ বোঝা যায় যে বিকাশ কেবল অর্থনীতি ও সংস্কৃতিক্ষেত্রেই নয়, — সামাজিক সম্পর্ক ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়। বিষয়বস্তুর দিক থেকে সামাজিক সম্পর্ক ও সমাজজীবনের রূপ দরিদ্র হতে পারে, সমৃদ্ধও হতে পারে, কম বেশি পরিপক্কও হতে পারে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা যত উন্নত হয় এবং আরও পরিপক্কতা লাভ করে, ততই সমাজতান্ত্রিক সমাজের নূতন ও উচ্চতর পর্যায়ে উত্তরণ ঘটছে — এমন কথা বলার ভিত্তি পাওয়া যায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিকাশের ফলাফল বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেস এমন সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টির ২৪তম কংগ্রেসের সামনে মোট কার্যকলাপের যে বিবরণী

রেখেছে তাতে বলা হয়েছে যে সোভিয়েত ইউনিয়নে **উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ** গড়ে উঠেছে।

উন্নত সমাজতন্ত্রের সহজাত লক্ষণ তা হলে কী?

সর্বোপরি **অর্থনীতি ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে এবং জনগণের সমৃদ্ধির স্তরে পরিমাণগত ও গুণগত উন্নতির লক্ষণ।**

সোভিয়েত ইউনিয়নে জাতীয় অর্থনীতি যে কতখানি বিকশিত হয়েছে নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলি থেকে তা বিচার করা যাবে: ১৯৭৫ সনে সোভিয়েত দেশে শিল্প উৎপাদনের পরিমাণ ১৯১৩ সনের তুলনায় ১৩১ গুণ বেশি ও ১৯৪০ তুলনায় ১৭ গুণের বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে। গুণগত সম্পর্কেও যুদ্ধপূর্ব অর্থনীতির সঙ্গে বর্তমান সোভিয়েত অর্থনীতির তুলনা হয় না: উৎপাদনের সমস্ত আধুনিক শাখা আজকের সোভিয়েত অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত, অগ্রণী যন্ত্রবিজ্ঞানে সে সজ্জিত এবং উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মিদল তার কাজে নিযুক্ত।

অর্থনৈতিক বিকাশের স্তরের বিষয়গত মূল্যায়ন করতে গেলে কেবল গতকাল যা ছিল তার সঙ্গে তুলনা দিলেই চলবে না, — আজ অন্যান্য দেশে যা আছে তার সঙ্গেও, — অর্থাৎ বিশ্বের মানদণ্ডে তুলনা করা দরকার। এ ধরনের তুলনা যথেষ্ট অর্থপূর্ণ। পরিমাণগত দৃষ্টিতে: উৎপাদনের আয়তনের হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন দৃঢ়ভাবে বিশ্বের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে রয়েছে এবং বিশ্বের শিল্পজাত উৎপন্ন দ্রব্যের এক-পঞ্চমাংশ সে উৎপাদন করে থাকে ('দ্বিতীয় স্থান' কথাটির তাৎপর্যও অপরিবর্তিত হয়ে নেই: যুদ্ধপূর্বকালে এর অর্থ ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদনের ৪০ শতাংশ, আর এখন — প্রায় ৮০ শতাংশ)। গুণগত বিচারে: সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বে প্রথম রকেট,

মহাকাশযান ও বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরির সাহায্যে মহাকাশ চর্চার সূচনা করে, — যার মধ্য দিয়ে বৈজ্ঞানিক চিন্তার চূড়ান্ত ও যন্ত্রবিজ্ঞানের চরম কথা মূর্ত হয়ে উঠেছে।

পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ অথবা বিশ্বের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎকেন্দ্র — কেবল অর্থনীতিগত নয়, — সংস্কৃতিগত বিকাশেরও উচ্চ স্তরের স্বাক্ষ্য দেয়। এর পেছনে আছে সর্বজনীন অষ্টম শ্রেণী শিক্ষা, দশ লক্ষ বিজ্ঞানকর্মী (বিশ্বের সমগ্র বিজ্ঞানকর্মীর এক-চতুর্থাংশের বেশি), ৫০ লক্ষের উপর উচ্চ শিক্ষার্থী এবং ১৯১৮—১৯৭৩ সনে উচ্চ ও মাধ্যমিক বিশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষাপ্রাপ্ত ২ কোটি ৭০ লক্ষেরও বেশি বিশেষজ্ঞ। ক্লাব, গ্রন্থাগার, থিয়েটার ও মিউজিয়মের সংখ্যার হিসাবে এবং প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার পরিমাণের দিক থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বে প্রথম স্থানের অধিকারী।

বিশ-তিরিশ বছর আগেও সোভিয়েত জনগণ মানবজাতির সংস্কৃতিভাণ্ডারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। বিস্তৃত বুনিয়াদ ও প্রতিভার প্রকাশ ও স্ফুরণের জন্য অনুকূল পরিবেশ উক্ত অবদান বহুগুণ বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। আজ দেশে বিশ্বব্যাপী খ্যাতির অধিকারী হাজার হাজার বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়র, লেখক ও কবি, শিল্পী ও ভাস্কর, সুরকার ও সঙ্গীতশিল্পী, পরিচালক ও অভিনেতা রয়েছেন ও কাজ করে চলছেন।

জনগণের সমৃদ্ধিক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র বিকাশের ফলাফল নেহাৎ স্বল্প প্রভাব বিস্তার করে নি। ১৯৪০ থেকে ১৯৭৫ সনের মধ্যে জনসাধারণের মাথাপিছু প্রকৃত আয় ৪·৭ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত দুই পাঁচসালাকে একত্রে ধরলে ১৯৬৫

সনের তুলনায় মাসিক ১০০ রুবল এবং তদূর্ধ্ব আয়সম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা ১৯৭৫ সনে ৮·৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

কেবল সোভিয়েত জনসাধারণের বাসব্যবস্থার ব্যাপারে নয়, — অতীতে যে সব জিনিস বিলাসের সামগ্রী বলে গণ্য হত অথবা যার অস্তিত্বমাত্র ছিল না, জীবনযাত্রার সেই সব অসংখ্য দ্রব্যের (আসবাবপত্র, রেফ্রিজারেটর, টেলিভিশন, রেডিও-সেট, কাপড়-কাচা মেশিন, মোটরগাড়ি ইত্যাদি)। সরবরাহব্যবস্থার আমূল উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। মানুষের পরিচর্যা এবং তার প্রতি সমাজের তত্ত্বাবধানের সকল ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। ক্রেইশ ও কিণ্ডারগার্টেন, বিশ্রামভবন, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, হাসপাতাল, রোগপ্রতিষেধক প্রতিষ্ঠান, পর্যটনকেন্দ্র, স্টেডিয়াম, সুইমিং পুল ও খেলাধুলাসংক্রান্ত অন্যান্য নির্মাণকর্মের জাল চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

জনগণের জীবনযাত্রার মানের উল্লেখযোগ্য সূচক — মানুষের আয়ুর গড় পরিমাণ। সোভিয়েত ইউনিয়নে তা এখন ৭০ বছরের ঊর্ধ্বে পেঁাছেছে এবং এই গড় পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ বলে গণ্য হয়।

উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজের অপর একটি লক্ষণ — **সমাজতান্ত্রিক সংস্থার এবং সামাজিক সত্তা ও বোধের রূপগত পরিপূর্ণতা।**

এই পরিপূর্ণতা সাধারণভাবে পরিমাপ করার নয়। সংখ্যাতত্ত্ব সংঘটিত পরিবর্তনের আকার সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করে এবং তার জন্য বিশদ টীকার কোন প্রয়োজন হয় না; অথচ তাতেও উক্ত পরিপূর্ণতার পরিচয় ক্বচিৎ ধরা পড়ে। ঠিক বলতে গেলে অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও জনগণের

সমৃদ্ধিতে সোভিয়েত দেশের সাফল্য অর্জনের মধ্যেই সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিকাশমানতার মূল নিহিত আছে।

সমাজতন্ত্রের বনিয়াদের কথা ধরা যাক, — তা হল সামাজিক মালিকানা। গোড়ায় মনে হতে পারে যে যুদ্ধপূর্ব সময় থেকে তাতে তেমন কোন মৌলিক পরিবর্তন দেখা দেয় নি, — পরিমাণগত বিকাশ ঘটেছে মাত্র। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। যে উৎপাদনের উপায় নিয়ে সামাজিক সম্পদ গড়ে ওঠে, তা বৃদ্ধি পাওয়ার (পরিমাণগত ও গুণগত) সঙ্গে সঙ্গে উক্ত উপায়সমূহের সামাজিকীকরণের মাত্রা লক্ষণীয়ভাবে ঊর্ধ্বগামী হল, — এবং সর্বাগ্রে তা ঘটল সমবায়ী-যৌথখামারী মালিকানা বিকাশের ফলে।

উৎপাদনের সামাজিক উপায়ের ব্যবহার ও বন্দোবস্তের মান ও অর্থনীতি পরিচালনার মান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেল।

ব্যাপারটা এই যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি পরিচালনায় দক্ষতা অর্জন, — উৎপাদন ও বণ্টনে যথাযথ অনুপাত নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রস্তুতের বিদ্যা আয়ত্তে আনা, কলকারখানা পরিচালনার কাজে জনসাধারণের অংশগ্রহণ ও সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার মতো অর্থনৈতিক প্রগতির বিপুল পরিচালনা শক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষালাভ এবং এই ধরনের আরও বহু সমস্যার সমাধান রাতারাতি সম্ভব নয়। এসবেরই জন্য দরকার বিশেষ বিশেষ বিষয়গত ও বিষয়ীগত পরিস্থিতির সুপরিণতি, শ্রমিক, ইঞ্জিনিয়র, কারিগর, পরিচালক ও পরিকল্পনা-প্রস্তুতকারী উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন ও অভিজ্ঞ কর্মিদলের।

সামাজিক মালিকানা ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিব্যবস্থার পরিপক্বতার নিদর্শন — **সোভিয়েত ইউনিয়নে সামাজিক উৎপাদনের ক্রমবর্ধমান ফলপ্রসূতা।**

সোভিয়েত সমাজের সামাজিক কাঠামোর মধ্যেও নূতন ব্যবস্থার পরিপূর্ণতার **পরিচয় মেলে।** এখনও অবশ্য তা শ্রেণীহীন সমাজ নয়, কেননা একমাত্র পূর্ণ কমিউনিজমেই শ্রেণীর বিলোপ ঘটা সম্ভব। তবে তিরিশের দশকের মধ্যভাগে, — সমাজতন্ত্রের বিজয়ের ঠিক পর পর অবস্থাটা যে রকম ছিল এখন তার থেকে সমাজ অনেক এগিয়ে গেছে। সামাজিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের শ্রেণীগত ভাগের প্রাকার ভেঙ্গে পড়েছে, শ্রম ও জীবনযাত্রার পরিস্থিতি এবং শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবীসম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকৃতি কাছাকাছি হয়ে আসতে লাগল, সম অধিকারবিশিষ্ট মেহনতী মানুষের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের উত্তরোত্তর প্রকাশ ঘটতে থাকল।

একই ধরনের পরিবর্তন জাতীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমাজতন্ত্রের পূর্ণতাপ্রাপ্তির কথা বলা সম্পূর্ণ সম্ভব সর্বাগ্রে এই কারণে যে লেনিন নির্দেশিত জাতীয় নীতির কল্যাণে সোভিয়েত ইউনিয়নের সকল জাতির অর্থনীতির উন্নয়ন ও সংস্কৃতির বিকাশ সুনিশ্চিত হয়েছে, আর তারই ভিত্তিতে ইতিমধ্যে জাতিসমূহের রাজনৈতিক সম অধিকারমাত্র নয়, — তাদের যথার্থ সমতা অর্জিত হয়েছে। পিতৃভূমির মহাযুদ্ধের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সোভিয়েত জনগণের মৈত্রী দৃঢ়সংসক্ত হয়েছে। **জাতিসমূহের ঘনিষ্ঠতা, জনসাধারণের নূতন ঐতিহাসিক ঐক্য — সোভিয়েত জনগণ গড়ে ওঠার** বাস্তব প্রক্রিয়া তার ভিত্তিভূমি।

সমাজের অর্থনৈতিক বনিয়াদের বিকাশের সঙ্গে তার মানসিক জীবনযাত্রার পরিবর্তনের সংযোগ আছে। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব এখন আর কেবল প্রভুত্বকারী, অর্থাৎ অন্যান্য মতাদর্শের উপর আধিপত্য বিস্তারকারী তত্ত্বমাত্র নয়। বস্তুতপক্ষে তা সোভিয়েত ইউনিয়নের জনসাধারণের সর্বজনীন বিশ্ববীক্ষার মর্যাদা লাভ করেছে। বলাই বাহুল্য যে কথাটিকে একেবারে সহজ করে নিলে চলবে না: সমাজ-চৈতন্যের ক্ষেত্রে এখনও বিভিন্ন ধরনের অবৈজ্ঞানিক চিন্তার (বিশেষত ধর্ম) সাক্ষাৎ মেলে। কর্মসূচিতে রয়েছে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বে গভীরতর অধিকার অর্জন এবং বুর্জোয়া মতাদর্শের বিরুদ্ধে ও বিপ্লবী শিক্ষার বিভিন্ন রকম বিকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামসম্পর্কিত কর্তব্য। তবে, এখন এই সংগ্রাম দৃঢ়ভাবে অধিকৃত পাদভূমি থেকে পরিচালিত হচ্ছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের নূতন ঐতিহাসিক জনসমাজ গঠনের কথা প্রসঙ্গে আমরা উক্ত প্রক্রিয়ার একটি দিকের উপর — ঠিক বলতে গেলে, সোভিয়েত সমাজের আন্তর্জাতিকীকরণের উপর বিশেষ জোর দিয়েছি। তবে প্রক্রিয়াটির আরও একটি দিক আছে — তা হল সামাজিক সমরূপতার দিকে অগ্রসরণ। সোভিয়েত ইউনিয়নে উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজের সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ: ‘আমাদের দেশে গড়ে উঠেছে নূতন ঐতিহাসিক জনসমাজ — সোভিয়েত জনগণ। আর তার অর্থ এই যে সামাজিক ও জাতীয় ভেদাভেদের উর্ধ্বে সোভিয়েত জনসাধারণের আচার-ব্যবহার, প্রকৃতি ও বিশ্ববীক্ষার সাধারণ চরিত্র ক্রমেই আরও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে। তার অর্থ এই যে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর যে জোট সর্বদা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তিস্বরূপ,

তা সমাজতান্ত্রিক অবস্থানে বহুকাল যাবৎ দৃঢ়সংসক্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঐ দুই শ্রেণীর অচ্ছেদ্য রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত ঐক্যের মধ্যে নিজস্ব বিকাশ খুঁজে পেয়েছে। আজ সমগ্র মেহনতী জনসাধারণ এবং কায়িক ও বুদ্ধিমার্গীয় শ্রমের কর্মীদের দৃঢ় ঐক্যবদ্ধতা, শ্রমিক শ্রেণী, যৌথখামারের কৃষককুল ও গণ বুদ্ধিজীবীসম্প্রদায়ের ঐক্য যে আমাদের বাস্তব জীবনের প্রকৃত ঘটনা, আজ আমরা একথা বলার অধিকার রাখি। এই ঐক্যে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে শ্রমিক শ্রেণী, এবং তা দৃঢ় ও অবিচ্ছেদ্য!' (ল. ই. ব্রেজনেভ। মস্কো শহরের বাউমান নির্বাচনী এলাকার ভোটদাতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারকালে প্রদত্ত ভাষণ, ১৪ জুন, ১৯৭৪)।

সপ্তম অধ্যায়

কমিউনিজমের পথ

৩৩ ॥ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও বৈজ্ঞানিক-টেকনিক্যাল বিপ্লব

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ

পরিণত সমাজতন্ত্রে সমাজ যত উচ্চ স্তরে পৌঁছুক না কেন, এটা স্পষ্ট যে সেখানেই ছেদ নয়, — কমিউনিজমে আরোহণের আর একটি সোপানমাত্র। সমাজতন্ত্রকে যে অনড় এবং চিরকালের জন্য বেঁধে দেওয়া কোন একটা কিছু বলে মনে করা ঠিক হবে না, — ইতিপূর্বে উল্লেখ করা ভ. ই. লেনিনের সেই কথাগুলির ভিত্তি এখানেই। আজ এটা প্রত্যক্ষ যে উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ সমগ্র ঐতিহাসিক পর্ব জুড়ে থাকে এবং সেই পর্ব ধরে ধীরে ধীরে কমিউনিজমের মূলনীতি প্রতিষ্ঠার উপযোগী পরিস্থিতি গড়ে তুলতে হয়, বহু জটিল সমস্যার সমাধান করতে হয়।

সেগুলির মধ্যে প্রধান — যাতে জনসাধারণের বিজ্ঞানভিত্তিক মান অনুযায়ী চাহিদা পুরোপুরি মেটানো সম্ভব হয় সেই উদ্দেশ্যে সামাজিক শ্রমের উৎপাদনশীলতা

এবং অতঃপর বৈষয়িক ও মানসিক সম্পদের প্রাচুর্য অর্জন। বোঝাই যাচ্ছে যে তাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং পশ্চিম ইউরোপের উন্নত দেশগুলিতে অর্জিত শ্রমের উৎপাদনশীলতা ছাড়িয়ে যেতে হবে।

শ্রমের উৎপাদনশীলতার মানদণ্ডে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি এখনও কেন অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি থেকে পিছিয়ে আছে এই প্রশ্ন করতে গেলে বিবেচনা করে দেখা দরকার যে পুঁজিবাদী দেশগুলি যথেষ্ট সুবিধার অধিকারী। প্রথমত, সেগুলি এমন অঞ্চলের অন্তর্গত, যেখানে অনুকূল পরিস্থিতিবশত (ঘন জনবসতি, সহজ মেলামেশা এবং বৈষয়িক সামগ্রী ও জ্ঞানের আদান-প্রদানের সুযোগ, নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া ইত্যাদি) সভ্যতার রাজবর্ত্ম নির্মিত হয়ে আছে এবং অন্য যে-কোন জায়গার আগে শিল্প বিকাশের পূর্বশর্ত তৈরি হয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের ক্ষমতাসীন শ্রেণী ঔপনিবেশিক লুণ্ঠনের পথে পদানত জাতিসমূহের উপর শোষণ চালিয়ে বিপুল পরিমাণ সঙ্গতি সঞ্চয় করেছে, — যার ফলে শাসক দেশগুলিতে শিল্প বিকাশের গতি প্রভূত বৃদ্ধি পেয়েছে; নয়া উপনিবেশবাদ এবং অর্থনৈতিক পরাধীনতার সাহায্যে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি আজও এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বহু দেশ থেকে উপরি মুনাফা লোটে। এই ঘটনা এবং অন্যান্য ঘটনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে শ্রমের উৎপাদনশীলতার সর্বোচ্চ পর্যায় গড়ে তোলার কোন সামর্থ্য পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার নিজের নেই; অথচ বুর্জোয়া মতাদর্শবাদীরা তার বিপরীত প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। ঐ জাতীয় কল্পনার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে পুঁজিবাদী দুনিয়ায় উন্নত দেশগুলির পাশাপাশি

অনুন্নত দেশও রয়ে গেছে এবং উন্নত দেশগুলি যখন সমৃদ্ধি লাভ করতে থাকে, অনুন্নতরা তখন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে।

অবশ্য, নির্মম উপায়ে শ্রমের তীব্রতা বৃদ্ধি এবং নূতন প্রযুক্তিবিদ্যা প্রচলনের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক নিয়ম যে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে নির্দিষ্ট প্রেরণা সঞ্চার করে একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু পুঁজিবাদ ইতিমধ্যে দু'শ বছরেরও বেশি বিদ্যমান, স্বাভাবিকভাবেই তা নিজের মূলনীতির 'পূর্ণতাসাধনে'র এবং সাধ্যমতো সীমানায় তাকে দাঁড় করানোর মতো অবসর দিয়েছে। আর সমাজতন্ত্র তার ঐতিহাসিক যাত্রা শুরু করেছে মাত্র।

সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের বিকাশ এবং সোভিয়েত জনসাধারণের চাহিদার পূর্ণতর পরিতৃপ্তির পক্ষে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি যে সবচেয়ে প্রধান ব্যাপার — একথা আমরা বলি কেন?

অবশ্য অন্য উপায়েও উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়: যত বেশি সম্ভব কলকারখানা, খনি গড়ে তুলে, ফসল উৎপাদনের বিস্তার ইত্যাদি ঘটিয়ে। কিন্তু অর্থনীতির এমন ব্যাপক বিকাশের ক্ষেত্রে, এমন কি গঠনকর্মের বর্তমান উন্নত গতি বজায় থাকলেও একমাত্র শিল্প দ্রব্যের উৎপাদন দ্বিগুণ করতেই কয়েক দশক লেগে যাবার কথা। আর ব্যাপারটা কেবল সময় নিয়ে নয়। অনিবার্যভাবে প্রশ্ন উঠত, নূতন নূতন কলকারখানায় কাজের জন্য কোটি কোটি শ্রমিকই বা কোথায় পাওয়া যাবে?

জাতীয় অর্থনীতিতে নিযুক্ত কর্মীদের সংখ্যাবৃদ্ধির যেখানে একটা সীমা আছে, সেখানে সমাজতন্ত্রের পরিস্থিতিতে শ্রমের উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি সীমাহীন। স্বভাবতই, আমরা

নূতন নূতন কারখানা নির্মাণ করি না তা নয়, — তবে আমাদের সামাজিক উৎপাদন বিকাশের মূল উৎস — শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।

এই মূল সমস্যার সমাধানের পথই বা কী?

সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্বের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক-টেকনিক্যাল বিপ্লবের সাফল্যের সংযোগসাধন

কার্ল মার্কসের কথায়, মানবজাতি কেবল সেই সব সমস্যাই উত্থাপন করে, যেগুলির সমাধান তার পক্ষে সম্ভব। সমাজতন্ত্র কল্পনা থেকে বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের বাস্তব সমস্যায় পরিণত হতে পারে একমাত্র এই কারণে যে তার প্রয়োজনীয় উৎপাদনী শক্তি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে। কেবল বৃহৎ যন্ত্রশিল্পই যে সমাজতান্ত্রিক সমাজের বৈষয়িক বনিয়াদ হতে পারে তার উপর জোর দিয়ে মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতারা বিজ্ঞান ও প্রকৌশলগত প্রগতির ভিত্তিতে তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।

এই ব্যাপারে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং বিংশ শতাব্দীর সূচনা সকল প্রত্যাশা ছাড়িয়ে গেছে। বহু বনিয়াদি আবিষ্কারের ফলে, — সর্বোপরি পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আবিষ্কারের ফলে অভিনব প্রযুক্তিগত প্রাচুর্য ঝরে পড়ল: রুডল্‌ফ ডিজেলের ইঞ্জিন, আলেক্সান্দর পপোভের রেডিও, টমাস এডিসনের ধ্বনিগ্রাহক যন্ত্র, লুমের ভ্রাতৃদ্বয়ের চলচ্চিত্র ক্যামেরা ইত্যাদির আবির্ভাব ঘটল। অনেকেরই তখন ধারণা হয়েছিল যে এমন বেশি দিন চলতে পারে না, সৃজনী শক্তি অবশ্যম্ভাবীরূপে নিঃস্ব হয়ে আসবে, অপেক্ষাকৃত মন্দার পর্ব দেখা দেবে। কিন্তু এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী সত্ত্বেও দেখা গেল যে এসবই মানবপ্রতিভার জয়যাত্রার সূচনা, তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রস্তাবনামাত্র।

মোটামুটি এই শতাব্দীর বিশের দশকে বিজ্ঞান ও প্রকৌশলগত বিকাশের বন্যাস্রোত শুরু হল। বনিয়াদি আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের স্রোত বৃদ্ধি পেতে পেতে একে একে বিজ্ঞানসংক্রান্ত জ্ঞানের সকল শাখায় ছড়িয়ে পড়ল, মহাকাশ, অণুবিশ্ব ও জীবকোষের রহস্য ভেদ করল। হাজার বছরের ঐতিহ্যসম্পন্ন চিরাচরিত বিজ্ঞানের সন্ধিলগ্নে জীবরসায়ন ও রশ্মিবিকিরণমূলক প্রজননশাস্ত্র অথবা জ্যোতিৰ্পদার্থবিদ্যা ও নভোউদ্ভিদবিদ্যার মতো বিজ্ঞানের নূতন নূতন শাখা জয়লাভ করেছে ও দ্রুত পরিপূর্ণতা অর্জন করেছে। শক্তির নূতন নূতন উৎসের আবিষ্কার ও কৃত্রিম উপাদান সৃষ্টির কল্যাণে মানুষের জ্ঞানের দিগন্ত এবং প্রকৃতির উপর তার প্রভুত্বের সীমা অসাধারণ বিস্তৃত হয়েছে। সাইবারনেটিক্স ও কম্পিউটার পদ্ধতির উদ্ভব উৎপাদন পরিচালনক্ষেত্রে বিপ্লবের সূচনা করেছে। শত শত বছর ধরে নির্দিষ্ট ধরনের প্রযুক্তিগত উন্নতিসাধন নিয়ে সন্তুষ্ট শিল্পের কোন কোন শাখায় কেবল আমূল কৌশলিক পরিবর্তনেরই দরকার হল না, — অন্তত প্রতি দশ বছর অন্তর অন্তর প্রকৌশলের আগাগোড়া নবীকরণ আবশ্যক হয়ে পড়ল।

ইংরেজ পদার্থবিদ ও সমাজকর্মী জন বার্নাল এর নাম দিয়েছেন **বৈজ্ঞানিক-টেকনিক্যাল বিপ্লব।** তাঁর এই পরিভাষা ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করেছে। সত্যি সত্যিই আমাদের কথাটা হচ্ছে বিপুল পরিমাণ গুণগত ওলটপালট নিয়ে, — যা তার পরিধি ও গভীরতার দিক থেকে সভ্যতার ইতিহাসে বাষ্পশক্তি ও বিদ্যুৎ আয়ত্তে আনা এবং শারীরিক শ্রম থেকে যন্ত্রচালিত শ্রমে উত্তরণের মতো বিপ্লবী পথনির্দেশকে ছাড়িয়ে যায়।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক-টেকনিক্যাল বিপ্লবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল বিজ্ঞানের ভূমিকার আমূল পরিবর্তন। অতীতে বিজ্ঞানের ভূমিকা মূলত ছিল জ্ঞানের হাতিয়ার হিশেবে। কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে (বলবিদ্যার নিয়ম যন্ত্রপাতি নির্মাণে এবং পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের নিয়ম — পরীক্ষামূলক পদ্ধতিতে প্রকৌশলগত উৎকর্ষসাধনে সহায়তা করে) উৎপাদনপ্রক্রিয়ার বিকাশে এবং শ্রমের হাতিয়ারের উৎকর্ষসাধনে তার প্রভাব প্রত্যক্ষ বা সরাসরি ছিল না। আজ বিজ্ঞান আরও বেশি পরিমাণ উৎপাদনের সরাসরি ও সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বহু ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অতীতে শিল্পের যে-সব শাখা অপরিচিত ছিল তার ভিত্তি রচনা করেছে। অন্যান্য চিরাচরিত শিল্পের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং নূতন যন্ত্রবিজ্ঞান ও প্রকৌশল প্রয়োগের ভিত্তিতে দ্রুত সামাজিক শ্রমের উৎপাদনশীলতা বহুগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক-টেকনিক্যাল বিপ্লবের প্রভাব কোন ক্রমেই শ্রমের হাতিয়ার ও উপায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, — তা সমাজের মুখ্য উৎপাদনী শক্তি — মানুষের ক্ষেত্রেও প্রসারিত। এই প্রভাব বহু ধরনের। এক দিক থেকে তা আধুনিক শ্রমিক, কারিগর ও ইঞ্জিনিয়রের কাছ থেকে আরও উচ্চ পর্যায়ের বৈজ্ঞানিক শিক্ষামূলক তালিম এবং বিশেষীকৃত জ্ঞানমাত্রই নয়, — সাধারণ চর্চারও দাবি করে। অন্য দিকে, তার কল্যাণে সামাজিক সম্পদের সৃষ্টি শ্রমসময় ব্যয়ের উপর প্রত্যক্ষভাবে আরও কম নির্ভর করে, বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের সাফল্যের দ্বারা আরও বেশি পরিমাণে নির্ধারিত হয়। কার্ল মার্কস উৎপাদনী শক্তির অনুরূপ বিকাশের সঙ্গে শ্রমের নিজস্ব চরিত্র পরিবর্তনকে সম্পর্কিত করেছেন: ‘শ্রম এখন

আর ততটা উৎপাদনপ্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে রইল না, যতটা হয়ে দাঁড়াল এমন এক শ্রম, যেখানে অপর পক্ষে উৎপাদনপ্রক্রিয়ার সঙ্গেই মানুষের সম্পর্ক — নিয়ামকের ও নিয়ন্ত্রণকারীর।'

উৎপাদনের স্বয়ংক্রিয়তা মানুষকে যন্ত্রের পেছনে একঘেয়ে ও অর্থহীন পরিচালনশক্তির ব্যবহার থেকে ধীরে ধীরে নিষ্কৃতিলাভের এবং সৃজনশীল ও গঠনমূলক কার্যকলাপে শক্তি কেন্দ্রীভূত করার সম্ভাবনা এনে দিয়েছে — আধুনিক বৈজ্ঞানিক-টেকনিক্যাল বিপ্লব এমনই বাস্তব সম্ভাবনার দ্বার উদ্ঘাটন করেছে। এই সম্ভাবনা সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের সম্পূর্ণ উপযোগী। সেই সঙ্গে জনসাধারণের স্বার্থের উপযোগী পরিকল্পিত অর্থনীতিসম্পন্ন সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সীমা অনন্ত বিকাশের সর্বাপেক্ষা অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে তুলতে সক্ষম। এইভাবে, বৈজ্ঞানিক-টেকনিক্যাল বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত, তারা একে অপরের সহযোগী এবং পরিণামে মানবসভ্যতার অগ্রগতির একই অনিবার্যতা তাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেস যে সমস্যাটি উত্থাপন করেছে তা হল সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্বের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক-টেকনিক্যাল বিপ্লবের সমন্বয়সাধন।

বৈজ্ঞানিক-টেকনিক্যাল বিপ্লবের সাফল্য এবং সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব যদি একে অপরের সহযোগী হয়, উভয়ে যদি একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় তবে সমন্বয়ের কথা ওঠে কেন? কথা ওঠে এই কারণে যে এসব প্রক্রিয়ার লক্ষ্য ও গতিপ্রকৃতির মিল সামাজিক উন্নতির গতিবৃদ্ধির বিষয়গত সম্ভাবনা তৈরি করে মাত্র। এই সম্ভাবনাগুলি আপনা-আপনি

বাস্তবায়িত হয় না। তাকে বাস্তবে পরিণত করতে হলে মানুষের লক্ষ্যনিষ্ঠ কার্যকলাপের প্রয়োজন, প্রয়োজন যথোচিত নীতির।

খুব সাধারণ একটা উদাহরণ। সমাজতন্ত্রের বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব — তার পরিকল্পনা অনুযায়ী বিকাশ। বৈজ্ঞানিক-টেকনিক্যাল বিপ্লবের বিশিষ্ট সাফল্য — কম্পিউটার যন্ত্রবিজ্ঞান। দুয়ের সুষম সমন্বয় নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য ফলাফলের সূচনা করতে এবং অর্থনীতিসংক্রান্ত কার্যকলাপ সক্রিয় করে তুলতে ও তার ফলাফলবৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। কিন্তু এমন সমন্বয় মোটেই সাধারণ ব্যাপার নয়। তার উপযুক্ত কর্তব্য সামনে রাখার পরও ইলেক্ট্রনিক কম্পিউটার যন্ত্রের সাহায্যে পরিকল্পনাগঠন পদ্ধতি উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে এবং পরিকল্পনের চাহিদা অনুযায়ী উক্ত যন্ত্রের উৎকর্ষসাধন, বিশেষজ্ঞদের পুনর্বার শিক্ষা ইত্যাদির পেছনে কম শক্তি ব্যয় করতে হয় না।

সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্বের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক-টেকনিক্যাল বিপ্লবের সাফল্যের সমন্বয়সাধন — অবশ্যই এককালীন কাজ নয়, — নূতন নূতন সমস্যা সমাধানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এক অবিরাম সৃজনী প্রক্রিয়া। সমাজতন্ত্রের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি যত বেশি পরিপূর্ণতা লাভ করবে, বৈজ্ঞানিক-টেকনিক্যাল প্রগতির সম্ভাবনাও ততই খুলে যাবে। নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবন আবার তার দিক থেকে সামাজিক উন্নতির গতিবৃদ্ধি এবং আমাদের লক্ষ্যে দ্রুত সাফল্য অর্জন সম্ভব করে।

উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজের শ্রেষ্ঠত্বের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক-টেকনিক্যাল বিপ্লবের সাফল্য সমন্বয়ের পথেই কমিউনিস্ট গঠনকর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা — সামাজিক শ্রমের সর্বোচ্চ উৎপাদনশীলতা প্রবর্তন — সমাধান করা যাবে।

৩৪ ॥ কমিউনিজমের দিকে গমনের দ্বন্দ্বতত্ত্ব

বিষয়গত প্রক্রিয়া ও সচেতন কার্যকলাপ

সমাজতন্ত্র — কমিউনিজমের প্রথম পর্যায়। একই সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দুই পর্যায়ের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই প্রাকার নেই। কমিউনিজম উন্নত সমাজতন্ত্র থেকে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে। এর জন্য সমস্ত কিছু ভেঙ্গে আবার গড়ার দরকার হয় না: যা দরকার তা হল সমাজতন্ত্রের উৎপাদন বনিয়াদ এবং সামাজিক সম্পর্কের বিকাশ ও উৎকর্ষসাধন এবং প্রয়োজনমতো তার পুনর্গঠন, আর তাতে নিবিড়ভাবে কমিউনিজমের দিকে পৌঁছানো সম্ভব হবে।

অর্থনীতি ও সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এবং মানুষের চৈতন্যে ও মনস্তত্ত্বজগতেও গুণগত পরিবর্তন ঘটতে থাকবে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি, সামাজিক সম্পর্ক ও জনসাধারণের কমিউনিস্ট চেতনার ক্রমিক উৎকর্ষের অর্থ মোটেই সামাজিক প্রগতির মন্দগতি নয়। বরং তার বিপরীত, — সমাজতান্ত্রিক সমাজ যত বেশি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবে, তার অগ্রগতিও তত দ্রুত হবে: কমিউনিস্ট গঠনকর্মের গতি নিরন্তর বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

কমিউনিস্ট সমাজ নির্মাণকর্মে কঠোরতম ধারাবাহিকতার প্রয়োজন আছে: যেমন তাড়াহুড়ো করে আগে দৌড়ে যাওয়া ঠিক নয়, তেমনি ঠিক নয় আসন্ন কোন পরিবর্তনের রূপায়ণ থেকে বিরত থাকা। লেনিন বাস্তব রাজনীতির শিক্ষা দিয়েছেন। ভবিষ্যতের প্রতি নজর দিতে পারার অর্থ মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া নয়, — বাস্তব জরুরী পরিস্থিতির কথা সর্বদাই মনে রাখতে হবে।

যৌথখামারীর সহায়ক অর্থনীতি এর দৃষ্টান্ত মিলবে। ভবিষ্যতে এর ভাগ্য কী হবে তার উত্তর সম্পূর্ণ পরিষ্কার: তার বিলোপ ঘটতে বাধ্য। আর কেন, — তাও স্পষ্ট। প্রথমত, সহায়ক অর্থনীতিক্ষেত্রে শক্তিসম্পন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুযোগ থাকে না, স্বল্প উৎপাদনের পেছনে অধিক শ্রম ব্যয়িত হয় — এক কথায় সহায়ক অর্থনীতি ব্যবস্থায় শ্রম — স্বল্প-উৎপাদনী, — কমিউনিজমে যা বজায় রাখার কোন অর্থ হয় না। দ্বিতীয়ত, এবং এটা মুখ্য, — কমিউনিস্ট সমাজে সব মানুষ কেবল সামাজিক উৎপাদনে এবং সমাজের জন্য কাজ করবে, আর তার চাহিদা মেটানো হবে কেবল সামাজিক সঙ্গতি থেকে — এই ধারণার সঙ্গে সহায়ক অর্থনীতি বিষয়গত, খাপ খায় না।

তবে এই মুহূর্তে যৌথখামারীরা সহায়ক অর্থনীতিকে প্রত্যাখ্যান করতে পারছে না, কেননা তা তাদের ব্যক্তিগত চাহিদা আরও ভালোভাবে মেটানোর এবং সচ্ছলতা বৃদ্ধির সহায়তা করে চলছে। এই পরিস্থিতিতে সহায়ক অর্থনীতি উচ্ছেদের প্রশ্ন তোলাটা ভুল হবে। অর্থনীতিগতভাবে তার অবসান কাম্য। কৃত্রিমভাবে এই প্রক্রিয়ার গতিবৃদ্ধির তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা — উদ্দেশ্যের পক্ষে ক্ষতিকারকই হবে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিকাশ — বিষয়গত, এবং নিয়মিত প্রক্রিয়া, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে। কমিউনিজম গঠনের জন্য দরকার সমাজের সামনে উপস্থিত সমস্যার সক্রিয়, সৃজনধর্মী সমাধান। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সোভিয়েত দেশের জনসাধারণের সচেতন, লক্ষ্যাভিমুখী কর্মপরিচালনায় কমিউনিজম প্রতিষ্ঠিত হয়।

বৃদ্ধির স্ববিরোধ ও বাধা

অগ্রগতি সর্বদাই **বিরোধ অতিক্রমের** সঙ্গে এবং কোন এক সময়ে ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করলেও পরে বিকাশের

প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে এমন সব প্রাচীন, থিতিয়ে পড়া অভ্যস্ত রূপের ভাঙ্গনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

সমাজতন্ত্রের স্ববিরোধ এবং পুঁজিবাদের স্ববিরোধের মধ্যে পার্থক্য আছে। এখানে বিরোধ হল বৃদ্ধির: সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির উন্নয়নের সঙ্গে, জনগণের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক চাহিদাবৃদ্ধির সঙ্গে; বিরোধ — নূতন ও পুরাতনের মধ্যে, অগ্রণী ও পশ্চাৎপদের মধ্যে।

পুঁজিবাদী সমাজে উৎপাদনী শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে বিরোধ অনিবার্যরূপে সংঘর্ষের আকার ধারণ করে, এবং সে সংঘর্ষ পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যে সমাধিত হতে পারে না বলে তা সমাজব্যবস্থারূপে পুঁজিবাদের বিনাশ ডেকে আনে। সমাজতন্ত্রে সম্পত্তির সামাজিক মালিকানা উৎপাদনী শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে সংঘর্ষ নিবারণ করে। সামাজিক মালিকানা উৎপাদনী শক্তিবৃদ্ধির অনুকূল সম্ভাবনা গড়ে তোলে।

তা হলে আর উৎপাদনের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরোধটা কোথায়? বিরোধ এখানেই যে উৎপাদনী শক্তির বিকাশের পরিমাণ অনুযায়ী উৎপাদন-সম্পর্কের কোন কোন সূত্র পিছিয়ে পড়ে থাকে। এক ধরনের সংযোগ সূত্রের বদলে অন্য ধরনের সংযোগ সূত্র স্থাপনের ফলে সমাজতান্ত্রিক সম্পর্কের মূলকথা পাল্‌টায় না, — বরঞ্চ তা বিকশিত হয়, সমৃদ্ধ হয়। বিরোধ স্বয়ং মীমাংসিত হয় সমাজের দ্বারা, তা সমাজকে বিকাশের নূতন সোপানে উত্তোলন করে।

বিরোধ আপনা-আপনি অতিক্রান্ত হয় না, — তা রক্ষণশীলতা, জাড্য ও পশ্চাৎপদতাবিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়।

সোভিয়েত সমাজের সামনে আরও এক ধরনের বাধা দেখা দেয়।

যেমন, বেশ কিছু সঙ্গতি দেশের প্রতিরক্ষা কাজে আমাদের ব্যয় করতে হয়। জাতীয় অর্থনীতির বাজেটে এটা এক বিরাট বোঝা। কিন্তু আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সেনাবাহিনী সজ্জিত করতে আমরা বাধ্য। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছ থেকে সামরিক আক্রমণের আশঙ্কা যতদিন আছে, ততদিন গোলা-বারুদ শুকনো রাখতে হবে।

সাময়িক প্রকৃতির বাধা-বিপত্তিও আছে। কখনো কখনো খরা অথবা ভূমিকম্পের মতো প্রত্যক্ষ ক্ষয়-ক্ষতিমূলক বিষয়গত কারণবশত তা দেখা যায়। দূর প্রাচ্য ও সাইবেরিয়ার কঠিন প্রাকৃতিক পরিস্থিতি অবশ্যই দেশের এই সব প্রাকৃতিক সম্পদসমৃদ্ধ অঞ্চল থেকে সম্পদ উদ্ধারের পথে প্রতিবন্ধকস্বরূপ। শ্রমশক্তি বণ্টন, তার প্রস্তুতি ও পুনঃপস্তুতির ক্ষেত্রে এমন সব জটিল সমস্যা উদ্ভূত হয় যেগুলি একমাত্র দীর্ঘকালীন প্রচেষ্টার ফলে সমাধান করা যেতে পারে। যেমন, বলা যেতে পারে কোন খনি অঞ্চলে মূল্যবান খনিজ সম্পদের ভাণ্ডার কমে গেলে শ্রমশক্তি উদ্বৃত্ত হয়ে পড়তে পারে, এবং এটা বেশ বোঝা যায় যে জনসাধারণের পুনর্বাসন ব্যবস্থা অথবা তাদের বৃত্তি অনুযায়ী এই জায়গায় তাদের কর্মসংস্থান খুব একটা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। বৈজ্ঞানিক-টেকনিক্যাল প্রগতির ফলে বৃত্তিকে বৃত্তি লোপ পায়, আর সেই কারণেই জনসাধারণকে নূতন কাজে শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মজুরিও যাতে হ্রাসপ্রাপ্ত না হয় সেদিকে নজর রাখা দরকার। সমাজজীবনে এ ধরনের শত শত সমস্যা দেখা দেয়, তাছাড়া এর মধ্যে অনেকগুলি

আগে থাকতে আন্দাজ করা সম্ভব হলেও এমন সমস্যাও কম নেই যার আবির্ভাব আকস্মিক।

বিষয়ীগত কারণেও বাধা দেখা দিতে পারে। পরিকল্পনের অসঙ্গতি, উপকরণ ও শ্রমবণ্টন সমস্যাসমাধানে ত্রুটি জাতীয় অর্থনীতিতে অসামঞ্জস্যের সূচনা করতে পারে, বিকাশের গতিতে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

অবশ্যই, নূতন সমাজ গঠনের মতো জটিল কাজে, — যেখানে অবিরাম অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের এখন পর্যন্ত অজ্ঞাত রূপের প্রচলন ও প্রয়োগক্ষেত্রে তার পরীক্ষা লেগেই আছে, সেখানে ভুলত্রুটি একেবারেই হবে না এমন গ্যারাণ্টি দেওয়া যায় না। এক্ষেত্রে কর্তব্য হল ভুলচুক যতদূর সম্ভব কমিয়ে আনা, এবং কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রধান কাজই হল সকল সামাজিক সমস্যার সবচেয়ে ফলপ্রসূ ও উত্তম সমাধান খুঁজে বার করা।

সমস্যার ত্রিধারা

মার্কসীয়-লেনিনীয় তত্ত্বের অন্যতম মূলনীতি হল কোন রকমের অবাস্তব পরিকল্পনা কিংবা আগে থাকতে ভবিষ্যতের খুঁটিনাটি ব্যাপার সম্পর্কে সুনিশ্চিতভাবে কিছু বলার চেষ্টা না করা। একমাত্র জীবনই নির্দিষ্ট সমস্যার নির্দিষ্ট সমাধান বলে দিতে পারে, এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কমিউনিস্ট বণ্টনব্যবস্থা কোথা থেকে শুরু হবে আজকে তা আন্দাজ করার চেয়ে নিরর্থক আর কিছুই হতে পারে না।

অবশ্যই, এই মূলনীতি কেবল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই প্রসারিত। বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীতে ভবিষ্যতের বর্ণনা, —

অবশ্য যদি তা অলস কল্পনাবিলাস না হয়ে বৈজ্ঞানিক ধারণার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে, — ভাবনাকে উদ্বুদ্ধ করতে, মহৎ উদ্দেশ্যে আমাদের আকর্ষণ করতে এবং কল্পনায় সমৃদ্ধ করে তুলতে সাহায্য করে।

মার্কসীয়-লেনিনীয় বিজ্ঞান সম্পর্কে বলা যায় যে **কমিউনিজমের মূলতত্ত্বের** ভবিষ্যৎ বিবরণ প্রসঙ্গে তার মতামত অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। উক্ত বিবরণের পশ্চাতে আছে সামাজিক বিকাশের বিষয়গত নিয়মসংক্রান্ত জ্ঞান। এই জ্ঞানের ভিত্তি — সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা।

কমিউনিজমের মূলতত্ত্ব এবং কোন লক্ষ্য অর্জন আমাদের কাম্য তা জানার পর আমরা কমিউনিজম গঠনের **মূল ধারা** নির্ধারণ করি। আর তা হল **কমিউনিজমের বৈষয়িক-টেকনিক্যাল বনিয়াদ গঠন, কমিউনিস্ট সামাজিক সম্পর্কসংগঠন এবং নূতন মানুষের শিক্ষা।**

প্রথম বিচারেই কমিউনিজম গঠনের মূল ধারাসমূহের অবিচ্ছেদ্য পারস্পরিক সম্পর্ক ধরা পড়ে। কলকারখানা নির্মাণ ক'রে, সামাজিক সম্পদের বৃদ্ধি ঘটিয়ে আমরা তার দ্বারা শ্রম ও বণ্টনব্যবস্থার কমিউনিস্ট মূলনীতিতে উত্তরণের পরিস্থিতি গড়ে তুলি, অর্থাৎ সামাজিক সম্পর্কের উৎকর্ষ সাধন করি। সামাজিক সম্পর্কের বিকাশের ফলে মানুষের চেতনার পুনর্গঠন এবং নূতন নৈতিক গুণাবলীসংক্রান্ত শিক্ষা ঘটে। কমিউনিস্ট সামাজিক সম্পর্ক এবং নূতন মানুষের শিক্ষা তাদের দিক থেকে উৎপাদনী শক্তি বিকাশের ক্ষেত্রে গভীরতম প্রভাব বিস্তার করে।

৩৫ ॥ কমিউনিজমের বনিয়াদ

কমিউনিস্ট সমাজ গঠন — সর্বোপরি তার বৈষয়িক-টেকনিক্যাল বনিয়াদ গড়ে তোলা, অর্থাৎ উৎপাদন বিকাশের এমন এক গুণগত ও পরিমাণগত মাত্রায় পেঁছানো, — যাতে কমিউনিজমের মূলনীতি প্রচলন করা যায়। এই মাত্রায় পেঁছানো যাবে একমাত্র বৈজ্ঞানিক-টেকনিক্যাল বিপ্লবের ফলাফলের সম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ ব্যবহার এবং অর্থব্যবস্থায় উক্ত ফলাফলের বাস্তব প্রচলনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে।

সামাজিক শ্রমের উচ্চ উৎপাদনশীলতা অর্জনের সমস্যা মীমাংসিত হওয়ার এবং পরবর্তী পাঁচসালাসমূহ সম্পাদনের পরিণাম অনুযায়ী বর্তমানে কমিউনিস্ট সমাজের উৎপাদন বনিয়াদ স্থাপিত হয়। এই প্রক্রিয়ার মূল উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

শক্তিবিজ্ঞান

কমিউনিজমের প্রকৌশলক্ষেত্রে বিদ্যুৎশক্তির বিরাট প্রাধান্যের সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণের কারণ এই যে বিদ্যুৎশক্তি সহজেই অন্যান্য শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে (যান্ত্রিক, তাপশক্তি, রাসায়নিক), বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা যায় (যার ফলে তা বিভিন্ন যন্ত্রে এবং অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতিতে ব্যবহার করা সম্ভব) এবং বহুদূরে প্রেরণ করা যায় (উৎপাদনের উত্তম সংস্থানে তা সহায়তা করে)। এর ফলে বিদ্যুৎশক্তিই রূপান্তরিত হয় আধুনিক প্রকৌশলগত প্রগতির ভিত্তিতে।

অর্থনীতির প্রবল বিকাশ ও জনসাধারণের সচ্ছলতাবৃদ্ধির ফলে বিদ্যুৎশক্তির যে বিরাট চাহিদা দেখা দেবে তা একমাত্র

দেশের পূর্ণ বৈদ্যুতীকরণের ফলেই মেটানো যেতে পারে।

দেশের পূর্ণ বৈদ্যুতীকরণের জন্য শক্তিব্যবস্থার আরও প্রসার প্রয়োজন। **সোভিয়েত ইউনিয়নের অখন্ড শক্তিব্যবস্থা** প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শক্তিব্যবস্থার একত্রীকরণ সম্পন্ন হবে। এই ব্যবস্থার ফলে সম্পূর্ণ অভাবনীয় পরিমাণ ও জটিল ধরনের অনবদ্য নির্মাণকর্ম বাস্তবে পরিণত হবে। অখন্ড শক্তিব্যবস্থা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিদ্যুৎশক্তি চালিত অর্থনীতির পক্ষে অত্যন্ত লাভজনক হবে এবং তাকে আরও নিপুণভাবে কাজে লাগানোর উপযোগী করে তুলবে।

বৈদ্যুতীকরণের প্রচন্ড বিকাশের অর্থ এই নয় যে জ্বালানি এবং শক্তির অন্যান্য উৎসের চাহিদা সম্পূর্ণ ফুরিয়ে যাবে; কেননা বহু বিদ্যুৎকেন্দ্র কয়লা, তেল ও গ্যাসে চলে। ভারী ও হাল্‌কা শিল্পের বহু শাখা, পরিবহণ, কৃষি অর্থনীতি কঠিন ও তরল জ্বালানির ব্যাপক ব্যবহারকারী ছিল এবং রয়ে গেছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা শক্তি ব্যবহারের নূতন নূতন উৎসের সম্ভাবনা উন্মুক্ত করছে।

পরমাণুশক্তি ব্যবহারের পরিধি বিস্তৃত হতে চলেছে। ১৯৫৪ সন থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে বিশ্বে প্রথম নিউক্লিয়াস জ্বালানিচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র কাজ করছে। বর্তমানে বেলোইয়ার্স্ক, ভরোনেজ এবং আরও কতকগুলি পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র চলছে।

পরম ঐশ্বর্যসম্পন্ন সৌরতেজ আয়ত্তে আনাতে হবে। বিশেষ করে সিলিকিট সেমিকন্ডাক্টারসহ সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিরাট সম্ভাবনা উন্মুক্ত হয়েছে। সেমিকন্ডাক্টার ব্যাটারী পৃষ্ঠের প্রতিটি বর্গমিটার বলতে গেলে যতক্ষণ সূর্যের আলো থাকে, সব সময় ১০০ ওয়াট শক্তি সরবরাহ করে। এই ধরনের ব্যাটারী সোভিয়েত কৃত্রিম উপগ্রহ,

মহাকাশযানগুলিতে ব্যবহৃত হয়। শক্তিসম্পন্ন ভূমিস্থ সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা চলছে।

সোভিয়েত শক্তিবিজ্ঞান এখন পৃথিবীর গভীর অভ্যন্তরভাগে নিহিত তাপের ব্যাপক ব্যবহারের মুখে। বাষ্প অথবা উষ্ণ জলপ্রবাহরূপে পৃথিবীতে যে প্রাকৃতিক তাপ আছে, কামচাৎকা, কুরিল দ্বীপপুঞ্জ, ককেশাস ও মধ্য এশিয়ায় তা ব্যবহার করা হয়। ভূতাপীয় বিদ্যুৎকেন্দ্র নামে পরিচিত বিদ্যুৎস্টেশনসমূহ ইতিমধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছে। তা ছাড়া এমন স্টেশনও তৈরি হচ্ছে, যেগুলি চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণবশত সমুদ্রে ১০, ১৫ এমন কি ২০ মিটার উ'চু পর্যন্ত জোয়ারের যে প্রকান্ড ঢেউ ওঠে তার শক্তিকে বিদ্যুতে পরিণত করবে। জলচালিত ঘূর্ণযন্ত্রসমেত বিশেষ ধরনের বাঁধ তাকে বশীভূত করে। সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রথম জোয়ারবিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হয় কোলস্কি উপদ্বীপে বারেনৎস্ সাগরের খাড়িতে, — যেখানে জোয়ার বিশেষ প্রবল।

উপকরণ

আধুনিক শিল্পের প্রথম শর্ত যদি হয় শক্তি, তা হলে দ্বিতীয় শর্ত হবে সেই সব উপকরণ যা দিয়ে যন্ত্রপাতি, দালান-কোঠা ও অসংখ্য ভোগ্যবস্তু উৎপন্ন হয়।

উপকরণ তৈরি করতে গিয়ে, তা মানুষের প্রয়োজনের দিক থেকে কতখানি আরামপ্রদ ও সুবিধাজনক প্রকৃতি এ নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায় নি। প্রকৃতির তৈরী উপকরণ খুব কমই আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। মাত্র কিছুদিন আগেও নূতন যন্ত্রপাতির ডিজাইনার এবং বাসস্থান ও কারখানাগৃহের প্রকল্প নির্মাণকারী স্থপতিদের এমন সব প্রাথমিক উপকরণের আশ্রয় গ্রহণ করতে হত, — যেগুলি গত কয়েক দশক যাবৎ প্রকৌশলক্ষেত্রে রেওয়াজের মধ্য দিয়ে সমর্থিত হয়েছে। এমন জটিল অণুর ধর্ম বিশ্লেষণ করতে ও আগে থাকতে তার ধর্ম জানতে শেখায়

পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রের পক্ষে পূর্বাহ্নে দেওয়া ধর্ম দিয়ে নূতন পদার্থের 'পরিকল্পনারচনা' সম্ভব। তার অর্থ এই যে উপকরণবিদ ইতিপূর্বে ডিজাইনারের চারপাশে যে গণ্ডী বেঁধে দিয়েছিল, তা থেকে সে ধীরে ধীরে মুক্ত হতে লাগল। প্রযুক্তিগত চিন্তার সর্বাপেক্ষা উপযোগী এবং, যা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, — তা হল দ্রব্য প্রক্রিয়াজাতকরণের পক্ষে বেশ সুবিধাজনক উপকরণ বাছাইয়ের স্বাধীনতা তার আছে। যেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদার্থ প্রকৃতিতে নেই, সেক্ষেত্রে ডিজাইনার উপকরণের প্রয়োজনীয় ধর্ম উল্লেখ করে দিলেই তা পাওয়া যাবে। এইভাবে, প্রযুক্তিক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে উচ্চ তাপমাত্রা সহনশীল ইস্পাত ও সেমিকণ্ডাক্টার, অভঙ্গুর কাচ ও অদাহ্য বস্তু, যে-কোন অ্যাসিডে টেকসই বাসনপত্র ও ঘর্ষণজনিত স্ফুলিঙ্গবিহীন গিয়ার, বিদ্যুৎপ্রবাহের স্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্নকরণের প্রয়োজন হয় না এমন বল্টু ও সেতু জোড়া যায় এমন রজন।

আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞানের যে-কোন সাফল্য, তা সে মহাকাশযানের উৎক্ষেপণ, জটিল উৎপাদনের পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাই হোক অথবা 'বুদ্ধিমান' কম্পিউটার যন্ত্র তৈরিই হোক — নির্দিষ্ট, উদ্ভাবিত এবং পরন্তু বহু বিচিত্র ধর্মসম্পন্ন নূতন উপকরণ ব্যতীত তা বাস্তবে পরিণতই হত না। কোন কোন ব্যবস্থায় দরকার উচ্চ তাপমাত্রায় সংরক্ষিত কাঠিন্য, অন্যত্র — তড়িৎ-চুম্বকক্ষেত্রের দ্রুত পরিবর্তনের প্রতি লক্ষ্য রাখার দরকার, তৃতীয় কোথাও হয়ত দরকার প্রচণ্ড আক্রমণাত্মক রাসায়নিক উপকরণের বিরুদ্ধে স্থিরতা।

উপকরণ এবং প্রকৌশলগত সম্ভাবনার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের আমূল পরিবর্তনের ফলে টেকনিক্যাল প্রগতির পথে আরও দ্রুত এগিয়ে যাওয়া যাবে: ডিজাইনারদের যে-সব উপকরণ পাওয়া সম্ভব সেগুলি না দিয়ে তাদের দাবি

অনুযায়ী উপকরণ দেওয়া সম্ভব হবে। আমরা যখন এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারব, তখনই সে যুগের সূচনা হবে, যাকে 'অনন্ত বাছাইয়ের যুগ' বলা যেতে পারে।

লৌহখনিজাত কাঁচা মালের বিপুল সম্পদ, — যার ফলে শস্তা ধাতুর উৎপাদন বিকশিত হতে পারে, — তার গঠনগত গুণবৃদ্ধির সম্ভাবনা যন্ত্রনির্মাণ, ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং জাতীয় অর্থনীতির সকল শাখার উদ্দেশ্যে নির্মিত অন্যান্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে বহুকালের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে।

শিল্পক্ষেত্রে টিটানিয়াম, গেরমানিয়াম, সেসিয়াম, হীলিয়াম ইত্যাদির মতো বিরল ধাতুর ব্যবহার ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে। স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাসম্পন্ন অসংখ্য যন্ত্রে এগুলি লাগানো যেতে পারে। টিটানিয়ামের মূল্যবান পদার্থগত ও যান্ত্রিক ধর্ম এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মালের বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে অত্যল্প ক্ষয়শীলতার ফলে তার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে (কেবল টিটানিয়াম সঙ্করের দ্বারা এক একটি বৃহৎ বিমানের ভার কয়েক টন হ্রাস পায়; টিটানিয়ামের তৈরী লোকমোটিভ ইঞ্জিন ইস্পাতের তৈরী ইঞ্জিন থেকে অর্ধেক হাল্‌কা হতে পারে)।

তা ছাড়া, ধাতুর স্থান নিতে চলেছে অন্যান্য আরও লাভজনক উপাদান — সেগুলির মধ্যে ফেরো কংক্রিট ও প্ল্যাস্টিকের স্থান সর্বাগ্রগণ্য।

উপযোগিতার দিক থেকে প্ল্যাস্টিক বহু ক্ষেত্রে পুরোমাত্রায় ধাতুর স্থান নেয়, — এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে তা ধাতুর চেয়েও উৎকৃষ্ট। এই অর্থে তাকে যে 'অপূরণীয় স্থান পূরণকারী' বলা হয় তা নিরর্থক নয়।

জাতীয় অর্থনীতির রসায়নীকরণ বিপুল সুবিধার সম্ভাবনা নিয়ে আসছে। রাসায়নিক উপায়ে নির্মিত দ্রব্যের

পেছনে ব্যয় প্রাকৃতিক কাঁচা মালের তুলনায় কম। কৃত্রিম ও রাসায়নিক উপাদানজাত দ্রব্যের গুণ অনেক বেশি এবং তা সামাজিক দিক থেকে প্রয়োজনীয় শ্রমের ক্ষেত্রেও বেশি লাভজনক। নূতন উপাদানসমূহ জনগণের বিভিন্ন ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন বৃদ্ধি করে।

তৃতীয়ত, কাঁচা মালের সম্পদের অধিকতর পূর্ণ, মিতব্যয়ী ও কার্যকরী ব্যবহারেরও বিরাট তাৎপর্য আছে।

যেমন, স্বাভাবিক অবস্থায় একমাত্র যান্ত্রিক প্রক্রিয়াজাতকরণের পদ্ধতিতেই কাঠের ব্যবহারে গাছ বন থেকে আসার পথেই কেবল বর্জ্য হিশেবে প্রায় তার দুই-তৃতীয়াংশ (ডালপালা, করাতের গুঁড়ো, টুকরো, খণ্ড ইত্যাদিরূপে) হারায়। অথচ রসায়নে স্পিরিট, সেলুলোজ, কাগজ ও অন্যান্য দ্রব্য তৈরির কাজে প্রায় সম্পূর্ণ বর্জ্যই ব্যবহৃত হতে পারে।

যন্ত্রীকরণ ও স্বয়ংক্রিয়করণ

যন্ত্রীকরণ ও স্বয়ংক্রিয়করণ — উৎপাদনশীলতাবৃদ্ধি ও শ্রমভার লাঘবের অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য উপায়। যখন আমরা শ্রমভার লাঘবের কথা বলি তার অর্থ মোটেই এই নয় যে কমিউনিজমে ঢিলেঢালা অলস গতিতে কাজ করা চলবে। শ্রম মানে শ্রমই এবং তা সর্বদাই মানুষের শারীরিক ও মানসিক শক্তি, তার প্রয়াস ও অধ্যবসায়ের ব্যয় দাবি করবে। শ্রমভার লাঘবের কথা যখন বলি, তখন আমরা বোঝাই তার সজ্জীকরণের নিরন্তর বৃদ্ধি। ভারী শিল্পের এবং বিশেষ করে যন্ত্রপাতি নির্মাণশিল্পের বিকাশ, শিল্পে, পরিবহণ ও কৃষিক্ষেত্রে যন্ত্রীকরণের ফলে কঠিন হস্তচালিত শ্রম, যার কোন সৃজনী ধর্ম একেবারে নেই, তার অপরিহার্যতা ক্রমে হ্রাস

পায়, এবং যে-সব জীবিকা মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক ও তার আয়ু হ্রাসের কারণ সেগুলি লুপ্ত হয়।

কোদাল হাতে মাটি কাটা মজুরের জায়গা নিল এক্সক্যাভেটর, যা চালায় কারিগর ও যন্ত্রচালক। কাষ্ঠশিল্পে কাঠুরের শ্রমভার লাঘব করেছে বিদ্যুৎচালিত করাত ও ট্রেলর ট্র্যাক্টর। যন্ত্রপাতিনির্মাণ, ধাতু-শিল্প ও নির্মাণক্ষেত্রে কুলি ও মুটের জায়গায় কাজ করছে ক্রেন ও এলিভেটর যন্ত্রের চালকরা। তৈল নিষ্কাশনক্ষেত্রে বালতি বা পাত্র হাতে তৈল উত্তোলনকারীর জায়গা নিয়েছে জটিল যন্ত্রপাতি চালনাকারী ড্রিলার ও অপারেটর।

কৃষিতেও ঐ একই ধরনের পরিবর্তন ঘটল, সেখানে উৎপাদনের মূলে দেখা দিল যন্ত্রচালক — ট্র্যাক্টরচালক ও কম্বাইনচালক।

উৎপাদনের বহু শাখায় কঠিন হস্তচালিত শ্রমের ব্যবহার আজও রয়ে গেছে। এর কারণ বিশেষত এই যে কোন কোন শ্রমপরিচালনা যন্ত্রীকরণের দ্বারা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কিন্তু এ বাধাও অতিক্রম করা যায় এবং ভবিষ্যতে টেকনিক্যাল প্রগতি কঠিন হস্তচালিত শ্রমের অবসান ঘটাতে সাহায্য করবে।

সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের যন্ত্রীকরণ ও স্বয়ংক্রিয়করণের ফলে কর্মীদের যোগ্যতাবৃদ্ধির প্রয়োজন হয়, শ্রমে আরও **সৃজনী ধর্ম** আরোপ করে। বোঝাই যাচ্ছে যে কোদাল চালিয়ে কাজ করা এবং বিশাল ক্রেন ও এলিভেটর চালিয়ে কাজ করা একই কথা নয়। কোদাল চালনায় কি খুব একটা জ্ঞানের দরকার? আর তাছাড়া এটাও ত ঠিক যে এতে কোন বড় সৃজনী সম্ভাবনা উদ্‌ঘাটিত হয় না: এখানে বিশেষ সূক্ষ্মতার প্রয়োজন নেই। ক্রেনচালককে কেবল যে ন্যূনতম, বৈজ্ঞানিক-টেকনিক্যাল জ্ঞান আয়ত্ত করতে হবে তাই নয়, — তার বুদ্ধি এবং কৌশলী উদ্ভাবনী শক্তির উপর যন্ত্রের যথাযোগ্য ব্যবহার নির্ভর করে, সে শ্রমের যতদূর সম্ভব

যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার ও পদ্ধতি অনুসন্ধান করে। আর অনেকেই যন্ত্রব্যবস্থার উৎকর্ষসাধনের প্রয়াসে প্রবৃদ্ধ হয়। শ্রমের এই নূতন পরিস্থিতির ফলেই উৎকর্ষসাধন ও উদ্ভাবনার মতো ব্যাপক গণসৃষ্টির আবির্ভাব ঘটেছে।

স্বয়ংক্রিয়পদ্ধতি শ্রমের পরিস্থিতি ও চরিত্রে আরও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা করে। যে-কোন উৎপাদনপ্রক্রিয়ার স্বয়ংক্রিয়করণের দৃষ্টান্ত বর্তমানে কম নয় এবং প্রত্যেকেরই নিশ্চয় সে সম্পর্কে পড়া আছে, আর সম্ভবত শিক্ষামূলক ভ্রমণের সময় ব্যক্তিগতভাবে কিছু কিছু পরিচয়ের সুযোগও ঘটেছে। সেই কারণেই আমরা স্বয়ংক্রিয়ব্যবস্থার সাধারণ কতকগুলি মূলনীতি সম্পর্কে বললাম মাত্র, যেগুলি কেবল নির্দিষ্ট কতকগুলি যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রব্যবস্থার ক্ষেত্রেই নয়, — গোটা কর্মশালায়, কারখানায়, এমন কি জাতীয় অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়।

যন্ত্রের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য কেবল ধাতু কাটা ইত্যাদি ধরনের উপাদান প্রক্রিয়াকরণের পদ্ধতিমাত্র দ্রুত করাটাই বড় কথা নয়, — সহায়ক ক্রিয়ায়, — ঠিক যে-সব কাজ মানুষ হাতে সম্পন্ন করে, সেখানে ব্যয়িত সময়ও সংক্ষেপ করা দরকার। যে-সব সহায়ক কাজ হাতে সম্পন্ন হয়, তার বেগ বৃদ্ধির দৈহিক সীমা বেশিদূর নয়। এই কারণেই সেগুলিকে স্বয়ংক্রিয় করা হয়।

কাজ চলাকালে নানা যন্ত্রপাতির স্বয়ংক্রিয় নিয়মনের উদ্দেশ্যে নূতন নূতন যন্ত্রব্যবস্থার প্রচলন এবং দ্রব্যের গুণ ও পরিমাণের উপর স্বয়ংক্রিয় নিয়মনের সাহায্যে, প্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্দেশ্যে গৃহীত উপাদান, বর্জ্য পরিষ্কারের কাজ ইত্যাদি দেখাশোনার জন্য যন্ত্রসমূহের স্বয়ংক্রিয়করণের মাত্রা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

স্বয়ংক্রিয় কার্যচক্র কোথাও যদি বন্ধ হয়ে যায় এবং সেখানে যদি শ্রমিকের হস্তক্ষেপ দরকার হয়, সেক্ষেত্রে আমাদের আধা-স্বয়ংক্রিয় শ্রমযন্ত্র আছে। প্রায় ক্ষেত্রেই সরবরাহ বন্দোবস্ত স্বয়ংক্রিয়ব্যবস্থায় সাধিত হয় না এবং আধা-স্বয়ংক্রিয়ব্যবস্থায় যোগান আর মাল খালাসের কাজ শ্রমিককেই করতে হয়।

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র কেবল পৃথক পৃথক, স্বতন্ত্র ধরনের ক্রিয়ার গতিই বৃদ্ধি করে না, — তাদের পরস্পরের মধ্যে **সম্মিলন**ও ঘটায়। ধরা যাক, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের একটি অংশ কোন যন্ত্রাংশের ফ্ল্যাট তৈরি করছে, অপর অংশ ব্লক প্রসেসিং শেষ করছে, আর তৃতীয় অংশ পৃষ্ঠদেশ মসৃণের কাজ করছে, — কাজের সমগ্র প্রক্রিয়াটি একযোগে সম্পন্ন হয়।

স্বয়ংক্রিয়ব্যবস্থা ব্যতিরেকে এমন একটি যন্ত্রের কথা যদি কল্পনা করা যায়, যেখানে বিভিন্ন ধরনের কাজ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতো একযোগে, একই পরিমাণে সম্পন্ন হতে পারে, তা হলে সে রকম যন্ত্র চালাতে গেলে মানুষের শত শত হাত ও শত শত চোখের গভীর বোঝাপড়া প্রয়োজন। স্বয়ংক্রিয়ব্যবস্থা পরিচালনা করে যান্ত্রিক 'হাত' এবং ইলেক্ট্রনিক 'চোখ'।

যখন কাজের চলার সঙ্গে ফাঁকা চলা যুক্ত হয়, তখনই আবির্ভাব ঘটে অবিরাম কার্যরত যন্ত্রের।

অবিরাম কার্যরত যন্ত্রের একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত হতে পারে রোটারি ছাপাযন্ত্র, যাতে যে বস্তুর উপর কাজ হয় তা, অর্থাৎ কাগজ অবিরাম চলতে থাকে এবং ছাপার প্রক্রিয়াও অনবরত ঘটতে থাকে। এ ধরনের যন্ত্র বর্তমানে বিরতি-সহযোগে কর্মরত মুদ্রণ দ্রুত স্থানচ্যুত করছে, কেননা তা অতুলনীয় উৎপাদনশীলতার অধিকারী।

অবিরাম কার্যরত যন্ত্র বলতে গেলে, শিল্পের সকল শাখায় কাজ করতে পারে। ধাতু প্রক্রিয়াকরণেও স্বয়ংক্রিয়পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ

করা হয়, — এখানে কাজের প্রক্রিয়া বৃত্তাকারে চলে। মেশিনের অবিরাম ঘূর্ণনে দ্রব্য প্রক্রিয়াজাত হয়। ঘূর্ণ্যমান যন্ত্রব্যবস্থার প্রতিটি বিভাগ একই ধরনের ভারবহনক্ষম, তারা যে সরবরাহ পেয়ে থাকে প্রক্রিয়াকরণের পর এক ক্ষেপে তা একই জায়গায় এনে ফেলা হয় রোটারি স্বয়ংক্রিয় লাইন নামে অভিহিত লাইনগুলি এই পদ্ধতিতে কাজ করে।

স্বয়ংক্রিয় উপায়ে চালিত অনেকগুলি কার্যপদ্ধতি একত্রিত করে কম্বাইন ও স্বয়ংক্রিয় লাইনের মতো বহুব্যবস্থাসম্পন্ন এমন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র তৈরি হতে পারে যাতে প্রক্রিয়াজাতকরণ চলাকালে উপাদান নিরবচ্ছিন্নভাবে স্থানান্তরিত হতে থাকে।

স্বয়ংক্রিয়করণের সর্বোচ্চ স্তর — স্বয়ংচল কারখানা তৈরি, যেখানে সমন্বিতরূপে যন্ত্রের স্বয়ংক্রিয়ব্যবস্থা কাজ করে।

স্বয়ংক্রিয়করণের আধুনিক উপায় ও কম্পিউটার প্রকৌশল ছাড়া এবং পরিচালনপদ্ধতি ও সর্বাধিক কার্যক্ষম আত্মনিয়মনব্যবস্থা গড়ে তোলা ছাড়া অবিরাম কার্যরত বিপুল গতিসম্পন্ন প্রক্রিয়ার পরিচালনা অসম্ভব।

সমাজতন্ত্রে ও পুঁজিবাদে

উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতেও স্বয়ংচলযন্ত্র এবং স্বয়ংক্রিয় লাইনের ব্যবহার নেহাৎ কম নয়। বিভিন্নধর্মী সমাজব্যবস্থায় স্বয়ংচলযন্ত্র প্রচলনের অদৃষ্ট কী? তার পরিণতিই বা কী?

আজকের দিনের স্বয়ংক্রিয় কৌশলের প্রধান যোগ্যতা এই যে তা মানবশ্রমের ভার লাঘব করে; তবে এটাই তার একমাত্র যোগ্যতা নয়। আমরা দেখেছি যে এর ফলে

উৎপাদনপ্রক্রিয়া পরিচালনের ক্ষেত্রে যে স্বয়ংনিয়ামনপদ্ধতি প্রচলিত হয় তাতে কাঁচা মাল, সামগ্রী ও সরঞ্জামের মতো উৎপাদনপ্রক্রিয়ার বাকি সব উপাদানের যথাযোগ্য ব্যবহারের সম্ভাবনা প্রকাশ পায়। এটা আরও উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে শিল্পের বহু শাখায় মোট উৎপাদনব্যয়ের মধ্যে আর্থিক ব্যয় প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে। শেষোক্ত পরিস্থিতি পুঁজিবাদী কারবারীদের প্রায়ই প্রলুব্ধ করে। তবে স্বয়ংক্রিয়করণের অর্থনৈতিক তাৎপর্য পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক সমাজে মোটেই এক পর্যায়ের নয়, আর **তার সামাজিক পরিণাম ত সরাসরি বিপরীত।**

পুঁজিবাদী সমাজে স্বয়ংক্রিয়পদ্ধতির বিকাশের ফলে সবচেয়ে কঠিন যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তা হল **কর্মসংস্থান সমস্যা।** পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয়করণের অবধারিত ফল — বেকারত্বের বিপুল বৃদ্ধি।

বুর্জোয়া দেশগুলিতে স্বয়ংক্রিয়করণের ফলে দ্বিতীয় যে সমস্যার উদ্ভব হয় তা হল **বাজারের সমস্যা।** বহু প্রতিষ্ঠান তাদের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রী করা অসম্ভব হয়ে পড়বে এই ভয়ে নিজেদের কারখানা স্বয়ংচল ক'রে উৎপাদনের আকস্মিক বৃদ্ধি ঘটাতে নারাজ। এইভাবে, ইংলণ্ডে রেডিও-সেট নির্মাণের স্বয়ংক্রিয়ব্যবস্থাসম্পন্ন কারখানা বিক্রির অভাবে ১২ বছরের মধ্যে তার পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্ষমতায় পৌঁছুতে সক্ষম হয় নি।

বাজারের সমস্যার মতো বেকার সমস্যাও অবশ্য পুঁজিবাদের পক্ষে নূতন কিছু নয়। এ দুয়েরই উদ্ভবের কারণ একমাত্র স্বয়ংক্রিকরণ নয়। তবে স্বয়ংক্রিপদ্ধতির প্রচলনে তা অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করেছে বটে।

পশ্চিমে স্বয়ংক্রিয়করণকে অনেক সময় 'দানবীয় শক্তি' আখ্যা দেওয়া হয়। ইংরেজ পদার্থবিদ জর্জ টমসন তাঁর 'ভবিষ্যৎ পূর্বাভাস' গ্রন্থে এমন কথাও বলেছেন যে এক পুরুষ বাদে দূর থেকে পরিচালিত স্বয়ংচল যন্ত্র চিরকালের জন্য কোটি কোটি মানুষের কাজ ছিনিয়ে নেবে।

কিন্তু পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিক শ্রেণীর মাথার উপর যে বিপর্যয় ভেঙ্গে পড়েছে তার জন্য স্বয়ংক্রিয়করণ কি সত্য সত্যই দায়ী? অবশ্যই, নয়। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে স্বয়ংক্রিয়ব্যবস্থার প্রচলন যে কুফলের সূচনা করে তার মূল কারণ **ব্যক্তিগত মালিকানা** এবং তা থেকে উদ্ভূত **উৎপাদনের নৈরাজ্য ও তার পরিকল্পনাহীনতা।**

যেহেতু স্বয়ংক্রিয়ব্যবস্থার প্রচলন সমাজের বর্তমান বিকাশের স্তরে উৎপাদনী শক্তির সর্বোচ্চ পর্যায় মূর্ত ক'রে তোলে, সেই হেতু তার প্রধান দাবি হল নূতন উৎপাদন-সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা, যা উৎপাদনী শক্তির অবাধ বিকাশের পথ উন্মুক্ত করে।

সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের পরিস্থিতিতে স্বয়ংক্রিয়ব্যবস্থা সমাজে অদৃষ্টপূর্ব, বিপুল উৎপাদনী শক্তির বৃদ্ধি সম্ভব করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচিতে নির্দেশ করা হয়েছে:

'পুঁজিবাদের থেকে পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার পার্থক্য এই যে এতে টেকনিক্যাল প্রগতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র কর্মক্ষম জনসাধারণের পূর্ণ কর্মসংস্থান ঘটে। স্বয়ংক্রিয়করণ ও সংযুক্ত যন্ত্রীকরণ সমাজতান্ত্রিক শ্রমের কমিউনিস্ট শ্রমে ক্রমবৃদ্ধির বৈষয়িক বনিয়াদরূপে কাজ করে।'

স্বাভাবিক, সোভিয়েত শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহেও উচ্চ উৎপাদনশীল স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির প্রচলনের ফলে উৎপাদনের পৃথক পৃথক অংশে, পৃথক পৃথক কর্মশালায়, এমন কি সমগ্র কারখানায় কখনো কখনো বিপুল সংখ্যক কর্মী অব্যাহতি পেয়ে থাকে। কিন্তু পুরনো সরঞ্জামের বদলে নূতন সরঞ্জাম প্রচলনের ফলে অব্যাহতি পাওয়া শ্রমিকদের বেকারত্বের আশঙ্কা দেখা দেয় না এবং সামাজিক উৎপাদনের নিরন্তর বিস্তারে যে অতিরিক্ত উৎপন্ন দ্রব্য পাওয়া যাবে তাতে 'অতিরিক্ত মজুত' জনিত কোন সমস্যাও দেখা দেয় না।

পুরনো সরঞ্জামের বদলে নূতন স্বয়ংক্রিয় সরঞ্জাম আর্বিভাবের ফলে অব্যাহতি পাওয়া শ্রমিকদের শ্রমক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা একটা সহজ ব্যাপার নয়। এখানে নানা রকম সমাধানের আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে যখন স্বয়ংক্রিয়তা প্রাপ্ত হতে চলা কোন কারখানা একই কালে সম্প্রসারিত হয়ে চলে, তখন অব্যাহতি পাওয়া শ্রমিকদের ঐ কারখানাতেই বহাল রাখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রমিক ও কর্মচারীদের একই শহর বা অঞ্চলের অন্যান্য কারখানায় অথবা এক শহর ও অর্থনৈতিক অঞ্চল থেকে অপর শহর ও অঞ্চলে বদল করা আবশ্যক হয়ে পড়ে।

আরও দূর ভবিষ্যতে স্বয়ংক্রিয়তা প্রচলনের ফলে মানবশ্রমের যে অব্যাহতি ঘটবে তাতে মানসিক কার্যকলাপের পরিধি বিস্তৃত হবে। সমাজতান্ত্রিক সমাজের আরও বেশি মেহনতী মানুষ শিক্ষা ও সংস্কৃতি ব্যবস্থার জড়িত হয়ে পড়বে, শিল্প ও বিজ্ঞানকর্মের প্রতি মনোযোগী হবে। এসবই কমিউনিস্ট ব্যবস্থা গড়ে তোলার সহায়ক হবে।

উৎপাদনের সংহতিসাধন ও বিশেষীকরণ

বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের দ্রুত বিকাশ উৎপাদন সংগঠনের চাহিদা বৃদ্ধি করেছে। এখানে কী কী প্রবণতাই বা লক্ষণীয়?

এই ধরনের মূল পথরেখার অন্যতম হল উত্তরোত্তর

একীকরণ, **উৎপাদনের সংহতিসাধন।** ছোট ছোট কলকারখানার ভিত্তিতে শ্রমের উচ্চ উৎপাদনশীলতা অর্জন করা যায় না, যে-কোন দ্রব্য অথবা উৎপন্ন সামগ্রীর ব্যাপক উৎপাদন সম্ভব হয় না। বৃহৎ উৎপাদনেই এর বিস্তৃত সম্ভাবনা দেখা যায়। এখানে জটিল যন্ত্রপাতির, বিশেষত সংযুক্ত যান্ত্রিক এবং স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি সমাহারের ব্যবহার অধিকতর লাভজনক। বৃহৎ কারখানাগুলিতে আধুনিক প্রযুক্তিবিজ্ঞানের সকল সম্পদ পূর্ণ মাত্রায় ব্যবহার করা সম্ভব।

যে-কোন দেশের তুলনায় সোভিয়েত ইউনিয়নে বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেশি। তবে উৎপাদনের ভবিষ্যৎ সংহতিসাধনের এখনও সব রকম সুবিধা আসে নি। এখনও বেশ কিছু ক্ষুদ্র, অনুন্নত উৎপাদন রয়ে গেছে। কমিউনিজমের দিকে অগ্রসরের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র এবং যন্ত্রবিজ্ঞানে অনুন্নত শিল্প ও অর্থব্যবস্থা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, বৃহৎ এবং যন্ত্রবিজ্ঞানে অগ্রণী উৎপাদনের কাছে নতি স্বীকার করবে।

আধুনিক উৎপাদন সংগঠনের অপর উল্লেখযোগ্য নীতি — **বিশেষীকরণ।** এর মর্মার্থ নিহিত আছে কারখানাগুলির মধ্যে কঠিন শ্রমবিভাগব্যবস্থায়, এতে বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য-উৎপাদনকারী কারখানা অথবা পৃথক পৃথক কর্মশালা একই জাতীয় দ্রব্য উৎপাদনের পথ অবলম্বন করে। এর ফলে যন্ত্রপাতি ও কাঁচা মালের আরও উৎকৃষ্ট ব্যবহার, উচ্চ উৎপাদনক্ষমতাসম্পন্ন সরঞ্জামের, বিশেষত স্বয়ংচল যন্ত্রের প্রচলন, উৎপাদন প্রকৌশলের উৎকর্ষসাধন, উৎপন্ন দ্রব্যের মান উন্নয়ন এবং বহুল পরিমাণে উৎপাদনের মূল্য হ্রাস সম্ভব।

বিশেষীকৃত কারখানার দৃষ্টান্ত হিশেবে মোটরগাড়ি ও ট্র্যাক্টর নির্মাণ কারখানার উল্লেখ করা যেতে পারে। এই কারখানাগুলি একই জাতীয় প্রস্তুত দ্রব্য উৎপন্ন করে। এমন কারখানাও গড়া হয়, যেখানে মোটরগাড়ি ও বিমানের ইঞ্জিন, বল-বেয়ারিং, টায়ার ইত্যাদির মতো যন্ত্রাংশ তৈরি হয়। পৃথক পৃথক উৎপাদনের কাজ বিচ্ছিন্নকরণের নীতিতেও বিশেষীকরণ হয়ে থাকে: ঢালাই কারখানা, ব্ল্যাকস্মিথ-প্রেস কারখানা ইত্যাদি তার দৃষ্টান্ত।

বিশেষত শিল্পক্ষেত্রে বিশেষীকরণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতির নানা শাখার ও পৃথক পৃথক কারখানার পারস্পরিক নির্ভরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। যেমন, মেশিনটুলনির্মাণ কারখানার কাজ ক্ষুদ্রাংশ নির্মাণকারী ঢালাই কারখানার সরবরাহ, ইঞ্জিননির্মাণ কারখানা, যন্ত্রপাতিনির্মাণ কারখানা ইত্যাদির উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে থাকে। বিশেষীকৃত কারখানায় তৈরী বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম ব্যতীত ট্র্যাক্টর কারখানা চলতে পারে না। উৎপাদনের স্বাভাবিক কাজ সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে কারখানা এবং অর্থনীতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে ঘনিষ্ঠ উৎপাদন-সম্পর্ক সংগঠিত হয়। এই ধরনের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাকে **উৎপাদনের সমবায়ীকরণ** বলা হয়।

ভবিষ্যতে অর্থনীতিসংগঠনে **উৎপাদনের একত্রীকরণ** উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে। এতে লাভ প্রচুর। বহু কিছুর সম্মিলনে এই লাভ। এখানে কারণ হল যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অনুৎপাদনশীল মধ্যবর্তী স্তরের বিলোপ ও কাঁচা মালের সংযুক্ত ব্যবহার, সরঞ্জামের অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার এবং পরিবহণব্যয়ের হ্রাস।

এটাই স্বাভাবিক যে জাতীয় অর্থনীতির পৃথক পৃথক শাখায় একত্রীকরণ বিভিন্ন রূপে ও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়। যেমন, কাষ্ঠশিল্পে কাষ্ঠপ্রক্রিয়াজাতকরণের বিভিন্ন রকমের উপায় সম্মিলিত

করা হয় (প্রাথমিক পর্যায় এবং পরবর্তী পর্যায়ও)। রেল লাইনে বহু দূরে পথে কাঠের গুঁড়ির চেয়ে তক্তা চালান করাটা অধিকতর বুদ্ধিমানের ও বিচক্ষণতার কাজ। আবার একই জায়গায় কাষ্ঠবর্জ্যের রাসায়নিক শোধনপ্রক্রিয়া দ্বারা তা থেকে ভিনিগার, তার্পিন তেল ও অন্যান্য মূল্যবান উৎপন্ন দ্রব্য পাওয়া যেতে পারে; করাতের গুঁড়ো থেকে বিশেষ ধরনের প্রেস বোর্ড ইত্যাদি তৈরি করা যায়। ধাতু-শিল্পকে রসায়নের সঙ্গে সম্মিলিত করা লাভজনক। ব্লাস্ট ফার্নেসে প্রাকৃতিক গ্যাসের সঙ্গে অক্সিজেনের মিশ্রণ চলাকালে গ্যাসের গঠন পালটে যায় এবং তা মূল্যবান রাসায়নিক কাঁচা মাল হয়ে দাঁড়ায়: প্রতি টন কাঁচা লোহার জন্য ব্যবহৃত ব্লাস্ট ফার্নেস গ্যাস থেকে প্রায় ৩০০ কিলোগ্রাম শস্তা কৃত্রিম অ্যামোনিয়া পাওয়া যেতে পারে।

বহু ক্ষেত্রে একত্রীকৃত যন্ত্রব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণের ফলে শিল্পের সমগ্র শাখায় সম্পূর্ণ পুনর্নির্মাণ ঘটে: বহু বিশেষীকৃত শাখা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয় এবং বর্তমান দ্রব্যের উৎপাদন অন্য এমন এক শাখার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ছে, যেখানে তার উৎপাদন অনেক বেশি লাভজনক। যেমন, ভবিষ্যতে সারা দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সোডা এবং অর্ধেকের কাছাকাছি সালফিউরিক অ্যাসিডের উৎপাদনকে লৌহেতর ধাতু-শিল্পে সংহত করার কথা ভাবা হচ্ছে, — যাতে লৌহেতর ধাতু-শিল্পের আসল কাজ চলার পথেই মূল্যবান ধাতু নিষ্কাশিত হয়ে এগুলি পাওয়া যেতে পারে। এই ধরনের সমাহার ব্যবস্থাসম্পন্ন কারিগরি উৎপন্ন দ্রব্যের আরও একটি বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব আছে, এবং তাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়: এতে অধিকাংশক্ষেত্রে আবহাওয়া দূষীকরণ ও জলে বিষক্রিয়ার আশঙ্কা দূর হয়। একটি শাখার তথাকথিত শিল্পবর্জ্য অন্য শাখার অতি মূল্যবান কাঁচা মাল রূপে পরিগণিত হয়। বর্জ্যের পরিমাণ বেশি থাকা প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক অপূর্ণতার সুনিশ্চিত লক্ষণ।

খাদ্য ও কৃষিশিল্পে সংযুক্ত উদ্যোগ গড়ে তোলা অত্যন্ত সুবিধাজনক। এটা বেশ বোঝা যায়: কৃষির কাঁচা মাল তার গঠনপ্রকৃতির দিক থেকে সমাহারপূর্ণ। বিভিন্ন মরশুমে তার আবির্ভাব এবং একার্থসঙ্ঘে তাদের প্রতিটির পুনরুৎপাদনে একই জাতীয় যন্ত্র ব্যবহার করা যেতে পারে। এর ভিত্তিতে যৌথখামার, রাষ্ট্রীয় খামার ও স্থানীয় শিল্পোদ্যোগগুলির মধ্যে উৎপাদন-সম্পর্ক দৃঢ় হতে থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচিতে নির্দেশ করা হয়েছে যে ধীরে ধীরে কৃষি-শিল্প সম্মিলনের উদ্ভব হবে।

উৎপাদনের প্রখরতাসাধন

কমিউনিজমের বৈষয়িক-টেকনিক্যাল বনিয়াদ গড়ে তুলতে গিয়ে আমরা কেবল উৎপাদনের পরিমাণগত বৃদ্ধিরই চেষ্টা করি না, — আমাদের চেষ্টা — উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তা যেন অধিকতর ফলপ্রসূও হয়। উৎপাদনের কার্যকারিতার এমন উৎকর্ষসাধনের নাম **প্রখরতাসাধন।**

উৎপাদনের প্রখরতাসাধনে সেই সব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান হয়, যার উপর গোটা অর্থনীতির পরবর্তী বৃদ্ধির দ্রুতগতি নির্ভর করছে।

এর অর্থ — শিল্প উৎপাদনের গঠনে উৎকর্ষসাধন, যে-সব শাখা আধুনিক বৈজ্ঞানিক-টেকনিক্যাল উন্নতির মুখ্য দিক নির্দেশ করে সর্বাগ্রে তার বিকাশ, কারখানাসমূহের বিশেষীকরণ ও সমবায়ীকরণের স্তর উন্নয়ন, নূতন ধরনের কাঁচা মাল ও উপাদানের ব্যবহার এবং সমগ্র জাতীয় অর্থনীতিতে অখণ্ড প্রকৌশলনীতির আশ্রয় গ্রহণ।

এর অর্থ — যন্ত্রপাতি, কাঁচা মাল, উপাদান ও জ্বালানির উন্নততর ব্যবহার, সর্বক্ষেত্রে সদ্ব্যবহার ও মিতব্যয়, উৎপন্ন দ্রব্যের দ্রুত উৎকর্ষবৃদ্ধি, তার উৎপাদনমূল্য হ্রাস, উৎপন্ন দ্রব্যের শ্রেণীগত প্রসার এবং তারই ফলস্বরূপ জাতীয়

অর্থনীতির প্রয়োজন ও জনগণের উপযোগের যতদূর সম্ভব পূর্ণ সন্তুষ্টিবিধান।

এর অর্থ — অর্থনীতির সমগ্র শাখার বিশেষজ্ঞদের — শ্রমিক, ইঞ্জিনিয়র, কারিগর, কর্মচারী প্রমুখের শিক্ষাগত উন্নতিবিধান, বিজ্ঞানের উচ্চ সম্ভাবনাপূর্ণ শাখাসমূহের বিকাশ এবং তার জন্য শিক্ষাপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী বিশেষজ্ঞদের কর্মিদল সরবরাহ।

এমন কি এই ক্ষুদ্র তালিকা থেকেও দেখা যায় যে প্রখরতাসাধন হয়ে থাকে ঠিক এমন পথে, যাতে অগ্রসর হলে শ্রমের উৎপাদনশীলতাকে সমগ্র সমাজের আয়তনে উন্নত করা যায়।

কমিউনিজমের বৈষয়িক-টেকনিক্যাল বনিয়াদের জন্য শিল্পের মতো **কৃষির**ও তীব্র বিকাশ প্রয়োজন।

কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনবৃদ্ধি দুটি উপায়ে হতে পারে: অপরিবর্তিত কৃষিপ্রযুক্তির ভিত্তিতে চাষের জমি বিস্তার করে (বিকাশের ব্যাপক পথ) ও কৃষিজমির এক একটি ইউনিট থেকে ক্রমবর্ধমান পরিমাণ কৃষিদ্রব্য লাভের দ্বারা (প্রখর বিকাশ)। পার্টির কর্মসূচিতে বলা হয়েছে: 'কৃষি অর্থনীতির উন্নয়ন এবং কৃষিজাত উৎপন্ন দ্রব্যের ক্ষেত্রে দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর মুখ্য উপায় — সর্বাঙ্গীণ যন্ত্রীকরণ এবং যথাক্রমে **প্রখরতাসাধন...**'

কৃষি অর্থনীতিতে উৎপাদনের মূল উপায় — জমি। এই কারণে কৃষি অর্থনীতি পরিচালনার প্রখরতা সর্বোপরি নির্ধারিত হয় এই মূল প্রাকৃতিক উপাদান কীভাবে ব্যবহৃত হয়, তার দ্বারা। যন্ত্র মাত্রেই বিনষ্ট হয়, কিন্তু জমি তা হয় না। যদি তা উত্তম রূপে চাষ ও সারযুক্ত করা যায়, তাতে বিচক্ষণভাবে, পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ফসলের চাষ করা যায়

এবং ফসলের সঠিক আবর্তনব্যবস্থা প্রচলন করা যায়, তা হলে জমির উর্বরতা সর্বদা বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

প্রখরতাসাধনের মূল ধারা কী?

অর্থনীতির প্রখরতাসাধনের অর্থ, প্রথমত, প্রতি হেক্টর জমি থেকে আরও বেশি পরিমাণ উৎপন্ন দ্রব্য পাওয়া, দ্বিতীয়ত, **যন্ত্রীকরণ** ও **রাসায়নিক ব্যবস্থা** প্রচলনের ভিত্তিতে শ্রমের উৎপাদনশীলতাবৃদ্ধি ও দ্রব্যের উৎপাদনমূল্যে হ্রাস।

সাম্প্রতিক কালে যৌথখামার ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলি প্রতিটি এলাকার পরিস্থিতি অনুযায়ী উচ্চ প্রকৌশলগত ও অর্থনৈতিক সূচক সমন্বিত নূতন নূতন যন্ত্র পেয়ে আসছে। প্রখর কৃষিব্যবস্থা প্রচলনের জন্য অবশ্য প্রতি ইউনিট জমিতে ব্যবহৃত কৃষিযন্ত্রপাতির সংখ্যাবৃদ্ধিমাত্র নয়, — কৃষিপ্রযুক্তিক্ষেত্রে উচ্চ উৎপাদনক্ষম কর্ম পরিচালনা এবং তার সযত্ন সংরক্ষণও আবশ্যক।

কৃষিজাত উৎপাদনের ধারাবাহিক প্রখরতাসাধনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল তার সর্বাঙ্গীণ **বৈদ্যুতীকরণ**।

উদ্ভিদ ও প্রাণী সংরক্ষণের জন্য সার ও রাসায়নিক পদ্ধতি ব্যবহারের বহু বছরের অভিজ্ঞতা এবং তার অর্থনৈতিক কার্যকারিতার হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে যে কৃষি অর্থনীতির প্রখরতাসাধনের অন্যতম উপায় — **রাসায়নিক ব্যবস্থার** আশ্রয়গ্রহণ। বিশিষ্ট সোভিয়েত কৃষিরসায়নবিদ আকদামিশিয়ন দ. ন. প্রিয়ানিশ্নিকভ লিখেছেন যে রসায়ন 'নূতন নূতন মহাদেশ' গড়ে তোলে, অর্থাৎ এতটা বাড়তি পরিমাণ কৃষিদ্রব্য দেয়, বৃহৎ বৃহৎ দেশের গোটা উৎপাদন পরিমাণের সমতুল।

রসায়নবিদ, শারীরতত্ত্ববিদ ও জীবরসায়নবিদরা সাম্প্রতিক কালে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও উৎপাদনক্ষমতা নিয়মিত করার উদ্দেশ্যে নূতন নূতন রাসায়নিক উপায়-উপকরণ গড়ে তোলা ও প্রয়োগের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে সেই সব রাসায়নিক দ্রব্যের যার অল্পমাত্রায় প্রয়োগ উদ্ভিদের বিকাশে গতিসঞ্চার করে, আর বেশিমাত্রায় প্রয়োগে বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং তার বিনাশ ঘটায়। প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ চাষের খেত থেকে বাছাই পদ্ধতিতে আগাছা ধ্বংসের উপায়, ফল ও শাক সব্জি বৃদ্ধির জন্য উত্তেজক পদার্থ, ঠাণ্ডা বসন্তের সময় মুকুলের বিকাশ ও উদ্ভিদের প্রস্ফুটন বিলম্বিত করার এবং গুদামে সংরক্ষণকালে আলুর কলের উদ্‌গম রোধ, ফলের গাছ, তুলো ও অন্যান্য বৃক্ষ থেকে অপরিণত কোরকের উচ্ছেদের জন্য রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার কৃষিক্ষেত্রে ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

উদ্ভিদ পত্রশূন্য করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত যে-সব পদার্থের দ্বারা আলু, টম্যাটো, সয়া ও অন্যান্য উদ্ভিজ্জের কাণ্ড পত্রাদি শুকিয়ে ফেলা সম্ভব হয় তাতে তুলো এবং অন্যান্য ঘরোয়া চাষের যান্ত্রিক পদ্ধতি ফসল সংগ্রহ সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। নিষ্পত্রীকরণ পদার্থ ব্যবহারের ফলে যন্ত্রের সাহায্যে তুলো সংগ্রহ সম্ভব। এতে মধ্য এশীয় প্রজাতন্ত্রসমূহ এবং অন্যান্য দক্ষিণাঞ্চলের বিপুল সংখ্যক মানুষ মরশুমের সময় অতিরিক্ত দৈহিক শক্তি ব্যবহারের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছে।

আজও কৃষি অর্থনীতি বহুল পরিমাণে আবহাওয়া পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল। কৃষি অর্থনীতিকে যাতে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার উপর নির্ভর না করতে হয় তার জন্য কী করা যায়? মানুষ আবহাওয়াকে ত এখনও নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে নি।

খরা অঞ্চলগুলিতে নিশ্চিত ফসল লাভের উপযুক্ত পন্থা — জমিতে জল সরবরাহ ও জলসেচের (খাল খনন) ব্যবস্থা অবলম্বন। এতে দক্ষিণাঞ্চলের প্রখর সূর্যকিরণপ্রাপ্ত

এবং স্বল্প আর্দ্রতাসম্পন্ন বিস্তীর্ণ জমি চাষের জন্য ব্যবহার করা সম্ভব হয়। জলসেচনের কল্যাণে মধ্য এশিয়ায়, রুশ ফেডারেশন ও ইউক্রেনের দক্ষিণে এবং ট্রান্স ককেশীয় প্রজাতন্ত্রসমূহে লক্ষ লক্ষ হেক্টর জমি কাজে লাগানো যাবে। এর ফলে যেমন গম, তুলো, চাল, ভুট্টার মতো মূল্যবান কৃষিজাত দ্রব্য সর্বদা প্রয়োজনীয় পরিমাণে পাওয়া সম্ভব হবে, তেমনি মাংস, দুধ, মাখন এবং পশমের উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের ইউরোপীয় অংশের অকৃষ্ণ-মৃত্তিকাস্তরযুক্ত জলা জমি থেকে জল নিকাশ করে তাতে ধীরে ধীরে আবাদের পরিকল্পনা আছে। ১৯৬৬ সনের মে মাসে জলসেচ ও ভূমি উন্নয়ন সমস্যা নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক পূর্ণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনের সিদ্ধান্তে কয়েকটি পাঁচসালা নিয়ে বিস্তৃত জলসেচ ও ভূমি উন্নয়ন ব্যবস্থাসংক্রান্ত কর্মসূচি নির্দেশ করা হয়েছে।

পশুপালন ব্যাপারে বহু সমস্যার সমাধান করতে হবে: এখানেও দোহন করা দুধের পরিমাণ ও মাংস উৎপাদনের বৃদ্ধি গ্যারাণ্টিযুক্ত করা আবশ্যক। আর এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর সবচেয়ে নিশ্চিত উপায় — শ্রমের অগ্রসরমান পদ্ধতি, আরও উন্নত ধরনের যন্ত্রবিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের নবতম সাফল্যের প্রচলন।

এই সব উপায়ের ফলপ্রসূ ব্যবহার অনেকখানিই নির্ভর করে বৃহৎ পশুপালনসমাহার অর্থাৎ পশু-পক্ষী লালনপালন ও তাদের পুষ্টিসাধনের উপযোগী খাদ্যব্যবস্থার জন্য এক ধরনের বিশাল সংযুক্ত উদ্যোগ গড়ে তোলার উপর।

পশুপালন বিকাশে রসায়নের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। কৃষি অর্থনীতির এই শাখায় তার প্রবেশ প্রধানত তিনটি

পথে: পশুখাদ্যরূপে, টিনজাতকরণের পদার্থরূপে এবং জীবনের প্রক্রিয়া নিয়ামনের উপায় ও পদার্থরূপে।

কৃষি অর্থনীতিসংক্রান্ত কর্মে বৈদ্যুতীকরণ ও যন্ত্রীকরণ এবং রসায়নের ব্যাপক প্রচলনের তাৎপর্য এই যে বৈজ্ঞানিক-টেকনিক্যাল বিপ্লব কেবল শিল্প নয়, — কৃষি অর্থনীতিও অধিকার করছে।

বিজ্ঞান — বিপুল উৎপাদনশীল শক্তি

ইতিপূর্বেই দেখা গেছে যে বৈজ্ঞানিক-টেকনিক্যাল বিপ্লব বিজ্ঞান ও উৎপাদনসম্পর্কের মৌলিক পরিবর্তন ঘটায়, তাদের পারস্পরিক নৈকট্য ও পারস্পরিক অনুপ্রবেশের সূচনা করে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও তার বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে আগে যে ব্যবধান ছিল তা ক্রমেই হ্রাস পেতে চলেছে। প্রকৃতির ঘটনাপুঞ্জের ব্যাখ্যাপ্রদান ছেড়ে বিজ্ঞান এগিয়ে চলল প্রকৃতিতে সংঘটিত প্রক্রিয়া ও রাসায়নিক বিক্রিয়ার পুনরুৎপাদনে এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃতিকেও ছাড়িয়ে গেল। যেমন বিজ্ঞান সূক্ষ্ম রশ্মিবিকিরণের মধ্যে আলোকজাত তেজ কেন্দ্রীভূত করার যে উপায় আবিষ্কার করেছে প্রকৃতিতে তা জানা ছিল না; রাসায়নিক পদ্ধতিতে সৃষ্ট বহু পদার্থ স্বাভাবিক পরিবেশে দেখা যায় না।

বিজ্ঞান নিজস্ব উৎপাদনক্ষমতার ভিত্তি অর্জন করে। প্রায় হাজার ব্যক্তির এক কর্মিদল পরিচালিত এবং কয়েক শ' মিটার চৌম্বক পরিধিসম্পন্ন অতিকায় কণিকা বেগবর্ধক বিশাল যন্ত্র, প্রকাণ্ড বায়ুগতিনির্ধারক সুড়ঙ্গ, ইলেক্‌ট্রনিক অণুবীক্ষণ ও ইলেক্‌ট্রনিক কম্পিউটারের মতো অতি

আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির কথা মনে করা যেতে পারে। এসবই জটিল ইঞ্জিনিয়রিং নির্মাণকর্ম।

অন্য দিকে, আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিত্তিতে উৎপাদন ক্রমে ক্রমে বহুগুণ বৃদ্ধি করা বীক্ষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্তর থেকে সকল বৃহৎ প্রযুক্তিগত রূপান্তরের সূচনা। আধুনিক পরিস্থিতিতে উৎপাদনক্ষেত্রে উদ্ভাবনার ব্যাপারে অবধারিতরূপে বৈজ্ঞানিক অন্বেষণের পরিচয় মেলে।

অন্য কথায় বলা যায় যে বিজ্ঞান ধীরে ধীরে প্রত্যক্ষ উৎপাদনী শক্তিতে পরিণত হতে চলেছে। তবে, এমন ভবিষ্যৎ শুধু কমিউনিজম অভিমুখী সমাজেই সম্ভব। এর কারণ কী? কারণ এই যে বিজ্ঞানের প্রযুক্তিগত ব্যবহারের ক্ষেত্র বিস্তার গুরুত্বপূর্ণ হলেও প্রত্যক্ষ উৎপাদনী শক্তিতে তার পরিণতির চরম বনিয়াদ নয়। বিজ্ঞান পূর্ণমাত্রায় উৎপাদনী শক্তি হয়ে দাঁড়াতে পারে একমাত্র সামাজিক উৎপাদনের সুষম বিকাশকালে, যখন প্রকৌশলগত ব্যবহার উৎপাদনের উপায়ের উন্নতিসাধনমাত্র করে না, — সঙ্গে সঙ্গে সমাজের মূল উৎপাদনী শক্তি — মানুষের বিকাশে পর্যন্ত সহায়তা করে।

* * *

যে বৈষয়িক ও বস্তুগত ভিত্তির উপরে মানুষে মানুষে কমিউনিস্টসুলভ নূতন সম্পর্ক গড়ে উঠবে আমরা তার বিকাশের মুখ্য উপায়গুলি অনুসন্ধান করেছি। পুঁজিবাদ উৎপাদনী শক্তির যে স্তর গড়ে তুলেছে ভবিষ্যৎ কমিউনিস্ট সমাজের বৈষয়িক-টেকনিক্যাল বনিয়াদ সেই সীমানা ছাড়িয়ে বহুদূর এগিয়ে যাবে, বৈজ্ঞানিক-টেকনিক্যাল উন্নতির চরম

সাফল্য অর্জিত হবে এবং দেশ উৎকৃষ্ট ও পরম শক্তিসম্পন্ন যন্ত্রবিজ্ঞানে সজ্জিত হবে।

শক্তিসম্পদের সাগরপ্রমাণ প্লাবন কিংবা অভূতপূর্ব বস্তুসম্পদ, অথবা বিচক্ষণ যন্ত্রবাহিনী — যার কথাই বলি না কেন, এগুলোর কোনটাই আপনা-আপনি হয়ে ওঠে না।

৩৬ ॥ শ্রেণীহীন সমাজের দিকে

সমাজতন্ত্র গঠনের পরিণামে শ্রেণীভিত্তিক সমাজের অনিষ্টকর রূপ — মানুষের উপর মানুষের অত্যাচারের বিলোপ ঘটে। মানুষ সামাজিক অর্থনীতিক্ষেত্রে পরিশ্রম করে, শ্রম অনুযায়ী প্রাপ্য অর্জন করে এবং রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে সমানাধিকারের ভিত্তিতে অংশগ্রহণ করে।

কিন্তু শ্রেণীগত পার্থক্য এবং তার আনুষঙ্গিক সামাজিক পার্থক্য (শহর ও গ্রামের মধ্যে, শারীরিক শ্রম এবং বুদ্ধিমার্গীয় শ্রমে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে) এখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নি। যতক্ষণ পর্যন্ত সেগুলি থাকে, ততক্ষণ মানুষের শ্রম ও জীবনযাত্রার পরিস্থিতিতে পূর্ণ সমতা আসতে পারে না। ঠিক এই কারণেই এই সব প্রভেদের অবসান এবং শ্রেণীহীন সমাজ গঠন — কমিউনিজম গঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

কমিউনিস্ট মালিকানা — শ্রেণীহীন সমাজের বনিয়াদ

শ্রেণীগত পার্থক্য বজায় থাকার মূল কারণ এই যে শ্রমিকের শ্রম সমগ্র জনগণের মালিকানার সঙ্গে সম্পর্কিত, কিন্তু কৃষকের — যৌথখামারী মালিকানার সঙ্গে। এর অবসান

ঘটবে তখনই, যখন সমাজতান্ত্রিক মালিকানার দুই রূপের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হবে **উৎপাদনের উপায়ের উপর অখণ্ড কমিউনিস্ট মালিকানা।**

এটা কীভাবে ঘটবে?

কমিউনিজমের বৈষয়িক-টেকনিক্যাল ভিত্তি গড়ে ওঠার পথে **গণমালিকানা বৃদ্ধি পেতে থাকে।** তার আয়তন বৃদ্ধি পায়: প্রতি বছর হাজার হাজার নূতন কলকারখানা, স্কুল ও বাসগৃহ, সিনেমা হল ও ক্লাব, পলিক্লিনিক ও স্টেডিয়াম নির্মিত হয়, শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহে নূতন নূতন যন্ত্রপাতি বসানো হয়, তাদের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। আগেই বলা হয়েছে যে তার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের সংহতিসাধন এবং কলকারখানার বিশেষীকরণ ও সমবায়ীকরণ চলে, উৎপাদনী শক্তির বিন্যাসে উৎকর্ষ সাধিত হয়, জাতীয় অর্থনীতির পরিচালনা উন্নত হয়।

সমাজতান্ত্রিক গণমালিকানা সরাসরি কমিউনিস্ট মালিকানায় বিকশিত হয়। যৌথখামারী মালিকানার অবস্থাটা তুলনামূলকভাবে জটিল: তাকে গণমালিকানার কাছাকাছি আসতে হবে, তার সঙ্গে একাকার হয়ে মিলে যেতে হবে। এই সমস্যার সমাধান কীভাবে হতে পারে?

মনে হতে পারে যে এ সমস্যা সমাধানের সহজতম উপায় — সকল যৌথখামারকে রাষ্ট্রীয় খামারে পরিণত করা। কিন্তু এ ধরনের রূপান্তরে সমস্যার সমাধান হবে না, সমগ্র কৃষি অর্থনীতির আপনা-আপনি উন্নয়ন ঘটবে না। মানুষের প্রয়োজন যতদূর সম্ভব বর্ধিত পরিমাণে শস্য, মাংস, দুধ ও অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্য, আর তার জন্য নূতন প্রযুক্তির প্রচলন, কৃষিকার্য ও পশুপালন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সাফল্যের ব্যাপক প্রয়োগ এবং শ্রম সংগঠনে উৎকর্ষসাধন

একান্ত প্রয়োজন — অর্থাৎ, **কৃষি অর্থনীতির উৎপাদনী শক্তিতে প্রচণ্ড উন্নয়ন** ঘটাতে হবে। সমস্যা সমাধানের এটাই চাবিকাঠি, কেননা যৌথখামারী উৎপাদনের উন্নয়নে যৌথখামারী মালিকানা এতদূর পর্যন্ত বিকশিত হবে যাতে তা গণমালিকানার সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যাবে।

মালিকানার যৌথখামারীর রূপ কি উৎপাদনী শক্তির এমন বিকাশ, এমন ঊর্ধ্বায়ন ঘটাতে পারে? অবশ্যই, পারে। তার প্রমাণ এই যে এখন পর্যন্ত পিছিয়ে থাকা যৌথখামারগুলির সঙ্গে সঙ্গে এমন বহু সংখ্যক যৌথখামারও আছে যা রাষ্ট্রীয় খামারের চেয়ে কোন অংশে খারাপ ত নয়ই, বরং ভালো ফল দিচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, উৎপাদনের যৌথখামারীর রূপের সম্ভাবনা মোটেই ফুরিয়ে যায় নি, তা থেকে যে বিশাল মজুত বেরিয়ে আসে তার চূড়ান্ত ব্যবহার প্রয়োজন। অর্থাৎ কৃষি অর্থনীতিতে উৎপাদনের রাষ্ট্রখামারীয় রূপের মতো যৌথখামারীয় রূপেরও বিকাশ ঘটানো দরকার।

সমাজতান্ত্রিক মালিকানার দুই রূপের ঘনিষ্ঠতা

এখন দেখা যাক যৌথখামারী উৎপাদনের উন্নয়ন এবং কৃষি উৎপন্ন দ্রব্যের যথার্থ কারখানায় যৌথখামারসমূহের রূপান্তরসাধন কীভাবে সমবায়ী মালিকানার সামাজিকীকরণের স্তর উন্নত ক'রে গণমালিকানার সঙ্গে তাকে ঘনিষ্ঠ করে তোলে। ট্র্যাক্টর, কম্বাইন এবং আধুনিক কৃষি উৎপাদনের বিবিধ যন্ত্রপাতির মধ্যে যৌথখামারী কৃষকসম্প্রদায়ই বলি, শ্রমিক শ্রেণী বলি আর

বুদ্ধিজীবীসম্প্রদায় বলি — সমগ্র সোভিয়েত জনগণের শ্রম মূর্ত হয়ে উঠেছে।

যৌথখামারগুলির সামাজিক অর্থব্যবস্থা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে **যৌথখামারের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন-সম্পর্কের উৎকর্ষ সাধিত হতে থাকে।** যৌথখামারগুলি কেবল শস্যের ব্যাপারে নয়, — কৃষিজাত অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যাপারেও আরও পূর্ণ মাত্রায় সদস্যদের চাহিদা মেটাতে থাকে, আর তারই ভিত্তিতে সহায়ক অর্থব্যবস্থা ধীরে ধীরে সেকেলে হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের মতো সবেতন ছুটি ও অন্যান্য প্রাপ্য মেটানো হয়।

সাম্প্রতিক কালে **অন্তঃযৌথখামার ও রাষ্ট্র-যৌথখামার উৎপাদন সমবায়** বিকাশ লাভ করছে, **কৃষিশিল্পসমাহার** গড়ে উঠছে। যৌথখামারগুলির মধ্যে সহযোগিতার এই রূপ কী দিতে পারে? কোন কোন সময় একটি ছোট বিদ্যুৎকেন্দ্র, কৃষিজাত কাঁচা মালের প্রাথমিক শোধন কারখানা ও অন্যান্য ধরনের কারখানা, যৌথখামারীদের জন্য বিশ্রামকেন্দ্র ইত্যাদির নির্মাণও একক যৌথখামারের শক্তিতে কুলোয় না। এই কারণে পাশাপাশি কতকগুলি যৌথখামার নিজেদের সঙ্গতি একত্রিত করে সম্মিলিত শক্তিতে নির্মাণের কাজ করে। প্রায়ই যৌথখামার রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে একযোগে এই ধরনের নির্মাণকর্ম পরিচালনা করে। এটাও কি বলে দিতে হবে যে এ ধরনের উদ্যোগ এবং অন্যান্য নির্মাণকর্ম আর সমবায়ী মালিকানার অন্তর্গত সম্পত্তিমাত্র থাকতে পারে না: গণমালিকানাধীন উদ্যোগের সঙ্গে তার সামান্যই পার্থক্য আছে। এইভাবে, **যৌথখামারের সঙ্গতির সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সঙ্গতির** প্রত্যক্ষ **সংযোগ** চলে।

একথা জানা আছে যে সমাজতান্ত্রিক মালিকানার অন্যতম প্রধান সুবিধা এই যে তাতে উৎপাদন পরিকল্পনা করার সুযোগ আছে। এখন, এই ব্যাপারে সমাজতান্ত্রিক মালিকানার দুই রূপের মধ্যে যে-কোন পার্থক্য অতিক্রান্ত হচ্ছে: যৌথখামারগুলিতে (তাদের সম্পত্তিকে সমবায়ী প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি হিসাবে গণনা করে) শিল্পক্ষেত্রে উদ্ভাবিত **পরিকল্পনের** অতি উৎকৃষ্ট **প্রণালী ও পদ্ধতি** সাফল্যের সঙ্গে গৃহীত হয়ে থাকে।

মূল তহবিলের বৃদ্ধি, যৌথখামারগুলির মধ্যে এবং যৌথখামার ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের বিকাশ, সেই সঙ্গে উৎপাদন-সম্পর্কের অন্যান্য দিকের উন্নতি থেকে প্রমাণিত হয় যে যৌথখামারী মালিকানা গণমালিকানার কাছাকাছি চলে আসছে। কিন্তু তার অর্থ কি এই যে সমাজতান্ত্রিক মালিকানার উভয় রূপ নিজের নিজের মতো বিকশিত হতে থাকে: একটি আগে যায় এবং অপরটি তার পিছু নেয়? অবশ্যই, নয়। যৌথখামারীয় উৎপাদনবৃদ্ধিতে (এবং তার ফলস্বরূপ যৌথখামারীয় সম্পত্তির সামাজিকীকরণের মান উন্নয়নে) বৈদ্যুতীকরণ, রাসায়নিক ব্যবস্থার প্রচলন, কৃষিশ্রমের ধারাবাহিক যন্ত্রীকরণ ও স্বয়ংক্রিয়করণ, এবং ভূমি উন্নয়নের ভূমিকা সবচেয়ে বড়। এই কর্তব্য পালন করে কৃষিজাত উৎপন্ন দ্রব্যের উৎকর্ষসাধনের জন্য গ্রামে বৃহৎ যন্ত্রবিজ্ঞান ও উর্বরতাসাধন ব্যবস্থাসম্পন্ন শিল্পের প্রচলন।

মালিকানার দুই রূপের বিকাশ পরস্পরের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, এই বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ ক'রে গণমালিকানা এবং মালিকানার দুই রূপ একাকার হয়ে যাবে। উক্ত প্রক্রিয়া যখন সম্পন্ন হবে তখন শ্রেণীতে

শ্রেণীতে মূল প্রভেদ বিলুপ্ত হবে। তার চেহারাটা কেমন দাঁড়াবে?

সকল উৎপাদন কর্মী সাধারণের শিল্প ও কৃষি উদ্যোগসমূহে কাজ করবে।

সকলের শ্রম ব্যবস্থা মোটামুটি* এক রকম হবে।

সকলেই তার শ্রম অনুযায়ী সাধারণের অর্থ থেকে পারিশ্রমিক লাভ করবে, সামাজিক তহবিলের মাধ্যমে বণ্টনীয় সম্পদ সমভাবে ব্যবহার করবে।

৩৭ ॥ শহর ও গ্রাম

গ্রামোন্নয়নের উপায়

কমিউনিস্ট মালিকানা গঠনের সঙ্গে **শহর ও গ্রামের মধ্যে সামাজিক পার্থক্যের বিলোপ** প্রক্রিয়া সম্পর্কযুক্ত; শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে তোলার পক্ষে এর তাৎপর্য বিরাট।

তবে, এটাও মনে রাখা দরকার যে গ্রাম এবং শহরের মধ্যে পার্থক্যকে শ্রেণী পার্থক্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ এক করে দেখলে চলবে না: এভাবে দেখা ঠিক হবে না এই কারণে যে কেবল যৌথখামারীরাই নয়, রাষ্ট্রীয় খামারের শ্রমিক এবং গ্রামে কর্মরত বুদ্ধিজীবীসম্প্রদায়ের বিশাল বাহিনীও গ্রামে বাস করে এবং পরিশ্রম করে। অন্য দিকে অদ্যাবধি

---

* 'মোটামুটি' কথাটা এখানে আকস্মিকভাবে প্রযুক্ত হয় নি। ব্যাপারটা এই যে আরও কিছু অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য শ্রমব্যবস্থায়, — বিশেষ করে কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত শ্রমব্যবস্থায় এই পার্থক্য বজায় থাকবে। তবে সে পার্থক্যের কোন সামাজিক চরিত্র আর থাকবে না।

পার্থক্য বজায় থাকার কারণ কেবল পূর্বতন শ্রেণী-বৈরিতার মধ্যে নয়, — সমাজ বিকাশের ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতেও নিহিত বটে। শিল্পের কেন্দ্রস্থল হওয়ায় নগর বহুকাল থেকেই উচ্চতর মানের শ্রমচর্চা ও জীবনচর্চার বাহক হয়ে দাঁড়িয়েছে, আর শোষক শ্রেণীর চেষ্টা ছিল শহর থেকে গ্রামের পশ্চাৎপদতাকে চিরস্থায়ী করে রাখা।

সামাজিক উৎপাদনের সকল শাখায় সমাজতান্ত্রিক সম্পর্কের বিজয়ের ফলে এই বিরোধের অবসান ঘটল। গ্রাম আর শহরের কাঁচা মাল সরবরাহের নিছক লেজুড় হয়ে রইল না, — তা সমাজতন্ত্রের সামাজিক ব্যবস্থার সমমর্যাদাসম্পন্ন অন্যতম অংশগ্রহণকারী হয়ে দাঁড়াল।

অর্থনৈতিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিপ্লব গ্রামের চেহারা পাল্‌টে দিল। গ্রামে এখন উচ্চ ও মধ্যশিক্ষাপ্রাপ্ত লক্ষ লক্ষ যোগ্যতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ — কৃষিবিশেষজ্ঞ, প্রাণিসংক্রান্ত প্রযুক্তিবিদ, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়র ও শিক্ষাবিদ কাজ করেন। লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসী বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রায়িত কাজ আয়ত্তে এনেছে। স্কুল, কিন্ডারগার্টেন, ক্রেইশ, হাসপাতাল, সংস্কৃতিভবন, গ্রন্থাগার ছাড়া, চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা, রেডিও-সেট ও টেলিভিশন ছাড়া, অপেশাদার শিল্পীদল ও ক্রীড়াসংগঠন ছাড়া আধুনিক গ্রামের রূপ কল্পনা করা যায় না।

তবে শহর ও গ্রামের মধ্যে এখন জীবনযাত্রার ব্যাপারে মৌলিক পার্থক্য বজায় আছে। বাসগৃহসংস্থান ও জীবনযাত্রার সুযোগ-সুবিধার দিক থেকে গ্রাম এখনও শহরের থেকে অনেক পেছিয়ে পড়ে আছে; সাংস্কৃতিক বিকাশের মানদণ্ডেও তা শহর থেকে পেছিয়ে। এখানেই মূলত অতীতের সামাজিক অসমতার অবশিষ্ট চিহ্ন প্রকাশ পায়, —

কমিউনিজম গঠনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যার চূড়ান্ত বিলোপ ঘটতে থাকে।

গ্রামের সাংস্কৃতিক দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পশ্চাৎপদতা অপসারণের উদ্দেশ্যে কমিউনিস্ট পার্টি সামগ্রিক ব্যবস্থা অবলম্বন করে। পল্লী অঞ্চলের বসতিগুলি প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার আধুনিক চাহিদা অনুযায়ী সুযোগ-সুবিধা পায়। গণশিক্ষার ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও খাদ্যপরিবেশন ব্যবস্থার শাখা-প্রশাখা আরও বিকশিত হতে থাকে। গ্রামের নির্মাণক্ষেত্রে স্থাপত্য, বাসগৃহের অলঙ্করণ ও সজ্জা উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়। গ্রামের জলসরবরাহ, গ্যাস ও বিদ্যুৎসরবরাহ ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত রূপ লাভ করে। ফলে গ্রামবাসীরাও নগরবাসীদের মতো সমস্ত বৈষয়িক ও মানসিক সম্পদের সুযোগ পাবে।

সমস্ত রকম সুযোগ-সুবিধা ও সেবাব্যবস্থার অধিকারী গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী মানুষ কি নগরবাসীর তুলনায় নিজেকে কোনও ব্যাপারে খাটো বলে মনে করবে? সাধারণভাবে ত তা নয়। অচিরে তার বিপরীত ঘটবে, কেননা সমতুল অনেকগুলি পরিস্থিতিতে শহরের জীবনের তুলনায় গ্রামীণ জীবন উৎকৃষ্ট: নির্মল বায়ু, নীরবতা এবং সৌন্দর্য সম্ভোগের সুযোগ, — যা প্রাণবান প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের নিরন্তর সংযোগ ঘটায়, — তা গ্রামেই পাওয়া যায়।

এখানে, এইভাবে বিপরীত একটি সমস্যার উদ্ভব ঘটে — নগরের অনাময় ব্যবস্থা। উক্ত সমস্যার নিজস্ব সমাধান আছে। ইতিমধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নে কোলাহল এবং মোটরগাড়ি থেকে নির্গত গ্যাস ও কারখানার বর্জ্য দ্বারা দূষীকৃত আবহাওয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য বিরাট কাজ চলছে।

মস্কো এবং অন্যান্য বৃহৎ শিল্পকেন্দ্র ঘিরে যে-সব সহ নগরী গড়ে উঠছে সেগুলির মধ্যে নাগরিক ও গ্রামীণ জীবনের প্রকৃষ্ট সমন্বয় দেখতে পাওয়া যাবে। অন্য কথায়, গ্রাম যেমন জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির দিক থেকে শহরের পর্যায়ে উন্নীত হয়, শহরও তেমনি স্বাস্থ্য পরিস্থিতি ও প্রকৃতির সঙ্গে নৈকট্যের দিক থেকে গ্রামের পর্যায়ে উন্নীত হয়।

এর সঙ্গে সংযোগের অপূর্ব উপায়ের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যার কল্যাণে 'পরিত্যক্ত' বলে ভাবার কোন অনুভূতির উদয় হতে পারে না। আধুনিক এরোপ্লেন ও হেলিকপ্টার বর্তমানে ডজন কয়েক মিনিটের হিসাবে গ্রামবাসীকে শহরে পেঁছে দেয়, — সময় সময় উপকণ্ঠে বসবাসকারী শহরবাসীকে শহরের কেন্দ্রে পেঁছুতে যে সময় লাগে ঠিক তার মধ্যে। এসব যানবাহনের বদলে আরও উৎকৃষ্ট ধরনের যানবাহন প্রচলিত হবে। এক কথায়, কাজের খাতিরে অথবা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে যে-কোন কেন্দ্রে আসাটা আজকের দিনের পাশের গ্রামে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার চেয়ে কঠিন কিছু হবে না।

আজকের থেকেও শক্তিসম্পন্ন রেডিও ও টেলিভিশনযন্ত্র, টাটকা খবরের কাগজ, আগে থাকতে কোন রকম ফরমাইশ দেওয়া এবং বিরক্তিকর অপেক্ষা ছাড়াই টেলিফোন সংযোগ ব্যবস্থা — এসবের ফলে মানুষ যেখানেই বাস করুক না কেন, মুহূর্তের মধ্যে সবচেয়ে তাজা খবর পেয়ে যাবে, যে-সব ঘটনা ঘটছে তার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবে।

এর ফলে গ্রাম বলতে আমরা আজ যা বুঝি সেই ধারণাই লুপ্ত হবে। যুক্তিসঙ্গতভাবে পরিকল্পিত, অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ এবং কালি ও ধোঁয়ার মলিনতা থেকে মুক্ত শহর অগণিত সুনির্মিত পল্লী বসতির সঙ্গে মিলিত হবে।

অবশেষে, যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হল কৃষি উৎপাদন যন্ত্রীকরণের (এবং অতঃপর তার স্বয়ংক্রিয়করণের) কল্যাণে এবং কৃষিকার্য ও পশুপালনে বিজ্ঞানের প্রচলনে **কৃষিশ্রম শিল্পশ্রমের বৈচিত্র্যে রূপান্তরিত হতে থাকে।**

এইভাবে, এবং একমাত্র এই উপায়েই শহর থেকে গ্রামের পশ্চাৎপদতা দূর করা সম্ভব। নিজস্ব পরিস্থিতিগত কারণে কৃষিশ্রম যন্ত্রীকরণ ও স্বয়ংক্রিয়করণকে স্বীকার করে না নিলে শহর ও গ্রামের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য দূরীকরণের সকল প্রচেষ্টা আমাদের সদিচ্ছা সত্ত্বেও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হত। কৃষি অর্থনীতিতে হস্তচালিত শ্রমই যদি প্রাধান্য লাভ করে তবে শহর ও গ্রামের সমপর্যায়ী সাংস্কৃতিক বিকাশের কথা বলার কোন অর্থ হয় না। সব গোয়ালিনীকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা যায়, কিন্তু এমন ব্যবস্থা গ্রহণ বাস্তবসম্মত নয়, কেননা শিগ্‌গিরই তাদের অর্জিত জ্ঞান ব্যবহারের এবং তাকে সৃজনশীল শ্রমে সমৃদ্ধ করে তোলার কোন জায়গা পাওয়া যাবে না।

কৃষিশ্রম যখন আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞানের বনিয়াদে স্থানান্তরিত হয় তখন ব্যাপারটি সম্পূর্ণ অন্য। এ ধরনের যন্ত্রবিজ্ঞানের জন্য কর্মীদের অনেক উচ্চ পর্যায়ের বিশেষ এবং সাধারণ জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। জীববিজ্ঞান, পশুচিকিৎসাশাস্ত্র ইত্যাদির কিছু কিছু অধ্যায় সম্পর্কে জ্ঞান ছাড়া জীবজন্তুর উৎপাদনক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ অসম্ভব। অর্থব্যবস্থা পরিচালনার সর্বাপেক্ষা যুক্তি-সিদ্ধ উপায়ের অনুসন্ধান, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সৃজনকর্মের জন্য অনন্ত সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত হতে থাকে।

যৌথখামার ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলি শস্য, মাংস, দুগ্ধ ও অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদনের যথার্থ কারখানায় পরিণত হয়।

আর কারখানায় শ্রমের অর্থ — শিল্পক্ষেত্রে শ্রম, যাতে অতি উচ্চ পর্যায়ের জ্ঞান ছাড়াও প্রয়োজন হয় কর্মীদের সমষ্টিচেতনা।

মনে রাখতে হবে যে এক্ষেত্রে বাধা বিপত্তিও আছে। নিজস্ব বিশেষত্বের দিক থেকে কৃষিশ্রম স্বয়ংক্রিয়ব্যবস্থার অধীনে আনা অধিকতর জটিল, কেননা কৃষিকর্ম ও পশুপালনক্ষেত্রে উৎপাদনের প্রক্রিয়া অবিরাম নয়, তাতে কেবল মানুষ ও যন্ত্রবিজ্ঞানেরই নয়, — প্রকৃতিরও ভূমিকা আছে: উদ্ভিদের পরিপক্কতা, পশুর বৃদ্ধি ইত্যাদির সময় প্রকৃতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। তবে, এতে ইতিমধ্যেই বহু শ্রমপ্রক্রিয়ার স্বয়ংক্রিয়করণে (যেমন, কৃষিযন্ত্রবিদ ফ. লোগিনভ উদ্ভাবিত স্বয়ংক্রিয় ট্র্যাক্টর) কোন রকম প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হয় নি, আর দূর ভবিষ্যতে ত কৃষি অর্থব্যবস্থয় সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ কাজের ধারাবাহিক স্বয়ংক্রিয়করণও সম্ভব হবে।

শিল্পশ্রমের বৈচিত্র্যে কৃষিশ্রমের রূপান্তরের ফলে এমন অবস্থার উদ্ভব হয় যাতে শিল্পে নিযুক্ত মেহনতীদের মতো কৃষিশ্রমে নিযুক্ত মেহনতীরা তাদের কাজে বুদ্ধিমার্গীয় ও শারীরিক শ্রমের সম্মিলন ঘটাতে পারে।

৩৮ ॥ বুদ্ধিমার্গীয় ও শারীরিক শ্রম

কল্পস্বর্গবাদী সমাজতন্ত্রীরাও এমন এক সময়ের কথা কল্পনা করেছিলেন যখন শ্রেণীভিত্তিক সমাজের অন্যতম বৃহৎ অন্যায় — বুদ্ধিমার্গীয় ও শারীরিক শ্রমের কর্মীরূপে মানুষের মধ্যে বিভাগের অবসান ঘটানো সম্ভব হবে।

সমাজতন্ত্র এই ক্ষেত্রে অতীত বিরোধের অবসান ঘটিয়েছে। সমাজতন্ত্রে বিশেষ অধিকারভোগের

উত্তরাধিকারসূত্রে বুদ্ধিমার্গীয় শ্রমের প্রাধান্য আর রইল না, — জ্ঞানের পথ সকলের সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেল। সোভিয়েত বুদ্ধিজীবীসম্প্রদায় শ্রমিক শ্রেণী ও যৌথখামারী কৃষকসম্প্রদায়ের অস্থিমজ্জা, — সমাজের মূল শ্রেণীসমূহের সঙ্গে তার স্বার্থ ও ভাগ্য একাকার। অন্য দিকে সাংস্কৃতিক বিপ্লব বিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান ও শিল্পে ব্যাপক জনসাধারণকে দীক্ষিত করেছে। বিস্তৃতম অর্থে বলতে গেলে লক্ষ লক্ষ উদ্ভাবক ও উৎকর্ষসাধনকারী, সৌখীন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী মানুষ, শিক্ষায় ও সৃজনকর্মে অবসরবিনোদনকারী লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ও কৃষক — এরাই হল বুদ্ধিজীবী মানুষ।

এতে অবশ্য সমাজে বুদ্ধিমার্গীয় এবং শারীরিক শ্রমে মানুষের বিভাগ বজায় থাকার তথ্য বাতিল হয়ে যায় না। উক্ত বিভাগের সম্পূর্ণ বিলোপ কি সম্ভব? — এবং হলে, তা কেমনভাবে? কল্পস্বর্গবাদী সমাজতন্ত্রীরা যে-সব সমাধান দিয়েছেন তার একটি হল বুদ্ধিমার্গীয় ও শারীরিক শ্রমের পর্যায়ানুবৃত্তি।

বর্তমানে বহু মানুষের কার্যকলাপের মধ্যেই এ ধরনের পর্যায়ানুবৃত্তি দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, শ্রমিক তার পরিশ্রমের কাজ শেষ করার পর অধ্যয়নে অথবা উন্নত ধরনের প্রকৌশল গড়ে তোলায় মন দেয়; সারাদিন তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানোর পর গণিতজ্ঞ অবসর সময়ে বাগানের পরিচর্যা করেন। এসব ক্ষেত্রে দেখা যায় বৃত্তির বদল ঘটছে কাজের সময়ের বাইরে, — মানুষের মূল বৃত্তি একই থেকে যাচ্ছে এবং তাতে আগের মতোই হয় বুদ্ধিমার্গীয় অথবা শারীরিক শ্রম প্রাধান্য বিস্তার করছে।

কাজের সময় হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমের

পর্যায়ানুবৃত্তি আরও বিকশিত হবে। এটা ব্যক্তিমানুষ ও সমাজ উভয়ের পক্ষেই হিতকর। তবে, মানুষের কাছে আধুনিক উৎপাদন ও বিজ্ঞানের দাবি — বিশেষীকৃত শিক্ষা। যন্ত্রসংস্থাপনকারী, কৃষিবিদ, শিক্ষক — যে কারও শ্রমের কথাই ধরি না কেন, — জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও বিশেষ যোগ্যতা তার পক্ষে অপরিহার্য। দক্ষতা অর্জন করতে গেলে মানুষের প্রয়োজন প্রধানত কোন একটা ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা অর্জন করা, — এ ছাড়া উৎপাদন, বিজ্ঞান ও শিল্পে তার কাছ থেকে সত্যিকারের কোন সাফল্য আশা করা যায় না। এসব থেকেই বোঝা যায় যে লোকে যাতে তার নির্বাচিত কাজ পরিপূর্ণরূপে আয়ত্ত করতে পারে তার জন্য গভীর বিশেষীকৃত শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন আছে।

সমস্যার সমাধান তা হলে কোথায় অনুসন্ধান করা যায়?

আপাত দৃষ্টিতে, তা করা যায় শারীরিক শ্রমের নিহিতার্থে এমন পরিবর্তনের পথ ধরে, যা বুদ্ধিমার্গীয় শ্রমের সঙ্গে তার নৈকট্য ঘটাতে পারে। অন্য কথায়, যাতে উৎপাদনক্ষেত্রে কাজেরই দাবি হয় কর্মীদের কাছ থেকে উৎকৃষ্ট মানসিক শক্তির চর্চা এবং যাতে সৃজনকর্মের সম্ভাবনা মুক্ত হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

কমিউনিজমের বৈজ্ঞানিক-টেকনিক্যাল বনিয়াদের নির্মাণ ঠিক এই পথেই নিয়ে যায়। সর্বোপরি কঠিন হস্তচালিত শ্রম সম্পূর্ণ অন্তর্ধান করে — সর্বত্র লোকের সাহায্যের জন্য যন্ত্র এগিয়ে আসে; একমাত্র গত দু-তিন দশকের মধ্যে অত্যধিক মানবশক্তি ব্যয়কারী, মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক এবং তার আয়ুক্ষয়কারী বেশ কয়েক শ' বৃত্তি অতীতের গর্ভে বিলুপ্ত হয়েছে।

যন্ত্র যত জটিল হতে থাকে, তাতে কর্মরত শ্রমিকের পক্ষে বিভিন্ন বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান এবং উৎপাদনকৌশলের গভীর উপলব্ধি ততই আবশ্যক হয়ে পড়ে। তাকে একবার শিখে নেওয়া কাজের যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলে না, — সর্বদাই নিজের জ্ঞানের আশ্রয় নিতে হয়, অর্থাৎ সেই জ্ঞানকে সরাসরি নিজের শ্রমের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলতে হয়। **মানুষের উৎপাদনকর্মে বুদ্ধিমার্গীয় ও শারীরিক শ্রমের মৌলিক সংযোগের** পরিস্থিতি গড়ে ওঠে।

এই বাস্তব পরিস্থিতি সম্পূর্ণ করে তোলে গণশিক্ষার সেই সংগঠন, যা সমাজের প্রতিটি সদস্যের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে সহায়তা করে। প্রত্যেকে নির্বাচিত বৃত্তি শিক্ষা করবে, আধুনিক বিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হবে, উৎপাদনশীল শ্রমে সরাসরি অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র ও শ্রম

কঠিন হস্তচালিত শ্রমের অবসান যদি নিকট ভবিষ্যতের ব্যাপার হয়, ত বুদ্ধিমার্গীয় ও শারীরিক শ্রমের মৌলিক সংযোগ — অনেক বেশি জটিল সমস্যা: একমাত্র স্বয়ংক্রিয়ব্যবস্থাসম্পন্ন কমিউনিস্ট উৎপাদনের ভিত্তিতে তার পূর্ণ সমাধান সম্ভব।

স্বয়ংক্রিয়করণের সূচনাপর্বে 'স্বয়ংক্রিয় বোতামের স্বর্গরাজ্য' এবং 'স্বর্গসুখভোগে'র কিংবদন্তী গড়ে ওঠে, কারও কাছে মনে হয়েছিল যে কর্মীদের পক্ষে এমন এক সময় আসবে যখন তারা 'স্রেফ বোতাম টিপে' বিশাল বিশাল যন্ত্র চালনা করতে এবং বাধ্য রোবটকে দিয়ে হুকুম মাফিক কাজ করিয়ে নিতে পারবে।

গোড়াতেই বলে রাখা দরকার যে 'স্রেফ বোতাম টেপা' — প্রথম দৃষ্টিতে কাজটা যেমন সহজসাধ্য বলে মনে হয়, আসলে তেমন নয়। 'বোতামে যন্ত্র পরিচালনব্যবস্থা' শ্রমিকের শ্রম হাল্‌কা করেছে; স্বয়ংক্রিয়ব্যবস্থাসম্পন্ন রোলিং মিলের অপারেটর, ক্রেনচালক, বিদ্যুৎকেন্দ্রের পরিচালক ইঞ্জিনিয়র — সকলেই এর আশ্রয় গ্রহণ করে। এতে মূলত নির্দেশপ্রেরণই সরলীকৃত হয়। কিন্তু যেটা প্রধান কাজ, অর্থাৎ নির্দেশ প্রেরণের আগে যে সমাধান, তার জন্য দরকার — ভালোমতো জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এবং উপস্থিতবুদ্ধি, — এক কথায়, সমস্ত রকম প্রয়াস।

তবে, এই প্রয়াসও কেবল একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞানে উৎপাদনপ্রক্রিয়া বহুগুণ ত্বরান্বিত হয়। এমন পরিস্থিতিতে মানুষের পক্ষে প্রক্রিয়ার গতির উপর দৃষ্টি রাখা সম্ভব নয়। প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক গতি ক্ষুণ্ণ হলে সে কিন্তু আর সময়মতো ব্যাপারটা বুঝে উঠে ভুল সংশোধন করতে অথবা দুর্ঘটনা ঠেকাতে পারে না। তাই 'স্রেফ বোতাম টিপে দেওয়া' ব্যবস্থাসম্পন্ন জমকাল যন্ত্রপাতির মহান নির্মাতা নিজে তারই উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতির উৎপাদনশীল ক্রিয়ার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

এখানে মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসে কম্পিউটার, যা দিয়ে সেকেণ্ডে হাজার হাজার অপারেশন সম্ভব। দ্রুত কার্যক্ষমতা ছাড়া এসব যন্ত্রের আরও একটি উল্লেখযোগ্য গুণ আছে: প্রক্রিয়ার পৃথক পৃথক স্তর তাদের 'স্মরণে' থাকে, তারা ফলাফলের তুলনামূলক বিচার ক'রে তার ভিত্তিতে উৎকৃষ্ট পন্থা নির্বাচন করতে পারে। এইভাবে, যন্ত্র দিয়ে কাজের সর্বাপেক্ষা লাভজনক পদ্ধতি নির্ধারণ ক'রে 'নির্দেশদানে'র সময় তার সাহায্য নেওয়া যায়। চোখের পলকে কার্যক্ষম হুকুম তামিলকারী কম্পিউটার তড়িৎব্যবস্থাচালিত উক্ত নির্দেশসমূহ 'মেনে নেয়'। সংক্ষেপে বলতে গেলে দ্রুত কার্যক্ষম কম্পিউটার মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই উৎপাদনপ্রক্রিয়া 'পরিচালনা' করতে পারে।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে: স্বয়ংক্রিয় উৎপাদনব্যবস্থায় মানুষের উপরে কী ভার বর্তাবে?

মানুষের যা করার থাকবে তা হল অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক কাজ — স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির ডিজাইন ও প্রস্তুতকরণ এবং তদুপরি স্বয়ংক্রিয়ব্যবস্থার জন্য কর্মসূচি প্রণয়ন। সবচেয়ে 'বুদ্ধিমান' যন্ত্রও কেবল অত্যন্ত নির্দিষ্ট কতকগুলি সীমানার মধ্যে 'ভাবতে' পারে, — তাও আবার মানুষই তাকে সময় সময় যে অতি জটিল কর্মসূচি দিয়ে 'দম দেবে' সেই অনুযায়ী।

আগামী দিনের উৎপাদনশ্রম যেমন কঠিন হবে না, তেমনি একঘেয়েও হবে না। মানুষ স্বয়ংক্রিয়পদ্ধতিতে সম্পন্ন একঘেয়ে কাজ যন্ত্রের হাতে সমর্পণ ক'রে নিজে যন্ত্র কৌশলের নিয়মন ও নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। এখানেই ইঞ্জিনিয়রিং-টেকনিক্যাল কার্যকলাপের বহুমুখিনতা।

ফলে, কমিউনিজম গঠনের সঙ্গে সঙ্গে **পুরনো** যে **শ্রমবিভাগব্যবস্থা** অধিকাংশ মানুষকে কঠোর এবং নিষ্প্রাণ কাজের মধ্যে ফেলে রেখে দিয়েছিল, তার সম্পূর্ণ **বিলোপ ঘটবে।** যে-কোন কাজের চরিত্র হবে সৃজনধর্মী এবং তাতে প্রয়োজন হবে বিস্তৃত বৈজ্ঞানিক ও টেকনিক্যাল জ্ঞানের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের বিশেষীকরণের সম্মিলন। 'মাথার এবং হাতে'র কাজের সুষম সমন্বয়ের ফলে যে-কোন শ্রম উপভোগ ও আনন্দের উৎসে পরিণত হবে। এর অর্থ মোটেই এমন নয় যে শ্রম অবসরবিনোদনে পরিণত হবে। শ্রম মানুষের কাছ থেকে সব সময়ই মানসিক ও শারীরিক শক্তি এবং প্রচণ্ড উদ্যমের প্রয়োগ দাবি করে।

স্পষ্ট করে বলতে গেলে আজকের দিনে একজন শল্যচিকিৎসক যেমন একই কালে হাতের এবং মাথার কাজ করতে গিয়ে বুদ্ধিমার্গীয় এবং শারীরিক শ্রমের মধ্যে তাঁর

কাজে কোনটা প্রাধান্য বিস্তার করছে সে সম্পর্কে ভাবেন না, ভবিষ্যতের মানুষও তেমনি তা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাবে না।

সেই সঙ্গে যদি এমন মনে করা হয় যে সকল মানুষের কাজেই বুদ্ধিমার্গীয় ও শারীরিক শ্রমের 'মাত্রা' হবে সম্পূর্ণ সমান, তা হলে ব্যাপারটা নেহাৎই সরলীকরণ হয়ে দাঁড়ায়। বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিতে বুদ্ধিমার্গীয় ও শারীরিক শ্রমপ্রয়োগের অনুপাত সর্বদাই বিভিন্ন রকম হবে। যেমন, ভূতত্ত্ববিদের কথা যদি ধরি — তার পেশীর উপর চাপ শারীরিক শ্রমে নিযুক্ত অন্যান্য কর্মীদের তুলনায় বেশি।

এইভাবে, সময়ে বুদ্ধিমার্গীয় ও শারীরিক শ্রমে মানুষের বিভাগ আর থাকবে না; বিশেষ স্তর হিশেবে বুদ্ধিজীবীসম্প্রদায়ের বিলোপ ঘটবে।

* * *

উৎপাদনের উপায়ের উপর অখণ্ড কমিউনিস্ট মালিকানার গঠন, শহর ও গ্রামের মধ্যে সামাজিক পার্থক্যের বিলোপ, মানুষের উৎপাদনকার্যে বুদ্ধিমার্গীয় ও শারীরিক শ্রমের অঙ্গাঙ্গি সমন্বয় — এসবই হল বাস্তব সামাজিক প্রক্রিয়া যা শ্রেণীগত সীমা নিশ্চিহ্নকরণের দিকে পরিচালনা করে।

৩৯ ॥ কমিউনিস্ট শ্রম ও বণ্টন ব্যবস্থার দিকে

কমিউনিজমের মূলনীতিতে উত্তরণের দুই শর্ত

শ্রম অনুযায়ী পারিশ্রমিকের নীতি — সমাজতন্ত্রের অন্যতম মহান বিজয়; পুঁজিবাদে বৈষয়িক সম্পদ ও মনের

খোরাক বণ্টনের ব্যাপারে যে অস্বাভাবিক অসাম্য বজায় আছে এই নীতি তার বিরোধী।

তবে, শ্রম অনুযায়ী পারিশ্রমিক প্রদানের তাৎপর্য মাত্রই জীবনযাত্রার পরিস্থিতিতে পূর্ণ সমতা নয়। যেখানে বিশেষ নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয় এমন শ্রমে নিযুক্ত মানুষ অদক্ষ শ্রমে নিযুক্ত মানুষের তুলনায় বেশি উপার্জন করে এবং স্বভাবতই অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে জীবন নির্বাহ করে। পারিবারিক সদস্যসংখ্যার পার্থক্যের ফলেও জীবনযাত্রার মানে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক অসাম্যের এই সব জের নিশ্চিহ্ন হবে তখনই, যখন সমাজ শ্রম ও বণ্টনের কমিউনিস্ট নীতির — 'প্রত্যেকের ক্ষমতা অনুযায়ী থেকে প্রত্যেককে তার চাহিদা অনুযায়ী' নীতির রূপায়ণে সক্ষম হবে। এর জন্য কোন পরিস্থিতি আবশ্যক?

সাধারণ সুস্থ চিন্তা এ কথাই বলে যে সর্বোপরি প্রয়োজন **বৈষয়িক ও মানসিক সম্পদের প্রাচুর্যসৃষ্টি** এবং উৎপাদনী শক্তির এমন বিকাশসাধন ও সামাজিক শ্রমের উৎপাদনশীলতার এমন এক উচ্চমাত্রা অর্জন, যাতে সমাজ তার সকল সদস্যের যুক্তিসঙ্গত দাবি সম্পূর্ণভাবে মেটাতে পারে।

এক্ষেত্রে মানুষের চাহিদা সর্বদাই বৃদ্ধি পেতে থাকে, — অর্থাৎ সামাজিক সম্পদ আরও দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া উচিত।

খাদ্যদ্রব্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, জুতো ও বাসগৃহের মতো জীবনধারণের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় ভোগ্যবস্তুর চাহিদাক্ষেত্রে ব্যাপারটি তুলনামূলকভাবে সহজ। স্বাভাবিক জীবনী শক্তি বিকাশের জন্য মানবদেহের পক্ষে কী পরিমাণ ক্যালরির দরকার, খাদ্যে কতটা শ্বেতসার, স্নেহজাতীয় পদার্থ, কার্বোহাইড্রেট ও ভিটামিন থাকা উচিত, কত জোড়া জুতো, কয় প্রস্থ জামা-কাপড় প্রতিটি মানুষের লাগতে পারে এবং সুস্থ ও সংস্কৃতিবান জীবনযাত্রার পক্ষে বাসস্থানের আয়তন

কেমন হওয়া উচিত — বিজ্ঞানীরা সে-সব হিসাব করে বার করেছেন। এ ধরনের সূচকের নাম যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ।

জনসংখ্যার হিসাব নিয়ে এবং তার বৃদ্ধির পরিমাণ গণনা ক'রে কোন চাহিদা কখন পূর্ণভাবে মেটানো যেতে পারে তার সময় নির্ধারণ সম্ভব।

মানুষের চাহিদা অবশ্য অপরিবর্তিত থেকে যায় না: মানুষের সৌন্দর্যবোধ বিকশিত হয়, নূতন নূতন ফ্যাশনের জামা, জুতো ও আসবাবপত্র চালু হয়। তবে, এই সব পরিবর্তন ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ভোগ্যবস্তুর চাহিদা মিটিয়ে যথাযথ উৎপাদন — বিভিন্ন ধরনের দাবি পূরণে এবং উচ্চ মানের রুচি পরিতৃপ্তিতে সক্ষম হবে।

এরই সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পূর্ণ নূতন ধরনের চাহিদার সূচনা করে, যা বলতে গেলে ভালো পোশাক পরার চাহিদা থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় না। কয়েক শতাব্দী আগে অধিকাংশ মানুষেরই বই ছাড়া চলে যেত, অথচ আজ আমাদের কাছে 'দেহে'র খাদ্যের চেয়ে মনের খাদ্য কোন অংশে কম প্রয়োজনীয় নয়। তিরিশ বছর আগে টেলিভিশনের কোন চাহিদা ছিল না, — কিন্তু আজ প্রত্যেকের ঘরে টেলিভিশনের ছোট্ট পর্দাটি থাকা চাই-ই, এবং সোভিয়েত রেডিও-টেকনিক্যাল শিল্পের দায়িত্ব হল আগামী কয়েক বছরের মধ্যে উক্ত চাহিদা পূরণ করা। ভিডিও-টেলিফোন সবে প্রচলিত হতে যাচ্ছে, তবে আগামী দু-এক দশকের মধ্যে প্রত্যেকেই যে এই প্রয়োজনীয় ও সুবিধাজনক যন্ত্রটি পেতে চাইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কমিউনিজমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অতি দ্রুত বৃদ্ধি যে কী নূতন দাবির সূচনা করবে তা আজ আমরা কল্পনাও করতে পারি।

বৈষয়িক ও আত্মিক সম্পদের প্রাচুর্য — কমিউনিস্ট নীতিতে উত্তরণের প্রাথমিক শর্ত হলেও একমাত্র শর্ত নয়: এর কারণ এই যে এটা কেবল বণ্টনের নীতি নয়, — শ্রমনীতিও বটে। আর সত্যিই ত প্রাচুর্য কোথা থেকেই বা

আসবে? মানুষ নিজে এবং সমাজকল্যাণের জন্য নিবেদিত তার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রম ছাড়া আর কে এবং কীই বা মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে পারে? ঠিক এই কারণেই শ্রমে পূর্ণমাত্রায় নিজ নিজ ক্ষমতা প্রয়োগে সমাজের সকল সদস্যের সম্মতি এবং নিজের জ্ঞান ও নৈপুণ্য, প্রতিভা ও উদ্যম সমাজকে অর্পণের মতো উদারতাবোধ — কমিউনিস্ট নীতি প্রবর্তনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হয়ে দাঁড়ায়। কমিউনিজম গঠনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রম নিজে নিশ্বাসপ্রশ্বাসের স্বাভাবিক ও জরুরী চাহিদার মতো মানবদেহের প্রাথমিক প্রয়োজনীয় তাগিদে পরিণত হয়।

ভ. ই. লেনিনের কথায়: 'কমিউনিস্ট শ্রম হল... সমাজের স্বার্থে বিনামূল্যে শ্রমদান, এই শ্রমের উৎপত্তি বিশেষ বাধ্যতামূলক মেয়াদ কাটানোর জন্য নয়, মূল্যবান পণ্যদ্রব্যের অধিকার প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে নয়, পূর্বনির্ধারিত আইনবলে প্রতিষ্ঠিত কোন কিছুর ভিত্তিতে নয়, — এ হল স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রম, নিয়মের অতিরিক্ত শ্রম, যা কোন রকম পারিতোষিক অথবা পারিতোষিকের অনুরূপ শর্তের কথা বিবেচনা করে না; এ হল সাধারণের স্বার্থে মেহনতের অভ্যাসবশত শ্রম... সুস্থ দেহের দাবিতে শ্রম।'

শ্রম ও বণ্টনের কমিউনিস্ট নীতির উভয় অংশ অঙ্গাঙ্গিভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত: ক্ষমতা অনুযায়ী শ্রম ছাড়া চাহিদা অনুযায়ী বণ্টনও হতে পারে না। অতএব জীবনযাত্রার সম্পদের প্রাচুর্যসৃষ্টি এবং কমিউনিস্ট শ্রমসম্পর্কের আদর্শে সমাজের সদস্যদের শিক্ষিত করে তোলা — একই কালে এই দুই সমস্যার সমাধান আবশ্যক। শ্রমের ফলাফলে কর্মীদের বৈষয়িক আগ্রহশীলতানীতির ক্রমিক রূপায়ণ — এই সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি।

বৈষয়িক আগ্রহশীলতা ছাড়া শ্রমের উৎপাদনশীলতার নিরন্তর ঊর্ধ্বগতি ও সামাজিক সম্পদের বৃদ্ধি অসম্ভব। এ ছাড়া কোটি কোটি মানুষকে কমিউনিজমের দিকে পরিচালনা করা যায় না এবং ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ যাতে অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে সকল মানুষের জরুরী চাহিদায় পর্যবসিত হয় তাও করা সম্ভব নয়। এই কারণে বৈষয়িক আগ্রহশীলতার ভিত্তিতে কমিউনিজম গঠন হওয়া উচিত, শ্রম অনুযায়ী পারিশ্রমিক — জনসাধারণের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা মেটানোর মূল উৎস থেকে যায়।

মানুষ যদি কোন প্রয়োজনীয় জিনিস কেনার উদ্দেশ্যে এবং ব্যক্তিগত ব্যবহার ও পরিতৃপ্তিসাধনের জন্য অর্জিত অর্থ ব্যয়ের অভিপ্রায়ে সততার সঙ্গে কাজ করে যায়, তাতেই তাকে অভিনন্দন জানানো যেতে পারে। কিন্তু মানুষ যত অর্থ উপার্জন করে তার অর্জনের লোভও তত বেড়ে ওঠে — এমনও দেখা যায়। অর্থের পশ্চাদ্ধাবন তার জীবনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় এবং সে তখন নিজের প্রয়োজনে যত না কাজ করে, তার থেকে বেশি কাজ করে জমার বাক্সের জন্য। আর মুনাফা সন্ধানে রত এমন ব্যক্তি প্রায়ই অসাধু পন্থার আশ্রয় নিয়ে অপরাধে জড়িয়ে পড়ে।

কমিউনিস্টরা ব্রহ্মচারী মুনি-ঋষি নয়, মানুষের ভালোভাবে জীবনযাপনের ন্যায়সঙ্গত ইচ্ছার অস্বীকৃতি তাদের কাছে অপরিচিত। কিন্তু তাই বলে স্বর্ণপ্রভুত্বের পাল্লায় পড়াও তাদের কাম্য হয়। এই কারণে, ইতিপূর্বে যেমন মন্তব্য করা হয়েছে, সমাজতন্ত্রে শ্রমের বৈষয়িক প্রেরণা নৈতিক প্রেরণার সঙ্গে সম্মিলিত হতে হবে। সোভিয়েত সমাজে শ্রমের নৈতিক প্রেরণা সর্বোপরি মানুষ যে শোষক শ্রেণীর হয়ে কাজ করছে না, — কাজ করছে নিজের জন্য, সমগ্র সমাজের জন্য — এই বোধ অত্যন্ত তীব্র হয়ে

দাঁড়িয়েছে। পার্টি সোভিয়েত মানুষকে তার শ্রমের সামাজিক তাৎপর্য এবং শ্রমের প্রতি তার সচেতন সম্পর্কের শিক্ষা দেয়। সোভিয়েত জনগণ মুনাফার জন্য মেহনত করে না, — মেহনত করে কমিউনিজমের মহান সাধনার সাফল্যের জন্য। এবং তাদের শ্রম শতগুণ পরিশোধিত হয়ে ফিরে আসে, সামাজিক সম্পদের অবিচল বৃদ্ধি নিশ্চিত করে।

সমাজতন্ত্রের সমালোচকদের প্রত্যুত্তর

যে মুহূর্তে কমিউনিজমের মূলনীতি সূত্রবদ্ধ হল, কমিউনিস্ট মতবাদের বিরোধীরা ঘোষণা করল যে এর বাস্তব রূপায়ণ অসম্ভব। আধুনিক বুর্জোয়া মতাদর্শবাদীরাও ঐ একই কথা জোর দিয়ে বলে চলছে। তাদের কথায়, আলস্য মানবপ্রকৃতিতে অন্তর্নিহিত এবং মানুষ একমাত্র ক্ষুধার তাড়নায় অথবা মুনাফার লোভে আচ্ছন্ন হয়ে পরিশ্রম করে। যে মুহূর্তে সমাজ সকলের চাহিদা মেটাবে তখন কেউ আর কুটোটিও নাড়বে না।

এ ধরনের অপবাদ মানুষের প্রতি কী দারুণ অবিশ্বাসের পরিচয় দেয়! না, মানুষ প্রকৃতিগতভাবে অলস নয়, ভাবজগতের অধিবাসী নয়, — সে পরিশ্রমী: বিখ্যাত সূক্তির পুনরাবৃত্তি করে বলা চলে পাখির জন্ম যেমন ওড়ার জন্য, মানুষের জন্মও তেমনি শ্রমের জন্য।

প্রতিভাশালী লেখক বালজাককে সারা জীবন নিদারুণ অর্থকষ্টের মধ্যে কাটাতে হয়েছিল। তাই বলে ‘হিউম্যান কমেডি’র আবির্ভাবের জন্য আমরা যে স্বার্থপরতা ও মুনাফালোলুপতার কাছে বাধিত তা প্রতিপন্ন করার কথা কার মাথায় খেলবে? মানুষের অন্তরাত্মা প্রকাশের শ্রেষ্ঠ রূপের পরিচায়ক সৃজনের আবেগ লেখককে উদ্দীপিত করেছিল। ঐ একই আবেগ বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত অসংখ্য মানুষকে পরিচালনা

করে, — হোক না সে চমৎকার ফুলের চাষে অকৃপণ শক্তিনিয়োগকারী উদ্যানপালনবিৎ অথবা সর্বক্ষণ মৌলিক ডিজাইন তৈরির কাজে মগ্ন ইঞ্জিনিয়র।

সোভিয়েত ইউনিয়নে এখনই জনসংখ্যার এক উল্লেখযোগ্য অংশ শ্রমে তাদের পূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে এবং এ না করে তারা পারে না। কমিউনিস্ট শ্রম-সম্পর্ক গড়ে তোলার আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী লক্ষ লক্ষ মানুষ — সমালোচকদের জল্পনা-কল্পনার যোগ্য প্রতিবাদ।

আলস্য জন্মগত প্রবৃত্তি নয়। নিষ্ক্রিয়তা এবং তার অনুরূপ শিক্ষা থেকে এর জন্ম। নূতন সমাজে মানুষ শৈশব থেকে শ্রমের পাঠশালায় শিক্ষা পায়, সে সৃজনশীল শ্রমে জীবনের লক্ষ্য ও অর্থ দেখতে শেখে। আর যদি এমন অবস্থায়ও কিছু কিছু মানুষ অবহেলার পরিচয় দেয় এবং দায়সারা গোছের পরিশ্রম করে, তবে সমাজ তাদের প্রভাবিত করতে পারে। সোভিয়েত সমাজ এখনই সৎ পরিশ্রমবিরোধী এই সব বিচ্ছিন্ন পরজীবীদের বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে সংগ্রাম পরিচালনা করছে। এমন কথা অনুমান করার কী কারণ থাকতে পারে যে ভবিষ্যতে যখন ক্ষমতা অনুযায়ী শ্রম সব মানুষের অথবা প্রায় সব মানুষের জরুরী চাহিদা হয়ে দাঁড়াবে তখন একজন অলস ব্যক্তি কয়েক হাজার পরিশ্রমী মানুষকে বিশ্লিষ্ট করে দিতে পারবে? হাজার হাজার পরিশ্রমী মানুষ একজন নিষ্কর্মাকে অবশ্যই তার বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করাতে সমর্থ হবে।

বুর্জোয়া মতাদর্শবাদীদের আরও একটি যুক্তি আছে। তাদের কেউ কেউ বলে যে যে-মুহূর্তে সমাজ সকলকে চাহিদা অনুযায়ী পরিতৃপ্ত করবে, সেই মুহূর্তে মানুষের ঐশ্বর্যশালী হওয়ার 'সহজাত প্রবৃত্তি' মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে,

প্রত্যেকে অপরের চেয়ে বেশি গ্রহণ করার চেষ্টায় থাকবে, আর তার ফলে সামাজিক সম্পদ লুটপাট হয়ে যাবে। অন্যেরা এর বিপরীত, — ব্যাপারটাকে এমনভাবে কল্পনা করে যেন কমিউনিস্ট সমাজ মানুষের চাহিদা পরিমিত করতে থাকবে, প্রত্যেককে একই খাদ্যদ্রব্যের সমপরিমাণ অংশ দেবে, প্রত্যেককে নির্দিষ্ট ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ পরতে দেবে ইত্যাদি। এই রকম বিষণ্ণ চিত্র অঙ্কন করে কুৎসারটনাকারীরা নিজেরাই কান্নার রোল তোলে এবং 'বেচারি কমিউনিস্ট'দের ব্যক্তিগত রুচি বিসর্জন দিতে হবে, জীবনের সমস্ত রকম আনন্দ থেকে তারা বঞ্চিত হবে ও তারা স্ট্যান্ডার্ড ডামি-মূর্তিতে পরিণত হবে — এমন অদৃষ্টের কথা ভেবে অঝোরে চোখের জল ফেলে।

এখানেও বুর্জোয়ারা কী ক'রে নিজেদের প্রকৃতি ও সাদৃশ্য অনুযায়ী কমিউনিস্ট মানুষকে বিচারের চেষ্টা করে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বুর্জোয়া নীতিবোধে লালিতপালিত মানুষ কমিউনিজমে গিয়ে পড়লে সত্যি সত্যিই আত্মহারা হয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠবে: 'যা পার লুঠে নাও!' তবে ব্যাপারটা এই যে মুনাফাখোররা কমিউনিজমে পেঁছুতে পারবে না। আগেই বলা হয়েছে যে কমিউনিস্ট বণ্টননীতি পুরোপুরি প্রবর্তিত হয় তখনই, যখন সমাজে কমিউনিস্ট নীতিবোধ বিজয়ী হয়েছে এবং সকল মানুষের সচেতনতা যথেষ্ট উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। আর কমিউনিস্ট মানুষের চেতনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই যে অতি বিকৃত চাহিদার উদয় তার ঘটে না, তার চাহিদা সর্বদাই যুক্তিসঙ্গত।

কমিউনিস্ট সমাজের সচেতন মানুষ কখনও ১০০ কামরাওয়ালা ব্যক্তিগত বাড়ি দাবি করতে যাবে না, যখন

তিন কামরার ফ্ল্যাটেই তার চলে যায়; অথবা নিজের বাসগৃহের দেয়াল জুড়ে এমন জমকাল পেণ্টিং টাঙাতে যাবে না, যার যোগ্য স্থান মিউজিয়ম এবং অন্যান্য প্রকাশ্য জায়গা, যেখানে সকলেই তার সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে; জামা-কাপড়ে সিন্দুক ভর্তি করার অথবা ভূগর্ভ কুঠরিতে খাদ্যদ্রব্য মজুত করার প্রবৃত্তিও তার হবে না, যখন তার সত্যিকারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় সামগ্রী সে সামাজিক ভাণ্ডার ও সামাজিক মজুত থেকে পেতে পারে।

চাহিদা সম্পর্কে এমন বিচক্ষণ উপলব্ধির আওতায় থেকে প্রত্যেকেই তার ব্যক্তিগত রুচি ও প্রবণতা মেটাতে পারে: ফ্ল্যাট সাজাতে পারে, পছন্দসই পোশাক-পরিচ্ছদ পেতে ও তার ফরমাইশ দিতে পারে এবং নিজের পছন্দমতো জীবনযাত্রা গড়ে তুলতে পারে। সময়ের ব্যাপারে কোন কার্পণ্য না থাকলে ভোজনরসিকরা ঘরে বসে তাদের রসনা পরিতৃপ্ত করতে পারে (কেননা সমষ্টিগত ভোজনালয়ে খেতে কাউকে বাধ্য করা হচ্ছে না!) আর ফ্যাশনদুরস্ত মেয়েরা ও কেতাদুরস্ত পুরুষেরা* তাদের সাজ পোশাকের সৌন্দর্যের ব্যাপারে যত্ন নিতে পারে।

---

* সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধানের ইচ্ছেটা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত, — বিশেষ করে তরুণ বয়সে। আসল কথাটা এই যে তা যেন মানুষকে জগৎ থেকে দূরে ঠেলে না দেয়, তাকে যেন বেশভূষার দাসে পরিণত না করে ফেলে। এই শর্তে পরিপাটি সাজসজ্জার প্রয়াস নিন্দনীয় ত নয়ই, — বরং প্রশংসনীয়। প্রাচুর্যের সমাজে পোশাকচর্চা এবং সাধারণভাবে জীবনযাত্রার মান যে আরও বিকশিত হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সাম্প্রতিক কালে বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গিতে যারা কমিউনিজমের সমালোচনা করে, তাদের সঙ্গে পেটি বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রবাদী সমালোচকরা গলা মিলিয়েছে। বৈষয়িক আগ্রহশীলতার নীতিকে তারা আক্রমণের মূল লক্ষ্যবিন্দু হিশেবে বেছে নিয়েছে বলা চলে। তাদের কথা অনুযায়ী অধিক পরিমাণ শ্রম ও শ্রমের উৎকর্ষ হিশেবে অধিক পারিশ্রমিক প্রদানের নীতি মানুষকে স্বার্থপর ও অর্থলোলুপ করে তোলে, আর সোভিয়েত জনসাধারণের জীবনযাত্রার উন্নত মান, তাদের টেলিভিশন ও রেফ্রিজারেটর প্রাপ্তি যেন তাদের বিপ্লবী ভাবধারা থেকে বিচ্যুত করছে এবং সোভিয়েত সমাজকে 'অধোগতি'র পথে, সোভিয়েত ইউনিয়নে 'পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা'র দিকে পরিচালনা করছে।

এই ধরনের বিচারের মধ্যে সমাজতন্ত্রকে নির্বিচার সাধারণীকরণের রাজত্ব এবং বিপ্লবী মনোভাবকে অভাব-অনটনে দিন কাটানো মানুষের বিশেষ ধর্ম বলে ধারণা করার আদত পেটি বুর্জোয়া প্রবণতা অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। অতি বিপ্লবীরা যেমন বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা করে, — ঘটনাটা যদি তাই হত তবে কমিউনিজম একেবারেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত, কেননা তা হলে জনগণের সচ্ছলতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে-কোন সমাজতান্ত্রিক সমাজ পুঁজিবাদী অধোগতির কবলে পড়তে বাধ্য। পেটি বুর্জোয়া বিপ্লবীদের দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক এমনই এক হাস্যকর সিদ্ধান্তের দিকে পরিচালনা করে। এমন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কমিউনিজম গড়া যায় না। মানুষ বিপ্লবের পথে নামে, সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করে যাতে নিজের জন্য এবং সন্তান-সন্ততিদের জন্য সমৃদ্ধ, মুক্ত ও সুখী জীবন গড়ে তোলা যায়। জনগণ তা অর্জন করে নিজেদের বীরত্বপূর্ণ

শ্রমের দ্বারা এবং তার সাহায্যে পুঁজিবাদী দেশের অধিবাসীরা তাদের ভাইদের সামনে দৃষ্টান্ত তুলে ধরে। সমগ্র বিশ্বের মেহনতী মানুষের সামনে মহান আন্তর্জাতিক কর্তব্য — বিপ্লবী চেতনা আজ সোভিয়েত জনগণ দেখতে পায় সেই কাজের মধ্যে, যাতে কমিউনিজম সাফল্যের সঙ্গে গড়ে তোলা যায়।

৪০ ॥ কমিউনিস্ট সামাজিক আত্মনিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রব্যবস্থার পুনর্গঠন

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অন্যতম উল্লেখযোগ্য পূর্ব-অনুমান এই যে কমিউনিজমে কমিউনিস্ট সামাজিক আত্মনিয়ন্ত্রণকে জায়গা করে দিয়ে রাষ্ট্র তিরোহিত হবে। বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের আবির্ভাব অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। ভবিষ্যতে সমাজ জীবনের রঙ্গমঞ্চ থেকে তার প্রস্থান একই রকম অপরিহার্য হয়ে পড়বে।

রাষ্ট্রের তিরোধান — এককালীন কোন ব্যাপার নয়, আকস্মিক কোন বিস্ফোরণ নয়, — এক দীর্ঘমেয়াদী ক্রমিক প্রক্রিয়া। ভ. ই. লেনিন নির্দেশ করেছেন: 'রাষ্ট্রের পূর্ণ তিরোধানের জন্য দরকার পূর্ণ কমিউনিজম।'

কমিউনিজম গঠনের পথে রাষ্ট্রের তিরোধানের পরিস্থিতি ও পূর্বশর্ত গড়ে উঠতে থাকে। সর্বাগ্রে — অর্থনৈতিক পূর্বশর্ত। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছে উৎপাদনী শক্তির এমন এক উচ্চ পর্যায়ে বিকাশের সাফল্য, যাতে মানুষের ক্রমবর্ধমান বৈষয়িক ও মানসিক চাহিদার পরিপূর্ণ ও

নিরন্তর পরিতৃপ্তি ঘটতে পারে; ফলে শ্রম ও উপযোগের পরিমাপের উপর নিয়ন্ত্রণ অনাবশ্যক হয়ে পড়বে।

রাষ্ট্রের তিরোধানের জন্য সামাজিক পূর্বশর্তও আবশ্যক। শ্রেণীবিভাগ ও শ্রেণী পার্থক্যের, শহর ও গ্রামের মধ্যে এবং মানসিক ও কায়িক শ্রমের মধ্যে পার্থক্যের সমস্ত রকম চিহ্ন বিলোপ করা একান্ত প্রয়োজন। কেবল এর পরই সমাজের অভ্যন্তরে মানুষের সম্পর্ক রাজনৈতিক চরিত্র হারাবে।

অবশেষে, রাষ্ট্রের তিরোধানের জন্য সমাজের সদস্যদের চেতনা ও সংস্কৃতির উচ্চ মান, মানুষের চৈতন্যে ও জীবনযাত্রায় পুঁজিবাদের জের অতিক্রম এবং কমিউনিস্ট নীতিবোধের পূর্ণ বিজয়ের মতো মতাদর্শগত পূর্বশর্তও দরকার।

এই হল রাষ্ট্র তিরোহিত হওয়ার মূল অভ্যন্তরীণ শর্তাবলী। নির্দিষ্ট এমন কতকগুলি বাহ্যিক পরিস্থিতিও আবশ্যক হয়ে পড়ে, যেগুলি ছাড়া রাষ্ট্রের তিরোধান ঘটা সম্ভব নয়। তা হল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের পূর্ণ ও চূড়ান্ত বিজয় এবং সাম্রাজ্যবাদের দিক থেকে সামরিক হামলার সমস্ত রকম আশঙ্কার অবসান।

রাষ্ট্রের তিরোধান এবং কমিউনিস্ট সামাজিক আত্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গঠনকে দুই স্বতন্ত্র, পরস্পর বিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া মনে করা ঠিক হবে না। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঞ্চিত বিপুল অভিজ্ঞতা এবং সময়ের পরীক্ষায় অতিক্রান্ত সমাজ পরিচালনার যে-সব রূপ ও পদ্ধতিকে কমিউনিজমে সার্থকভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে সেগুলি প্রত্যাখ্যান করা কিন্তু মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। এখানে প্রশ্ন কেবল বিচক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গির নয়, — প্রথমে রাষ্ট্রের তিরোধান ঘটবে এবং তারপর 'পরিষ্কৃত' জায়গার উপর সামাজিক

আত্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা শুরু হবে — ঘটনার এমন বিকাশ বাস্তব পরিকল্পনায় একেবারেই অসম্ভব। এটা এক অখণ্ড প্রক্রিয়া — **সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার কমিউনিস্ট সামাজিক আত্মনিয়ন্ত্রণে বিকাশের প্রক্রিয়া।**

কমিউনিস্ট সমাজে কি কোন রকম শাসনক্ষমতার অস্তিত্ব থাকবে?

কেবল শাসন কার্যে বিশেষ এক স্তরের মানুষের উপস্থিতি বলতে যা বোঝায় সে ধরনের প্রকাশ্য কোন শাসন কমিউনিজমে থাকবে না। তবে সামাজিক সংগঠনের রূপ যাই হোক না কেন এক দিকে সুস্পষ্ট কর্তৃত্ব অপর দিকে তার সুস্পষ্ট অনুসরণ সর্বদাই বজায় থাকবে। কমিউনিস্ট উৎপাদনের মতো জটিল ও নিখুঁত অর্থনীতিব্যবস্থা বিচক্ষণ কেন্দ্রীকরণ ও নেতৃত্ব ছাড়া মোটেই চলতে পারে না।

অর্থাৎ, কমিউনিজমেও শাসন বজায় থাকবে, তবে সে শাসনের কোন রাজনৈতিক চরিত্র নেই, তা শ্রম ও জীবনযাত্রার স্বেচ্ছামূলক শৃঙ্খলার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

'প্রয়োজনীয় যন্ত্র' রূপে রাষ্ট্রের অবলুপ্তি এবং আচরণবিধির সমষ্টিরূপে গ্রথিত যে-সব আইনের পেছনে রাষ্ট্রের শক্তি নিহিত তার অবলুপ্তির অর্থ মোটেই এমন নয় যে কমিউনিস্ট সমাজে কোন রকম আচরণবিধি থাকবে না। সংগঠিত মানবসমাজ তার সকল সদস্যের জন্য সামাজিক জীবনযাত্রার পক্ষে অবশ্যপালনীয় নীতি-নিয়ম নির্ধারণ করে দেয়। কমিউনিস্ট সমাজে জীবনের সর্বজনগ্রাহ্য নীতির অনুসরণ সকল মানুষের চাহিদা ও অভ্যাস হয়ে দাঁড়াবে।

স্পষ্টত, কমিউনিস্ট সমাজেও এমন বিচ্ছিন্ন অমিতাচারের ঘটনা দেখা দিতে পারে, যা হয়ত আজকের

দিনের আইনলঙ্ঘনের ঘটনার সামিল। উদাহরণস্বরূপ, অনবধানজনিত কাজে গুরুতর ত্রুটি, আচার-ব্যবহারে ত্রুটি ইত্যাদির কথা বাদ দেওয়া যায় না। চারপাশের লোকজনের দ্রুত প্রতিক্রিয়া এবং তাদের অবলম্বিত ব্যবস্থা যে সত্বর সকলের সমর্থন লাভ করবে — এই বিশ্বাস বিচ্ছিন্ন অমিতাচারের ঘটনা দমনের পক্ষে যথেষ্ট হবে।

আজ রাষ্ট্রসংস্থা যে-সব ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করে থাকে — অর্থনীতি ও সংস্কৃতিসংক্রান্ত কার্যপরিচালনা, উঠতি পুরুষের লালনপালন ও শিক্ষাদান এবং শ্রম ও উপযোগ সংগঠন — কমিউনিজমে তা অন্তর্ধান করবে না, — সমাজের বিকাশ অনুযায়ী পুনর্গঠিত হবে। এক্ষেত্রে কার্যপরিচালনা করবে নির্দিষ্ট সামাজিক কর্মকৌশল, সামাজিক আত্মনিয়ন্ত্রণের রাষ্ট্রহীন ব্যবস্থা। উক্ত কর্মকৌশলে রাজনৈতিক চরিত্র না থাকলেও তা যে-কোন রাষ্ট্রের চেয়ে শক্তিশালী হবে তার বিপুল নৈতিক কর্তৃত্বের বলে।

রাষ্ট্রের তিরোধান — জটিল সামাজিক প্রক্রিয়া। এটাও অত্যন্ত স্পষ্ট যে এমন কি কমিউনিস্ট সামাজিক আত্মনিয়ন্ত্রণব্যবস্থা গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই তা প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক পরিপূর্ণতা লাভ করবে না। এই কারণে রাষ্ট্র তিরোহিত হওয়ার পরও যে কিছু সময়ের জন্য কমিউনিস্ট পার্টি বজায় থাকবে এমন মনে করার যথেষ্ট ভিত্তি আছে। সামাজিক আত্মনিয়ন্ত্রণের সকল শাখায় অব্যাহত ও সুশৃঙ্খল কর্মব্যবস্থা নিশ্চিত করে পার্টি তার ঐতিহাসিক ব্রত সমাধা করবে এবং সমগ্র সমাজের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যাবে।

অষ্টম অধ্যায়

নূতন মানুষের শিক্ষা

৪১ ॥ ব্যক্তিমানুষ ও সমাজ

মানুষ সম্পর্কে বিতর্ক

কমিউনিজম মানুষের বৈষয়িক ও মানসিক সম্পদের প্রাচুর্য সূচনা করে, সুখের পরিস্থিতি গড়ে তোলে। আর এসবের জন্য মানুষের কাছে তার দাবি অনেক। নিজেদের শ্রমেই আমাদের জীবনের সাচ্ছন্দ্য অর্জন করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ মানুষকে বন্ধু ও ভাইয়ের মতো ভাবতে না পারবে ততক্ষণ সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। ধর্মীয় কুসংস্কারে যে ব্যক্তি আচ্ছন্ন, তাকে পূর্ণ অর্থে স্বাধীন করা যায় না। আত্মার দিক থেকে যে নিঃস্ব, জ্ঞানের আনন্দ যার কাছে অপরিচিত শিল্পের সৌন্দর্যের প্রতি যে অন্ধ ও বধির সে সুখী হতে পারে না।

অন্য কথায়, কমিউনিজম গঠন করার সময় সমাজের মানুষকে তার উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে, তাদের মধ্যে উচ্চ গুণাবলীর শিক্ষা দিতে হবে এবং মানুষের মর্যাদাকে মসিলিপ্ত করে এমন সব কিছু থেকে তাকে মুক্ত হতে সাহায্য করতে হবে। কোন কোন স্বপ্নাশ্রয়ী উপন্যাসে যেমন দেখা যায় বলা নেই কওয়া নেই কোথা থেকে 'রেডি মেড' কমিউনিস্ট মানুষ এসে হাজির হয় এবং যারা

কমিউনিজমের দাবিতে সাড়া দেয় না তারা যে কোথায় উধাও হয় কে জানে, — এখানে ব্যাপারটা কিন্তু তার থেকে অনেক জটিল। ইতিহাস যে 'মানব উপাদান' দিয়েছে তাই দিয়ে কমিউনিজম গড়ে তুলতে হয়, আর সে উপাদান এক জাতের নয়, — তার মধ্যে যেমন অনেক কিছু ভালো আছে, তেমনি মন্দেরও অভাব নেই।

নূতন মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার অর্থ তার মানসিকতার এবং শ্রম, সমাজ ও পরিবারের সঙ্গে তার সম্পর্কের পুনর্গঠন, অর্থাৎ তার **চেতনা ও আচরণের ক্ষেত্রে বিপ্লব** বলতে পুরোপুরি যা বোঝায় তা সম্পন্ন করা।

এ ধরনের সমস্যার কি আদৌ সমাধান সম্ভব?

বুর্জোয়া সমাজবিদ ও নীতিবিদরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলে: 'না!' তাদের কথায়: 'মানুষ প্রকৃতিগতভাবে অপরিবর্তনীয় প্রাণী। দু'হাজার বছর ধরে তাকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে: হত্যা করো না, অপহরণ করো না, প্রতারণা করো না, কিন্তু দুনিয়ায় আগের মতোই রক্তের ধারা বইছে, রাহাজানি বৃদ্ধি পাচ্ছে, ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। মানুষকে অবশ্যই কিছু পরিমাণে সমাজজীবনের উপযোগী করে তোলা যায়, তাকে বাহ্য শিষ্টাচার পালনের পরিধির মধ্যে শিক্ষা দেওয়া যায়, কিন্তু তাই বলে তার মধ্য থেকে পশুত্বকে উন্মূলিত করা এবং তার অসৎ স্বভাবকে দূর করা কখনই সম্ভব হবে না।'

মার্কসবাদীরা বলেন: 'তা নয়! মানুষকে নূতন করে শিক্ষা দেওয়া যায়।'

বুর্জোয়া সমাজতত্ত্ববিদ ও নীতিবিদদের কথা ঠিক নয়। সমাজজীবনের যে বিশেষ পরিস্থিতি থেকে মানুষের দোষ-ত্রুটির উদ্ভব তা অপসারিত হলে অনিবার্যভাবে সেগুলির

বিলোপ ঘটবে। ব্যক্তিগত মালিকানা এবং মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ — এইগুলি হল সে-সব পরিস্থিতির অন্যতম। ব্যক্তিগত মালিকানা সমাজকে বিনা পরিশ্রমে জীবনের সমস্ত রকম সম্পদের যথেচ্ছা ব্যবহারকারী মুষ্টিমেয় ধনিক গোষ্ঠী এবং বৈষয়িক ও আত্মিক সম্পদের দিক থেকে হৃতসর্বস্ব, সৃজনীক্ষমতার প্রয়োগ ও তার বিকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত কোটি কোটি মেহনতী জীবনের সমস্ত রকম সম্পদের যথেচ্ছা ব্যবহারকারী প্রচেষ্টার জগতে অনিবার্যভাবে আধিপত্য বিস্তার করে বুর্জোয়া ব্যক্তিতাবাদ, — যা মানুষে মানুষে বিরোধের সূচনা করে, বুর্জোয়া নেকড়েসুলভ নীতিশাস্ত্র অনুযায়ী: 'প্রত্যেকে নিজের জন্য', 'মানুষ মানুষের পক্ষে নেকড়ে' ইত্যাদি নিয়ম পত্তন করে।

পুঁজিবাদী দুনিয়ায় কেবল সমাজজীবনের বাস্তব পরিস্থিতিই 'সকলের বিরুদ্ধে সকলের লড়াই' সম্পর্ক (ইংরেজ দার্শনিক হব্‌স শোষণভিত্তিক সমাজকে এইভাবে চিহ্নিত করেছেন) সূচনা করে না। প্রতিদ্বন্দ্বীর টুঁটি টিপে ধরার এবং নৃশংসতা ও প্রতারণার সাহায্যে ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের অধিকারী হওয়ার সামর্থ্য রাখে এমন 'শক্তিমান ব্যক্তি'র যশোকীর্তনকারী বুর্জোয়া মতাদর্শও এর জন্য দায়ী। প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলনকারী ফাশিস্ত তত্ত্বসমূহে এর আরও খোলাখুলি ও নির্লজ্জ প্রকাশ ঘটেছে। ফ্যাশিবাদের ভাবাদর্শগত পূর্বসূরী নীৎশে এক 'অতিমানব' ও 'পাংশুকেশী খলশক্তি' যুগের আগমন ঘোষণা করেছে, যে শক্তি দুনিয়ায় রক্তের বন্যা বইয়ে দেবে এবং সমগ্র মানবজাতিকে দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ করবে।

বিকৃত বুর্জোয়া নীতিবোধের বিরোধিতা করছে প্রলেতারীয় নীতিবোধ, — যা মানবজাতি তার ঐতিহাসিক যাত্রাপথে যে-সব উৎকৃষ্ট নৈতিক গুণ অর্জন করেছে সেগুলি সযত্নে রক্ষা করে আসছে। কেবল রক্ষা করাই নয়, — বুর্জোয়া মতাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তা তুলেও ধরে। এই একটি ঘটনাই মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে বুর্জোয়া মতাদর্শবাদীদের মিথ্যা রটনার স্বরূপ উদ্ঘাটনের পক্ষে যথেষ্ট। না, মানুষের ত্রুটির জন্য তার প্রকৃতি দায়ী নয়, — দায়ী পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, যা মানুষের প্রকৃত স্বভাবকে বিকৃত করে ফেলে।

চেতনায় বিপ্লব ঘটানো অবশ্যই যে-কোন বিপ্লবের চেয়ে কঠিন ব্যাপার। কিন্তু যে সমাজে জীবনযাত্রার বাস্তব পরিস্থিতিই মানুষের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনে, নূতন কমিউনিস্ট নীতিবোধের জয়যাত্রায় সহায়তা করে, সেখানে তার বিজয় অবধারিত।

মানুষ ও তার ভাগ্যসংক্রান্ত তর্কবিতর্ক বহু আগেই তত্ত্ব থেকে প্রয়োগে এসে দাঁড়িয়েছে।

১৯১৭ সনে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাওয়া দুনিয়ার অপর অংশে মেহনতী মানুষকে অনবরত বোঝানো হচ্ছে যে সে অতি ক্ষুদ্র। ধর্মপ্রচারক, টেলিভিশনের ঘোষক, দর্শনবিষয়ক প্রবন্ধাদির রচয়িতা — সকলে উঠে পড়ে একথাই বোঝানোর চেষ্টা করছে যে পৃথিবীতে মানুষের সমস্ত জীবনটা একটা বাইরের আবরণমাত্র, আর সে নিজে — প্রাকৃতিক শক্তির সামনে নেহাৎই ধূলিকণা, 'পরম সত্তা'র বশংবদ আজ্ঞাবহ।

এর বিরোধিতা করে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে উচ্চ, কমিউনিস্টসুলভ ধারণার প্রতিষ্ঠা দেখতে

পাওয়া যায়। মানুষ প্রাকৃতিক শক্তির দাস নয়, — সে আপন সুখের কারিগর ও প্রকৃতির প্রভু; সামাজিক ঝটিকার ঘূর্ণাবর্তে বালুকণামাত্র নয়, — ইতিহাসের স্রষ্টা। আজও যা কিছু মানুষের সদ্‌গুণকে ভূলুণ্ঠিত করতে পারে, মানুষ সে-সব থেকে মুক্ত হওয়ার ক্ষমতা রাখে এবং সে স্বয়ং নিজের হাতেই তা করে, — নিজের জন্য নূতন দুনিয়া গড়ে তোলে। ব্যক্তি ও সমাজতান্ত্রিক সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের সমগ্র ব্যবস্থাটি নূতন মানুষের শিক্ষার কাজ করে।

ব্যক্তির উপর সমাজের এবং সমাজের উপর ব্যক্তির প্রভাব

প্রতিটি মানুষ সমাজের সঙ্গে বহু সূত্রে গ্রথিত। তার জীবনের বৈষয়িক পরিস্থিতি সামগ্রিকভাবে কোন পর্বে অর্জিত সমাজের উৎপাদনী শক্তি বিকাশের মানের উপর নির্ভর করে। তার মানসপ্রবণতা, ভাবনার প্রকৃতি, নীতিবোধ — এসবই সামাজিক প্রভাবের ফল এবং সব কিছুর উপর বর্তমান সামাজিক রীতিনীতি এবং বহু পুরুষ ধরে গঠিত ঐতিহ্য (জাতীয় অথবা সাধারণভাবে মানবজাতিগত) — উভয়েরই ছাপ দেখতে পাওয়া যায়।

কার্ল মার্কসের কথায়: 'মানুষ যদি তার প্রকৃতির দিক থেকে সামাজিক জীব হয়, তবে তার সত্যিকারের প্রকৃতিগত বিকাশ একমাত্র সমাজেই হতে পারে এবং তার প্রকৃতিগত শক্তির বিচার পৃথক পৃথক ব্যক্তির শক্তি দিয়ে না করে সমগ্র সমাজের শক্তি দিয়েই করা উচিত।' এখানে মানুষের

সামাজিক উৎপত্তি এবং সমাজের সঙ্গে তার একাত্মতাসংক্রান্ত ধারণার গভীর অভিব্যক্তি ঘটেছে। সামাজিক কার্যকলাপের মাধ্যমে ছাড়া মানুষ অন্য কোন উপায়ে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না। তদুপরি নিজের প্রকৃতিও সর্বাগ্রে নির্ধারিত হয়ে থাকে সামাজিক জীবনে সে কতখানি অংশগ্রহণ করেছে এবং ইতিহাসে তার গতিবিধি কতটা গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে, — তার দ্বারা। রুশ সাহিত্য সমালোচক, সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়সংক্রান্ত রচনাদির লেখক ভিস্‌সারিওন বেলিনস্কি পরিষ্কার লিখেছেন: 'জীবিত মানুষ তার অন্তরাত্মায়, হৃদয়ে ও শোণিতপ্রবাহে সমাজজীবনের লক্ষণ বহন করে থাকে: সমাজের অসুস্থতা তাকে পীড়া দেয়, তার যন্ত্রণায় সে কষ্ট পায়, সুস্থতায় সে বিকশিত হয় এবং সিদ্ধিতে সে পরম সুখ উপভোগ করে।'

ব্যক্তিত্ব ধারণাটি আমরা মানুষের সামাজিক প্রকৃতি ও সমাজের সঙ্গে তার পারস্পরিক সম্পর্কের কথা মনে রেখে ব্যবহার করে থাকি।

সামগ্রিকভাবে সমাজ এবং বিশেষ করে মানুষের প্রত্যক্ষ সামাজিক পরিবেশ তার ব্যক্তিত্ব গঠনে চূড়ান্ত প্রভাব বিস্তার করে ।কিন্তু বিপরীত সম্পর্কটাও চোখে না পড়ার মতো নয়। সমাজ শেষ পর্যন্ত বহু ব্যক্তিমানুষের সমবায়ে গড়ে ওঠে। প্রতিটি বস্তু কারও না কারও তৈরী, প্রতিটি ভাব কারও না কারও মস্তিষ্কে সুপরিণত, প্রতিটি শব্দ কারও না কারও উচ্চারিত। সামাজিক সম্পদ ও সংস্কৃতি পৃথক পৃথক ব্যক্তির সম্মিলিত শ্রমে গড়ে ওঠে। সমাজজীবনের তীব্রতা ও পরিপূর্ণতা এবং তার বিকাশের গতি এক দিকে যেমন সমাজব্যবস্থার উপর নির্ভর করে, অপর দিকে তেমনি নির্ভর

করে সমাজের অন্তর্গত সদস্যদের সৃজনের উদ্যম, তাদের ক্ষমতার বাস্তব প্রয়োগ ও বিকাশের স্তর এবং শ্রমের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ও অন্যান্য নীতিবোধের উপর।

এইভাবে, 'সমাজ ও ব্যক্তিমানুষে'র সম্পর্ক এক পারস্পরিক ক্রিয়াশীল পদ্ধতি হয়ে দাঁড়ায়, তবে পারস্পরিক ক্রিয়ার চরিত্র এখানে জটিলতার দিক থেকে বিশিষ্ট ধরনের। মানবসভ্যতা বিকাশের সমগ্র কাল জুড়ে এই সম্পর্ক দর্শন ও নীতিশাস্ত্রের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল, উক্ত সম্পর্ক রাজনৈতিক আলোচনার সামগ্রী এবং সাহিত্য ও শিল্পের অন্যতম শাশ্বত বিষয়বস্তু হিশেবে কাজ করেছে। নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বিস্তৃত বর্ণচ্ছটা দুই চরম মতামতকে ঘিরে আবর্তিত: এক দিকে যারা সমস্ত রকম সামাজিক দায়িত্ব থেকে ব্যক্তিমানুষের মুক্তির পক্ষে, অপর দিকে যারা সমাজের সামনে ব্যক্তিমানুষের সম্পূর্ণ অধীনতার সমর্থনে সংগ্রামরত। এই সব দাবির অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক তাৎপর্য কী তার বিচার না করেও বলা চলে যে এগুলি মানবতাবিরোধী।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সঙ্গে গলা মিলিয়ে যারা সমস্ত রকম সামাজিক, নিয়ম-কানুনকে আবর্জনাস্তূপে নিক্ষেপের আওয়াজ তোলে সেই সব নৈরাজ্যবাদী থেকে শুরু ক'রে যেখানে 'মহান কর্ণধারে'র ইচ্ছার প্রতি বিচারবিবেচনাহীন বশ্যতা রূপে উচ্চ নৈতিক গুণের সমাদর, — এমন এক বিশাল সেনানিবাসে সমাজকে পরিণত করার তত্ত্বগঠনের ও তার বাস্তব রূপদানের যারা প্রয়াসী সেই সব মাওবাদী পর্যন্ত বিভিন্ন ধারার পেটি বুর্জোয়া বিপ্লবীদের কাছ থেকে এমন দাবি শুনতে পাওয়া স্বাভাবিক। বলাই বাহুল্য যে বিজ্ঞানভিত্তিক কমিউনিজমের মূলতত্ত্বের

সঙ্গে এর বিন্দুমাত্র মিল নেই এবং এ ধরনের যে-কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

বহু মানবতাবাদী চিন্তাবিদ ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বার্থের মধ্যে সুসমঞ্জস সমতাসাধনের উদ্দেশ্যে নিজস্ব ধরনের আদর্শ সূত্র অনুসন্ধান করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জার্মান দার্শনিক ইম্মানুয়েল কাণ্টের বিখ্যাত অনুশাসন: 'অপরের ক্ষেত্রে এমন কিছু না করা যা নিজের ক্ষেত্রে কাম্য নয়' — বিরাট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এই বিধি মানুষে মানুষে এবং ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কবিষয়ক সমস্যার সমাধান বলে গণ্য হত। তবে, গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলে এটা লক্ষ্য করা কঠিন হবে না যে এতে যা আছে, তা নেতিবাচক নির্দেশমাত্র: কেমন আচরণ করা অনুচিত, — সে সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু কেমন আচরণ করা উচিত সে ব্যাপারে কোন কথাই নেই।

মন্ত্রপূত সূত্রের অনুসন্ধান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল, কেননা পুঁজিবাদী সমাজে শাসক শ্রেণী এবং মেহনতী মানুষের স্বার্থের মধ্যে কোন রকম সমতা নেই এবং থাকতে পারেও না। পুঁজিবাদ তার নিজস্ব প্রকৃতি অনুযায়ীই ন্যায়পরায়ণ এবং তদুপরি সাধারণ, অর্থাৎ সকলের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য সমাজ ও ব্যক্তিমানুষের সম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ করে দিতে নারাজ। এবং এরই নীরব স্বীকৃতি হিশেবে যেন কাণ্টীয় অনুশাসন পরস্পরকে গলাধঃকরণ না করার নীতিতে সংগ্রাম পরিচালনার আহ্বান জানিয়েছে।

ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কবিষয়ক সমস্যার সমাধান করতে গেলে গোড়ায় প্রাথমিক পরিস্থিতির

পরিবর্তনসাধন — স্বয়ং সমাজের পুনর্গঠন এবং ব্যক্তির নূতন করে শিক্ষাদান প্রয়োজন। বিজ্ঞানভিত্তিক কমিউনিজমের তত্ত্বগত সমস্যা এইভাবে সূত্রবদ্ধ হয়েছে এবং এইভাবেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দ্বারা তার সমাধানে আসা গেছে।

সমাজতন্ত্র সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আত্মিক প্রগতিকে যে ব্যক্তিমানুষের বিকাশের সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত করে এখানেই তার ঐতিহাসিক যোগ্যতা এবং পুঁজিবাদের উপর তার মূল প্রাধান্য। এখন থেকে এবং চিরকালের জন্য **সমাজ-প্রগতির প্রধান মানদণ্ড হয়ে দাঁড়াচ্ছে মানুষের শ্রীবৃদ্ধি ও তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ, আর মানুষের যোগ্যতার মানদণ্ড — সমাজের প্রতি সেবা এবং সমাজের বৃদ্ধি ও বিকাশে তার প্রযত্ন।** ব্যক্তিমানুষ এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে সম্পর্কের এই হল বাস্তব ভিত্তি।

ব্যক্তিত্ব গঠন

ইতিপূর্বে লক্ষ্য করা গেছে যে সমাজের, তথা সামাজিক পরিবেশের প্রভাবে ব্যক্তিমানুষ গঠিত হয়। সমাজতন্ত্রের পরিস্থিতিতে উক্ত প্রভাব দ্বিবিধ লক্ষণাক্রান্ত। প্রথমত, সমাজ তার নিজের অস্তিত্বের বাস্তব ঘটনা এবং তার অভ্যন্তরীণ মুখ্য রীতির সাহায্যে ব্যক্তিমানুষ গঠন করে। দ্বিতীয়ত, মানুষকে কমিউনিজমের ভাবমন্ত্রে শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যে তা সচেতন ও সুসঙ্গত কার্য পরিচালনা করে।

কমিউনিস্ট শিক্ষা সর্বোপরি শিক্ষাগ্রহণকারীদের আগ্রহের কথা মনে রাখে। তার উদ্দেশ্য — আরও সর্বাঙ্গীণ বিকশিত ব্যক্তিত্ব গঠন। এই উদ্দেশ্য সামাজিক স্বার্থ এবং

উৎপাদনী শক্তি বিকাশের গতিবৃদ্ধি ও সামাজিক সম্পর্কের উৎকর্ষসাধনসংক্রান্ত সমস্যার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিসম্পর্কে যুক্ত।

জনসাধারণকে কমিউনিস্ট শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা — পার্টির কার্যকলাপের মধ্যে অন্যতম মুখ্য স্থান অধিকার করে। এটি কমসমোলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এতে উঠতি পুরুষকে গড়ে তোলা ও তার শিক্ষার ভার মূলত যাদের উপর ন্যস্ত রয়েছে সেই পরিবার ও বিদ্যালয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন সোভিয়েত, ট্রেড ইউনিয়ন এবং অন্য সব সামাজিক সংগঠন, সাহিত্য ও শিল্প, প্রেস, রেডিও ও টেলিভিশন অংশগ্রহণ করে থাকে। এক কথায়, এ হল সর্বসাধারণের সমাধানযোগ্য সমস্যাগুলির অন্যতম।

ব্যক্তিমানুষ গঠনের পুরো দায়িত্বটি সমাজের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া কিন্তু ঠিক হবে না। একথা মানতেই হবে, যে সাক্ষরতা পেতে অনিচ্ছুক তাকে সাক্ষরতা দান করা সহজসাধ্য নয়; যে নিজের দোষ-ত্রুটি স্বীকারে অনিচ্ছুক তার মধ্যে সদ্গুণ জাগিয়ে তোলা দুরূহ। প্রকৃতি ও সমাজের নিয়ম সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টির পরিধি ও তার উপলব্ধির মাত্রা কতটা বিস্তৃত হবে তা অনেকখানি নির্ভর করে তার নিজের উপর। এক কথায়, আনুষঙ্গিকভাবে আরও ভালো হওয়ার এবং আরও জানার জন্য মানুষের আন্তরিক আগ্রহ এবং আত্মোন্নতির উদ্দেশ্যে কর্মশক্তি পরিচালনা অর্থাৎ স্বশিক্ষা ছাড়া আর কোন কিছুই শিক্ষার প্রক্রিয়া এমন ত্বরান্বিত ও সহজসাধ্য করে তুলতে পারে না।

শিক্ষা — সাধারণত অত্যন্ত জটিল ও শ্রমসাধ্য প্রক্রিয়া। তা মানুষকে যতদূর সম্ভব বেশি জ্ঞান এবং প্রয়োজনীয় নৈতিক গুণে মণ্ডিত করার এবং তার অন্তর্নিহিত প্রতিভা ও ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা করার দাবি থেকে উদ্ভূত

কমিউনিস্ট শিক্ষার সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। মানুষ কমিউনিস্ট গঠনকর্মের পথ ধরে যত অগ্রসর হয়, এই সমস্যার সমাধান ততই সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বহু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক কাজ সম্প্রসারণের প্রস্তুতি চলছে। এর মধ্যে আছে সোভিয়েত আইন-কানুন ও বিচারব্যবস্থার বনিয়াদসংক্রান্ত ধারণা গড়ে তোলা, সমাজতান্ত্রিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক এবং নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞানসঞ্চারের উদ্দেশ্যে আইনসংক্রান্ত শিক্ষাদান; আছে — শিল্পের নিয়ম বুঝতে পারার ও তার শ্রেষ্ঠ অবদান উপভোগ করার মতো নন্দনতাত্ত্বিক শিক্ষা, যা সুন্দরের প্রতি ভালোবাসা এবং প্রকৃতি ও মানুষের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য উপলব্ধির ক্ষমতা বিকশিত করে তোলে।

অখণ্ড ও বহুমুখী ব্যক্তিত্ব গঠনের আরও অনেকগুলি ধারা আছে। তাদের মধ্যে মুখ্য যেটি বাকি সব কিছুর এক ধরনের নৈতিক বনিয়াদ হিশেবে কাজ করে তা হল শ্রমের শিক্ষা।

৪২ ॥ মেহনতে ধাতস্থ নূতন মানুষ

শ্রমের কাব্য

শক্তির কী অসাধারণ আবেশ, কী আনন্দই না অনুভব করা যায় যখন বিশেষ মেহনতে প্রয়োজনীয় কোন কিছু গড়ে তোলা যায়! মনে হয় সূর্যের কিরণটা যেন আরও উজ্জ্বল, চারদিকের জগৎ যেন হাস্যোজ্জ্বল, আর সুন্দর ও কল্যাণকর অনুভূতির প্রাচুর্যে হৃদয় যেন হাল্‌কা বোধ হয়।

বিখ্যাত সোভিয়েত কবি ভ. ইয়া. ব্র্যুসভ লিখেছেন:

কর্ম সে মহা-আনন্দময়
খেতে, মেশিনে ও টেবিলে বসে —
ঘর্মঝরানো কাজই সুসময়
আত্মস্বার্থহীন যদি হয়,
আছে পৃথিবীতে অখণ্ড সুখ শ্রমের বশে।

মানুষের পক্ষে শ্রম হল ফূর্তি ও মানসিক উদ্দীপনার উৎস। শ্রম তার আত্মনির্ভরতা, উদ্যম, তীক্ষ্ণতা, কর্মপ্রবণতা ও চরিত্রের দৃঢ়তা গড়ে তোলে।

মানুষের পক্ষে শ্রমের তাৎপর্য সম্পর্কে অনন্যসাধারণ রুশ শিক্ষাবিদ ক. দ. উশিন্স্কি বলেছেন: 'ব্যক্তিগত শ্রম ছাড়া মানুষ সামনের দিকে এগোতে পারে না; এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না; সে পিছু হটতে বাধ্য। মানুষের দেহ, হৃদয় ও মস্তিষ্ক শ্রমের দাবি করে, আর সে দাবি এমনই সনির্বন্ধ যে যদি কোন কারণে মানুষের জীবনে তার ব্যক্তিগত শ্রমের প্রকাশ দেখতে না পাওয়া যায়, তা হলে সে প্রকৃত পথ হারিয়ে ফেলে এবং তার সামনে অন্য যে দুটি পথ খোলা থাকে তারা উভয়ই সমান মারাত্মক: জীবন সম্পর্কে অসীম বিরক্তিবোধ, গভীর অনীহা ও অতলস্পর্শী বিষণ্ণতার পথ অথবা অগোচরে স্বেচ্ছাবৃত আত্মনিধনের পথ অবলম্বন, — যে পথে মানুষ দেখতে দেখতে শিশুসুলভ খামখেয়ালিপনা অথবা নীচ আনন্দ উপভোগের পর্যায়ে নেমে আসে। দুটি পথের যে কোনটিতেই জীবিত অবস্থাতে মানুষকে মৃত্যু অধিকার করে বসে; কেননা ব্যক্তিগত শ্রম, স্বাধীন শ্রম — এই হল জীবন।'

শোষণ শ্রমের আনন্দ হরণ করে। শ্রম শ্রমিকের পক্ষে এমন এক বোঝা হয়ে দাঁড়ায় যা সে জীবিকাসংস্থানের জন্য বহন

করতে বাধ্য। আর সে শ্রমেও আবার অনেকের অধিকার থাকে না। কোটি কোটি সুস্থ ও কর্মক্ষম মানুষ মৌলিক মানবাধিকার — শ্রমের অধিকার থেকে বঞ্চিত। এবং এতদ্‌সত্ত্বেও পুঁজিবাদে পর্যন্ত কর্মরত মানুষ উচ্চ নৈতিক গুণে বিশিষ্ট হয়ে থাকে। কার্ল মার্কসের কথায়: 'পরিশ্রমে রুক্ষ তাদের মুখগুলো আমাদের উপর মানবিক মহত্ত্বের দীপ্তি বিচ্ছুরণ করে।'

সমাজতন্ত্র শ্রমকে শোষণের নিগড় থেকে মুক্ত করে। স্বাধীন শ্রম চোখের উপর সৃজনে পরিণত হয়। যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রগতি এতে প্রভূত সহায়তা করে। ধাতু-কারখানায় ইস্পাত ঢালাইকরের শ্রমের কথা ধরা যাক। আধুনিক টেকনিক্যাল সাজসরঞ্জামের ফলে এ কাজের জন্য শ্রমিকের বেশ জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। আর স্বয়ংক্রিয় লেদ মেশিনে টার্নারের কাজ? অতীতে ভালো কারিগর সম্পর্কে যেখানে বলা হত 'চমৎকার হাত,' আজ সেখানে এটুকুই যথেষ্ট নয়, 'চমৎকার মাথা'ও বলতে হয়।

তবে, এর অর্থ এমন নয় যে যতক্ষণ পর্যন্ত না যন্ত্রবিজ্ঞান শ্রমের চরিত্র পুরোপুরি বদল করছে এবং সর্বক্ষেত্রে তাকে সৃজনে পরিণত করছে ততক্ষণ অপেক্ষা করে থাকতে হবে। কেননা একটু নজর দিলেই যে-কোন শ্রমকে চিত্তাকর্ষক করা যায়। আর তার অর্থ এই যে নিজের সমস্ত ক্ষমতাকে কাজে নিক্ষিপ্ত করতে হবে এবং যতদূর সম্ভব সুষ্ঠুভাবে তা সম্পাদন করতে হবে। সর্বদাই বুদ্ধি খাটানো যায়, ভেবে কোন কিছুর উৎকর্ষসাধন করা যায় এবং তার ফলে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি সম্ভব হয়। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে অতি 'সাধারণ' বৃত্তিটি হল আগ্রহ।

প্রাণবান চিন্তাকে কাজে লাগানোর প্রয়াস মেহনতী মানুষের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ও প্রবণতায় প্রেরণা সঞ্চার করে এবং বলতে গেলে এই সব ক্ষমতার স্তর কিছুটা উন্নতও করে। শ্রমের প্রতি সচেতন সম্পর্ক এবং কাজে নিবিষ্টতার ফলে অতি সাধারণ বৃত্তির কর্মীরা নিজ নিজ মেধার প্রকাশ ও বিকাশ ঘটাতে পারে।

সৃজন — শ্রমে আনন্দ ও তৃপ্তির সঞ্চার করে, মানুষকে তার কার্যকলাপের দ্বারা গভীরভাবে সন্তুষ্ট করে এবং তার অন্তর্জগৎ সমৃদ্ধ করে। এ রকম শ্রম শেষ পর্যন্ত জীবনের সর্বপ্রথম চাহিদা হয়ে দাঁড়ায়। মহান সোভিয়েত লেখক মাক্সিম গোর্কির ভাষায়: 'প্রতিটি মানুষের মধ্যে নির্মাতার প্রাজ্ঞ শক্তি সংগুপ্ত আছে, ...তাকে বিকাশ ও প্রস্ফুরণের স্বাধীনতা দিতে হবে, যাতে তা দুনিয়াকে আরও বেশি চমৎকারিত্বে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে।'

যৌথ শ্রমে মানুষে মানুষে নূতন সম্পর্কের সূচনা হয়: মৈত্রী, পারস্পরিক সহায়তা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা দৃঢ় হয় এবং সমষ্টির দাবি ও মতামতের উপযোগী করে নিজের আচরণ গড়ে তোলার অভ্যাস অর্জিত হয়। আমার শ্রম মানুষের কাছে প্রয়োজনীয়, — এই প্রত্যয় মানুষকে বাধা-বিপত্তি অতিক্রমে সাহায্য করে, তার শক্তি বৃদ্ধি করে। সৃজনশীল শ্রমে নিযুক্ত মানুষের দিকে লক্ষ্য করলেই তা বোঝা যাবে। তার জীবন সর্বদাই চিত্তাকর্ষক, নূতনের অন্বেষায় সম্পৃক্ত, প্রতিটি দিন তার সামনে বিস্তীর্ণ দিগন্ত উন্মোচন করে।

সোভিয়েত জনগণের কাছে শ্রম — মর্যাদার কাজ, জীবনের মর্মকথা।

এই পুরুষের কীর্তি

সোভিয়েত জনগণ ভাসিলি চাপায়েভ ও সের্গেই লাজো, নিকোলাই অস্ত্রোভ্স্কি ও আর্কাদি গাইদার, অলেগ্ কশেভোই ও জোয়া কস্মদেমিয়ান্স্কায়ার কালের কীর্তিতে গর্বিত। তাদের ঈর্ষিত গৌরবের কথা স্মরণ করে কোন কোন সোভিয়েত তরুণ-তরুণী ভাবে প্রবল বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের উদ্দীপনা বুঝি বা অতীতের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু জীবনে কীর্তির স্থান সর্বদাই আছে। কেবল নিজেদের সময়ের কর্তব্যের কথা ভালোভাবে বুঝে নিয়ে সাহসের সঙ্গে তা সমাধানের জন্য অগ্রসর হতে হয়।

সমাজতন্ত্র বীরত্বপূর্ণ কীর্তি প্রকাশের ক্ষেত্র অভূতপূর্বভাবে প্রসারিত করেছে। তা মানবজীবনের মূল ক্ষেত্র শ্রমে কীর্তি প্রকাশের দ্বার অবারিত করে দিয়েছে। গোর্কির কথায়: 'শ্রম ও সৃজনের বীরত্বের চেয়ে গরীয়ান আর কিছু দুনিয়ায় নেই'।

যদি নিজের কাজের গভীর অর্থ বোঝা যায়, তার সামাজিক তাৎপর্য অনুধাবন করা যায় এবং নিজেকে সৈনিক বলে ভাবা যায় তবে কৃতিত্ব প্রদর্শনের আন্তরিক তাগিদ প্রকাশ পায়। তখন বীরত্বপূর্ণ কিছু দেখা সম্ভব, — এমন কি যাকে মামুলী বৃত্তি বলে মনে হয়, তার মধ্যেও। তখন সর্বদা এবং সর্বত্র সত্যের জন্য সংগ্রামের পৌরুষ এবং ক্ষুদ্র সুখের মধ্যে নিজের জীবনকে বেঁধে না রেখে মাতৃভূমির স্বার্থে আত্মনিয়োগের পরম আনন্দ অর্জন করা সম্ভব হবে, — তবে সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে রাতারাতি বীরের পর্যায়ে উন্নীত হওয়া যায় না। কমিউনিস্ট শ্রমসম্পর্ক হল পরিণত চিন্তা ও দৃঢ় প্রত্যয়ের এবং মাতৃভূমির প্রতি

নিজের কর্তব্য সম্পর্কে গভীর আন্তরিকতা ও নাগরিক বোধের অভিব্যক্তি।

কমিউনিজমের জন্য সংগ্রামের পুরোভাগে হাজার হাজার শ্রমবীরের আবির্ভাব ঘটেছে। এঁরা হলেন ফিটার ভিক্তর এরমিলভ, খনিশ্রমিক নিকোলাই মামাই, ট্র্যাক্টরচালক আলেক্সান্দর গিতালভ, থ্রেড কাটার কন্‌স্তান্তিন মাস্‌লি, টার্নার ক্লারা কুচেরভা, মেশিন অপারেটর তুর্‌সুনই আহুনভা, যৌথখামারের কর্মী স্তেপানিদা ভিশ্‌তাক এবং অন্যেরা।

অর্থনীতি ও সংস্কৃতিগত নির্মাণক্ষেত্রে সর্বোচ্চ কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ 'সমাজতান্ত্রিক শ্রমের বীর' খেতাব প্রচলনের পর পঁচিশ বছরের বেশি কেটে গেছে। আজ সোভিয়েত ইউনিয়নে হাজার হাজার 'সমাজতান্ত্রিক শ্রমের বীর' আছেন। এঁদের মধ্যে আছেন শিল্প ও কৃষি এবং পরিবহণ ও যোগাযোগকর্মী, নির্মাণকর্মী, বিজ্ঞানকর্মী, ডাক্তার ও শিক্ষক।

মাতৃভূমির কর্মে বিশিষ্টতা অর্জনের জন্য তাঁদের মধ্যে অনেকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার 'কাস্তে ও হাতুড়ি' স্বর্ণপদকে ভূষিত হয়েছেন। এঁরা হলেন আকাদেমিশিয়ান ম. ভ. কেল্‌দিশ, খনিশ্রমিক ই. ই. ভ্রিদ্‌কো, মহাকাশযান নির্মাতা স. প. করলিওভ, বিমান ডিজাইনার আ. ন. তুপলেভ, যৌথখামারকর্মী বাস্‌তি মাসিম কিজি বাগিরভা প্রমুখ।

মহাকাশে মানবজাতির পথ নির্মাণকারী নির্ভীক সোভিয়েত বাজপাখিরা বীরত্ব ও সোভিয়েত দেশপ্রেমের উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য নিজেদের মধ্যে রূপায়িত করেছেন। মহাকাশচর্চার পথপ্রদর্শক ও নক্ষত্রের সান্নিধ্যলাভকারী তাঁরা হয়ে দাঁড়ালেন সোভিয়েত মানুষের পৌরুষ ও সৌন্দর্য, নৈতিক শক্তি ও মানসিক ঐশ্বর্যের প্রতিমূর্তি।

আমাদের সময়কার অন্যতম বিখ্যাত বীর ইউরি গাগারিনের নাম চিরদিন মানবজাতির দীপ্তিস্বরূপ হয়ে থাকবে। সোভিয়েত দেশ ও কমিউনিস্ট পার্টির সন্তান তাঁর উপর মানুষের জন্য প্রথম মহাকাশের তোরণ উন্মুক্তকরণের সম্মানজনক দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। এ ঘটনা ঘটেছিল ১৯৬১ সনের ১২ই এপ্রিল।

ইউরি আলেক্সেয়েভিচ গাগারিনের জীবন আরও হাজার হাজার সোভিয়েত মানুষেরই মতো। ১৯৩৪ সনের ৯ই মার্চ স্মলেন্স্ক অঞ্চলের এক যৌথখামারকর্মী পরিবারে তাঁর জন্ম। তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে মস্কো অঞ্চলের অন্তর্গত ল্যুবের্ৎসি শহরের কারিগরী বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করেন। সারাতভ শিল্প কারিগরী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করেন। বিমানবিদ্যার প্রতি তাঁর আগ্রহের ফলে তিনি প্রথম বিমান ক্লাবে এবং অতঃপর অরেনবুর্গ সামরিক বিমানবিদ্যা ও বিমানচালক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হন।

প্রতিভাবান ও নির্ভীক ফাইটার বিমানচালক ইউ. আ. গাগারিন মহাকাশচারী বাহিনীতে যাঁরা প্রথম অন্তর্ভুক্ত হন তাঁদের অন্যতম। এখানেই তাঁর বিশিষ্ট গুণাবলীর উজ্জ্বলতম প্রকাশ ঘটে। তিনি দৃঢ়তা ও উদ্যমের সঙ্গে মহাকাশচর্চা ও মহাকাশপ্রকৌশলসংক্রান্ত জটিল সমস্যাদির সমাধানে ব্যাপৃত হন এবং মহাকাশযানের ক্রুদের তালিম ও প্রশিক্ষণের পেছনে বহু শক্তি ব্যয় করেন। তিনি বিরাট আকর্ষণীক্ষমতা ও বিনয়ের গুণে সকলের ভালোবাসা অর্জন করেছিলেন; গাগারিনের স্নিগ্ধ হাসি কোটি কোটি মানুষের স্মরণে আছে। ১৯৬৮ সনের ২৭শে মার্চ এই বীরের সংক্ষিপ্ত গৌরবময় জীবনে ছেদ পড়ল — প্রশিক্ষণমূলক বিমানচালনাকালে এক দুর্ঘটনায় তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

নিঃস্বার্থ শ্রমে মানুষের প্রয়াস যত প্রবল, সে তত ঐশ্বর্যবান ও সুন্দর হতে থাকে। সচেতন শ্রমসম্পর্কে শিক্ষিত হয়ে ওঠা মানুষকে ভাবীকালের অনুসন্ধানকারী বলা হয়। বীরত্বপূর্ণ কাজ করে তারা শ্রমে নূতন মানুষের অমূল্য নৈতিক গুণাবলীর অধিকারী হয়। এই কারণেই **কমিউনিস্ট শিক্ষার মূল কথা** সচেতন শ্রমসম্পর্ক গঠন।

সমাজকল্যাণমূলক কর্মের পাঠশালা

যে পাঠশালায় ছেলেমেয়েরা পড়ে এবং যেখানে বিষয়বস্তু আয়ত্তে আনতে হলে সময় সময় পাঠ শোনা ও বাড়ির জন্য দেওয়া কাজ সমাধান করাটাই যথেষ্ট, সেই পাঠশালা নিয়ে কথা হচ্ছে না। সমাজের প্রতি নিজের দায়িত্ববোধের শিক্ষাসম্পর্কে আমাদের কথা। আর তার জন্য শ্রমের পাঠশালা, জনকল্যাণমূলক কর্মের পাঠশালা ছাড়া অন্য কোন পাঠশালা নেই।

সমাজতন্ত্রের পরিস্থিতিতে শ্রমের ক্ষেত্রে ব্যাপক জনসমাজের বীরত্ব — এক সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, সামাজিক সম্পদবৃদ্ধি এবং নিজের সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমির ক্ষমতাবৃদ্ধির প্রয়াসে অনুপ্রাণিত নূতন শ্রম-সম্পর্কের উদ্ভব হয়েছে। প্রথম কমিউনিস্ট সুব্বোৎনিক (শনিবাসরীয় কর্ম), প্রথম আমলের পাঁচসালাকালে স্বেচ্ছা ক্ষিপ্রকর্মিবাহিনীর আন্দোলন, তিরিশের দশকের স্তাখানভের উদ্যম, যুদ্ধের বছরগুলিতে রণাঙ্গনের পশ্চাদ্‌ভাগে বীরদলের শ্রমকীর্তি, সর্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার বিশাল পরিধি এবং কমিউনিস্ট শ্রমসম্পর্ক গড়ে তোলার গণ-আন্দোলন — এর প্রমাণ।

পুঁজিবাদ তার উত্তরাধিকার হিশেবে শ্রমের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশের যে জঘন্য অভ্যাস, পরজীবী জীবনযাপনের প্রয়াস, উচ্ছৃঙ্খলতা, স্বেচ্ছাচারিতা, জাড্য ইত্যাদি রেখে গিয়েছিল তা অতীতের গর্ভে বিলীন হতে চলেছে। এগুলির সঙ্গে সঙ্গে আজও সোভিয়েত দেশে শ্রমসংক্রান্ত শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও অলসতার ঘটনা চোখে পড়ে এবং বিবেকহীন এমন কর্মীদের দেখতে পাওয়া যায়, যারা সমাজকে স্বল্প পরিমাণ শ্রম

দিয়ে তার কাছ থেকে বেশি আদায় করে নিতে চায়। নূতন শ্রমসম্পর্কে মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা যে সমাজতন্ত্রেও এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা — এ সমস্ত তার প্রমাণ। সোভিয়েত ক্ষমতার প্রথম বছরগুলিতেই ভ. ই. লেনিন মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন যে 'নূতন শ্রমশৃঙ্খলাগঠন, মানুষে মানুষে নূতন পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্কের রূপ এবং শ্রমের প্রতি মানুষের আকর্ষণ ও সারা জাগিয়ে তোলা — বহু বছর ও বহু দশকের কাজ। এ কাজ — সবচেয়ে অভিনন্দনযোগ্য এবং সবচেয়ে মহৎ কাজ।'

নূতন শ্রমসম্পর্কে প্রতিটি মানুষের দীক্ষা ব্যতীত কমিউনিস্ট গঠনকর্ম অগ্রসর হতে পারে না।

অন্যান্য কাজের মতো এক্ষেত্রেও পার্টির সক্রিয় সহায়ক লেনিনীয় উত্তরাধিকারের প্রতি বিশ্বস্ত কমসমোলের কার্যকলাপ থেকে প্রমাণিত হয় যে একমাত্র কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে সম্মিলিত শ্রমেই নিজেকে সত্যিকারের কমিউনিস্ট রূপে গড়ে তোলা সম্ভব।

৪৩ ॥ সমাজতান্ত্রিক চেতনার বিশেষত্ব

সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের মূলনীতি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত মানবচৈতন্যগত বিপ্লবের চূড়ান্ত অভিব্যক্তি তখনই ঘটে, যখন ধীরে ধীরে শোষণভিত্তিক ব্যবস্থার দ্বারা উদ্রিক্ত মানবতাবিরোধী ও সমাজবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্হিত হতে থাকে এবং তার জায়গায় সমাজতন্ত্রে উদ্ভূত নব নব ধারণা ও অভ্যাস গড়ে ওঠে। কমিউনিস্ট শ্রমসম্পর্ক গঠনের পাশাপাশি যৌথক্রিয়াবাদ, মানবতাবোধ, সামাজিক কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা, সমাজতান্ত্রিক

দেশপ্রেম ও প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের মতো বিশেষত্বের কথাও মনে রাখতে হবে। উক্ত ধর্মগুলির সব কয়টিই যে পরস্পরের অতি সন্নিহিত এবং তারা যে একই ঘটনার — ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যবর্তী পারস্পরিক সম্পর্কের সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির বিভিন্ন দিক উপস্থাপনা করে মাত্র — এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

প্রত্যেকে সকলের জন্য, সকলে একের জন্য

সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া হল যৌথক্রিয়াবাদের দুনিয়া। কিশোর বয়স থেকেই সোভিয়েত জনসাধারণ যৌথব্যবস্থার মধ্যে বাস করে, সকৃতজ্ঞ চিত্তে তার সাহায্য গ্রহণ করে এবং নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তাকে অর্পণ করে। যৌথব্যবস্থার সমাধিকারভোগী এবং সম্মানীয় সদস্য হিশেবে মানুষ নিজের প্রতি অনেক বেশি আস্থাবান হয়। সমষ্টির সঙ্গে মতভেদে মানুষ গভীর মনোকষ্ট অনুভব করে।

যৌথব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত কর্মীদের আমরা অনেক সময় সামাজিক মানুষ বলে থাকি। কিন্তু কথাটা মোটেই ঠিক নয়, কেননা সামাজিক বলতে আমরা প্রচলিত অর্থে যা বুঝি, তা হল বন্ধুবান্ধবদের প্রতি অমায়িকতা ও শুভাকাঙ্ক্ষা। যৌথক্রিয়াবাদ বলতে অন্য ধরনের, আরও উচ্চ পর্যায়ের গুণ বোঝায়, — যেগুলি হল যৌথ কাজে আগ্রহ এবং তার সাফল্য ও অসাফল্যের জন্য ব্যক্তিগত দায়িত্বের বোধ। যৌথব্যবস্থার মধ্যে বাস করতে শেখার অর্থ — নিজেকে তার অংশ বলে অনুভব করা এবং সর্বদা ও সর্বক্ষেত্রে যৌথক্রিয়াবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম — **প্রত্যেকে সকলের জন্য, সকলে একের জন্য** — মেনে চলা। এই নিয়ম

মেনে চলতে পারলে সমষ্টিস্বার্থের সঙ্গে ব্যক্তিস্বার্থের অঙ্গাঙ্গি মিলন সম্ভব।

ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বার্থের মধ্যে বিরোধের উদ্ভব অবশ্য ঘটে। যেমন, বিরোধ হতে পারে বন্ধুর দোষ-ত্রুটি বিচারের নীতিগত কর্তব্য এবং তাকে আঘাত দেওয়ার, এমন কি হয়ত বা তাকে হারানোর আশঙ্কার মধ্যে। এই সংঘাত এবং এ ধরনের আরও বহু সংঘাত, যা জীবনে প্রায়ই দেখা দিতে পারে, — একমাত্র একটি নিয়মের ভিত্তিতে সমাধান করা যেতে পারে: সর্বদা এবং সর্বক্ষেত্রে সর্বোপরি ভিত্তি করতে হবে যৌথ স্বার্থের উপর।

আসলে এর জন্য দরকার সাধারণ শৃঙ্খলানিষ্ঠা। এছাড়াও আছে শৃঙ্খলার উচ্চতর রূপ, যা নিহিত থাকে মানুষের সামাজিক সক্রিয়তার মধ্যে এবং সমষ্টি যাতে সাফল্যের সঙ্গে উপস্থিত সমস্যার সমাধান করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ব্যক্তির সকল প্রয়াস পরিচালনার মধ্যে। এ ধরনের সক্রিয়তা যৌথক্রিয়াব্যবস্থা ও তার অন্তর্গত সদস্যদের সমৃদ্ধ করে, তখন আর তা সামাজিক স্বার্থের কাছে ব্যক্তিগত স্বার্থের নিছক অধীনতা মাত্র না হয়ে উভয়ের **অঙ্গাঙ্গি সম্মিলন** হয়ে দাঁড়ায়।

যৌথক্রিয়ায় ব্যক্তিগত দায়িত্ব সম্পর্কে গভীর বোধের দৃষ্টান্ত — ভালেন্তিনা গাগানভার মহৎ কর্ম। বাঁধাধরা উঁচু মজুরি প্রত্যাখ্যান করে তিনি, তাঁর নিজের ভাষায়, যাদের কাছে 'কাজ করা যেন গান গাওয়া' — তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পিছিয়ে থাকা কর্মিবাহিনীতে চলে এলেন। নিজেদের শক্তির উপর আস্থা হারিয়ে ফেলা নূতন বান্ধবীরা তাঁকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে গ্রহণ করল, কিন্তু অভিজ্ঞা তন্তুকর্তনকারিণী তাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে ও সামনের সারিতে এগিয়ে আসতে সাহায্য করলেন। এইভাবে, ভালেন্তিনা

গাগানভা নিজের অজানিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের যৌথক্রিয়াবাদের ইতিহাসে নূতন অধ্যায় সূচনা করলেন।

যৌথক্রিয়া মানুষকে অনেক কিছু দেয়, তা তার কাছ থেকে অনেক কিছু চাওয়ারও অধিকার রাখে। যারা যৌথক্রিয়াবাদের মূলনীতি লঙ্ঘন করে, বন্ধুদের ক্ষতিসাধন করে অথবা এমন কি তাদের সুনাম নষ্ট করে তারা উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত হয়। ভুল-ত্রুটি জোড়াতালি দেওয়া নয়, দোষ-ত্রুটির সঙ্গে আপস নয়, — নীতিগতভাবে তার অকপট উদ্‌ঘাটন — এটাও এক প্রয়োজনীয় নিয়ম যাকে বাদ দিয়ে সুস্থ যৌথব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না।

সমালোচককে, এমন কি ন্যায়পরায়ণ সমালোচককেও গ্রহণ করা সহজ নয়। কিন্তু মানুষের পক্ষে জিদ করে ভ্রান্তি আঁকড়ে থাকার চেয়ে জঘন্য আর কিছু হতে পারে না। বন্ধুদের মন্তব্য মনোযোগ দিয়ে শুনতে পারা, মিথ্যা অহঙ্কার দমন করা, ভুল শোধরানোর চেষ্টা — অপরের শ্রদ্ধার পাত্র হওয়ার পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় গুণ। আত্মসমালোচনামূলক আচরণ কেবল মানুষের সততার পরিচায়ক নয়, — তার **বিনয়েরও** পরিচায়ক বটে।

মহান শারীরতত্ত্ববিদ ও আকাদমিশিয়ন ই. প. পাভলভ যুবসম্প্রদায়ের উদ্দেশে লিখেছিলেন: 'তোমাকে যত বড় মূল্যই দেওয়া হোক না কেন, কখনও এমন কথা ভেব না যে তুমি সব কিছু জেনে বসে আছ; সর্বদা নিজেকে একথা বলার মতো পৌরুষ থাকা চাই: আমি অজ্ঞ। অহমিকার দ্বারা নিজেকে আচ্ছন্ন হতে দিও না। এতে যেখানে রাজী হওয়া দরকার সেখানে বেঁকে বসবে, এতে হিতকর পরামর্শ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রত্যাখ্যান করে দেবে এবং এতে বাস্তবতার সীমা সম্পর্কে বোধ লুপ্ত হবে।'

যৌথক্রিয়ায় শ্রমদান নূতন মানুষের শিক্ষার শক্তিশালী উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সোভিয়েত জনসাধারণ যে যৌথভাবে — দলে দলে, কর্মবাহিনীর পর কর্মবাহিনী, বিভাগকে বিভাগ, কর্মশালাকে কর্মশালা, কারখানাকে কারখানা কমিউনিস্ট শ্রমের দিকে চলেছে, এটা আকস্মিক ঘটনা নয়। যৌথক্রিয়াবাদ ব্যক্তিমানুষকে প্রমিত করে এবং তার ব্যক্তিত্বনাশের কারণ হয় — বুর্জোয়া মতাদর্শবাদীদের এই কথন জীবনের অভিজ্ঞতায় মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে। সমষ্টির সঙ্গে ব্যক্তির সংযোগ যত বিস্তৃত তার অন্তর্জগৎ তত সমৃদ্ধ সুন্দর হয়ে ওঠে, তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের তত পূর্ণ ও বর্ণোজ্জ্বল উদ্বোধন ঘটে।

যৌথক্রিয়াসম্পর্কে সচেতনতার অন্যতম সক্রিয় রূপ — নিজের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও সাফল্যের ভাগ অপরকে দিতে প্রস্তুত থাকার মতো ঔদার্য। এই ধর্মের নাম সঙ্গত কারণেই দেওয়া হয়েছে 'স্বয়ং প্রত্যর্পণ'।

স্বার্থান্বেষীদের সময় সময় যতই সফল ও আত্মতৃপ্ত বলে মনে হোক না কেন, অতিরিক্ত আত্মকেন্দ্রিকতার মূল্য তাদের শেষ পর্যন্ত দিতে হয়। তারা মানসিকভাবে নিঃস্ব হয়ে পড়ে এবং জনসাধারণের প্রতি মানুষের ব্যক্তিগত ঔদার্য, প্রতিদানে তাদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাবোধ যে আনন্দের সঞ্চার করে তা থেকে বঞ্চিত হয়। বিশিষ্ট সোভিয়েত শিক্ষাবিদ আ. স. মাকারেঙ্কো সঙ্গত কারণেই মন্তব্য করেছেন: 'বিপুল ইচ্ছার অর্থ কোন কিছু কামনা ও অর্জন করতে পারামাত্র নয়, — দরকার মতো কোন কিছু প্রত্যাখ্যানের জন্য নিজেকে বাধ্য করতে পারাও বটে। ইচ্ছা — নিছক কামনা ও তার পরিতৃপ্তি নয়, — ইচ্ছা একাধারে কামনা ও বিরতি এবং কামনা ও প্রত্যাখ্যান...'

মানুষ — মানুষের বন্ধু, কমরেড ও ভাই

যৌথক্রিয়াবাদী হওয়ার অর্থ মানুষকে ভালোবাসা এবং তার শুভকামনা করাও বটে। নৈতিক গুণাবলী হিশেবে যৌথক্রিয়াবাদ মানবতাবাদেরই প্রতিরূপ। ম. ই. কালিনিনের ভাষায়: ‘মানুষের উচিত মানুষকে ভালোবাসা। মানুষকে ভালোবাসতে পারলে বাঁচা আরও সুন্দর, আরও আনন্দের ওঠে, কেননা মানববিদ্বেষীর মতো দুর্দশার মধ্যে আর কেউ বাঁচে না।’

আমরা সোভিয়েত জনসাধারণের গভীর মানবতাবোধের সাক্ষী। মানবিক আচরণের গুরুত্ব কেবল নির্দিষ্ট ফললাভের দৃষ্টিভঙ্গিতেই নয়। যাদের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়েছে, যাদের যত্ন নেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে মানুষের প্রতি বিশ্বাস এবং যৌথক্রিয়াব্যবস্থার ন্যায়পরতা সম্পর্কে আস্থা দৃঢ় হয়েছে। এবং তাদের প্রত্যেকে নিজেদের পালা এলে অন্যদের সাহায্য করার চেষ্টা করবে। এইভাবে, মানবিক আচরণ এক ধরনের ‘পরস্পর প্রতিক্রিয়া’ গড়ে তোলে।

মানুষের প্রতি যত্ন ও সংবেদনশীলতার মাত্রা কোন নিয়মের দ্বারা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। সর্বদা কেবল মানুষের যোগ্যতাকে সম্মান জানানোর আবশ্যকতা মনে রাখতে হবে। এটা হল মানবতাবাদের মূল দাবি।

মানুষে মানুষে সম্পর্কের ক্ষেত্রে উন্নত মানবতাবোধ ও ঔদার্যের বহু দৃষ্টান্ত ইতিহাসে সুপরিচিত। কিন্তু মানুষ ও স্বীকৃত সমাজের সম্পর্কক্ষেত্রে মানবতাবাদ কার্যত বাদই দেওয়া ছিল।

সমাজতন্ত্রে ‘মানুষ — মানুষের বন্ধু, কমরেড ও ভাই’ — এই নীতি সমগ্র সমাজের নৈতিক মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

সমাজতান্ত্রিক মানবতাবাদের উজ্জ্বল অভিব্যক্তি ঘটেছে ব্যক্তিমানুষের কল্যাণ ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশে রাষ্ট্রের প্রয়াসের মধ্যে, মাতৃভূমির শ্রীবৃদ্ধিতে ও নিজের বন্ধুবান্ধবের প্রতি মানুষের বিশেষ মনোযোগের মধ্যে।

সমাজতান্ত্রিক মানবতাবাদ মানুষকে প্রকৃষ্ট অর্থে বীরব্রতী হতে দাবি জানায়: তার কাছ থেকে দাবি করে মানুষের প্রতি শিষ্টতা ও সংবেদশীলতা, মনোযোগ ও সৌজন্যবোধ। চোখের সামনে দুর্বলের উপর অবিচার দেখতে পেলে রুখে দাঁড়াতে হবে; মানুষর কর্তব্য — ভালোবাসা ও সেবা-যত্ন দিয়ে মা-বাবাকে ঘিরে রাখা; বয়স্কদের কাছ থেকে জীবনের সম্পদ, অভিজ্ঞতা ও কোন কিছু অর্জনের জন্য তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা; ছোটদের সচল ও সৎ মানুষ হয়ে উঠতে সাহায্য করা। একত্রে বসবাসের এগুলি হল প্রাথমিক দাবি। এর মধ্যেও আবার গভীর মর্ম সঞ্চার করা যেতে পারে: নিজের কর্তব্য বাধ্যতামূলকভাবে পালন না করে আবেগ ও হৃদয় দিয়ে পালন করে।

মানুষকে ভালোবাসার অর্থ — তার কাছ থেকেও দাবি করা, যে-সব দোষ-ত্রুটি তার অধোগতির কারণ সে-সব থেকে তাকে মুক্ত হতে সাহায্য করা। অকপটতা ছাড়া সত্যিকারের বন্ধুত্বের কি কোন অর্থ আছে? নেই, কেননা পারস্পরিক 'অন্যায় মার্জনা'র ভিত্তিতে এবং কোন রকম 'বোঝাপড়া ছাড়া' গড়ে ওঠা সম্পর্কের মধ্যে কপটতা ও ভণ্ডামি থাকতে বাধ্য।

সার্বিক 'খ্রীষ্টপ্রেম', যা কপট উপায়ে বুর্জোয়া নীতিবোধ প্রচার করে থাকে, তার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক মানবতার কোনও সম্পর্ক নেই। মানুষের প্রতি ভালোবাসাবশতই যারা নিদারুণ শোষণের মুখে জনসাধারণকে ঠেলে দেয়, যারা

জনগণকে নির্যাতন করে এবং মানবজাতির উপর যুদ্ধের সন্ত্রাস সঞ্চার করে — তাদের প্রতি সমস্ত মনপ্রাণ ঘৃণায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

সামাজিক কর্তব্য।
সমাজতান্ত্রিক দেশপ্রেম ও আন্তর্জাতিকতাবাদ

সামাজিক কর্তব্য হল সমাজের প্রতি, নিজের জাতির প্রতি মানুষের নৈতিক দায়িত্ব ও তার হিতার্থে সব কিছু করতে পারার মতো মানসিক প্রস্তুতি। বিপ্লবের নির্ভীক বীরব্রতী ফ. এ. দ্জেরজিন্স্কির কথায়: 'কর্তব্য — কোন বাধ্যবাধকতা নয়, — এটা প্রয়োজনীয়তা, চাহিদা, গভীর প্রত্যয়, জীবনের সার্থকতা।'

সামাজিক কর্তব্য ব্যক্তিগত পরিকল্পনা ও ইচ্ছার সঙ্গে সর্বদাই মেলে না, দুয়ের মধ্যে সময় সময় বিরোধ দেখা দেয়। ঠিক এখানেই মানুষের কমিউনিস্টসুলভ বিবেকের পরিধি, তার বিশ্ববীক্ষা ও আদর্শবোধের সন্ধান মেলে। ইচ্ছাকে কর্তব্যের বশীভূত করতে পারা — রাজনৈতিক এবং নৈতিক পূর্ণতাপ্রাপ্তির লক্ষণ। শত শত সহস্র সহস্র সোভিয়েত মানুষ ঠিক এই পরিচয়ই দিয়েছে: দেশকে অনাবাদী জমি থেকে ফসল সরবরাহের উদ্দেশ্যে এবং ভয়ঙ্কর উত্তরাঞ্চলের সম্পদকে মানুষের কাজে লাগানোর সংকল্প নিয়ে তারা শহরের আরামপ্রদ জীবন প্রত্যাখ্যান করে দুরূহতা ও কৃচ্ছ্রতার পথ বেছে নিয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশপ্রেম এবং আন্তর্জাতিকতাবাদের মতো ভাবাদর্শগত গুণাবলী সামাজিক কর্তব্যের সুস্পষ্ট বোধের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত।

দেশপ্রেম — এক গভীর সামাজিক অনুভূতি, — স্বতন্ত্র পিতৃভূমির বহু শতাব্দী ও বহুবর্ষব্যাপী অস্তিত্বের ফলে যা দৃঢ়সংসক্ত হয়। এতে, যে দেশে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি ও লালিতপালিত হয়েছি, যার ইতিহাস ও জনগণের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিশেবে আমরা নিজেদের অনুভব করি, — তার প্রতি আমাদের ভালোবাসার অভিব্যক্তি ঘটে। দেশপ্রেম — মানবপ্রকৃতির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, তা মানুষকে নিজের জাতির নামে সক্রিয় কার্যকলাপে প্রবৃত্ত করে। সমাজতান্ত্রিক দেশপ্রেম অগ্রণী সমাজব্যবস্থার প্রতি ও কমিউনিজমের কাজে নিঃস্বার্থ আনুগত্য এবং যে সোভিয়েত জনগণ সমগ্র মানবজাতির সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথ নির্মাণ করছে তার প্রতি বিপুল গর্ববোধের সঙ্গে যুক্ত। মৃত্যুর মুখে মানুষ কীভাবে তার মাতৃভূমির কথা, তার নিজের বাড়ি, দীর্ঘশাখাসমন্বিত উইলো অথবা বার্চ গাছের কথা স্মরণ করে — তার বিবরণ কবি ও লেখকদের রচনায় বারবার পাওয়া যায়। সোভিয়েত মানুষের কাছে মাতৃভূমি কেবল তার অন্তরের প্রিয় দেশের প্রকৃতির মধ্যেই মূর্ত হয়ে ওঠে না: সে তার রূপ খুঁজে পায় পাইওনিয়র সমাবেশ ও তরুণবয়সের কমসমোলের স্মৃতির মধ্যে এবং তা রূপায়িত হয় বন্ধুত্বের সেই অনবদ্য পরিবেশের মধ্যে যা সোভিয়েত যৌথজীবনযাত্রাকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। সোভিয়েত মানুষের বোধে মাতৃভূমি ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এক সূত্রে গাঁথা।

সমাজতান্ত্রিক দেশপ্রেম কোন অন্ধ অনুভূতি নয়। ‘দম্ভী দেশপ্রেম’ এবং আমাদের যা কিছু আছে তা নিয়ে অসংযত বড়াই — কমিউনিস্টদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। যে-সব জিনিস ত্রুটির পর্যায়ে পড়ে দম্ভী ’দেশপ্রেমিক’ তা

নিয়েও বড়াই করতে প্রস্তুত। 'ভিন্ন গোত্রীয়' সব কিছুর প্রতি তার অবজ্ঞা।

মাতৃভূমির প্রতি প্রকৃত প্রেম হল খোলা চোখে প্রেম।

সোভিয়েত জনগণ সঙ্গত কারণে নিজেদের অপূর্ব সাফল্যের জন্য গর্ববোধ করে, কিন্তু তারা নিজেদের ত্রুটি খুঁজে বার করার মতো সৎসাহসও রাখে এবং তা অপসারণের জন্য সর্ববিধ প্রচেষ্টা নিয়োগ করে। তারা অন্যান্য জাতির প্রকৃষ্ট সাফল্য আয়ত্তে আনতে, এমন কি পুঁজিবাদীদের কাছ থেকে যতটুকু শেখার তা শিখতে কুণ্ঠা বোধ করে না।

সমাজতান্ত্রিক দেশপ্রেমের বিশেষত্ব — আন্তর্জাতিকতাবাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক এবং অন্য জাতির প্রতি, তাদের জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা। জাতীয় অহংবাদ ও জাতিদম্ভ সোভিয়েত জনগণের কাছে অপরিচিত। কমিউনিজমের বিজয়ের জন্য সংগ্রাম করে তারা শ্রমিক শ্রেণী ও সকল দেশের জনসাধারণের কাছে তাদের আন্তর্জাতিক কর্তব্য পালন করে। সোভিয়েত জনগণ মুক্তি ও জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত সকল জাতিকে যে বৈষয়িক, রাজনৈতিক ও নৈতিক সমর্থন দিয়ে থাকে তাতে তার আন্তর্জাতিকতাবাদের পরিচয় মেলে। সমাজতান্ত্রিক সমাজের মানুষ সকল জাতির প্রতিনিধির উদ্দেশ্যে ভ্রাতৃপ্রতিম সাহায্যের হস্ত প্রসারণে সর্বদা প্রস্তুত।

সমাজতান্ত্রিক দেশপ্রেম ও আন্তর্জাতিকতাবাদের ঐক্যের সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে আধুনিক পরিস্থিতিতে, যখন সমাজতন্ত্র এক বিশ্বব্যবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অক্টোবর বিপ্লবে জাত সমাজতান্ত্রিক দেশপ্রেম একক পিতৃভূমির গণ্ডি অতিক্রম করে গেছে। আমাদের কালে তা কেবল নিজের

মাতৃভূমির প্রতি নয়, — সহযোগী সকল সমাজতান্ত্রিক দেশের প্রতি নিষ্ঠা।

ভবিষ্যতের কমিউনিস্ট সমাজে পৃথিবীর সকল জাতি এক বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর তখন দেশপ্রেম ও আন্তর্জাতিকতাবাদ সমগ্র মানবজাতির প্রতি, তার ক্রীড়াভূমি এই পৃথিবীর প্রতি অনুরাগের এক মহান অনুভূতিতে সম্পূর্ণ মিশে যাবে।

৪৪ ॥ বৈজ্ঞানিক বিশ্ববীক্ষা

অন্তর্মুক্তির পথ

এমন একজন লোকের কথা ধরা যাক, যার বিশ্ববীক্ষা বলে কিছু নেই। সে কী করে তার পারিপার্শ্বিক বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে এবং জীবনে নিজের স্থান নির্ধারণ করতে পারে? এ ধরনের লোকের না থাকবে কোন আদর্শ, না কোন সুস্পষ্ট লক্ষ্য, না কোন প্রত্যয়। জীবনসমুদ্রের তরঙ্গাভিঘাতে সে এখানে ওখানে নিক্ষিপ্ত হবে, কিন্তু যা কিছু ঘটছে তার অর্থ পর্যন্ত সে বুঝে উঠতে পারবে না। সে অবস্থার দাস।

যে-সব বুর্জোয়া দার্শনিক মনে করেন ব্যক্তির অন্তর্মুক্তি বুঝি বা সকল মতাদর্শ এবং সমস্ত রকমের বিশ্ববীক্ষা থেকে মুক্তির সূচনা করে, তাঁদের ধারণা যে কতদূর অসার এ থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

মানুষের অন্তর্জগতের একটু গভীরে অবগাহন করলে সহজেই প্রত্যয় হবে যে বস্তুত এমন কোন মানুষই নেই, যে কোন রকম বিশ্ববীক্ষার অধিকারী নয়। প্রতিটি লোকের জগৎ ও জীবনের অর্থ সম্পর্কে কোন না কোন ধারণা আছে।

তবে, তার অধিকাংশই বৈজ্ঞানিক নয়। আর তখনই মানুষকে মিথ্যা ধারণায়, — যেমন ধর্মীয় ও কূপমণ্ডূক ধারণায় আবদ্ধ হতে দেখা যায়।

বৈজ্ঞানিক বিশ্ববীক্ষা — অন্তর্মুক্তির জগতে প্রবেশের দ্বার, কেননা তা মানুষকে তার কর্মপথ নির্বাচনের যথার্থ স্বাধীনতা দেয়। প্রত্যেকের জীবনেই জটিল পরিস্থিতি আসে, যখন তাকে নিজেই সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। ভাবাদর্শগত পরিপক্কতা না থাকলে, সংঘটিত ঘটনাবলীর প্রকৃত মূল্যায়ন করতে না শিখলে মানুষ সহজেই ভুল করে বসতে পারে, ভ্রমাত্মক, এবং হয়ত বা সংশোধনাতীত ভ্রমাত্মক পদক্ষেপ করতে পারে। কমিউনিস্ট বিবেকবুদ্ধি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে।

মানুষের আচরণ, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক জীবনসংক্রান্ত ঘটনার উপর তীব্র বাদ-প্রতিবাদের সাক্ষী এবং অংশগ্রহণকারী আমরা সবাই। নানা ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত হয়। এর মধ্যে কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল তা বোঝার উপায় কী? অন্যদের কীভাবে বোঝানো যায় যে ভ্রান্ত মত পোষণ করছে, নিজের মতের যাথার্থ্যই বা কীভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়? অনাত্মীয় বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রকাশ এবং পশ্চাদ্‌পদ দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোবৃত্তি যে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়, একথা ভুলে গেলে চলবে না। ক্ষতিকারক ভাবধারাকে সনাক্ত করতে পারা এবং তাকে প্রতিঘাত করতে জানা চাই। এখানেই মানুষের ভাবগত পরিণতির অন্যতম লক্ষণ নিহিত। বৈজ্ঞানিক বিশ্ববীক্ষা, — যা জাগতিক বিকাশের গতিসংক্রান্ত বোধ ও পরিপ্রেক্ষিত দান করে দেশের অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক রঙ্গমঞ্চে সংঘটিত ঘটনাবলী হৃদয়ঙ্গমে সাহায্য করে, সচেতনভাবে

কমিউনিস্ট পন্থায় জীবন গঠনে সহায়তা করে, — তাকে আয়ত্তে করতে না পারলে এর কোন অর্থ থাকে না।

বৈজ্ঞানিক বিশ্ববীক্ষা আয়ত্তে আনতে গেলে কী দরকার?

এর জন্য সর্বোপরি দরকার জ্ঞান। জ্ঞানই গঠন করে সেই নির্মাণ-সামগ্রী, যা থেকে গড়ে ওঠে বৈজ্ঞানিক বিশ্ববীক্ষা। তবে তথ্য ও জ্ঞান যদি আলাদা আলাদা ইঁটের টুকরোর মতো ছড়ানো থাকে তা হলে তাদের মূল্য খুবই কম। এদের হৃদয়ঙ্গম করতে হবে, প্রণালীবদ্ধ করতে হবে। এ কাজে সাহায্য করে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মূল ভিত্তি ও পার্টিসংক্রান্ত তথ্যাদির অধ্যয়ন এবং মূলত — জীবনের সঙ্গে অর্জিত জ্ঞানের সাযুজ্যসাধন, বাস্তব ক্রিয়াকর্মে তার প্রয়োগ। একমাত্র তখনই জ্ঞান দৃঢ় কমিউনিস্ট প্রত্যয়ে পরিণত হবে।

আগেকার দিনে শিক্ষালয়ে পুনরাবৃত্তির উপযোগিতাসংক্রান্ত প্রবচনটির কদর ছিল। সোভিয়েত জনগণ তাকে কিছুটা অন্যভাবে বলে: প্রয়োগ — শিক্ষার জননী। চিন্তা করা, 'মনে মনে নাড়াচাড়া করা', এবং যা নিয়ে কাজ করছি, যা অধ্যয়ন করছি অন্ততপক্ষে সমস্যা হিশেবে, চিন্তায়, কল্পনায় এবং অতঃপর তাকে কাজে প্রয়োগের চেষ্টা — এই ত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

কমসমোলের তৃতীয় কংগ্রেসে ভাষণদান প্রসঙ্গে ভ. ই. লেনিন নির্দেশ করেন যে কর্ম এবং সংগ্রাম ছাড়া পুস্তিকা ও প্রবন্ধাদি থেকে প্রাপ্ত কমিউনিজমের পুঁথিগত বিদ্যার কোন মূল্য নেই। একমাত্র শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে একত্রে শ্রমের মধ্য দিয়ে সত্যিকারের কমিউনিস্ট হওয়া যায়। ঠিক এই কারণেই যাতে প্রতিটি মানুষের আচরণে কমিউনিস্টসুলভ

কর্মের সঙ্গে কমিউনিস্ট ভাবধারার অঙ্গাঙ্গি সম্মিলন ঘটে সেই দিকে কমিউনিস্ট পার্টির লক্ষ্য।

বৈজ্ঞানিক বিশ্ববীক্ষার দাবি — সৃজন। অন্যভাবে বলা যায়, একবার আয়ত্তে আনতে পারলেই তা চিরকালের জন্য ধরে রাখা যায় না, ক্রমাগত বিজ্ঞানে প্রভুত্ববিস্তারকারী প্রবণতার অনুসরণ, নূতন নূতন আবিষ্কারের তাৎপর্য অনুধাবনের প্রয়াস, আগামী দিনের যে-সব বনিয়াদী সমস্যা সমাধানের জন্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিজ্ঞানীরা পরিশ্রম করছেন সে সম্পর্কে (অতি সাধারণভাবে হলেও) ওয়াকিফহাল থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। স্পষ্টত, ঐ একই অনুসন্ধিৎসা আমাদের অন্ততপক্ষে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন সম্পর্কে, যন্ত্রবিজ্ঞান ও প্রকৌশলক্ষেত্রে নবপ্রবর্তন সম্পর্কে ধারণা গড়ে তুলতে অবশ্যই সাহায্য করে।

বৈজ্ঞানিক বিশ্ববীক্ষা মানুষকে জীবনের সব রকম জটিলতা ও পরিবর্তনশীলতা বুঝতে সাহায্য করে। 'জীবনের রূপান্তরসাধনে', জীবনকে আরও সুন্দর ও নিখুঁত করে গড়ে তুলতে এই বিশ্ববীক্ষা মানুষকে কতখানি সক্রিয় সহায়তা করে, তার দ্বারা এর মূল্য নির্ধারিত হয়। এর মধ্যে সাধারণ — নির্দিষ্ট রূপের সঙ্গে, জ্ঞান — প্রত্যয়ের সঙ্গে, চিন্তা — কাজের সঙ্গে এবং তত্ত্ব — প্রয়োগের সঙ্গে মিলিত হয়।

বৈজ্ঞানিক নিরীশ্বরবাদ

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় জ্ঞানবাদীরা একমাত্র বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিস্তারের সাহায্যে ধর্মীয় কুসংস্কারের অবসান ঘটানোর কথা ভেবেছিলেন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ

ধর্মীয় মতবাদ অতিক্রমণকে শোষণভিত্তিক ব্যবস্থার অবসান, সামাজিক সম্পর্কের সামগ্রিক পদ্ধতির রূপান্তর এবং ব্যাপক গণমানসে সংঘটিত বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত করে দেখে।

সমাজতন্ত্র জনসাধারণকে দিয়েছে বিবেকের মুক্তি — যে-কোন ধর্ম প্রচারের অথবা নিরীশ্বরবাদী হওয়ার এবং নিরীশ্বরবাদী প্রচারকার্য পরিচালনার অধিকার দিয়েছে। ১৯১৮ সনের ২৮শে জানুয়ারির ডিক্রিবলে গির্জাকে রাষ্ট্র থেকে এবং বিদ্যালয়কে গির্জা থেকে পৃথক করা হয়েছে। এর দ্বারা গির্জার সমস্ত রকম বিশেষ সুযোগ-সুবিধা এবং নাগরিকদের বিবেকের উপর যাবতীয় উৎপীড়ন বন্ধ হল। এরই সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নে ধর্মবিশ্বাসের অজুহাতে নিজের নাগরিক দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার অধিকার কারও নেই। আস্তিক এবং নাস্তিক নির্বিশেষে সকল সোভিয়েত মানুষ আইনের চোখে সমান।

সোভিয়েত ইউনিয়নে ধর্মবিশ্বাস অতিক্রম এবং জগৎসম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠার মূল উপায়স্বরূপ কাজ করে সমাজতান্ত্রিক বাস্তব অবস্থা ও জনসাধারণের সৃজনী কর্মতৎপরতা। ঈশ্বরবিশ্বাসীকে কেবল ঈশ্বর নেই বললেই সব সময় তার ধর্মীয় অনুভূতিকে প্রভাবিত করা যায় না। সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট গঠনকর্মের ব্যবহারিক কার্যকলাপেই অন্ধ বিশ্বাসের সম্পূর্ণ দেউলিয়াপনা এবং ঈশ্বরের সহায়তা ও 'ঐশ্বরিক করুণা'র হস্তক্ষেপ ছাড়া নিজের জীবন গড়ে তোলায় মানুষের সামর্থ্য প্রকাশ পায়।

সমাজতন্ত্র ও আধুনিক বিজ্ঞান সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে ধর্মকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে।

আজ সোভিয়েত দেশের বিদ্যালয়ের প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী পৃথিবীর উৎপত্তি, জীবনের উদ্ভব এবং মানবচৈতন্যের প্রকৃতি সম্পর্কে জানে। মানুষ মহাকাশের সীমানায় প্রবেশ করেছে, কৃত্রিম উপগ্রহ ও মহাকাশযান একের পর এক জগৎসৃষ্টির রহস্যের জট খুলতে সাহায্য করছে। বিজ্ঞানের প্রতিটি নূতন সাফল্য বুদ্ধির সর্বশক্তিমানতা এবং ধর্মীয় গোঁড়ামির শূন্যগর্ভতার পরিচায়ক।

অতীতে ধর্মযাজকেরা সক্রিয় সোভিয়েতবিরোধী ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করেছে। এতে কিন্তু সর্বান্তঃকরণে সোভিয়েত ব্যবস্থার ব্যাপক পক্ষপাতী ধর্মবিশ্বাসী জনসাধারণের প্রতি তাদের সরাসরি বিরুদ্ধাচারণ প্রকাশ পায়। ফলে গির্জা সোভিয়েত শাসনের প্রতি তার সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটিয়ে অপেক্ষকৃত বিশ্বস্ত নীতি গ্রহণে বাধ্য হয়। তবে, সেই মুহূর্ত থেকে গির্জা ও ধর্ম যে নিরীহ হয়ে গেল এমন মনে করার কোন কারণ নেই। গির্জা ও ধর্ম মানুষের চেতনাকে বিষাক্ত করে, তার আত্মিক বিকাশ রোধ করে এবং সময় সময় তার সামাজিক কার্যকলাপে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।

ধর্ম আধুনিক সমাজজীবনের উপযোগী হওয়ার জন্যও চেষ্টা করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এ ধরনের উদ্দেশ্যের পরিচয় মেলে এমন কথার উপর জোর দেওয়ার মধ্যে, বুঝি বা কমিউনিস্ট নীতিবোধের কিছু কিছু নিয়ম প্রথম ঘোষণা করে খ্রীষ্টীয় সুসমাচার, যেন খ্রীষ্টধর্ম ও কমিউনিজম — 'সমগোত্রীয় মতাদর্শ' ইত্যাদি। আসলে এটাই একমাত্র সত্য যে সূচনাপর্বের খ্রীষ্টীয় শিক্ষার মধ্যে দাস-সমাজের নীচের তলার সামাজিক শ্রেণী তার আশা-আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু বিভ্রান্তি যেমন সত্যের দুশমন,

খ্রীষ্টধর্ম এবং অন্যান্য ধর্মও তেমনি মর্মবস্তুর দিক থেকে কমিউনিজমের দুশমন।

আগেই বলা হয়েছে যে সোভিয়েত আইনে যে-কোন ধর্মের উপর বিশ্বাসের অধিকার আছে। সেই সঙ্গে যে-সব ধর্মীয় সংস্থা আইন লঙ্ঘন করে এবং সমাজবিরোধী কার্যকলাপ পরিচালনা করে, যাদের আচার-অনুষ্ঠান অন্যান্য নাগরিকের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করে এবং মানসিক সুস্থতা ও জীবনের পক্ষে ক্ষতিকারক হয় রাষ্ট্র তাদের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ করতে বাধ্য। কয়েকটি ধর্মসম্প্রদায় (অর্থাৎ অর্থডক্স, ক্যাথলিক, প্রোটেস্টান্ট ও ইসলামধর্মের মতো মূল ধর্মীয় সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু কিছু ধর্মীয় গোষ্ঠী) তাদের উন্মত্ত ধর্মান্ধতার জন্য বিশেষভাবে চিহ্নিত। তারা সমাজতন্ত্রবিরোধী রাজনৈতিক বক্তৃতাদির উদ্দেশ্যে ধর্মবিশ্বাসীদের উপাসনালয় এবং সমাবেশের সুযোগ গ্রহণ করে, পৃথক পৃথক ভাবে পশ্চাৎপদ লোকজনকে সমাজবিরোধী কার্যকলাপে প্ররোচিত করে।

সোভিয়েত দেশে ধর্মের অস্তিত্বের মূল তার সামাজিক চরিত্র হারিয়ে মুখ্যত মতাদর্শগত, নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। এই কারণে সোভিয়েত ইউনিয়নে ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রামের তাৎপর্য হল ধর্মীয় মতাদর্শ ও নীতিবোধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, — কদাপি ধর্মবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে নয়, — যাদের কমিউনিস্টরা বৈজ্ঞানিক বিশ্ববোধ, কমিউনিস্ট ক্রিয়াকর্মের রূপ ও কমিউনিস্ট নীতিবোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

স্বশিক্ষার কার্যকারিতা

বৈজ্ঞানিক বিশ্ববীক্ষা গঠন — এমন এক সক্রিয় পদ্ধতি, যার জন্য বিপুল শ্রম এবং জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ ও ভালোবাসা থাকা দরকার। শিক্ষার অর্থ মাধ্যমিক বিদ্যালয় শেষ করার সার্টিফিকেট অথবা উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ডিপ্লোমা পাওয়া নয়, — শিক্ষার ফলে মানুষ কখনই জ্ঞান অর্জন করে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না, নিরন্তর তার বিস্তার ও গভীরতাসাধনে সচেষ্ট থাকে।

সেই সঙ্গে শিক্ষিত মানুষের অবধারিত বিশেষত্ব তার বহুমুখী আগ্রহ, তার প্রয়াস কেবল নিজের মনোনীত শাখায় যোগ্যতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ হওয়াই নয়, — আমাদের সময়কার মূল রাজনৈতিক সমস্যা ও শিল্পরস হৃদয়ঙ্গম করাও বটে। স্বশিক্ষা হল সর্বোপরি স্বাধীনভাবে নিজের জ্ঞানের সম্প্রসারণ ও গভীরতাসাধন।

অনবদ্য সোভিয়েত শিশুসাহিত্যিক কর্নেই চুকোভ্‌স্কি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন: '...আমি মনে করি ঠিক হবে, যদি বলি: সর্বক্ষেত্রে স্বশিক্ষার জয় হোক!.. স্মরণ করি গোর্কিকে, যিনি গ্রন্থ পাঠের সাহায্যে তাঁর সমগ্র সর্বতোমুখী জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। এটা অবশ্যই চমৎকার যে আমাদের দেশে এমন বহু শিক্ষাবিদ ও প্রশিক্ষক আছেন যাঁরা প্রত্যেককে কোন না কোন বিদ্যা অর্জনে সাহায্য করে থাকেন, কিন্তু একমাত্র সেই বিদ্যাই স্থায়ী ও মূল্যবান, যা নিজস্ব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজে অর্জন করা হয়। প্রতিটি বিদ্যা হওয়া উচিত এক একটি আবিষ্কার — নিজস্ব আবিষ্কার।'

নিরন্তর স্বশিক্ষা ব্যতিরেকে মানুষের জগৎ নিঃস্ব ও সংকীর্ণ; স্বশিক্ষা জীবনকে উজ্জ্বলতর, আরও চিত্তাকর্ষক ও সমৃদ্ধ করে তোলে।

৪৫ ॥ নৈতিক দিগ্‌দর্শন

নৈতিকতা — সক্রিয় উপাদান

সমাজতান্ত্রিক সমাজে নৈতিকতা সামাজিক নিয়মনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

কোন কোন কারণবশত মানুষ নৈতিক আদর্শ অনুসরণ করে চলে? কেন মানুষ সে জায়গায় কাজ করতে যায়, যেখানে তার শ্রমের গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত বেশি? কেন সে ভুল-ত্রুটি স্বীকার করতে, অবসর সময়ের কিছু অংশ সমাজের জন্য ব্যয়ে এবং নিগৃহীত বন্ধুর সম্মান রক্ষায় এগিয়ে যেতে পারে?

যে বল নৈতিকতাকে ধারণ করে রাখে সর্বোপরি তা হল জনমত। কিন্তু একমাত্র জনমতের কল্যাণেই নৈতিকতার অস্তিত্ব নয়। মানুষের নিজের আগ্রহ, তার প্রকৃত অনুভূতি ও প্রবণতা, সর্বোপরি বিকশিত কর্তব্যবোধ — নৈতিক ক্রিয়া সম্পাদনে অংশগ্রহণ করে থাকে।

নৈতিক আদর্শ অথবা নীতিগত তত্ত্ব ‘মিথ্যা বলো না’, ‘বিপদে মানুষকে সাহায্য করো’ ইত্যাদি অনুজ্ঞারূপে মানুষের চেতনায় প্রকাশ পায়। তবে তা সর্বদা মানুষের নিজের প্রত্যয়ের সঙ্গে যুক্ত, — তার পক্ষে বাহ্য কোন কিছু নয়। সামাজিক প্রয়োজনীয়তাকে নিজের কর্তব্য হিশেবে গ্রহণ করে সোভিয়েত জনসাধারণ সেই প্রয়োজনীয়তা যে লক্ষ্যের সূচনা করছে, তা গ্রহণ ও অনুমোদন করে এবং তার সাফল্যের জন্য প্রয়াস নিয়োগে প্রস্তুত থাকে। এইভাবে, নৈতিক মান যে আচরণ নিয়মন করে, তার কারণ এই যে তা কেবল বাস্তব নিয়মই নয়, — **কর্তব্য ও বিবেকের দাবিও** বটে।

সেই সঙ্গে, নৈতিক আচরণ সর্বদাই ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠিত নিয়মের অনুসরণ নয়। কর্তব্যের অনুভূতি থেকে উদ্ভূত নূতন ধরনের অথবা বীরত্বপূর্ণ কর্ম, নূতন মত ও নূতন আদর্শ গড়ে তুলতে পারে।

জীবনের রূপ এমন বিচিত্র যে একটি কোন সূত্রে অথবা মূলনীতিতে তাকে বাঁধা যায় না, সব রকম ঘটনার জন্য একটি মাত্র নিয়ম ভেবে বার করা যায় না। তাছাড়া নৈতিক মান ন্যূনতম প্রযুক্তিসংক্রান্ত নিয়মের মতো হতে পারে, — একমাত্র যার জ্ঞানই মানুষকে ত্রুটি থেকে মুক্ত করে। নৈতিক জীবনে শুধু মানের অনুসরণ নয়, — অনুধ্যান এবং অনুসন্ধানও আছে। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ন্যায্য নির্বাচনের জন্য সর্বদা দরকার দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও বুদ্ধির প্রয়োগ।

সোভিয়েত পুরুষের উত্তরাধিকারসূত্র

পুরনো প্রবাদে বলা হয়: সময় বদলায় — রীতিও বদলায়। নীতিগতভাবে এটা সত্য। প্রতিটি যুগ মানুষের কাছে নিজস্ব দাবি নিয়ে আসে, প্রতিটি পুরুষ জীবনে নিজস্ব কিছু যোগ করে, নতুবা সমাজের অগ্রগতি হত না। তবু একটি প্রশ্ন জাগে: সময়ের এই ধাবনে কি কিছু মূলত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, — সর্বোপরি প্রাচীন পুরুষের কষ্টার্জিত যে-সব বস্তু, বলতে গেলে, উত্তরাধিকারের সবচেয়ে মূল্যবান অংশ — হারিয়ে যায় না?

নিঃসন্দেহে, যায় না। তার কারণ এই যে সোভিয়েত জনগণের বিভিন্ন পুরুষ বাস্তব ঐতিহাসিক যোগসূত্রে, কমিউনিজম নির্মাণসংক্রান্ত সমস্যার ঐক্যসূত্রে গ্রথিত।

নির্ভীকতা, জীবনের উদ্দেশ্যগত ঐক্য ও দৃঢ়তায় অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বীরেরা বিশিষ্টতার অধিকারী। তাঁদের কেবল সংগ্রামই করতে হয় নি, — নূতন পৃথিবীও গড়তে হয়েছে। এর জন্য কেবল বিপ্লবী উদ্দীপনাই যথেষ্ট ছিল না, — দরকার হয়েছিল বিচক্ষণতা ও মিতব্যয়িতা এবং অর্থনীতি পরিচালনার দক্ষতা। সমাজতন্ত্র যখন বাস্তব হয়ে দাঁড়াল তখন গড়ে উঠল যুদ্ধ পূর্ববর্তী পুরুষ। সোভিয়েত লেখক আলেক্সান্দর ফাদেইয়েভ তাঁর 'তরুণ গার্ড' উপন্যাসে উক্ত পুরুষের বৈশিষ্ট্য এইভাবে নির্ণয় করেছেন: 'যে বিশেষত্বগুলোকে সবচেয়ে পরস্পর বিচ্ছিন্ন বলে মনে হতে পারে — স্বপ্নচারিতা ও কর্মতৎপরতা, কল্পনাবিলাস ও ব্যবহারিক বুদ্ধি, কল্যাণবোধ ও নিষ্করুণতা, হৃদয়ের প্রসারতা ও পরিমিতিবোধ, পার্থিব আনন্দের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও আত্মসংযম, — পরস্পর বিচ্ছিন্ন বলে মনে হতে পারে এমন সব বিশেষত্ব একত্রে এই পুরুষের অদ্বিতীয় রূপ গড়ে তুলেছে।'

যেমন পৃথক পৃথক মানুষের জীবনে, তেমনি সমগ্র পুরুষের জীবনেও এমন সব মুহূর্ত আসে, যা তার সারমর্ম প্রকাশ করে থাকে।

এমনই এক পরীক্ষা — পিতৃভূমির মহাযুদ্ধ। সোভিয়েত তরুণসমাজ উদ্ঘাটন করল আত্মার মহিমা ও নির্ভীকতা, পরিণত রাজনীতিবোধ এবং সমাজতন্ত্রের প্রতি তার নিঃস্বার্থ আনুগত্য। তার কর্মনিষ্ঠ হাত যুদ্ধের ক্ষত নিরাময় করে তুলল — ভস্মস্তূপ থেকে শহর ও গ্রাম উদ্ধার করল, কলকারখানা ও যৌথখামার নবজীবনে মুখরিত করে তুলল। গৌরবজনক ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বস্ত তরুণসমাজ

মাতৃভূমির আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে গেল অনাবাদী ও পতিত জমির উদ্ধার এবং সাইবেরিয়া ও দূর প্রাচ্যের নির্মাণকর্মের মতো বিশেষ কঠিন কাজের ভার নিতে।

নিখিল সোভিয়েত লেনিনীয় কমিউনিস্ট যুবসঙ্ঘের পঞ্চদশ কংগ্রেসে ভাষণদান প্রসঙ্গে ল. ই. ব্রেজনেভ বলেন: ‘প্রতিটি নবীন বিপ্লবী পুরুষ নূতন ঐতিহাসিক সমস্যা সমাধান করে এবং সেই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত পদ্ধতি এবং সংগ্রামের ও জীবনের নিজস্ব রীতি খুঁজে বার করে,—যা তার জন্য অন্য কেউ তৈরি করে দিতে পারে না। অতীতের বীরদের অনুকরণ নয়, — তাঁদের বিপ্লবী হৃদয়াবেগ, তাঁদের গভীর কমিউনিস্টসুলভ প্রত্যয়, আমাদের পার্টির মহান কাজে তাঁদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ, তাঁদের অগ্নিগর্ভ রোমাণ্টিকতা এবং বিপ্লবের শত্রুদের প্রতি জ্বলন্ত ঘৃণা গ্রহণ করা উচিত; এসবই আয়ত্তে এনে আমাদের সামনে আজ কমিউনিজম গঠনকর্মের যে বহু বিচিত্র সমস্যা পড়ে রয়েছে তার সমাধানে নিয়োগ করতে হবে।’

যে কাজের জন্য পিতৃপুরুষ সংগ্রাম করে গেছেন তা সমাপ্ত করা, শতাব্দীর সঙ্গে তাল রেখে চলা — এগুলিই আজকের দিনের নবীন পুরুষের নৈতিক রূপ নির্ধারণ করে থাকে।

৪৬ ॥ কমিউনিস্ট নীতিবোধ ও দৈনন্দিন জীবনচর্যা

দৈনন্দিন জীবনচর্যা — ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়

নৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্র অত্যন্ত বিস্তৃত: মেহনতী ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনচর্যা, পরিবার এবং ব্যক্তিগত জীবনও তার অন্তর্ভুক্ত।

দৈনন্দিন জীবনচর্যা হল সেই সামাজিক পরিবেশ, যাতে মানুষ জীবনযাপন করে, যখন সে উৎপাদনসংক্রান্ত ও সামাজিক কার্যকলাপ নিয়ে ব্যাপৃত নয়, অর্থাৎ বলা যায়, যখন সে নিজেকে নিজের করে পায়। প্রশ্ন ওঠে: তা হলে কি দৈনন্দিন জীবনচর্যা প্রতিটি মানুষের সম্পূর্ণ নিজস্ব, ব্যক্তিগত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় না? না, দৈনন্দিন জীবনচর্যা দৃঢ়সূত্রে সমাজজীবনের সঙ্গে যুক্ত, তার অংশ বলা যেতে পারে। সকলেরই জানা আছে যে মানুষের বহু চারিত্র বৈশিষ্ট্য তার দৈনন্দিন জীবনচর্যার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রাপ্রণালীর উপর তার মনোবৃত্তি ও কার্যক্ষমতা নির্ভর করে থাকে। এসবই তার নৈতিক গঠন এবং শ্রম ও যৌথকর্মব্যবস্থার প্রতি তার সম্পর্ককে কম প্রভাবিত করে না।

দৈনন্দিন জীবনচর্যা সমাজব্যবস্থার চরিত্র দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। সমাজতন্ত্র প্রাচীন জীবনযাত্রাপ্রণালীর বনিয়াদ ধ্বংস করল: শুঁড়িখানা ও বস্তি, চিলতে ডাল জ্বালিয়ে কুটির আলো করা ও গির্জায় উপাসনা, জুয়াখেলা ও অজ্ঞতার বদলে দেখা দিল ক্লাব, থিয়েটার, সংস্কৃতি শিক্ষাকেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, আরামপ্রদ বাসস্থান, গ্রন্থ, বিদ্যুৎ ও টেলিভিশন। শিশুশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের জাল বিস্তার, খাদ্য পরিবেশনব্যবস্থার সম্প্রসারণ, দৈনন্দিন সেবাব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতি — ইত্যাদি ঘটনা একত্রে অবধারিতরূপে সোভিয়েত জনসাধারণের জীবনচর্যায় পরিবর্তন সূচনা করেছে।

তবে, যথোচিত বৈষয়িক পরিস্থিতি গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যে আপনা-আপনিই কমিউনিস্ট জীবনচর্যা প্রতিষ্ঠিত হবে — এমন কথা মনে করা সঙ্গত নয়। তার জয় নির্ভর করে

জনসাধারণের উপর, তাদের সাংস্কৃতিক মান এবং কমিউনিস্ট নৈতিকতার মূলসূত্র আয়ত্তে আনার উপর।

নূতন নূতন সুন্দর ঘর-বাড়ি ও ব্লক গড়ে তোলাই সব নয়, — তাতে সুন্দরভাবে, নূতন করে বাস করতে জানা দরকার। এই উদ্দেশ্যে সোভিয়েত জনগণ প্রতিটি রাস্তা, প্রতিটি প্রাঙ্গণ সুন্দর করে গড়ে, গাছপালায় সুশোভিত করে; যাতে ক্যাণ্টিন, দোকানপাট, দর্জির দোকান এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রাসংক্রান্ত জিনিসপত্রের মেরামতকারখানা জনসাধারণের সত্যিকারের চাহিদা মেটাতে পারে তার জন্য তাদের প্রয়াস থাকে; তারা স্বেচ্ছায় একত্রে বাসের সমাজতান্ত্রিক নিয়ম পালন করে।

নিজেদের জীবনচর্যা সংগঠন করে তারা ক্রমবর্ধমান অবসর সময়ের যথার্থ ব্যবহার শেখে। পাঠে ও নিজের জ্ঞানের পূর্ণতাসাধনে, সামাজিক কাজে এবং শিল্প খেলাধূলার পেছনে এর একটি বড়ো অংশ ব্যয়িত হয়। কিন্তু অনেকেই আবার দর্শক, পাঠক অথবা শ্রোতার ভূমিকায় থেকে সন্তুষ্ট নয়। তারা নিজেরা রং তুলি ধরতে শেখে, সাহিত্যে নিজ নিজ শক্তি পরখ করে মঞ্চে নামে, ক্রীড়াপ্রতিযোগিতায় যোগ দেয়।

নূতন কমিউনিস্ট সমাজব্যবস্থা যে সোভিয়েত জীবনচর্যার অন্তস্তলে উত্তরোত্তর প্রভুত্ব বিস্তার করছে এসব তারই সাক্ষ্য দেয়।

পরিবার ও বিবাহ

আত্মীয়তার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সামাজিক গোষ্ঠী — পরিবার, মানুষের জীবনে এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে।

পরিবার অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ। পরিবার যেন অনেকটা বিদ্যমান সমাজব্যবস্থার মূল বিশেষত্বের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ উপস্থাপন করে।

সমাজতন্ত্র পরিবার থেকে ব্যক্তিগত মালিকানাসম্পর্কের বন্ধন মোচন করে। মানবিক অনুভূতির কাছে অর্থবুদ্ধি হার মানে। দেনা-পাওনার ভিত্তিতে বিবাহ কুৎসিত ও নীতিবিরুদ্ধ ঘটনারূপে গণ্য। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নারীকে মুক্ত করেছে, তাকে পুরুষের সমান অধিকার দান করেছে।

পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নারী কমিউনিস্ট গঠনকর্মে অংশ গ্রহণ করছে। তার সামনে সামাজিক আগ্রহের জগৎ ব্যাপক উন্মুক্ত। ফলে স্বামীর উপর স্ত্রীর অর্থনৈতিক ও মানসিক নির্ভরশীলতার ভিত্তি অপসারিত হল। এতে পরিবারের নৈতিক ও ভাবাদর্শগত ভিত্তি — অনুরাগ, সৌহার্দ, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও অকপটতা, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আগ্রহের মিল, কর্মনিষ্ঠতা এবং সন্তানের প্রতি সেবা-যত্ন — আরও বেশি তাৎপর্য অর্জন করেছে। সোভিয়েত মানুষ পরিবারে স্বার্থ অন্বেষণ করে না, — তার প্রয়াস — আপন জনের সঙ্গে প্রেম ও সৌহার্দের নৈতিক চাহিদাপূরণ।

মানুষের জীবনে প্রেমের স্থান বিরাট। প্রেম যেমন পরম আনন্দ, তেমনি গভীর আবেগ ও নৈতিক বাধ্যতা। বুর্জোয়ারা 'প্রেমের মুক্তি' ধ্বনি তুলে যৌন স্বেচ্ছাচারিতার পক্ষে যে কৈফিয়ৎ দেয়, ভ. ই. লেনিন তার কঠোর সমালোচনা করেছেন। প্রেম — এমন এক বিপুল ও উজ্জ্বল অনুভূতি, যা অখণ্ড মানুষটিকে চায়। দেখো, খুচরো ভাঙ্গানিতে তাকে বদল করতে যেও না!

এ সম্পর্কে সোভিয়েত লেখিকা লিদিয়া অবুখভা সুন্দর কথা বলেছেন: 'লেরমনতভ যখন বলেন যে তিনি 'অন্তরের সর্বশক্তি প্রয়োগে' ভালোবাসেন, তখন কবির সে কথা গভীরভাবে বিবেচনা করতে হয়। প্রেম কোন ক্ষণিকের আলোড়ন নয়, যৌবনের কোন আবেশ নয়, যা কখনও একটি, কখনও বা অপরটিতে আবদ্ধ, — যদিও তা বহু উদগ্র ও বিশুদ্ধ মর্মপীড়ার পরিচয় বহন করে তবু তাকে প্রেম বলে গণনা করা যেতে পারে না। প্রেম — যথার্থই 'অন্তরের সর্বশক্তি প্রয়োগ,' মানসিক এবং শারীরিকভাবে একে অপরকে ছাড়া বাঁচতে না পারা। আর এমন অনুভূতি সঙ্গে সঙ্গেই আসে না, তার জন্য পরীক্ষার দরকার হয়, — এমন কি গোড়ায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরও। অতিরিক্ত কঠোরতায় তার শ্বাস রুদ্ধ হওয়ার আশংকা নেই: তার জন্য আমাদের যত বেশি মূল্য দিতে হয় (অর্থাৎ, প্রয়াস প্রয়োগ করতে হয়) সে ততই আমাদের সমগ্র সত্তার সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে যায়। কিন্তু হৃদয়াবেগ যে-কোন অপরিণামদর্শী আচরণকে নির্বিচারে মেনে নেবে — এমন কথা মনে করারও কোন কারণ নেই: অভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা, এমন কি ছলনা থেকে এর উদ্ভব।'

কীভাবে ভালোবাসতে হয় তার তৈরী ব্যবস্থাপত্র কেউ আগে থাকতে লিখে দিতে পারে না। এই অনুভূতি গভীরভাবে ব্যক্তিগত, সর্বদাই নূতন, সতেজ এবং সর্বদাই তার বহিঃপ্রকাশ বিশেষ ধরনের। কেবল একটি জিনিসই কামনা করা যায়: যে-কোন পরিস্থিতিতে — তা যত দুঃখজনক বা সুখকরই হোক না কেন — অনুভূতির পূর্ণতা ও মানবিক সদ্‌গুণ বজায় রাখা; এবং ক্ষুদ্র ও নীচ আচরণে নিজেকে কলঙ্কিত না করা। এই কলঙ্ক পরে অপনোদন করা দুঃসাধ্য।

কথা উঠতে পারে: ভালোবাসায় ত অংশগ্রহণ করে দুজন, তা হলে সেখানে সমাজের কী আছে? প্রেমিক-প্রেমিকার অন্তরঙ্গ জীবনের সর্বক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করা, তাঁদের প্রতিটি

পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রণ করা নিশ্চয়ই অশিষ্টতা এবং নেহাৎই অবাঞ্ছনীয়। আর সেটা কেউ দাবিও করছে না। কিন্তু প্রেম কেবল 'ব্যক্তিগত ব্যাপার' নয়। ভ. ই. লেনিনের কথায়: 'প্রেমে অংশ নেয় দুজন, এবং আবির্ভূত হয় তৃতীয় — নূতন জীবন। ওখানেই নিহিত আছে সামাজিক স্বার্থ, ওঠে সমষ্টির প্রতি তার কর্তব্যের প্রশ্ন।' প্রেমের যুক্তিসঙ্গত অনুবৃত্তি, তার পরবর্তী বিকাশ ও গভীরতাসাধন পরিবার ও সন্তানের পালনকার্যে।

বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া — অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ; এর জন্য প্রয়োজন পরিণত মানসিকতা, আর তা মানুষের উপর সমাজের প্রতি গুরু দায়িত্বভার অর্পণ করে। কখনও কখনও তরুণ-তরুণীরা এসব দায়িত্ব হৃদয়ঙ্গম না করে অথবা সেগুলি পূরণে সক্ষম না হয়ে সময়ের অনেক আগেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। আসলে, পরিবারের ভরণপোষণের জন্য সঙ্গতি এবং বিশেষ পরিস্থিতির প্রয়োজন। পিতা-মাতার ব্যয়ে জীবনধারণ — এটা প্রকৃতির দিক থেকে পরমুখাপেক্ষিতা, সোভিয়েত মানুষের চরিত্রের সঙ্গে তা খাপ খায় না।

কখনও কখনও এমন চিন্তাও প্রকাশ করা হয় যে কমিউনিজমে সন্তানের লালনপালনের সম্পূর্ণ ভার সমাজ নিজে গ্রহণ করবে এবং পরিবার এই দায়িত্ব থেকে মুক্ত হবে। একথা ঠিক যে সোভিয়েত ইউনিয়নে শিশুর শিক্ষাদীক্ষার প্রতি সমাজের দায়িত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে তা সমাজের মুখ্য ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে পরিবার এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে মোটেই অংশ গ্রহণ করবে না; কেননা সন্তানের প্রতি প্রতি পিতামাতার ভালোবাসা এবং তাদের পারস্পরিক মেলামেশার চাহিদা কেউ রহিত করতে পারে না। শিশুর জীবনে মা'র স্নেহের ভূমিকা যে কী বিরাট, তা প্রত্যেকেরই

জানা আছে। শিশুর বোধশক্তি ও মানসিক গুণাবলী গড়ে তোলার ব্যাপারে পিতামাতার বিপুল নৈতিক প্রভাব অস্বীকার করা একেবারেই অর্থহীন।

অতীতের জের অতিক্রম

সোভিয়েত সমাজ সবল স্বাস্থ্যের অধিকারী এবং পুঁজিবাদের স্বভাবসিদ্ধ রোগ তার অপরিচিত। সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, অর্থগৃধ্নুতা, পরজীবিতা এবং অন্যান্য বুর্জোয়া নীতিবোধ প্রকাশের কোন ভিত্তি নেই। সোভিয়েত ইউনিয়নের চার-পঞ্চমাংশেরও বেশি অধিবাসী সোভিয়েত শাসনক্ষমতাকালে জন্মেছে ও বড় হয়ে উঠেছে। এই সব মাঝারী বয়সী ও তরুণসম্প্রদায় ত পুঁজিবাদের মধ্যে বাসই করে নি, — তা হলে আবার অতীতের জের তাদের কোথা থেকে আসতে পারে?

মানুষের চৈতন্য তার বিকাশের ক্ষেত্রে যে সামাজিক জীবনযাত্রা থেকে কিছুটা পিছিয়ে থাকে, একথা সুবিদিত। এই কারণে যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে অতীতে কোন কিছুর উদ্ভব ঘটেছিল তা অন্তর্হিত হয়ে যাবার পরও বহুকাল অতীতের জের বজায় থাকে। অভ্যাস ও ঐতিহ্যের বলে বলীয়ান হয়ে অতীতের 'জন্মদাগ' যেন নূতন জগৎকে আঁকড়ে ধরে, এক পুরুষ থেকে অপর পুরুষে সঞ্চারিত হয় এবং সর্বশক্তিতে নূতন সমাজে দৃঢ়সংসক্ত হওয়ার চেষ্টা করে। তাছাড়া, একথাও ভুলে গেলে চলবে না যে প্রাচীন ধ্যানধারণা, ভাবধারা ও রীতিনীতি বাইরে থেকে বুর্জোয়া প্রভাবে পুষ্ট। সমাজতন্ত্রে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে এখনও যে কঠোরতা আছে সমাজবিরোধী ঘটনা তার সঙ্গেও যুক্ত।

প্রাচীনত্বের ঘৃণ্যতম আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায় কূপমণ্ডূকতায়। এর মূল কথা ভাবাদর্শহীনতা এবং নিজের ‘অহং’ ছাড়া আর সব কিছুর প্রতি নিস্পৃহ মনোভাব। কূপমণ্ডূক সমষ্টি এবং সমাজের স্বার্থ সম্পর্কে উদাসীন। তার একমাত্র আগ্রহ সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্যে এবং তা অর্জনের জন্য সে যে-কোন রকমের অব্যবস্থা মেনে নিতে প্রস্তুত, যদি তার জন্য সরাসরি কোন ঝুঁকি না নিতে হয়। কূপমণ্ডূক অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য অথবা মানুষের প্রতি নিঃস্বার্থ সাহায্যদানের ব্যাপারে মাথার একটি চুল পর্যন্ত খসাতে নারাজ।

কমিউনিজম এবং অতীতের জের পরস্পর সঙ্গতিহীন, আর পুরনো জগতের ‘জন্মদাগ’ একমাত্র সমগ্র জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়ই মুছে ফেলা সম্ভব। লেনিনের কথায়: ‘...**প্রবঞ্চক, পরাশ্রয়ী, গুণ্ডা-বদমাশের** কথা মনে রেখে এবং তাদের উপর পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে একমাত্র **ব্যাপক** কৃষক ও শ্রমিক জনসাধারণের বিপ্লবী উদ্দীপনার সঙ্গে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ও সততাপূর্ণ সহযোগিতার উদ্ভব — অভিশপ্ত পুঁজিবাদী সমাজের এই সব জের, মানবসমাজের এ সমস্ত আবর্জনা, নৈরাশ্যজনকভাবে পচা-গলা ও অসাড় এই সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং উত্তরাধিকারসূত্রে সমাজতন্ত্রের কাছে পুঁজিবাদের রেখে যাওয়া এই সংক্রামক ব্যাধি, এই প্লেগ ও গভীর ক্ষত অতিক্রম করতে পারে।’

কমিউনিস্ট গঠনকর্মের সাফল্য অতীতের জের অতিক্রমের প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি গড়ে তোলে। এরই সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত সমাজ প্রতিটি লোকের পেছনে কঠোর শিক্ষামূলক কাজ নির্বাহ করে। প্রমাণের শ্রেষ্ঠ উপায় — ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের ইতিবাচক দৃষ্টান্ত।

৪৭ ॥ মানুষের সব কিছু সুন্দর হওয়া চাই

মানুষের **সর্বাঙ্গীণ ও সুষম বিকাশের** জন্য অন্তর-সম্পদ, নৈতিক শুদ্ধতা এবং শারীরিক উৎকর্ষের সংযোগসাধন প্রয়োজন।

অন্তর-সম্পদ

বৈজ্ঞানিক বিশ্ববীক্ষা এবং উচ্চ আদর্শবোধ কমিউনিস্ট সমাজের অন্তর্গত মানুষের অন্তর-সম্পদের বনিয়াদ গড়ে তোলে। সোভিয়েত মানুষের আদর্শবোধ — কোন অন্ধ ধর্মবিশ্বাস নয়, তা কোন খেয়ালী কল্পনার ইচ্ছা পূরণকারী গোঁড়ামি নয়। প্রকৃতি ও সমাজবিকাশের নিয়ম সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞানের উপর নির্ভর করে নূতন মানুষ বাস্তব কার্যকলাপে তার প্রয়োগ ঘটায় এবং কমিউনিজমের পূর্ণ বিজয়ে তার আস্থা সচেতন।

অন্তর-সম্পদের চারিত্র বৈশিষ্ট্যের আর একটি রূপ — বহুমুখী জ্ঞান। তাই বলে এমন কথা মনে করা ঠিক হবে না যে সমাজের প্রতিটি মানুষ জ্ঞানের সমস্ত পরিসর এবং বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও শিল্পের সব রকম সাফল্য আয়ত্তে আনতে সমর্থ হবে। কথাটা তা নিয়ে নয়। বহু প্রকৌশলবিদ্যাবিষয়ক শিক্ষা নূতন মানুষকে বিজ্ঞান ও উৎপাদন ব্যবস্থার বনিয়াদ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানে সমৃদ্ধ করবে এবং তাকে দ্রুত নিজের বৃত্তি খুঁজে নিতে ও যে-কোন কাজে উৎকৃষ্ট বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠতে সাহায্য করবে।

সাহিত্য ও শিল্পের জ্ঞান ছাড়া, সৌন্দর্যের অন্বেষা ও উপলব্ধি এবং 'সৌন্দর্যসৃষ্টি'র ক্ষমতা ছাড়াও অন্তর-সম্পদ

অর্থহীন। এই সব কিছু মিলে **নন্দনতাত্ত্বিক শিক্ষার** সারমর্ম গড়ে তোলে।

কিন্তু শিল্পের অপূর্ব সৃষ্টি সকল মানুষকে সমভাবে উদ্দীপিত করে না কেন? শিল্পীর আঁকা ছবি দেখে কারও কারও মনে শিহরণ জাগে, আবেগ গোপন থাকে না। কেউ কেউ পাশ কাটিয়ে চলে যায়, — কৌতূহলশূন্য দৃষ্টি পড়ল কি পড়ল না। ব্যাপারটা কেবল এই নয় যে প্রত্যেকে নিজস্ব পন্থায় সৌন্দর্য উপলব্ধির দিকে অগ্রসর হয়। সৌন্দর্যবোধ ব্যাপারটিই শ্রমসাপেক্ষ। শিল্প রসাস্বাদনের জন্য প্রয়োজন শিল্পসংক্রান্ত শিক্ষার, অন্তত পক্ষে সাহিত্য ও শিল্পের অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য রচনাসম্পর্কিত জ্ঞান এবং নিজের গ্রহণক্ষমতা ও কল্পনা-শক্তির বিকাশ।

নন্দনতাত্ত্বিক শিক্ষা কেবল আমাদের অন্তর্জগৎকে সমৃদ্ধ করে না, — তাকে মহান করে তোলে। মানুষ সুন্দরের যত গভীরে অবগাহন করে, যত প্রবলভাবে তার প্রভাব অনুভব করে, নিজে ততই শুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট হয়।

নৈতিক শুদ্ধতা

নূতন মানুষের নৈতিক গঠনের বিশেষত্ব **কমিউনিজম গঠনকর্মীর নৈতিক অনুশাসন**রূপে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচিতে সূত্রবদ্ধ হয়েছে। নিম্নলিখিত নৈতিক সূত্র তার অন্তর্ভুক্ত:

— কমিউনিজমের কাজে নিষ্ঠা, সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমি ও সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের প্রতি প্রীতি;

— সমাজের কল্যাণে সততাপূর্ণ শ্রম: যে কাজ করে না, সে খায় না;

— সামাজিক সম্পত্তি রক্ষা ও তা বৃদ্ধির জন্য প্রত্যেকের তত্ত্বাবধান;

— সামাজিক কর্তব্য সম্পর্কে উচ্চ সচেতনতা, সামাজিক স্বার্থ লঙ্ঘনকারীকে সহ্য না করা;

— যৌথক্রিয়াবাদ ও বন্ধুসুলভ পারস্পরিক সহায়তা: সকলের জন্য প্রত্যেকে, একের জন্য সকলে;

— মানুষে মানুষে মানসিক সম্পর্ক ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা: মানুষ মানুষের বন্ধু, কমরেড ও ভাই;

— সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে সততা ও ন্যায়পরায়ণতা, নৈতিক শুদ্ধতা, সরলতা ও বিনয়;

— পারিবারিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, শিশুর শিক্ষাদীক্ষার প্রতি যত্ন;

— অন্যায়, পরজীবিতা, অসাধুতা, পদলিপ্সা ও অর্থগৃধ্নুতার প্রশ্রয় না দেওয়া;

— সোভিয়েত ইউনিয়নের সকল জাতির মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ববোধ, সংকীর্ণ জাতীয় মনোভাব ও জাতিবৈষম্য সহ্য না করা;

— কমিউনিজম, শান্তির কাজ ও জাতিসমূহের মুক্তির শত্রুদের সঙ্গে আপস না করা;

— সকল দেশের মেহনতী জনগণ ও সকল জাতির সঙ্গে ভ্রাতৃসুলভ সংহতি।

এই নৈতিক সূত্রগুলিতে কেবল বিপ্লবী প্রলেতারীয় নীতিবোধের দাবি এবং সোভিয়েত সমাজের অগ্রণী মানুষের উৎকৃষ্ট রূপেরই অভিব্যক্তি ঘটে নি, — ব্যাপক জনগণ হাজার হাজার বছর ধরে সামাজিক অত্যাচার এবং নীতিহীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে সর্বমানবিক নৈতিক নিয়মাবলী উদ্ভাবন করেছে তারও অভিব্যক্তি

ঘটেছে। এটাও বোঝা যায়, কেন নৈতিক অনুশাসন সোভিয়েত জনগণের কাছে এমন কতকগুলি মূলসূত্রের সমষ্টিমাত্র নয়, যার প্রকাশ কোন এক সময় ঘটবে; এ হল স্বকীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নৈতিক দিকদর্শন, যা দিয়ে তারা নিজেদের আচরণ ও কাজের পরিমাপ করে থাকে। কেমন হওয়া উচিত? — নৈতিক অনুশাসন এই প্রশ্নের সঠিক জবাব দেয়। এর শক্তি ঠিক এখানেই, যে এতে যে-সব নৈতিক আদর্শের কথা লিপিবদ্ধ আছে সেগুলি ভবিষ্যতের শুভ কামনায় নয়, — আজকের দিনেই কমিউনিজম গঠনের প্রতিটি কর্মীর পক্ষে আবশ্যক এবং তা আমাদের সময়কার অগ্রণী মানুষদের, বীরদের উদ্দীপিত করে। নৈতিক অনুশাসন সমষ্টিকে এবং পৃথক পৃথকভাবে প্রতিটি মানুষকে যে-কোন আচরণের ন্যায়পরতা এবং যেমন একান্তই নিজস্ব, তেমনি আশেপাশের মানুষের আচার-আচরণের সঠিক পন্থা নির্ধারণে সাহায্য করে।

শারীরিক উৎকর্ষ

মানুষের মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষ তার সুষম শারীরিক বিকাশের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ভ. ই. লেনিন অধ্যয়ন ও গবেষণাকর্মকে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত করার এবং দেহচর্চা, সন্তরণ, প্রমোদ-ভ্রমণ ও ব্যায়াম সহযোগে আগ্রহের বহুমুখিনতা পূর্ণতাসাধনের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন।

নূতন মানুষের বাহ্যরূপও তার অন্তর্লোকের মূল ঐশ্বর্য এবং উদার আচরণ অনুযায়ী হওয়া চাই। তার অর্থ এমন নয় যে কমিউনিজমে সকলে রূপকথাসুলভ সুন্দর হবে।

কিন্তু সকলেই হবে সুস্থ, ধাতস্থ ও নির্ভীক। তাছাড়া মানুষের জীবন আত্মিক দিক থেকে যত সমৃদ্ধ এবং নৈতিক অর্থে যত বিশুদ্ধই হোক না কেন, সত্যিকারের শারীরিক বিকাশ ছাড়া তা বহু আনন্দ থেকে বঞ্চিত।

স্বাস্থ্যরক্ষা ও শরীর মজবুত করার বড় উপায় — শারীরিক শ্রম এবং ব্যায়াম ও খেলাধুলার চর্চা।

যৌবনে ও মধ্যবয়সে শারীরিক শ্রমে ধাতস্থ হওয়ার ব্যাপারে, জীবনযাত্রা ও খাদ্যগ্রহণসংক্রান্ত নিয়মের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না দিলে সচরাচর অকাল বার্ধক্য ঘনিয়ে আসে। চল্লিশ বছর বয়সেই মানুষ লোলচর্ম হয়ে পড়ে, নিঃশ্বাসের কষ্ট, ক্লান্তি ও মাথার যন্ত্রণায় ভোগে। কিন্তু অন্য দিকে, যারা নিয়মিত খেলাধুলার চর্চা করে এবং সেই সঙ্গে জীবনযাত্রার নিয়ম যথাযথ পালন করে তারা উচ্চ কর্মদক্ষতা, উদ্যম ও প্রাণোচ্ছলতায় বিশিষ্ট হয়ে থাকে।

দেহচর্চা এবং স্বাস্থ্য গড়ে তোলার প্রতি মনোযোগ একই সঙ্গে আমাদের শ্রমমূলক কর্মে সাফল্য অর্জনের এবং প্রয়োজনমতো দেশের প্রতিরক্ষা কাজে পূর্ণ অংশগ্রহণের উপযুক্ত করে গড়ে তোলে। শারীরিকভাবে বিকশিত মানুষ অপেক্ষাকৃত দ্রুত এবং উত্তমরূপে প্রয়োজনীয় বৃত্তি আয়ত্তে আনে। দেহচর্চা ও খেলাধুলা থেকে বহু দূরে থাকা ব্যক্তির তুলনায় তার শ্রমের উৎকর্ষ ও উৎপাদনশীলতা বেশি।

স্বয়ংক্রিয় উৎপাদনব্যবস্থার ক্ষেত্রে মানুষের ক্রিয়ার রূপ যেমনই হোক না কেন, পরিণামে তা সর্বদাই ক্রিয়াশক্তির পর্যায়ে দাঁড়ায়। আর স্বয়ংক্রিয়তা যতই অগ্রসর হোক না কেন, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র-পরিচালনকর্মীদের অবশ্যই উৎকৃষ্ট শারীরিক শক্তি ও শ্রমক্ষমতার, এবং সর্বোপরি তথ্যাদি উপলব্ধির উচ্চ ক্ষমতা ও অক্লান্ত কর্মদক্ষতার অধিকারী হতে হবে; অথবা ব্যস্ত না হয়ে স্থির মস্তিষ্কে পরিচালনব্যাপারের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্যাসকলের যথাযথ, দ্রুত

সমাধানের ক্ষমতা রাখতে হবে। সেই সঙ্গে যেক্ষেত্রে সংকেত কম আসে অথবা যেগুলি একঘেয়ে, সেক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণকারীকে সজাগ থাকতে হয়। দ্রুত এবং জরুরী হস্তক্ষেপের জন্য তাকে সর্বদাই প্রস্তুত থাকা চাই। দেখা যাচ্ছে, ব্যাপারটা কেবল জ্ঞানের নয়। জটিল স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির নিয়ন্ত্রণকারী কর্মীর যে-সব গুণের বিকাশ অবশ্যপ্রয়োজনীয়, তার মধ্যে শারীরিক শিক্ষা ও খেলাধুলার ভূমিকা মোটেই নগণ্য নয়।

সাইবারনেটিক্‌সবিজ্ঞানীদের মতে জটিল এবং উচ্চ স্বয়ংক্রিয়ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে আধুনিক, এবং প্রকৃতপ্রস্তাবে মানসিক শ্রমের জন্য মানুষের শারীরিক বিকাশের যেমন ব্যাপক ও জটিল দাবি দেখা দিয়েছে, শারীরিক শ্রমের ক্ষেত্রেও তেমনটি দেখা যায় নি।

খেলাধুলা মানুষকে কেবল সাহস, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা, ধৈর্য ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের মতো জীবনের প্রয়োজনীয় গুণাবলী অর্জনেই সাহায্য করে না। খেলাধুলা চর্চার মধ্য দিয়ে একই সঙ্গে গড়ে ওঠে সৌন্দর্যবোধ, প্রকাশ পায় সুন্দর ভঙ্গিমা, কমনীয়তা, নমনীয়তা এবং গতির নৈপুণ্য ও সূক্ষ্মতা। স্কী খেলা ও পর্যটনমূলক অভিযানের মধ্যে বন্ধুত্বের অনুভূতি ও যৌথক্রিয়াবাদের তাৎপর্য আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করা যায়। অন্যান্য কাজের সঙ্গে খেলাধুলার বিচক্ষণ সম্মিলন — যেমন শারীরিক, তেমনি আত্মিক বিকাশের এক গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

* * *

যুগ যুগ ধরে কমিউনিজম ছিল নির্যাতিত ও ভাগ্যহতদের এক অবাস্তব স্বপ্ন। আজ তা বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে। এখন আর বৃদ্ধ ডিওজেনাসের মতো দিনের আলোয় লণ্ঠন হাতে মানুষ খুঁজে বেড়াতে হবে না। নূতন মানুষ জন্মেছে, পূর্ণতা লাভ করছে, পুরুষত্ব অর্জন করছে।

নবম অধ্যায়

পার্টি: কমিউনিজমের কর্ণধার

কমিউনিস্ট পার্টি — সোভিয়েত জনগণের সংগ্রামী, পরীক্ষিত অগ্রবাহিনী, যা স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে শ্রমিক শ্রেণী, যৌথখামারী কৃষক ও বুদ্ধিজীবীসম্প্রদায়ের অগ্রণী এবং অপেক্ষাকৃত সচেতন অংশকে সম্মিলিত করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন। লেনিন অখণ্ড বিপ্লবী সংগঠনে মার্কসবাদী দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উৎসস্বরূপ, তিনি তার গঠন, অভ্যন্তরীণ জীবনের আদর্শ এবং কর্মপদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। পার্টির অবিসংবাদী অধিনায়ক লেনিন এক-চতুর্থাংশ শতক ধরে তাকে গড়ে তুললেন বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমসম্পন্ন পার্টিতে, আন্তর্জাতিক পার্টি এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিশেবে। তিনি সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ে

পার্টির রণনীতি ও কর্মকৌশল প্রস্তুত করেন এবং তাকে অমূল্য ভাবগত ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ করেন।

সঙ্গত কারণেই সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টিকে লেনিনীয় পার্টি বলা হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে যথাযথ এবং উজ্জ্বলরূপে বলেছেন মায়াকোভ্স্কি: 'পার্টি ও লেনিন — যুগল সোদর...'

৪৮ ॥ সোভিয়েত সমাজে পার্টির ভূমিকা

সোভিয়েত জনগণের অগ্রবাহিনী

রাজনৈতিক পার্টিসমূহের চরিত্র, তাদের গঠনের মূলনীতি ও কার্যপদ্ধতি নির্ধারিত হয় কোন শ্রেণীর এবং জনসমাজের কোন স্তরের স্বার্থের পোষকতা তারা করছে, তার দ্বারা। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে রাশিয়ার প্রলেতারিয়েতের মূল স্বার্থের প্রবক্তা ও প্রলেতারিয়েতের অগ্রবাহিনীরূপে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির উদ্ভব।

শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে প্রলেতারিয়েতের পক্ষ সমর্থনকারী ও তার আগ্রহের রূপদানে ইচ্ছুক বহু রাজনৈতিক ধারা ও সংগঠনের পরিচয় পাওয়া যায়। সেগুলির কোন কোনটি বিপ্লবী পন্থায় আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে সংগ্রামের কোন সুস্পষ্ট কর্মসূচি দিতে না পারায় তাদের পক্ষে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। কোন কোনটি বা সন্ত্রাসবাদী পদ্ধতি ও উপায় অবলম্বন করায় শ্রমিক শ্রেণী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। অন্যেরা সংস্কারবাদীদের আওতায় পড়ে বুর্জোয়াদের সঙ্গে আপসের পথে নামে এবং নিজেদের কর্তব্যকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে ছোটখাটো সংস্কারসাধনে নামিয়ে নিয়ে যায়।

ভ. ই লেনিন প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টি রাশিয়ার প্রলেতারিয়েতকে তার পশ্চাতে সমবেত করে বিপ্লবে জয়লাভ

করতে **সমর্থ** হয়েছে বিশেষত **এই** কারণে যে সমগ্র কার্যকলাপে সে অনুসরণ করেছে শ্রমজীবী জনসাধারণের মুক্তির উদ্দেশ্যে পরিচালিত **সংগ্রামের বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মসূচি** — মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব, ধারাবাহিক বৈপ্লবিক রাজনীতির আশ্রয় নিয়েছে।

প্রলেতারিয়েতের মতো রাশিয়ার মেহনতী কৃষিজীবীরও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উচ্ছেদ ও সমাজের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরসাধনে আগ্রহ ছিল জন্মগত। কমিউনিস্ট পার্টি যে গ্রামে উল্লেখযোগ্য প্রভাব এবং গ্রামের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সক্রিয় সমর্থন অর্জন করেছে, প্রলেতারিয়েত ও কৃষকদের মূলগত স্বার্থের বাস্তব মিল তা পূর্বনির্ধারণ করে দিয়েছে। নিজের শ্রেণীগত উৎপত্তির কারণে এবং কর্তব্য হিশেবে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি হওয়ায় কমিউনিস্ট পার্টি দেশের সকল শোষিত শ্রেণীকে পুঁজিবাদের উপর আঘাত হানায় নেতৃত্ব দিয়েছে।

অক্টোবর বিপ্লবের পর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের কাছ থেকে নেতৃত্বের ভার পেয়ে পার্টি প্রলেতারীয় একনায়কত্ব ব্যবস্থার মুখ্য শক্তি হয়ে দাঁড়াল। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সোভিয়েত দেশ অর্ধ শতাব্দীর অধিক পথ অতিক্রম করেছে — এটা তার লেনিনীয় রাজনীতির, তার চিন্তাধারার বিজয়।

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস — বীরত্বের ইতিহাস, — তা সমৃদ্ধ ঘটনাবলীতে সম্পৃক্ত। তাতে নিরবচ্ছিন্ন বিজয়ের আনন্দ, কেবল বিচক্ষণ রাজনৈতিক সমাধানই যে দেখতে পাওয়া যাবে তা নয়। সাময়িক পরাজয়, ভুল-ভ্রান্তিও ছিল। তবে সে-সবে, তার নেতৃত্বে যা সম্পাদিত হয়েছে তার তাৎপর্য কমে না। পশ্চাৎপদ, দুর্দশাগ্রস্ত রাশিয়ার জায়গায় গড়ে উঠল ক্ষমতাশালী সমাজতান্ত্রিক শক্তি, —

শিল্প উৎপাদনের পরিমাণে যার স্থান বিশ্বে দ্বিতীয়, যে দেশ মহাকাশযাত্রার প্রথম পথনির্মাতা, সমগ্র মানবজাতির কাছে প্রগতির আলোকস্তম্ভ, শান্তি ও বিপ্লবী নবায়নের সুদৃঢ় দুর্গ। এটা যতখানি সমগ্র সোভিয়েত জনগণের সংগ্রাম ও শ্রমের ফল, ঠিক তেমনি পরিমাণে পার্টির কর্মতৎপরতা এবং লক্ষ লক্ষ কমিউনিস্টের বিচক্ষণতা, উৎসাহ, ইচ্ছা ও আত্মত্যাগের ফল।

প্রতিটি মহৎ বিপ্লবই নিজ নিজ বীরকে — বক্তা, সেনানায়ক ও সংগঠককে তুলে ধরে, — যেমন ছিলেন স্পার্তাকাস ও মুন্‌ৎসার, মারাত ও রবেস্‌পিয়ার। অক্টোবর বিপ্লবের যুগও তার বিশিষ্ট কর্মীদের নিয়ে এসেছে। লেনিনের সহসংগ্রামী ও অনুগামী, প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিভার অধিকারী বহু বিচিত্র ব্যক্তিত্বকে দেখা যায়: ছিলেন স্‌ভের্দলভ ও কিরভের মতো গণসংগঠক, ফ্রুঞ্জে ও ব্ল্যুখেরের মতো প্রতিভাধর সেনানায়ক, ছিলেন লুনাচার্‌স্কি ও অল্‌মিন্‌স্কির মতো প্রখর সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়সংক্রান্ত রচনাদির লেখক। সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করেছে সাধারণ বৈশিষ্ট্য — পার্টির কাজের প্রতি নিষ্ঠা ও উচ্চ আদর্শবোধ, অনমনীয় ইচ্ছা ও ব্যক্তিগত পৌরুষ এবং উচ্চ নীতিবোধ ও নিজের সম্পর্কে কঠোর মনোভাব। এসবই পূর্ণমাত্রায় সেই গুণাবলী যা 'বিপ্লবের বীরব্রতী' দ্‌জেরজিন্‌স্কি দাবি করতেন তাঁর জরুরী কমিশনের কর্মীদের কাছ থেকে এবং যাকে সাধারণভাবে প্রতিটি সত্যিকারের কমিউনিস্টের অবিচ্ছেদ্য ধর্ম: 'পরিষ্কার হাত, ঠাণ্ডা মাথা ও উষ্ণ হৃদয়' বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

পার্টির বিশিষ্ট কর্মীরাই কেবল এই গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন তা নয়, — এগুলি হয়ে দাঁড়াল সকল কালের লক্ষ লক্ষ কমিউনিস্টের নৈতিক আদর্শ। গৃহযুদ্ধ ও বিদেশী সামরিক হস্তক্ষেপের সময়, দুর্ভিক্ষ ও বিনাশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কালে এবং পিতৃভূমির মহাযুদ্ধের ভয়ঙ্কর বছরগুলিতে যেখানে কাজ কিছু কঠিন, সেখানেই এগিয়ে আসতে দেখা গেছে কমিউনিস্টদের, তাদের মন্ত্র হয়ে দাঁড়াল: 'কমিউনিস্টরা, আগে বাড়!' — এই ধ্বনি।

শোনা যাক জনৈক কমিউনিস্টের জীবনকথা, এমন কমিউনিস্টের সংখ্যা কিন্তু বহু।

কিরিল্ল অর্লোভ্স্কি পার্টিতে ঢোকেন তেইশ বছর বয়সে। তাঁর সমগ্র জীবন পার্টি ও জনগণের প্রতি সেবার এক আদর্শ। ১৯১৮ সনে ক. প. অর্লোভ্স্কির নেতৃত্বে গেরিলাবাহিনী বোব্রুইস্ক অঞ্চল থেকে জার্মান দখলদারদের বিতাড়ন করে দেয়, বিশের দশকে পোলিশ শ্বেতরক্ষীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। ১৯৩৬ সনে তিনি স্পেনে যুদ্ধ করেন। ১৯৪১ সনে ক. প. অর্লোভ্স্কিকে আবার বেলোরুশিয়ার জঙ্গলে দেখতে পাওয়া যায়। ফাশিস্ত বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের বছরগুলিতে ডজন ডজন দুঃসাহসী আক্রমণে তাঁকে অংশ নিতে দেখা গেছে। এমনই এক লড়াই পরিণামে মর্মান্তিক হয়ে দাঁড়াল: গুরুতর আঘাত, একটি পা কেটে বাদ দেওয়া, দ্বিতীয়টিতে জটিল অপারেশন এবং প্রায় সম্পূর্ণ বধিরতা।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল অর্লোভ্স্কি তাঁর পার্টি সংগঠনের কাছে লিখছেন: 'শারীরিক অক্ষমতাবশত আমার পক্ষে সৈনিক থাকা আর সম্ভব নয়। কিন্তু আমাকে শিক্ষা দিয়েছে কমিউনিস্ট পার্টি, তাই প্রিয় মাতৃভূমির কল্যাণের জন্য কাজের চেয়ে বড় আনন্দ এবং আর কোন উদ্দেশ্য আমার জীবনে থাকতে পারে না। এখন আমার সামনে যে প্রশ্নটা দাঁড়িয়েছে তা এই: মাতৃভূমির জন্য, পার্টির জন্য আমার সব দেওয়া কি ফুরিয়ে গেছে?' ১৯৪৫ সনে তিনি মস্কো থেকে বেলোরুশিয়ার ফাশিস্তবাহিনীবিধ্বস্ত গ্রাম মিশকোভিচিতে চলে আসেন এবং বিশ বছরের উপর, জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যৌথখামার 'রাস্‌সভেত্‌' (প্রত্যুষ) পরিচালনা করেন।

সমাজতন্ত্র গঠন — সোভিয়েত জনগণের দৃঢ় আস্থা ও সমর্থনের অধিকারী পার্টির পরিচালনা ও সাংগঠনিক কার্যকলাপের মূল পরিণাম। সোভিয়েত জনগণ বহুকাল থেকেই পার্টিকে দেখে আসছে কেবল শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠনরূপে নয়, — যৌথখামারের কৃষিজীবী, মেহনতী বুদ্ধিজীবী এবং সোভিয়েত সমাজের সকল স্তরের মানুষের রাজনৈতিক সংগঠনরূপেও বটে।

সমাজতন্ত্র গঠনের ফলে দেশে এমন কোন শ্রেণী ও

সামাজিক স্তর রইল না যাদের স্বার্থ শ্রমিকদের স্বার্থবিরোধী হতে পারে, গড়ে উঠল **জনগণের সামাজিক-রাজনৈতিক ঐক্য।** তবে, এটাও ঠিক যে একমাত্র মেহনতী শ্রেণী, সামাজিক গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত সমাজেও শ্রমজীবী জনসাধারণের বিভিন্ন অংশের উৎপাদনী ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিশেষত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্বার্থের নানা রেশ থেকে যায়। কিন্তু স্বার্থের এই সব রেশ, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের এই সব বিশিষ্ট চাহিদা নিজেদের মধ্যে আপসহীন বিরোধিতার সূচনা করে না। বরং উল্টো: সেগুলির সবচেয়ে ভালো বিচার ও মীমাংসা হতে পারে সমগ্র জনসাধারণের সাধারণ আগ্রহের পরিপোষক ঐক্যবদ্ধ পার্টি রাজনীতির আওতায়।

এইভাবে, সমাজতান্ত্রিক সমাজে প্রথম এমন এক জিনিস সম্ভব হল, যা ইতিহাসে এর আগে কখনও হয় নি — রাজনৈতিক পার্টি কেবল এক বিশেষ শ্রেণীগত স্বার্থের প্রবক্তা না হয়ে সমগ্র জনস্বার্থের প্রবক্তা হয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু এটা একটা দিকমাত্র। সমাজতন্ত্র গঠনকর্মের সঙ্গে সঙ্গে এমন অবস্থাও দেখা দিতে পারে যখন জনসমাজের কোন কোন স্তর পার্টি যেহেতু নিজের রাজনীতিতে তাদের আগ্রহের কথা বিবেচনা করে, সেই হেতু তার নেতৃত্বে সন্তুষ্ট তবে তার কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে না। নূতন এবং সমাজতান্ত্রিক বিকাশের উচ্চতর পর্যায়ে উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে এই সব স্তর (অন্ততপক্ষে তার অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল অংশ) বিরুদ্ধবাদীতে পরিণত হয়ে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের তত্ত্বনির্দেশিত পথে সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত করে দিতে পারে। এখানেই পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রক্রিয়ায় সম্ভাব্য সামাজিক সংঘর্ষের অন্যতম কারণ নিহিত।

এই কারণে সোভিয়েত ইউনিয়নে উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে ওঠার ফলে **সোভিয়েত জনগণের** সামাজিক-রাজনৈতিক ঐক্য ছাড়া **ভাবগত ঐক্যও** সৃষ্ট হওয়ার ঘটনাটি এক মূলনীতিগত তাৎপর্য বহন করে। তার অর্থ এই যে পার্টির মতাদর্শ সমগ্র জনগণের মতাদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বে বিজ্ঞানভিত্তিক উপস্থাপিত শ্রমিক শ্রেণীর কমিউনিস্ট লক্ষ্য ও আদর্শ সমাজের অন্যান্য স্তরের কাছে, সমগ্র সমাজের কাছে নিজস্ব লক্ষ্য ও আদর্শ হিশেবে গৃহীত হয়েছে।

কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ও প্রার্থী সদস্যসংখ্যা — ১ কোটি ৫৭লক্ষ। তাদের অর্ধেকেরও বেশি — শ্রমিক ও যৌথখামারজীবী। কর্মচারীভুক্ত কমিউনিস্টদের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং-টেকনিক্যাল কর্মী, কৃষি বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক, ডাক্তার, বিজ্ঞানকর্মী, সাহিত্য ও শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি — বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকারী। ৭০ শতাংশেরও বেশি কমিউনিস্ট বৈষয়িক উৎপাদনের বিভিন্ন শাখায় কর্মরত, তারা সরাসরি কলকারখানায়, নির্মাণক্ষেত্রে ও পরিবহণে এবং যৌথখামার ও রাষ্ট্রখামারে মেহনত করে। পার্টিতে ১৩১টি জাতি ও জাতিসত্তার প্রতিনিধি আছে। বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির অর্ধেকেরও বেশি সদস্য ও প্রার্থী সদস্যের বয়স চল্লিশের অনূর্ধ্বে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টিতে যে যুবসম্প্রদায়ের আগমন ঘটছে তার মধ্যে পুরুষানুক্রমিক উত্তরাধিকার, পার্টির বিপ্লবী মানসিকতা ও তার বীরত্বপূর্ণ ঐতিহ্যের প্রকাশ দেখতে পেয়ে লেনিন সর্বদা গর্ব প্রকাশ করেছেন।

সমাজে পার্টির নেতৃস্থানীয় ভূমিকার ভিত্তি — জনসমাজের সকল শ্রেণী ও স্তরের সঙ্গে তার স্থায়ী সংযোগ। এক দিকে জনসাধারণের সামনে পার্টির নীতি ব্যাখ্যা করা এবং কমিউনিস্ট গঠনকর্মের সাধারণ কর্তব্য সম্পাদনে তাদের

সংগঠিত করে তোলা আবশ্যক। অন্য দিকে পার্টিকে বিভিন্ন সামাজিক স্তরের বিশেষ আগ্রহসমেত জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিচয় লাভ করতে হবে, যাতে সেগুলির আলাপ-আলোচনা সম্ভব হয়, নিজের রাজনীতিতে জনগণের ইচ্ছার অভিব্যক্তি ঘটানো যায়।

ভ. ই. লেনিন জোর দিয়ে বলেছেন: 'অগ্রবাহিনী একমাত্র তখনই অগ্রবাহিনী যখন সে তার পরিচালিত জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে সত্যি সত্যিই সমগ্র জনসাধারণকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।' সোভিয়েত ইউনিয়নে পার্টি ও জনগণের যে ঐক্য গড়ে উঠেছে তা পার্টি নেতৃত্বের ফলপ্রসূতা এবং কমিউনিজমের দিকে সাফল্যজনক অগ্রগতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

পার্টি নেতৃত্বের রূপ ও রীতি

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি — শাসক পার্টি। তার এই ভূমিকা সোভিয়েত রাষ্ট্রের সংবিধানে বিধিবদ্ধ। কীভাবে, কী কী রূপে ও কী কী রীতির সাহায্যে পার্টি নেতৃত্ব সম্পাদিত হয়?

পার্টির পরিচালনমূলক কার্যকলাপের মূল উদ্দেশ্য — **রাজনৈতিক**। এটাও স্পষ্ট এই কারণে যে লেনিনের কথায় রাজনীতি 'কোটি কোটি মানুষের প্রকৃত ভাগ্যনিয়ন্তা', তার উপর নির্ভর করে দেশের বিকাশ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার প্রতিষ্ঠা ও জনগণের সমৃদ্ধি। বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের তত্ত্ব এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক রাজনীতির লেনিনীয় নীতির ভিত্তিতে পার্টি নিজেদের কর্মসূচিসংক্রান্ত দলিলে সমগ্র ঐতিহাসিক পর্বের জন্য

রাজনৈতিক কর্মপন্থা নির্ধারণ করে। তারই সঙ্গে সঙ্গে পার্টির কংগ্রেস এবং তার কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক সমস্যা উত্থাপন করে, তা সমাধানের মেয়াদ ও উপায় স্থির করে, অর্থাৎ চলতি রাজনীতি নির্ধারণ করে।

পার্টির রাজনৈতিক কার্যকলাপের ধারার মধ্যে পরিমাণগতভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যজনক — তার অর্থসংক্রান্ত নীতি: দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নসংক্রান্ত নির্দেশাবলী প্রস্তুত, অর্থব্যবস্থা পরিচালনার সাধারণ নীতি ও পদ্ধতিগুলির নির্ধারণ, যাকে সোভিয়েত সমাজের দৃঢ় অগ্রগতি রক্ষার — কমিউনিজমের বৈষয়িক-টেকনিক্যাল বনিয়াদ সৃষ্টির উপযোগী হতে হবে। ভ. ই. লেনিনের কথায়, অর্থনীতি — সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক রাজনীতি। এই চূড়ান্ত নির্দেশের সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতি রক্ষা করে অর্থনীতির বিকাশসংক্রান্ত সমস্যা পার্টি কংগ্রেসসমূহের আলোচনার কেন্দ্রস্থলে দেখতে পাওয়া যায়, কেন্দ্রীয় কমিটির অধিকাংশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনই তাকে উপলক্ষ করে আহূত।

পার্টি নেতৃত্বের আরও একটি উল্লেখযোগ্য দিক — **সাংগঠনিক**। তার প্রকাশ সর্বোপরি এখানেই যে পার্টি রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক সংগঠনগুলির কার্যকলাপের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে, কমিউনিজম গঠনপরিকল্পনার যুক্তিসঙ্গত জীবনায়ন ঘটায়। সোভিয়েত, ট্রেড ইউনিয়ন ও কমসমোলের উপর পার্টি নেতৃত্বের মধ্যে তাদের উপর হুকুমজারি ও প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগের, তুচ্ছ অভিভাবকত্ব ফলানোর কোন ব্যাপার নেই; বরং বিপরীত: তা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সংগঠনগুলির ভূমিকা ও দায়িত্ব এবং তাদের

উদ্যোগের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ পূর্বনির্ধারণ করে। কমিউনিস্টদের উপর ভরসা ক'রে এবং সোভিয়েত জনগণের স্বীকৃত অধিনায়ক হিশেবে তার মর্যাদার ভিত্তিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি রাজনৈতিক ভাবাদর্শের সাহায্যে তার সিদ্ধান্ত পরিচালনা করে।

শাসক পার্টিরূপে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার অঙ্গপ্রজাতন্ত্রসমূহের সরকার গঠন করে, সর্বোচ্চ শাসনসংস্থাসমূহের অনুমোদনের জন্য তাদের পেশ করে এবং কর্মিদলের শিক্ষা ও সংস্থাপনক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কাজ পরিচালনা করে। দায়িত্বপূর্ণ কর্মে কর্মীদের সুপারিশ করার সময় পার্টি সংগঠনসমূহ মেহনতী কর্মিদল, ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের মতামতের মূল্য দেয়। এক্ষেত্রে মানুষের কর্ম ও রাজনীতিসংক্রান্ত গুণাবলী, তার বিশেষ জ্ঞান, সাংগঠনিক ক্ষমতা এবং উচ্চ নীতিবোধের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়।

রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সংস্থার কার্যকলাপ এবং সমাজতান্ত্রিক বৈধতার উপর সাধারণ নিয়মনও পার্টির সংগঠনমূলক কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। পার্টির এই সব কার্যক্রম সম্পাদনে সহায়ক গণনিয়ামক সংস্থাগুলি রাষ্ট্রীয় কার্যপরিচালনায় জনসাধারণকে আকর্ষণের সহায়তা করে থাকে। তারা সোভিয়েত আইনের লঙ্ঘনসংক্রান্ত ঘটনার পরীক্ষা ও তার বিচার করা ছাড়াও অপব্যবহার নিবারণের চেষ্টা করে, জনসাধারণকে শিক্ষা দেয়।

গণনিয়ামক বাহিনীর যোদ্ধাবর্গ অসংখ্য। সাধারণ মেহনতী মানুষ, শ্রমিক ও গ্রামের সংবাদদাতা এবং 'কমসমোল সার্চ লাইটে'র তরুণ অংশগ্রহণকারীরা — এক কথায় যারা দোষ-ত্রুটির সঙ্গে আপসে নারাজ এবং যারা সোভিয়েত রাষ্ট্রযন্ত্রের সকল শাখার যথাযথ কাজে

শ্রমের উচ্চ ফলাফল অর্জনকে নিজেদের কর্তব্য বলে মনে করে — তারাই এর অন্তর্ভুক্ত।

পার্টির রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কার্যকলাপের সঙ্গে তার **মতাদর্শগত কাজ** — মার্কসীয়-লেনিনীয় বিশ্ববীক্ষার প্রচার, পার্টির রাজনীতি ব্যাখ্যা ও তা বাস্তবে পরিণত করার উদ্দেশ্যে জনসাধারণকে একত্রিত করা, মানুষের চৈতন্যগত বুর্জোয়া মতাদর্শ ও অতীতের জেরের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম এবং শিক্ষাদান, সংস্কৃতির সামগ্রিক উন্নয়ন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প এবং সকল ধরনের বৃত্তিগত ও ব্যাপক সৃজনী শিল্পের প্রতি যত্ন — অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। মতাদর্শগত কাজে সিদ্ধির প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় অর্থনৈতিক সাফল্যে — উৎপাদনসংক্রান্ত সমস্যার সমাধান, শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং শ্রমশৃঙ্খলা সুদৃঢ়করণে।

পার্টির কি রাজনৈতিক, কি সাংগঠনিক, কি মতাদর্শসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ — সবের মধ্যে আছে **বৈজ্ঞানিক চরিত্র** এবং সব কয়টিরই ভিত্তি —সমাজে সংঘটিত বাস্তব প্রক্রিয়া ও সামাজিক বিকাশের নিয়মানুগতা সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন। উক্ত নিয়ম থেকে যে-কোন রকম বিচ্যুতি, অধ্যাত্মবাদ এবং গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানে খামখেয়ালিপনা মারাত্মক ভুল ও লোকসানের দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে, কাজের বড় রকম ক্ষতি ঘটাতে পারে।

বহু বছরের নেতৃত্বের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি কার্যকলাপের বিচিত্রতম রূপ ও পদ্ধতির এক পরিপূর্ণ ভাণ্ডার গড়ে তুলেছে। তা ছাড়া, জীবনের অভিজ্ঞতা ক্রমাগত নূতন নূতন সমস্যা নিয়ে আসে। এই কারণে পার্টির দিক থেকে তার সমাজপরিচালনার রূপ ও

পদ্ধতি ক্রমাগত বিকশিত ও সমৃদ্ধ হতে থাকে: রাজনীতির কাজ সম্পাদনে জনসাধারণকে আকর্ষণ করার রূপ উৎকর্ষ লাভ করে, কর্মী বাছাইয়ের ব্যাপারে নূতন দাবি দেখা দেয়, কার্যসম্পাদনব্যবস্থা যাচাইয়ের অপেক্ষাকৃত কার্যকরী পদ্ধতির অনুসন্ধান চলে এবং মতাদর্শগত কার্যকলাপের রূপ জটিলতা প্রাপ্ত হয়।

এই সমস্ত কাজ সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচির — পার্টির উদ্দেশ্যপ্রকাশক মূল দলিলের দাবি অনুযায়ী।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচির তাৎপর্য

ভ. ই. লেনিন পার্টি কর্মসূচির উপর বিশেষ তাৎপর্য আরোপ করেন। তাঁর কথায়: ‘কর্মসূচি ছাড়া ঘটনার সকল রকম এবং প্রতিটি পরিবর্তনের সময় সর্বদা পন্থা বজায় রাখতে সমর্থ বিন্দুমাত্র একক রাজনৈতিক অবয়ব হিশেবে পার্টি থাকা অসম্ভব।’ কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচি মার্কসীয়-লেনিনীয় তত্ত্বের বনিয়াদের উপর দাঁড়িয়ে আছে, তা সৃজনশীলভাবে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ও শ্রমিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা সাধারণীকরণ করে থাকে। পার্টি ইতিমধ্যে কী অর্জন করেছে, তার সংগ্রাম কিসের জন্য এবং তার সমূহ কর্তব্য কী — এসব কথা কর্মসূচি স্পষ্ট ও যথাযথরূপে ঘোষণা করে।

পার্টির প্রথম কর্মসূচি গৃহীত হয়েছিল ১৯০৩ সনে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে। এটি প্রস্তুত করেন ভ. ই. লেনিন। পার্টি ও শ্রমিক শ্রেণীর

সামনে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের জন্য সংগ্রামের যে কর্তব্য কর্মসূচি উত্থাপন করে অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয় ও সোভিয়েত শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে তা সাধিত হয়।

পার্টির দ্বিতীয় কর্মসূচি গৃহীত হয় ১৯১৯ সনে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) অষ্টম কংগ্রেসে। এটিও প্রস্তুত হয় ভ. ই. লেনিনের নেতৃত্বে। এই কর্মসূচি হল শাসনক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত ও দুনিয়ার প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিচালক পার্টির কর্মসূচি। এতে মূল উদ্দেশ্য হিশেবে এমন এক সমস্যা সমাধানের কথা উত্থাপিত হয় যা নিয়ে ইতিপূর্বে আর কোন সমাজ, কোন রাজনৈতিক পার্টি নামে নি — তা হল সমাজতন্ত্র গঠন। প্রথম কর্মসূচির মতো এটিও পার্টি এবং সোভিয়েত জনগণকর্তৃক সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদিত হয়।

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সোভিয়েত জনগণ সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে, ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে পিতৃভূমির মহাযুদ্ধে বিজয়ের গৌরব লাভ করেছে। স্বল্প সময়ের মধ্যে যুদ্ধের ক্ষত নিরাময় করে পার্টি সমাজতন্ত্র গঠনের কাজ সম্পন্ন করার জন্য অগ্রসর হল।

পার্টি নূতন নূতন পরিস্থিতিতে সঠিক রাজনৈতিক পন্থা উদ্ভাবনে, সাফল্যের সঙ্গে দেশের জীবনযাত্রা পরিচালনায়, উদ্ভূত বাধাবিঘ্ন অপসারণে এবং ভুল-ত্রুটি সংশোধনে তার ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। এক্ষেত্রে ১৯৫৬ সনের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বিংশ কংগ্রেস উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। পার্টি লেনিনবাদী পন্থায় সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে স্তালিনের ব্যক্তিপূজাকে সমালোচনা করেছে, কেননা একক মানুষের ভূমিকা অতি বড় করে দেখানো মার্কসবাদ-লেনিনবাদবিরোধী, তা যৌথনেতৃত্ব থেকে বিচ্যুতি, অমূলক দমননীতি ও সমাজতান্ত্রিক

নিয়মানুগতার অন্যান্য ব্যতিক্রম হয়ে দেখা দিয়েছে। ব্যক্তিপূজা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রকৃতিতে, তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভিত্তিতে পরিবর্তন ঘটায় নি এবং ঘটাতে পারে নি। লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী জনসাধারণ সোভিয়েত সমাজ বিকাশের মুখ্য চালিকাশক্তিরূপে থেকে গিয়েছিল। পার্টি সজীব ও কার্যক্ষম ব্যবস্থা হিশেবে চলছিল, স্থানীয় পার্টি সংগঠনগুলি বিরাট কাজ চালায়।

পার্টি ও জনগণের কার্যকলাপের ফলে যুদ্ধোত্তর বছরগুলিতে সোভিয়েত ইউনিয়নে উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে উঠেছে। আমাদের বিকাশের নূতন ঐতিহাসিক পর্যায় শুরু হয়েছে, আর এর জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় কর্মসূচি গ্রহণের প্রয়োজন হল। সেই কর্মসূচি গৃহীত হল ১৯৬১ সনে, অক্টোবর মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২২তম কংগ্রেসে।

মুখ্য দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য হিশেবে উক্ত কর্মসূচিতে কমিউনিজমের বৈষয়িক-টেকনিক্যাল ভিত্তি নির্মাণের কথা বলা হয়েছে।

১৯৬৪ সনে, অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন এবং পার্টির ২৩তম ও ২৪তম কংগ্রেস পার্টির রাজনৈতিক পন্থা বিকাশের ক্ষেত্রে মূলনীতিগত তাৎপর্য বহনকারী।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৫তম কংগ্রেস (১৯৭৬ সনের ২৪শে ফেব্রুয়ারি —৫ই মার্চ) ১৯৭৬—১৯৮০ সনের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের প্রধান প্রধান দিক-নির্দেশ গৃহীত হয়। কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহে এবং দলিলপত্রাদিতে সোভিয়েত দেশে যে উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে উঠেছে তার অর্থনীতি ও সংস্কৃতি, সামাজিক সম্পর্ক ও রাজনৈতিক

ব্যবস্থার বিশদ চরিত্র বর্ণন এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ নিজেদের মধ্যে আলোচনাক্রমে যে বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করেছে, তার সাফল্যের মূল্যায়ন দেখতে পাওয়া যায়। কংগ্রেস শান্তি ও আন্তর্জাতিক সহায়তা এবং জাতিসমূহের মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য ভবিষ্যৎ সংগ্রামের কর্মসূচি প্রস্তুত করেছে।

৪৯ ॥ কমিউনিস্ট পার্টি জীবনের মূল নিয়ম

সমাজ পরিচালনার যে জটিল ও বহুবিধ কর্তব্য পার্টির সামনে দেখা দেয় তা সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদন করতে গেলে পার্টিকে আদর্শ গণতান্ত্রিক ও সুশৃঙ্খল সংগঠন হতে হবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক ব্যবস্থার মূলনীতি ভ. ই. লেনিন কর্তৃক উদ্ভাবিত এবং পার্টির সংবিধানে নিবদ্ধ।

এটা সম্পূর্ণ বোঝা যায় যে প্রতিটি নূতন ঐতিহাসিক পর্যায়ে পার্টির সামনে উদ্ভূত সমস্যা এবং কার্যকলাপের বাস্তব পরিস্থিতি সাংগঠনিক ব্যবস্থার নিরন্তর উৎকর্ষ দাবি করে। পার্টি যখন মুষ্টিমেয় পেশাদার বিপ্লবীদের সংগঠন ছিল এবং যখন তাকে গোপনে কাজ করতে হত তখন ব্যাপারটা এক রকম। কিন্তু যখন তা শাসনক্ষমতার অধিকারী হয়ে ব্যাপক আকার ধারণ করল, জনগণকে সমাজতন্ত্র গঠনের কাজে উদ্বুদ্ধ করল — তখন আর এক রকম। এবং অবশেষে তৃতীয়, — যখন ১ কোটি ৫৭ লক্ষের

পার্টি আমাদের কালে কমিউনিজম গঠনের কাজে নেতৃত্ব দেয়।

পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং নূতন ঐতিহাসিক কর্তব্যের কারণে পার্টি স্বীয় কার্যকলাপের রূপ ও পদ্ধতিগত যে নবায়ন ঘটিয়েছে তার পরিচয় মিলবে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২২তম কংগ্রেসে গৃহীত সংবিধানে এবং ২৩তম ও ২৪তম কংগ্রেসে অনুমোদিত সংযোজনায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির গঠন

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয় **উৎপাদনকেন্দ্র ও অঞ্চলগত নীতিতে।** পার্টির মূল সেল (অতীতে তার নামই ছিল পার্টি সেল) গঠন করে **প্রাথমিক পার্টি সংগঠন,** যা অন্ততপক্ষে তিনজন পার্টি সদস্য, অর্থাৎ কমিউনিস্ট কর্মিদলের অস্তিত্ব যেখানে আছে সেখানেই গড়ে ওঠে।

কমিউনিস্টরা তাদের কর্মস্থল অনুযায়ী কলকারখানা ও নির্মাণস্থল, রাষ্ট্রীয় খামার ও যৌথখামার, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ইনস্টিটিউট, সোভিয়েত সেনাবাহিনীর ইউনিটসমূহ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সংলগ্ন প্রাথমিক পার্টি সংগঠনের মধ্যে যুক্ত হয়। একমাত্র বিভিন্ন কারণবশত সামাজিক উৎপাদনক্ষেত্রে কর্মরত নয় এমন কমিউনিস্টরা (পেন্সনভোগী ও কেবল গৃহকর্মে নিযুক্ত নারী) তাদের বাসস্থান এলাকাভুক্ত পার্টি সংগঠনের মধ্যে যুক্ত হতে পারে। এইভাবে পার্টি গঠনে **উৎপাদননীতি** অনুসৃত হয়।

বৃহৎ প্রাথমিক পার্টি সংগঠনের অভ্যন্তরে কর্মশালা, শাখা, খামার, কর্মিবাহিনী ও বিভাগ অনুযায়ী পার্টি সংগঠন থাকতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টিতে প্রাথমিক সংগঠনের সংখ্যা ৩ লক্ষ ৯০ হাজারের উপর। এরাই পার্টির বনিয়াদ গঠন করে। বলতে গেলে এমন একটিও উল্লেখযোগ্য কর্মিদল ও শাখা নেই যেখানে পার্টি সংগঠন দেখতে পাওয়া যায় না।

প্রাথমিক সংগঠনের সর্বোচ্চ সংস্থা — পার্টি সভা। এখানে পার্টি রাজনীতি, নিজেদের সংগঠন ও সমগ্র কর্মিদলের জীবনসম্পর্কিত নানা প্রশ্ন আলোচিত হয়, কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য গ্রহণ ও পার্টি থেকে বহিষ্কারসংক্রান্ত প্রশ্ন সমাধিত হয়। প্রকাশ্য পার্টি সভায় পার্টিবহির্ভূত ব্যক্তিদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়। চলতি কাজ নির্বাহের উদ্দেশ্যে কমিউনিস্টরা প্রতি বছর নির্বাচনী সভা করে **ব্যুরো** অথবা **কমিটি** নির্বাচন করে; তার নেতৃত্বে থাকেন **সম্পাদক**। চলতি পর্যায়ের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদক এককভাবে সমাধান না করে পার্টি ব্যুরোর অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে একত্রে, অর্থাৎ **যৌথভাবে** সমাধান করেন। প্রাথমিক সংগঠনের কার্যকলাপে মূল বিষয়টি কী?

জনসাধারণের সঙ্গে কাজ, তাদের রাজনৈতিক ও নৈতিক শিক্ষাদান। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কার্যপরিচালনায় এবং শ্রম ও জীবনযাত্রা সংগঠনে তাদের দক্ষতাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সাহায্যপ্রদান। এ ক্ষেত্রে কমিউনিস্টের **ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত** মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

মহকুমা, শহর, নির্বাচনী এলাকা, জেলা, প্রদেশ ও অঙ্গপ্রজাতন্ত্রের সীমানার মধ্যে অবস্থিত প্রাথমিক পার্টি সংগঠনগুলি পার্টির মহকুমা, শহর, নির্বাচনী এলাকা,

জেলা, প্রাদেশিক ও অঙ্গপ্রজাতন্ত্র সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির গঠনে **আঞ্চলিক** নীতির তাৎপর্য এখানেই।

উৎপাদনকেন্দ্র ও অঞ্চলগত নীতি পার্টিকে কী দেয়? সংক্ষেপে বলতে গেলে তা কমিউনিস্টদের প্রতিটি কর্মিদলের নিজস্ব কার্যধারা রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মিলিত ইচ্ছা ও কাজের জন্য সাধারণ প্রস্তুতিযুক্ত এক বিশাল সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ করে।

সমাজজীবনের মূল প্রশ্ন সমাধিত হয় উৎপাদনের উপর। এখানেই আসে কমিউনিস্ট নির্মাণসংক্রান্ত পরিকল্পনার সমাধান, শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং জনগণের স্বাচ্ছন্দ্য ও সংস্কৃতির মান উন্নয়নের জন্য সংগ্রাম। আর এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে কলকারখানায় অথবা প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত কমিউনিস্টরা কার্যপ্রবাহের উপর সরাসরি প্রভাব বিস্তারে, জনগণের আরও গভীরে প্রবেশে সক্ষম।

অপরপক্ষে পার্টি সংগঠনগুলির মহকুমা ও শহরভিত্তিক ঐক্যের ফলে রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্রের সকল অঙ্গ এবং অর্থনীতি ও সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখার উপর পার্টি নেতৃত্বের এক সমাহারব্যবস্থা গড়ে ওঠা সম্ভব হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির উচ্চ সংস্থাসমূহ

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সর্বোচ্চ সংস্থা — তার কংগ্রেস। প্রতিটি পার্টি কংগ্রেস পার্টি ও জনগণের জীবনে এক একটি গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ।

কংগ্রেস তার অব্যবহিত পূর্ববর্তী কংগ্রেসের সময় থেকে তার সমাপ্তিপর্বের মধ্যে যা কিছু করা হয়েছে তার হিসাবনিকাশ করে এবং ভবিষ্যতের জন্য নূতন কর্তব্য নির্ধারণ করে। কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটি, কেন্দ্রীয় কণ্ট্রোল কমিশন ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় সংস্থার বিবরণী শোনা হয় ও অনুমোদিত হয়, প্রয়োজনমতো পার্টির কর্মসূচি ও সংবিধান অনুমোদিত, শোধিত ও পরিবর্তিত হয়; অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক রাজনীতিসংক্রান্ত প্রশ্নে পার্টির পন্থা নির্ধারিত হয়, কমিউনিস্ট গঠনকর্মবিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহের বিচার-বিবেচনা ও মীমাংসা হয়ে থাকে; কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় কণ্ট্রোল কমিশন নির্বাচিত হয়।

কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন প্রতি পাঁচ বছরে অন্তত একবার আহূত হয়। কংগ্রেস আহ্বান এবং তার বিচার-বিবেচনাধীন বিষয় সম্পর্কে কমিউনিস্টদের এবং পার্টি সংগঠনগুলিকে অন্তত দেড় মাস আগে জানিয়ে দেওয়া হয়। এতে পার্টির পক্ষে তার সর্বোচ্চ সভা আহ্বানের জন্য আরও ভালো করে প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব। কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনের আগে কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সমাধান অত্যাবশ্যক হয়ে পড়লে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সংবিধানে সাধারণ অধিবেশনবহির্ভূত জরুরী কংগ্রেস আহ্বানের সংস্থান আছে।

কংগ্রেসের অন্তর্বর্তীকালে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টির সকল কার্যকলাপ পরিচালনা করে। পরিস্থিতির ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় কমিটি সারা ইউনিয়ন পার্টি সম্মেলন আহ্বান করতে পারে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তার প্রকৃতির দিক থেকে কমিউনিস্ট পার্টির হৃৎপিণ্ড ও

মস্তিষ্ক। কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টি ও রাষ্ট্রের রাজনীতি নির্ণয় করে, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির বিকাশ নির্ধারণ করে, জনসাধারণকে কমিউনিজমের মানসিকতায় দীক্ষাদানে, দেশের আন্তর্জাতিক অবস্থান সুদৃঢ়ীকরণে এবং ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিসমূহ ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে সহযোগিতা ও সম্পর্ক গড়ে তোলার যত্ন নেয়। **সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি — পার্টি ও সোভিয়েত জনগণের যৌথ পরিচালক এবং কমিউনিজম গঠনের ভাবগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক নেতৃত্বের সদর দপ্তর।**

কেন্দ্রীয় কমিটিতে পার্টি সেই সব অপেক্ষাকৃত অভিজ্ঞ কমিউনিস্টদের নির্বাচন করে, যাঁদের পার্টি ও অর্থনৈতিক গঠনকর্মে, শিল্প, কৃষি, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, যুদ্ধবিষয় ও বৈদেশিক রাজনীতিতে গভীর জ্ঞান আছে।

পার্টি ও কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত সকল পার্টি সংগঠন ও প্রতিটি কমিউনিস্টের পক্ষে বাধ্যতামূলক।

কেন্দ্রীয় কমিটি পূর্ণাঙ্গ বৈঠকে (পূর্ণ অধিবেশনে) প্রতি ছয় মাসে অন্তত একবার মিলিত হয়। পূর্ণ অধিবেশনের অন্তর্বর্তীকালে পার্টির সমস্ত কাজ পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো নির্বাচন করে এবং চলতি কাজ, — প্রধানত কর্মী বাছাই ও কার্যনির্বাহের তত্ত্বাবধান সংগঠনের উদ্দেশ্যে সম্পাদকমণ্ডলী নির্বাচন করে। কেন্দ্রীয় কমিটি সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন করে।

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা

পার্টির গঠন ও তার জীবনের ভিত্তি — গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি।

এর অর্থ — প্রথমত, **উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে পার্টির সকল পরিচালনসংস্থার নির্বাচনশীলতা।**

পার্টিতে কর্ম পরিচালনা করে স্বয়ং কমিউনিস্টরা — সরাসরি অথবা নিজেদের ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে। কমিউনিস্টরা সর্বতোভাবে সমান অধিকারপ্রাপ্ত। পদাধিকারী ব্যক্তি, মুখ্য সহকর্মিবৃন্দ ও পার্টির সকল প্রতিষ্ঠান — নির্বাচনভিত্তিক, কাজের কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য ও বদলযোগ্য। প্রাথমিক পার্টি সংগঠন ব্যুরো থেকে কেন্দ্রীয় কমিটি পর্যন্ত — পার্টির সমস্ত সংস্থার নির্বাচনকালে তাদের গঠনপ্রণালীর নিয়মিত নবীকরণ এবং নেতৃত্বের ধারাবাহিকতার নীতি অনুসৃত হয়।

সাধারণ সভা (প্রাথমিক পার্টি সংগঠনের জন্য), সম্মেলন (মহকুমা, শহর, নির্বাচনী এলাকা, জেলা ও প্রাদেশিক সংগঠনগুলির জন্য) ও কংগ্রেস (অঙ্গপ্রজাতন্ত্রগুলির ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির জন্য) — পার্টি সংগঠনের সর্বোচ্চ পরিচালনসংস্থা। সভা, সম্মেলন অথবা কংগ্রেসে নির্বাচিত ব্যুরো ও কমিটি তাদের কার্যনির্বাহী সংস্থা হিশেবে কাজ করে এবং সংগঠনসমূহের চলতি কাজ পরিচালনা করে।

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার আরও অর্থ হল **নিজ নিজ পার্টি সংগঠন ও উচ্চ পর্যায়ের সংস্থাগুলির কালে কাজের ধারাবাহিক হিসাব দাখিল করা।** পার্টি সংস্থাগুলির নির্বাচনীভিত্তি, কৈফিয়ৎদানের বাধ্যবাধকতা ও বদলযোগ্যতার

কারণে যেমন মুখ্য সহকর্মিবৃন্দ গঠনে, তেমনি পার্টির জীবন ও বাস্তব কার্যকলাপসংক্রান্ত সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিচারে ও সমাধানে কমিউনিস্টদের সক্রিয় অংশগ্রহণ সম্ভব হয়ে ওঠে।

পার্টির জীবনসংক্রান্ত সকল প্রশ্ন সমাধান করে কমিউনিস্টরা কার্যকর ও মূলনীতিগত সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার সূচনা করে। ফলে তাদের পক্ষে জাড্য ও বাঁধা গতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সমস্ত রকম পশ্চাৎপদতা ও আমলাতান্ত্রিকতা দূরীকরণ, নূতনত্ব ও অগ্রণীব্যবস্থার দৃঢ়প্রতিষ্ঠা এবং পার্টিগত, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সংগঠনসংক্রান্ত কার্যকলাপের উৎকর্ষসাধন সম্ভবপর হয়।

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার অর্থ **কঠোর পার্টি শৃঙ্খলা ও সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে সংখ্যালঘিষ্ঠের বশ্যতাস্বীকার এবং নিম্নসংস্থাকর্তৃক উচ্চ পর্যায়ের সংস্থার সিদ্ধান্ত মেনে চলার বাধ্যবাধকতাও** বটে।

সংগঠনবদ্ধতা পার্টির শক্তি দশগুণ বৃদ্ধি করে, জটিলতম সমস্যার সমাধানে সাহায্য করে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ব্যতিরেকে, সমস্ত রাজনৈতিক প্রশ্নের স্বাধীন ও কার্যকর বিচার ব্যতিরেকে পার্টির অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র অর্থহীন। এটা স্বাভাবিক এবং প্রয়োজনীয় ব্যাপার বটে। কমিউনিস্টদের তত্ত্বগত প্রস্তুতি বিভিন্ন ধরনের, তাদের রাজনৈতিক ও জীবনসংক্রান্ত অভিজ্ঞতা এক রকম নয়। তাদের প্রত্যেকের প্রশ্ন সমাধানের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি আছে। স্বাধীন মতবিনিময়ের ফলে অপেক্ষাকৃত ভালো সিদ্ধান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। এ ধরনের সমাধান যখন পাওয়া গেল, তখনই কাজে ঐক্যবদ্ধতা ও কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। পার্টি শৃঙ্খলা কঠোরভাবে পালন করার মধ্যে কমিউনিস্টের

চিন্তার দৃঢ়তা ও পরিণত রাজনীতিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

পার্টি শৃঙ্খলা যে ভঙ্গ করে, যে উপদলীয় মনোভাবের আশ্রয় নেয়, পার্টিতে তার স্থান নেই। ঠিক এই কারণেই ত্রৎস্কিপন্থী ও অন্যান্য সুবিধাবাদী দল সেখান থেকে বিতাড়িত হয়েছে।

পার্টির বিশুদ্ধি রক্ষা এবং যাতে প্রতিটি কমিউনিস্ট **সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য খেতাবের উচ্চ মর্যাদা যোগ্যতার সঙ্গে বহন করতে ও অক্ষুণ্ণ রাখতে** পারে তার জন্য সচেষ্ট হওয়া — কমিউনিস্ট পার্টির ও তার সকল সংগঠনের জীবনের নিয়ম।

কমিউনিস্ট — উচ্চ মর্যাদার খেতাব

কমিউনিস্ট পার্টিতে মানুষকে আকর্ষণ করে ভাবগত প্রেরণা, যে কাজের জন্য পার্টি সংগ্রাম করছে তার ন্যায়পরতা সম্পর্কে বোধ এবং নিঃস্বার্থভাবে কমিউনিস্ট আদর্শকে সেবার আকাঙ্ক্ষা। **কমিউনিস্ট খেতাবের উচ্চ মর্যাদা বহনের** যোগ্যতা কার আছে?

সোভিয়েত ইউনিয়নের যে-কোন নাগরিক কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হতে পারে। এর জন্য তাকে সর্বপ্রথম **সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচি ও সংবিধান মেনে নিতে** হবে। এটা এমন গুরুত্বপূর্ণ কেন? কারণ এই যে কমিউনিস্ট পার্টি — একমতাবলম্বীদের পার্টি, আর কর্মসূচি ও সংবিধানও যে সাধারণ ভাবগত ভিত্তিতে কমিউনিস্টরা ঐক্যবদ্ধ হয়, ঠিক তারই প্রকাশক।

তবে এটাই সব নয়। মুখ্য পার্টি নির্দেশসমূহ মেনে নিলেই কমিউনিস্ট হওয়া যায় না। কমিউনিস্ট সে-ই, যে পার্টির কর্মসূচি ও সংবিধানে নিবদ্ধ দাবিসমূহ ও পার্টির রাজনীতি রূপায়ণের জন্য **সংগ্রাম করে।** কমিউনিস্টের কাছে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সংবিধানের দাবি হল কোন একটি পার্টি সংগঠনের কাজে যুক্ত থাকা, পার্টির সিদ্ধান্ত পালন ও সদস্য চাঁদা প্রদান।

কমিউনিস্ট যেখানেই কাজ করুক না কেন পার্টির কর্তব্যপালনে তাকে হতে হবে আদর্শস্থানীয়, জনসাধারণকে নিঃস্বার্থ শ্রমের প্রতি আকর্ষণে এবং দেশ ও জনগণের স্বার্থ সম্পর্কে তাদের আগ্রহী করে তোলার ব্যাপারে তাকে হতে হবে দৃষ্টান্তস্বরূপ। ভ. ই. লেনিনের কথায়: 'শ্রমশৃঙ্খলা ও উৎসাহের ক্ষেত্রে পার্টি সদস্যদের চলতে হবে সবার আগে আগে।' যা আমাদের অগ্রগতিকে ব্যাহত করে, যা কমিউনিজমের আদর্শবিরোধী — কমিউনিস্টের চেতনা ও বিবেক তার সঙ্গে আপস করতে পারে না।

পার্টি সদস্যপদে গ্রহণ করা হয় কেবল ব্যক্তিভিত্তিতে। পার্টিতে ভর্তি হতে গেলে ব্যক্তিগতভাবে আবেদন করতে হয়; ঐ আবেদন প্রাথমিক সংগঠনের সাধারণ সভায় আলোচিত হয়। ব্যক্তিভিত্তিতে পার্টিতে গ্রহণের ফলে আবেদনকারীর ব্যক্তিগত গুণাবলীর সঙ্গে বিশদ পরিচয় এবং তার ভালো-মন্দ সকল দিক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানা ও খুঁটিয়ে দেখা সম্ভব হয়।

যে-সব প্রার্থী-সদস্যের প্রার্থী হিশেবে নির্দিষ্ট এক বছরের মেয়াদ অতিক্রান্ত হয়েছে তাদের মধ্যে থেকে নূতন সদস্য গৃহীত হয়। পার্টিতে গ্রহণ করার বিষয়ে প্রাথমিক পার্টি সংগঠনের সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য বলে গণ্য হয় সভায় উপস্থিত

অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ পার্টিসদস্য তার পক্ষে ভোট দিলে।

১৮ বছর বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি পার্টিতে ভর্তি হতে পারে। ২৩ বছর বয়স পর্যন্ত তরুণ-তরুণীদের কমিউনিস্ট যুবসংঘ (কমসমোল) মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টিতে গ্রহণ করা হয়। পার্টিতে ভর্তি হতে গেলে নিখিল সোভিয়েত লেনিনীয় কমিউনিস্ট যুবসংঘের সদস্যকে অবশ্যই কমসমোলের অঞ্চল কমিটি বা শহর কমিটির সুপারিশ আনতে হয়। পার্টিতে প্রবেশের সুপারিশ তিনিই করতে পারেন যাঁর পার্টি কর্মকাল অন্তত পাঁচ বছর পূর্ণ হয়েছে এবং যিনি মিলিতভাবে উৎপাদনমূলক ও সামাজিক কাজের মধ্য দিয়ে আবেদনকারীকে অন্তত এক বছর ধরে জানেন।

কমিউনিস্টের অধিকারসমূহ পার্টি জীবনে তার সক্রিয় অংশগ্রহণ সম্ভব করে তোলে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যের পার্টি সংস্থাসমূহে নির্বাচন করার এবং নির্বাচিত হওয়ার অধিকার আছে। পার্টির রাজনীতি ও বাস্তব কার্যকলাপসংক্রান্ত প্রশ্নে পার্টির সভা ও পার্টি পত্র-পত্রিকায় স্বচ্ছন্দ ও কার্যকর আলোচনায় অংশগ্রহণের অধিকার তার আছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদাধিকার নির্বিশেষে যে-কোন কমিউনিস্টের সমালোচনা করতে পারে এবং যে-সব সভা অথবা বৈঠকে তার কার্যকলাপ অথবা আচরণের সমালোচনা হয় সেখানে ব্যক্তিগত অংশগ্রহণের দাবি জানাতে পারে। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি পর্যন্ত পার্টির যে-কোন সংস্থার কাছে প্রশ্ন ও আবেদন জানাতে পারে। কমিউনিস্টদের সক্রিয়তা — সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির শক্তি।

৫০ ॥ সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি ও বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি — সোভিয়েত সমাজের মুখ্য ও পরিচালিকাশক্তি। সেই সঙ্গে তা বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের অঙ্গীভূত অংশ ও সমাধিকারসম্পন্ন বাহিনী।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি লেনিন উত্তোলিত প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের পতাকার প্রতি সর্বদা আস্থাবান। কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের সংগঠক ও অধিনায়ক একই কালে তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন, তিনি ছিলেন জাতীয় কমিউনিস্ট পার্টিসমূহ গঠনের এবং বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের রণনীতি উদ্ভাবনের উৎসস্বরূপ।

দুনিয়ায় প্রথম সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করে এবং বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়ার হামলা থেকে তাকে রক্ষা করে সোভিয়েত জনগণ অন্য দেশের সহোদরদের প্রতি তাদের উচ্চ আন্তর্জাতিক কর্তব্য পালন করেছে। সোভিয়েত স্বেচ্ছাসেবকেরা প্রজাতন্ত্র রক্ষার জন্য অস্ত্র-হাতে স্পেনের মাটিতে লড়াই করেছে। হিটলারের জার্মানির বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রধান বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে, ফ্যাশিবাদের উপর বিজয়ে চরম অবদানের সূচনা করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ইউরোপ ও এশিয়ার বহু জাতিকে স্বাধীনতা অর্জনে সাহায্য করে, মানবসভ্যতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে।

বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি তার যে আন্তর্জাতিক কর্তব্য পালন করতে চলেছে তা সর্বোপরি এখানেই নিহিত যে তার নেতৃত্বে সূচিত কমিউনিজম গঠন বিপ্লব ও প্রগতির শক্তিতে প্রেরণা সঞ্চার করছে। সোভিয়েত দেশের সমগ্র ক্ষমতা শান্তির কাজে জাতিসমূহের মুক্তি ও স্বাধীনতা রক্ষার কাজে নিয়োজিত। সোভিয়েত ইউনিয়ন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের শিকার ভিয়েৎনামী জনগণ ও আরব জাতিসমূহকে সর্বতোভাবে সাহায্য দিয়ে আসছে। যারাই ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য এবং যে-কোন রকমের সামাজিক ও জাতীয় নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়াই করছে আমরা সর্বদা তাদের পক্ষে ছিলাম এবং থাকব।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালনা এবং সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম গঠনের ব্যাপারে নিজের সমৃদ্ধ সংগ্রামী অভিজ্ঞতার উদার বিনিময় করে, আর তার দিক থেকে অন্যান্য মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির তত্ত্বগত ও বাস্তব ক্রিয়াকলাপের অভিজ্ঞতার মধ্যে যা কিছু মূল্যবান তা গভীরভাবে অধ্যয়ন করে ও কাজে লাগায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাধারণ পথ নির্মাণে উল্লেখযোগ্য অবদান সূচনা করে এবং জনসাধাণের স্বার্থ, শান্তি, গণতন্ত্র, জাতীয় স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের জন্য ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের উদ্দেশ্যে সকল ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টির প্রয়াসের সঙ্গে নিজের প্রয়াসের সমন্বয় সাধন করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি কমিউনিস্ট আন্দোলনের সংহতি দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে সক্রিয় সংগ্রামে নিযুক্ত।

১৯৬৯ সনের জনুন মাসে মস্কোয় অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিসমূহের আলোচনা-সভা এই পথে এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। সেখানে 'বর্তমান পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের সমস্যাবলী এবং কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিসমূহ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সকল শক্তির ঐক্যবদ্ধ কার্যকলাপ'সংক্রান্ত প্রশ্ন আলোচিত হয়। আলোচনা-সভায় গৃহীত দলিলে এবং ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দের ভাষণে বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি গভীরভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে; সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী নীতির স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে, বিপ্লবী ও প্রগতিশীল শক্তির নূতন নূতন সম্ভাবনা তুলে ধরা হয়েছে; সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ কার্যকলাপের বিস্তৃত কর্মসূচি উত্থাপিত হয়েছে; কমিউনিস্ট আন্দোলনের দৃঢ়তাসাধন ও পরবর্তী বিকাশের জন্য শান্তি ও জাতিসমূহের প্রগতির সকল সমর্থকের কার্যকলাপ ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সংগ্রামের পথ নির্দেশিত হয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি বিকৃতিসাধন ও ইতরীকরণের দক্ষিণপন্থী ও 'বামপন্থী' সংশোধনবাদী ও জাতীয়তাবাদী প্রয়াস থেকে মার্কসীয়-লেনিনীয় মতবাদকে দৃঢ়তার সঙ্গে রক্ষা করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ ও ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির অভিজ্ঞতার সাধারণীকরণ করে তা কমিউনিস্টদের আন্তর্জাতিক মতবাদের — মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সৃজনশীল বিকাশ ঘটায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এবং প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের মূলনীতিতে অটল বিশ্বাসী এবং তা সমগ্র দুনিয়ায় বিপ্লবী

ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের সমর্থন ও বিকাশের জন্য যতদূর সম্ভব কাজ করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি শান্তি সুদৃঢ়ীকরণের জন্য এবং নূতন বিশ্বযুদ্ধের হুমকির বিরুদ্ধে ধারাবাহিক সংগ্রামের মধ্যে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ও শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি, সমগ্র বিশ্বের জনগণের প্রতি তার আন্তর্জাতিক কর্তব্যের অঙ্গীভূত অংশ দেখতে পায়।

উপসংহার

কমিউনিস্ট সমাজ কেমন হবে, আজকের দিনে মানুষ আর তা অনুমান করে না, — তার বিজ্ঞানসম্মত রূপ ধারণায় আনতে পারে। এখনও অবশ্য নিঃশর্তভাবে তার সকল খুঁটিনাটি বিচার করা যায় না। স্বয়ং জীবন এবং কমিউনিস্ট গঠনকর্মের বাস্তব অভিজ্ঞতা বহু প্রশ্নের সমাধান দেখিয়ে দেবে। কিন্তু ভবিষ্যতের প্রধানতম, সবচেয়ে মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি — স্পষ্ট।

কমিউনিজম জগতে শাশ্বত

শান্তি

প্রতিষ্ঠা করে।

বহু দুর্দশাগ্রস্ত ইতিহাসে এই প্রথম মানবজাতি শান্তিতে নিঃশ্বাস ফেলবে। যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক উপকরণ নির্মাণে অযথা

মানবশক্তিব্যয়ের পরিসমাপ্তি ঘটবে। বিশ্বের সকল দেশে যে-সব হাজার হাজার কলকারখানা বর্তমানে মারণাস্ত্র নির্মাণের কাজে ব্যাপৃত আছে সেগুলি মানুষের বিভিন্ন চাহিদা পরিতৃপ্তির সামগ্রী নির্মাণের কাজে রূপান্তরিত হবে। ফাইটার বিমান ও বোমারু বিমানের পরিবর্তে তারা তৈরি করতে থাকবে দ্রুতগতিসম্পন্ন যাত্রীবাহী লাইনার ও শক্তিশালী পরিবহণ বিমান, ক্ষেপণাস্ত্রের পরিবর্তে — মহাকাশ-রকেট, ট্যাঙ্কের পরিবর্তে — ট্র্যাক্টর, কামান ও গোলা-বারুদের পরিবর্তে — রেফ্রিজারেটর ও ভ্যাকুয়াম ক্লিনার জাতীয় কিছু।

আর বিজ্ঞানের সামনে কী নব নব উজ্জ্বল ভবিষ্যতই না খুলে যাবে! নূতন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ও তার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষাব্যবস্থা নির্মাণে ব্যাপৃত বহু সংখ্যক বিজ্ঞানসংস্থা ও বিজ্ঞানীর (দুই-তৃতীয়াংশের অধিক বিজ্ঞানী উক্ত কর্মে নিযুক্ত) প্রচেষ্টা নূতন নূতন ধরনের তাপশক্তি উপাদানের অনুসন্ধানে, মানুষের শ্রম সহজসাধ্য ও তার জীবনযাত্রা সুন্দর করে তোলার উদ্দেশ্যে যন্ত্রপাতির ডিজাইন তৈরিতে এবং রোগের সম্পূর্ণ মূলোচ্ছেদ ও মানুষের আয়ুবৃদ্ধির সংগ্রামে নিযুক্ত হবে।

'যুদ্ধ' শব্দটি থেকে যাবে কেবল রোগ ও বার্ধক্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, খরা ও অজন্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ, প্রাকৃতিক বিপদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মতো মানবিক ধারণার দ্যোতক হয়ে; আর 'শান্তি' হয়ে দাঁড়াবে সমগ্র বিশ্বচরাচরের সমার্থক।

উন্নত শক্তির অধিকারী মানবজাতি মহাবিশ্বের জগৎ জয়ে তার শক্তি নিয়োগ করতে পারবে। এর অর্থ অবশ্যই অন্যান্য গ্রহের অধিবাসীদের বলপূর্বক নিজেদের ইচ্ছাধীন করে রাখা নয় ('অন্তরীক্ষ-প্রতিবেশী'দের সঙ্গে

পৃথিবীবাসীদের সাক্ষাৎকার যে একদিন না একদিন ঘটবে, — সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহই নেই)।

হার্বার্ট ওয়েলসের 'গ্রহে গ্রহে যুদ্ধ' উপন্যাসে দেখা যায় যে পৃথিবীতে পদার্পণকারী মঙ্গলগ্রহবাসীরা আমাদের গ্রহকে অধিকারের উদ্দেশ্যে জীবন ধ্বংসের কাজে নেমেছে, কিন্তু একমাত্র জীবাণুর হস্তক্ষেপে মানুষ বিনাশের হাত থেকে রক্ষা পায়। বহু মার্কিন লেখকের কল্পনাভিত্তিক কাহিনী ও উপন্যাসাদিতে ভবিষ্যৎ মহাজাগতিক সাক্ষাৎকারের প্রায় অনুরূপ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এগুলির একটিতে মানুষ শুক্রগ্রহের অধিবাসীদের পরাধীন করে ফেলে উক্ত গ্রহে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার পত্তন করেছে। অন্য একজনের রচনা অনুযায়ী মহাজাগতিক অঞ্চলে 'প্রভাব ক্ষেত্র' অর্জনের উদ্দেশ্যে নৃশংস লড়াই বেধে গেছে। এই সব লেখক তাঁদের পারিপার্শ্বিক পুঁজিবাদী বাস্তব অবস্থার নিরিখে ভাবনা-চিন্তা করেন।

না, গ্রহে গ্রহে সাক্ষাৎকারের রূপটি সে রকম হবে না। সোভিয়েত কল্পকাহিনী লেখক ইভান ইয়েফ্রেমভ তাঁর একটি উপন্যাসে নিম্নোক্ত ভাব ব্যক্ত করেছেন: একমাত্র উচ্চ বৈজ্ঞানিক ক্ষমতাসম্পন্ন অসাধারণ বুদ্ধিমান প্রাণীর পক্ষেই আন্তর্গ্রহ উড্ডয়নসংগঠন ও নিজেদের প্রতিবেশিদের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব। আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এমন বিকাশ, বুদ্ধির এমন ঊর্ধ্বগামিতা সম্ভব একমাত্র সে সমাজেই, যা ন্যায়সঙ্গত, বিচক্ষণ বনিয়াদের উপর সংগঠিত। পৃথিবী থেকে প্রেরিত দূতেরা (ঠিক সেইভাবে অন্য গ্রহের দূতেরাও) নোংরা ও নৃশংস উদ্দেশ্য অনুসরণ করতে পারে না, বলপ্রয়োগ, ধ্বংস ও মৃত্যুর সূচনা করতে পারে না। তাদের একটিই মাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে: চিন্তাশীল প্রাণীদের ঐক্য

এবং প্রকৃতিকে বশে আনার কাজে, বুদ্ধি ও শ্রমের সমুন্নতিসাধনে সহায়তা।

যা হোক, মহাকাশ থেকে আমরা ফিরে আসব পৃথিবীর প্রসঙ্গে, এখানে এখনও প্রভূত কাজ পড়ে রয়েছে। মায়াকোভ্স্কির কথায় বলতে গেলে আমাদের গ্রহকে 'খুশির সাজে সাজাতে' হবে। আর

শ্রম

সে কর্তব্য পালন করে; কমিউনিজমে শ্রম সামগ্রিক সমাজজীবনের প্রধান বিষয় এবং প্রতিটি মানুষের ব্যক্তি-জীবনের মুখ্য অর্থ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ব্যাপারটিকে সর্বাগ্রে সামাজিক শ্রমের ফলাফলের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা যাক। সমাজের সংগঠিত প্রচেষ্টায় **জীবনের পক্ষে অপরিহার্য সকল সামগ্রীর প্রাচুর্য সৃষ্টিকারী উৎপাদনী শক্তির প্রচণ্ড বিকাশ** অর্জিত হবে। কার্ল মার্কসের কথায়, কমিউনিজমে ঐশ্বর্য পূর্ণধারায় প্রবাহিত হবে। আর উৎপাদনের সঙ্গে বিজ্ঞানের অঙ্গাঙ্গি সংযোগের ফলে ঐশ্বর্যের এই ধারা আরও দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। বিজ্ঞান এখনই হয়ে দাঁড়াচ্ছে উৎপাদনী শক্তি, কিন্তু আজ সে আমাদের যে সম্পদ আনয়ন করছে, তা ভবিষ্যতে সে মানবজাতিকে যা দেবে তার তুলনায় কিছুই নয়। অপেক্ষাকৃত দূর ভবিষ্যতের কথা বাদ দিলেও বিজ্ঞান আজ এমন সব সমস্যা সমাধানের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে, যার ফলে বৈষয়িক মূল্যবান বস্তু উৎপাদনক্ষেত্রে প্রকৃত বিপ্লব সম্পাদন সম্ভব।

এই সব সমস্যার মধ্যে যেটি নিঃসন্দেহে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হল বস্তুত যা তাপশক্তির অফুরন্ত ভাণ্ডার সেই থার্মোনিউক্লিয়াস প্রক্রিয়ার রহস্য আয়ত্তে আনা। উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের বৃদ্ধিতে যে-সব পদ্ধতি প্রভাব বিস্তার করে সেগুলি আয়ত্তে আনার তাৎপর্য যে কতখানি তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। অথবা বলা যেতে পারে আবহাওয়ার উপর নিয়ন্ত্রণের কথা, যার ফলে অজন্মা সমস্যার সমাধান করা যায়। কিংবা কৃত্রিম উপায়ে প্রোটিন এবং এমন আরও সব উপাদান প্রস্তুত করা, যেগুলি প্রকৃতি আমাদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে তৈরি করতে পারে নি।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ এবং কর্মীদের বৈজ্ঞানিক-টেকনিক্যাল ও সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের কল্যাণে **সামাজিক শ্রমের যে অসাধারণ উচ্চ উৎপাদনশীলতা** অর্জিত হবে তা উৎপাদনী শক্তি উন্নয়নের বনিয়াদ রচনা করবে। কমিউনিস্ট উৎপাদনব্যবস্থার কথা বলতে গিয়ে আমরা ধারণা করি কাজের নক্সা তৈরি থেকে শুরু করে উৎপাদনসামগ্রী প্রস্তুত পর্যন্ত সকল কাজে একমাত্র নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা ছাড়া সমস্ত কাজে মানুষের হস্তস্পর্শ ব্যতিরেকে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার সাহায্যে কার্যসম্পাদন।

সমৃদ্ধি ও আনন্দের উৎস — **শ্রম কমিউনিজমে হয়ে দাঁড়াবে সমাজের প্রতিটি সদস্যের জরুরী চাহিদা।**

মানুষ ভালোভাবে, তার কর্মশক্তি নিয়ে মেহনত করতে পারে বিভিন্ন কারণে। হতে পারে এই আশায় যে সে তার নিজের শ্রমের প্রচুর পুরস্কার পাবে। হতে পারে সে সমাজের প্রতি এটা তার কর্তব্য বলে মনে করে। হতে পারে তার কাছে নিজের কাজের আকর্ষণ এই যে তাতে তার সৃজনশীল ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে। আবার এমনও হতে পারে যে শ্রম

তার পক্ষে হয়ে দাঁড়িয়েছে এক অভ্যাসের ব্যাপার, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো এবং অপরের সঙ্গে মেলামেশার মতো স্বাভাবিক ও সাধারণ দাবি। এই সব কটি প্রেরণারই সম্মিলনে পাওয়া যাবে কমিউনিস্ট শ্রম।

এখানে নির্ঘাত আপত্তি উঠবে: 'সবই ত মানলাম, — কেবল শ্রমের ঐ বৈষয়িক প্রেরণাটি ছাড়া; কেননা ভ. ই. লেনিনই ত কমিউনিস্ট শ্রমকে সাধারণের স্বার্থে বিনামূল্যে শ্রমদান আখ্যা দিয়েছেন। তা হলে আবার পুরস্কারের প্রত্যাশার কথা ওঠা কেন?'

অবশ্যই, কোন কমিউনিস্ট ব্যক্তির মাথায় আসবে না স্বেচ্ছামূলক ক্ষিপ্র শ্রমের জন্য অবিলম্বে, সর্বাগ্রে এমন কোন জিনিস দাবি করার কথা, যা এখনও সকলের হাতে পেঁছায় নি।* সে বিনামূল্যে পরিশ্রম করে এবং যে অর্থ একেবারে থাকবে না তা দিয়ে বা অন্য কোন বৈষয়িক মূল্য দিয়ে তার শ্রমের পরিমাপ করা যাবে না। কিন্তু সেই সঙ্গে সামাজিক সম্পদ বৃদ্ধিতে সে আগ্রহশীল। কেবল এক্ষেত্রে তার আগ্রহ স্বার্থচিন্তাযুক্ত নয়, সে শুধু নিজের কথা ভাবে না, — ভাবে সমাজের সকলের কথা। অর্থাৎ, কমিউনিজমে শ্রমের অন্যতম প্রেরণা হবে সামাজিক সম্পদের বৃদ্ধিতে এবং প্রতিটি মানুষের জীবনযাত্রার নিরন্তর উৎকর্ষসাধনে যৌথ বৈষয়িক আগ্রহ।

---

* তুলনা হিশেবে অর্কেস্ট্রা অথবা সমবেত সঙ্গীতের কথা ধরা যাক। দল যদি সত্যিকারের সঙ্গীতপ্রেমী শিল্পীদের নিয়ে গঠিত হয়, তা হলে তাদের কেউ কি দায়সারা গোছের করে বাজনা বাজাবে এবং গান গাইবে এই ভেবে যে চেষ্টার সেখানে বিশেষ কোন পুরস্কার নেই?

কিন্তু আমরা যদি এই বক্তব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকি যে কমিউনিস্ট মানুষের বৈশিষ্ট্য হল শ্রমের আবশ্যকতার, তাতে সব বলা হয় না। শুধুই শ্রমের আবশ্যকতা নয়, — **ক্ষমতা অনুযায়ী শ্রমের আবশ্যকতা।** ঠিক এই কারণেই সামাজিক সম্পদ নিরন্তর বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং সমাজ তার সকল সদস্যের যুক্তিসঙ্গত দাবি সম্পূর্ণ মেটাতে পারবে।

‘প্রত্যেকের কাছ থেকে তার ক্ষমতা অনুযায়ী এবং প্রত্যেককে তার চাহিদা অনুযায়ী’ — কমিউনিজমের এই মূলনীতি রূপায়ণের তাৎপর্য হবে এই যে সমাজে পূর্ণ সামাজিক

সাম্য

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

চাহিদা অনুযায়ী তৃপ্তকরণের নীতি সাম্যধারণার সঙ্গে কতখানি সঙ্গতিপূর্ণ বিচার করে দেখা যাক।

সমাজতন্ত্রে মানুষ তুল্য শ্রমের জন্য একই পুরস্কার পায়, আর এখানেই সমাজতান্ত্রিক বণ্টননীতির ন্যায়পরতা নিহিত। কিন্তু লোকের ক্ষমতা ভিন্ন ভিন্ন রকমের, পরিবারের গঠন এক রকম নয়, আর সেই কারণে তাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্যদের চেয়ে বেশি উপার্জন করে ও ভালোভাবে জীবনধারণ করে। কমিউনিস্ট বণ্টননীতির প্রবর্তনে এই পার্থক্য বিলুপ্ত হয় এবং প্রকৃতি নিজে শ্রম ও সৃজনের ব্যাপারে অসমান ক্ষমতা দিয়ে মানুষে মানুষে যে বিভাগ রচনা করে রেখেছে সে অন্যায়ও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে দূর করা যায়।

প্রচলিত বিধির দৃষ্টিতে যেহেতু কমিউনিস্ট সমাজ শ্রমের পরিমাণ ও গুণ নির্বিশেষে প্রত্যেককে সম্পূর্ণ পরিমাণে পরিতৃপ্ত করে, সেহেতু এটাকে সাম্যের নিয়ম লঙ্ঘন বলতে হয়। কিন্তু প্রচলিত বিধি কমিউনিজমের পক্ষে খাটে না; কমিউনিজম উচ্চ ন্যায়বোধ ও সাম্যের প্রকৃত মানবতাবাদী আদর্শ স্থাপন করে প্রচলিত বিধিকে দূরে সরিয়ে দেয়: প্রতিটি মানুষ সমাজকে যতখানি দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, দিক, আর সমাজ তার যুক্তিসঙ্গত সকল চাহিদা পূরণ করবে।

কমিউনিস্ট সাম্যের অর্থ **শহর ও গ্রামের মধ্যে সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রাসংক্রান্ত পার্থক্যের বিলোপসাধন**ও বটে। কৃষিশ্রম শিল্পশ্রমের প্রকার প্রাপ্ত হবে, আর তার অর্থ এই যে শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে শ্রমের পার্থক্য শিল্পের বিভিন্ন শাখায় শ্রমের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায়, তার চেয়ে বেশি কিছু হবে না; শিল্পের মতো কৃষিতেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে **মানুষের উৎপাদনসংক্রান্ত কার্যকলাপে বুদ্ধিমার্গীয় ও শারীরিক শ্রমের সম্মিলন** ঘটার অনুকূল সম্ভাবনা গড়ে উঠবে।

নারীর সামাজিক অবস্থার ক্ষেত্রে যেটুকু অসাম্য আছে তাও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবে। এখানে সর্বোপরি কথাটা হচ্ছে নারীকে পীড়াদায়ক গৃহকর্ম থেকে (খাবার তৈরি, ধোয়া-কাচা, সেলাই ইত্যাদি) মুক্তিদান এবং, — বিশেষত ক্ষুদ্র শিশুর পরিচর্যাসংক্রান্ত বাধাকে সহজসাধ্য করে তোলা নিয়ে।

পরিশেষে, শারীরিক শক্তিতে নারী পুরুষের থেকে পিছিয়ে থাকার কারণে বর্তমানে নারী-পুরুষে যে অসাম্য

দেখা যায়, কমিউনিজমে তাও মূলত অতিক্রম করা যায়; কেননা উৎপাদনের যন্ত্রীকরণ ও স্বয়ংক্রিয়করণের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই শারীরিক শক্তির প্রাধান্য হ্রাস অনুভূত হতে থাকবে। এমন দিন আর দূরে নয়, যখন পুরুষের মতো নারীও জাতীয় অর্থনীতির যে-কোন শাখায় কাজ করতে পারবে। এক কথায়, যখন পরিশ্রমসংক্রান্ত কাজের কথা উঠবে, তখন কি আর 'দুর্বল' ও 'সবল' অপরার্ধের মতো শাশ্বত শব্দগুলির ব্যবহার স্বচ্ছন্দ ও সঠিক হবে কি না সন্দেহ। জ্ঞানে সজ্জিত এবং কমিউনিজমের বিশাল প্রযুক্তি পরিচালনাকারী অতীতের 'দুর্বল' অপরার্ধ কোন ব্যাপারেই 'সবল'দের কাছে পিছু হটবে না।

উৎপাদনের উপায়ের উপর একক কমিউনিস্ট মালিকানা গঠন এবং শ্রেণীবৈষম্য অপসারণের ফলে **শ্রেণীহীন সমাজ** সৃষ্ট হবে। আর এটাই হল সাম্যের চরম আদর্শ, যার পরে এ সম্পর্কে যে-কোন কথা অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়: মানুষে মানুষে ক্ষমতা ও রুচি বিষয়ে পার্থক্য সর্বদাই থেকে যাবে এবং ন্যায়পরতার অর্থ তাদের সমান করে দেওয়ার চেষ্টা নয়, — এর অর্থ প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে এবং সকলের জন্য একত্রে জীবনযাত্রা ও সৃজনের সবচেয়ে উপযুক্ত পরিস্থিতি গড়ে তোলা। ঠিক এই কারণেই শ্রেণীহীন সমাজগঠন — সাম্যের সম্ভবপর পুনর্বিন্যাস; আর তা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত শব্দটি নিজেই তার বর্তমান অর্থগত গুরুত্ব হারিয়ে ফেলবে।

সাম্যের হাতে হাত মিলিয়ে চলে

মুক্তি

কেননা একমাত্র মুক্ত মানুষই সাম্যের অধিকারী হতে পারে, আর একমাত্র সাম্যের অধিকারীই হতে পারে মুক্তির অধিকারী।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জনসাধারণকে শোষণের হাত থেকে মুক্ত করে। সমাজের পরবর্তী আর সমস্ত বিকাশের লক্ষ্য — এমন পরিস্থিতি গড়ে তোলা, যাতে **প্রতিটি মানুষ স্বাধীনভাবে নিজের সৃজনী দক্ষতার বিকাশ ও প্রয়োগ ঘটাতে পারে।** কমিউনিস্ট মুক্তির আদর্শ এখানেই নিহিত।

প্রতিভার অনন্ত উৎস যে জনগণের মধ্যে — সমাজতান্ত্রিক বাস্তবিকতা লেনিনের এই উক্তির পূর্ণ সমর্থনে। আজ দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যেতে পারে যে এই উৎসের মুখ আজ খুলে গিয়ে আমাদের দেশে অপূর্ব অংকুরের স্ফুরণ ঘটিয়েছে। কিন্তু জনগণের সৃজনী শক্তির প্রকৃত স্ফুরণ এখনও সামনে পড়ে রয়েছে। কমিউনিজমে প্রতিভার উৎস ভরা নদীতে পরিণত হবে, কেননা আমাদের জীবনযাত্রা যত সমৃদ্ধ হয়, জনগণের শিক্ষার মান যত উন্নত হয়, সৃজনের সম্ভাবনা তত বৃদ্ধি পায়, মানুষ তত পরিপূর্ণরূপে বিভিন্ন দিকে তার ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারে।

কমিউনিজমে স্বাধীন সৃজনের অনুকূল পরিবেশ বিশেষ করে মানুষের দাসত্ববন্ধনকারী **পুরনো শ্রমবিভাগ ব্যবস্থা উচ্ছেদের** সঙ্গে সম্পর্কিত। পুঁজিবাদে শ্রমিক সারা জীবন ধরে একই শ্রমক্রিয়ায় বাঁধা, কখনও কখনও তার তৈরী অংশ যে কোথায় কাজে লাগবে তা পর্যন্ত তার জানা থাকে না।

একঘেয়েমি ও বৈচিত্র্যহীনতা, প্রতিদিন একই গতিবিধির পুনরাবৃত্তি মানুষের শক্তি নিংড়ে নেয় ও বুদ্ধি শুষে ফেলে।

সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের পরিস্থিতিতে শ্রমিক তার শ্রমের সামাজিক তাৎপর্য উপলব্ধি করে, সে জানে যে তার তৈরী অংশগুলি এমন সব যন্ত্রপাতির যা যৌথখামারীকে উৎকৃষ্ট ফসল ফলাতে অথবা নির্মাণকর্মীকে নূতন নূতন ঘর-বাড়ি নির্মাণে সাহায্য করবে। এই চেতনা শ্রমে প্রেরণা সঞ্চার করে এবং কী করে আরও ভালোভাবে ও দ্রুত নিজের কর্তব্য পালন করা যায় সে সম্পর্কে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে। তা ছাড়া আমাদের এখানে শ্রমিক একই শ্রমক্রিয়ায় বাঁধা নয়: তার সামনে নিজের সংস্কৃতি ও প্রযুক্তিসংক্রান্ত মান উন্নয়নের পথ খোলা আছে, সে ইচ্ছে করলে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে অন্য জটিলতর উৎপাদনের কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারে।

তবে, পুরনো শ্রমবিভাগের অশুভ পরিণাম চূড়ান্তভাবে অতিক্রম করা সম্ভব হবে কমিউনিজমে, যেখানে বৈচিত্র্যহীন সকল শ্রমপ্রক্রিয়া সম্পাদিত হবে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে, আর মানুষ ব্যাপৃত থাকবে সৃজনকর্মে, যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণের কাজে। এইভাবে, যে-কোন শ্রম সৃজনী চরিত্র অর্জন করবে। বিস্তৃত শিক্ষা ও প্রসারিত সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে মানুষ কেবল তার নিজের মূল পেশার স্বার্থে জীবনধারণ করবে না, — সে তার অন্যান্য ক্ষমতারও বিকাশ ও প্রয়োগ ঘটাবে। অন্য কথায়, কমিউনিজমের মানুষ — **সর্বাঙ্গীণ বিকশিত, মানসিক ঐশ্বর্য, নৈতিক শুদ্ধতা ও শারীরিক উৎকর্ষতার** অধিকারী মানুষ।

জীবনধারণের অত্যন্ত অনুকূল বৈষয়িক ও মানসিক অবস্থার কল্যাণে এবং জীববিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র ও আরও

বহু বিজ্ঞানের সাফল্যবশত মানুষের আয়ুষ্কাল বর্ধিত হবে (বিজ্ঞানীদের কথায় —১৫০ বছর, আর সবচেয়ে আশাবাদী যারা, তাদের মতে — এমন কি ২০০ বছর)।

আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির ফলে মানুষ কেবল ব্যক্তিগতভাবেই লাভবান হবে না, — সামগ্রিকভাবে সমাজও এতে লাভবান হবে। বর্তমানে মানুষ জীবনের ১০—২০ বছর শিক্ষায় ব্যয় করে, মাত্র ২৫—৪০ বছর থাকে শ্রম ও সৃজনকর্মের জন্য। সবচেয়ে পরিপূর্ণ বয়সে, যখন অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জিত হয়, তখন শারীরিক শক্তি হীন হয়ে আসতে থাকে: কত সুন্দর সুন্দর চিন্তা অপরিপূর্ণ থেকে যায়, কত মূল্যবান মেধা থেকেই না আমরা বঞ্চিত হই এ কারণে যে প্রকৃতি মানুষের আয়ুষ্কাল নির্ধারণে বড় কৃপণ! সুতরাং, মানুষ যদি একশ' বছর অটুট শারীরিক শক্তির অধিকারী থাকতে পারে তা হলে সমাজ-প্রগতি যে কী পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

এমন কি ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের ভবিষ্যৎ এক নজরে দেখলেও কমিউনিজমে প্রতিষ্ঠিত মুক্তির মহিমা আমরা বুঝতে শুরু করি। পুঁজিবাদে শ্রমজীবী মানুষ নিঃস্বতা, শোষণ ও অধিকারহীনতা থেকে মুক্তির স্বপ্ন দেখে। সমাজতন্ত্র আমাদের এই মুক্তি দিয়েছে এবং এখন আমরা নিজের হাতে এমন এক সমাজ গড়ছি যেখানে মুক্তির সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটবে — তা মানুষের ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠবে।

কমিউনিস্ট সামাজিক স্বশাসনে প্রত্যেকের অংশগ্রহণও ব্যক্তিত্বের স্বাধীন বিকাশের অন্যতম অবিচ্ছেদ্য উপাদান।

কমিউনিজম শ্রমকে প্রাথমিক জরুরী চাহিদায় পরিণত করে। সামাজিক ক্রিয়াকলাপও ঠিক ঐ রকমই জরুরী চাহিদা হয়ে দাঁড়াবে।

শাসনপরিচালনায় প্রতিটি মানুষের অংশগ্রহণ এবং অতি সচেতন শৃঙ্খলাবোধ সামাজিক কার্যপরিচালনাকারী সকল সংগঠনের কার্যকলাপে সুশৃঙ্খলা, পরিচ্ছন্নতা ও যথাযথতা এনে দেয়। মুক্তির নীতিগত ধারণা এর সঙ্গে সম্পর্কিত। এখনও অবশ্য মাঝে মাঝে এমন লোক দেখতে পাওয়া যায়, যার কাছে মুক্তির অর্থ নির্ধারিত নিয়মশৃঙ্খলা এবং আশেপাশের লোকজনের স্বার্থের কথা না ভেবে নিজের খুশিমতো চলার সুযোগ। কিন্তু প্রত্যেকে যদি তার স্বেচ্ছাচার অনুযায়ী কাজ করে, তা হলে সমাজে নেমে আসে মুক্তি নয়, — নৈরাজ্য।

না, সমাজে মুক্তির অর্থ মোটেই সমাজ থেকে মুক্তি নয়, ব্যক্তিস্বাধীনতার অর্থ মোটেই স্বেচ্ছাচারের স্বাধীনতা নয়। প্রকৃত মুক্তির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হল কর্মিদলের, সমগ্র সমাজের ভাবনা-চিন্তা ও কর্মের সঙ্গে নিজের ভাবনা ও কর্মের সমন্বয়সাধন। মানুষের চৈতন্যে যখন ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বার্থের সমন্বয় ঘটে, তখন মানুষ **মুক্তিকে সমাজের কল্যাণে কাজ করার সুযোগ ছাড়া আর কোন রূপেই উপস্থাপন** করতে পারে না। কমিউনিজমের সচেতন নির্মাণকারীদের মুক্তি সম্পর্কে এই বোধই কমিউনিস্ট সমাজে শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হবে।

যেখানে সাম্য ও মুক্তির আধিপত্য, সেখানে অনিবার্যভাবে সকল মেহনতী মানুষের, সকল জাতির

ভ্রাতৃত্ব

প্রতিষ্ঠিত হবে।

'ভ্রাতৃ' শব্দটি চমৎকার। যখন আমরা ভ্রাতৃসুলভ সম্পর্কের কথা বলি, তখন আমরা এই বিষয়ের উপরই জোর দিই যে এটা কেবল কমরেডসুলভ নয়, নিছক বন্ধুসুলভ নয়, — আরও সুন্দর একটা কিছু এবং মানুষে মানুষে আরও সমুন্নত এক ধরনের সম্পর্ক।

সব কিছুকে কুলুঙ্গিতে ভাগ ভাগ করে কোথায় বন্ধুত্ব ও কোথায় কমরেডসুলভ মনোভাব আর কোথায় বা ভ্রাতৃত্ব তা 'নির্ধারণের' চেষ্টা অবশ্যই অর্থহীন ও অকাজের কাজ হবে। ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। ব্যাপারটা এই যে ভ্রাতৃত্ব বলতে আমরা বুঝি সেই সব প্রকৃত মানবিক, মানষ্যত্বপূর্ণ সম্পর্ক, মানুষের প্রতি মানুষের সেই গভীর আস্থা — যা ছাড়া কমিউনিজম সম্ভব নয়।

উক্ত সম্পর্কসমূহের সবচেয়ে সাধারণ প্রকাশ — যৌথবাদ, মানুষে মানুষে সহযোগিতা ও পারস্পরিক সাহায্য। কেননা যৌথ কাজে মানুষকে সর্বদা একে অপরের উপর নির্ভর করতে হয় এবং তাদের সাধারণ সাফল্য প্রায়ই নির্ভর করে প্রত্যেকের কার্যকলাপের উপর। সুপ্রাচীনকাল থেকে 'এই লোকটির উপর আস্থা রাখা যায়' — কথাগুলি বড় রকমের প্রশংসা হিশেবে সর্বদা চলে এসেছে, যেমন যুদ্ধের সময় 'এই লোকটির সঙ্গে আমি গুপ্তচরের কাজে নামব' — বলার চেয়ে আস্থার দৃঢ়তর অভিব্যক্তি আর কিছু ছিল না।

সামাজিক মালিকানার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা যৌথক্রিয়া কমিউনিজমে উত্তরণের পরিস্থিতিতে নিরন্তর বৃদ্ধি পেতে

থাকবে, নব নব উপাদানে সমৃদ্ধ হবে, অভূতপূর্ব রূপের প্রকাশ ঘটাবে।

কমিউনিজমের দিকে নিঃসঙ্গভাবে যাওয়া যায় না, — তা গঠন করা যায় একমাত্র সম্মিলিত প্রয়াসে, আর যারা আগে আগে চলেছে তাদের প্রথমতম কতর্ব্য হবে যারা কোন কারণে পিছিয়ে রয়েছে, তাদের সাহায্য করা: এই ভাবনাই নিরলসভাবে প্রচার করে চলেছে আমাদের পার্টি এবং সোভিয়েত জনসাধারণও তার প্রতি গভীর সমভাবাপন্ন। পশ্চাৎপদদের সাহায্য করতে গিয়ে সোভিয়েত সমাজের অগ্রণী মানুষ ও গোটা কর্মিদল ঠিক এমনই আচরণ করে।

পার্টির দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত সোভিয়েত জনগণের যৌথ চৈতন্যের উজ্জ্বল প্রকাশ হল বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত দেশের জনসাধারণ এবং স্বাধীন বিকাশের পথে প্রবেশকারী অথবা প্রবেশ-উদ্যত এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার জনগণের সঙ্গে নিজেদের সাফল্য ভাগ করে নেওয়ার মতো আগ্রহ। সোভিয়েত জনগণ সর্বদা এবং সর্বত্র যৌথবাদের মশাল বহন করে নিয়ে চলে, প্রগতি ও জাতিসমূহের মধ্যে মৈত্রী প্রতিষ্ঠার মহৎ উদ্দেশ্যে নিজেদের শক্তি ও জ্ঞান উৎসর্গ করে।

নিজেদের মহতী জন্মভূমির প্রতি নিষ্ঠ দেশপ্রেমিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সর্বদাই আন্তর্জাতিকতাবাদের অনুসারী হয়ে থাকব। আমরা নিজেদের দেশের জনসাধারণ ও জাতিগুলির মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে মৈত্রীর পথ নির্মাণ করে পরম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে জগতের আর সবার সম্পর্কে হাল ছেড়ে দিয়ে বলতে পারি না: যে যেমন খুশি যার যার বন্দোবস্ত করে নিক...

আর যখন সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম সমগ্র বিশ্বে চূড়ান্ত

বিজয় লাভ করবে, তখন সকল জাতির মধুরতম স্বপ্ন ও আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে পরিণত হবে।

এখন আর আমরা মানবেতিহাসের সেই স্বর্ণময় দিক সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করি না, — মার্কসীয়-লেনিনীয় বিজ্ঞান এবং তার সামাজিক প্রয়োগসংক্রান্ত সমস্ত প্রত্যয় নিয়েই আমরা তার কথা বলি। ইতিমধ্যেই সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রজাতন্ত্রগুলির মধ্যে সীমানা সম্পর্কে প্রাক্তন ধারণার অবলুপ্তি ঘটেছে, এবং যখন আমরা আমাদের অনন্ত-প্রসারিত জন্মভূমির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ভ্রমণ করি, তখন কারই বা মাথায় আসে লক্ষ্য করতে, — কতগুলি সীমানা অতিক্রম করা গেল? ধীরে ধীরে জাতীয় প্রভেদও মুছে যাবে, আর নিছক নাম অতীতের স্বাক্ষর মাত্রই হয়ে থেকে যাবে। এক ভ্রাতৃসুলভ পারিবারিক বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ মানবজাতি নিজের ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হবে, প্রকৃতিকে বশে আনার সবচেয়ে দুঃসাহসী ভাবনা-চিন্তা বাস্তবে পরিণত করবে।

শাশ্বত শান্তির পরিবেশে ভ্রাতৃত্বপাশে আবদ্ধ স্বাধীন ও সমাধিকারসম্পন্ন মানুষের সৃজনশীল শ্রম — একেই কি

সুখ

বলে না, — যে সুখ কমিউনিজম নিয়ে আসছে জনগণের জন্য?

পৃথিবীতে এমন লোক বোধ হয় দুটি পাওয়া ভার, যারা সুখ বলতে কী বোঝায়, — এই প্রশ্নের একই রকম উত্তর দেবে। একজনের কাছে জীবনের পক্ষে সকল আনন্দ সংসারিক ক্ষুদ্রতার দিকে মনোযোগ না দিয়ে নিজের প্রিয়

কাজ নিয়ে মেতে থাকার মধ্যে। অন্যজন সক্রিয় সামাজিক কার্যকলাপ ছাড়া সুখের কথা ভাবতেই পারে না, তৃতীয় জন হয়ত বা ভালোভাবে খাওয়া-পরার সম্ভাবনা ও প্রাচুর্যের কথা বলবে। চতুর্থ জন অবশ্যই খেলাধুলার কথা উল্লেখ করবে। বয়স ও মানসিকতা অনুসারে অনেকে প্রেম ও বাৎসল্যকে প্রথম স্থান দেবে... আর প্রত্যেকে এর মধ্যে যে-কোন এবং জীবনের আরও বহু আনন্দেরই পূর্ণমাত্রায় অধিকারী হবে। এবং হয়ত বা — একসঙ্গে সবগুলির।

কেউই অবশ্য সুখের গ্যারাণ্টি-কার্ড দিতে পারে না। মানুষের ভাগ্য এক এক রকমভাবে বিন্যস্ত। মানুষের জীবন থেকে সৃজনী অতৃপ্তি ও প্রতারিত আশা, ঈর্ষা ও অচ্ছেদ্য প্রেমের মতো মানসিক দুঃখ ও সংঘর্ষের চিরাচরিত কারণগুলি কারও পক্ষে কখনই দূর করা সম্ভব হবে বলে বাহ্যত মনে হয় না। এক কথায়, মনের কারিগরদের — লেখকদের উপর বিরাট কাজের ভার পড়বে: রঙ্গ-ব্যঙ্গ ও প্রহসনের বিষয় ছাড়াও জীবন নাটক ও ট্র্যাজিডির মালমশলা সরবরাহ করতে থাকবে। বিদ্রূপের তীক্ষ্ন অস্ত্রেও মরচে ধরবে না: মানবজাতি যখন সামনে এগিয়ে যায়, তখন সে সর্বদাই হাসি-ঠাট্টা দিয়ে তার অসঙ্গতি দূর করে।

আর মানবজাতি সব সময়ই এগিয়ে যাবে, এবং মানুষ যে এই আন্দোলনের একজন অংশীদার, সে যে নিজের সময়ের সঙ্গে পা ফেলে চলছে — এই বোধের চেয়ে সম্ভবত আর কোন কিছুই তাকে বেশি সুখ দিতে পারে না। ঠিক এই কারণেই, আর যে-কোন ব্যাপারে আমরা আমাদের উত্তরপুরুষের কাছে হার মেনেও, যা সবচেয়ে প্রধান তাতে হার মানছি না, — হার মানছি না আমাদের সুখী হওয়ার ক্ষমতায়।

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন
২১, জুবোভস্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
21, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union

Редактор русского текста
Л. П. Чернова
Контрольный редактор
М. Н. Кафитина
Художественный редактор
В. С. Камкина
Технические редакторы
И. И. Володина,
Н. И. Касаткина

Сдано в набор 4.01.1976 г.
Подписано в печать 18.11.1976 г.
Формат 74×90$^{1}/_{32}$.
Бумага типографская № 1.
Условн. печ. л. 21,55. Уч.-изд. л. 27,67.
Тираж 17.700 экз. Заказ № 18.
Цена 3 руб. 39 коп.
Изд. № 21219.

Издательство «Прогресс»
Государственного комитета
Совета Министров СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.
Москва 119021, Зубовский бульвар, 21.

Ордена Трудового Красного Знамени
Московская типография № 7 «Искра революции»
«Союзполиграфпрома» при Государственном
Комитете Совета Министров СССР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, Г-21, Зубовский бульвар, 21.

3 р. 39 к.